

# হাজারো প্রশ্নের জবাব

২ ॥ শিক্ষা-ক্যারিয়ার-সাফল্য

মহাজাতক

কেয়ারান্টাম

কোয়ান্টাম  
হাজারো প্রশ্নের জবাব  
২ ॥ শিক্ষা-ক্যারিয়ার-সাফল্য



মহাজাতক



যোগ ফাউন্ডেশন  
[www.quantummethod.org.bd](http://www.quantummethod.org.bd)

কোয়ান্টাম ৯ হাজারো প্রশ্নের জবাব

পর্ব ২ ৯ শিক্ষা-ক্যারিয়ার-সাফল্য

মহাজাতক

প্রকাশক

মায়িশা তাবাসসুম

যোগ ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,

শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৮৩৯৬৮১৫, ৮৩৯১৩৯১

০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩, ০১৭৪০-৬৩০৮৫৬, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮

E-mail : info@quantummethod.org.bd

গ্রন্থস্বত্ব

লেখক

প্রথম প্রকাশ

আখেরি দোয়া

২৭ জুলাই, ২০১২

প্রচ্ছদ

আবদুল্লাহ জুবাইর

মুদ্রাকর

উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার

ইসলাম ভবন (২য় তলা)

৬৮ ফকিরাপুল বাজার রোড,

ঢাকা-১০০০

মূল্য

৫২৫ টাকা

Quantum

Hajaro Proshner Jobab 2

(Quantum : The Answer to a Thousand Questions 2)

By : Mahajataq

Published by

Yoga Foundation

www.quantummethod.org.bd

Price : 85 \$

## উৎসর্গ

জানার আত্মহ নিয়ে  
যারা প্রশ্ন করেছেন,  
যাদের প্রশ্নের জবাব থেকে  
আলোকিত হয়েছেন  
লাখো মানুষ,  
সেই সত্যানুসঙ্গীদের  
উদ্দেশ্যে নিবেদিত ।

# হাজারো প্রশ্নের জবাব

২ ॥ শিক্ষা-ক্যারিয়ার-সাফল্য

মহাজাতক

কোয়ান্টাম

সাফল্যের রহস্য ৯

সফল হতে হলে ...	১১
মনছবি ॥	
মনছবি কী ॥ কীভাবে কাজ করে	১৭
লক্ষ্য কী হবে	২২
মনছবিতে কী দেখবো ॥ কীভাবে দেখবো	২৪
একাধিক বিষয়ে মনছবি	২৯
কখন, কতবার, কতক্ষণ	৩১
দেখতে না পেলে	৩২
মনছবির সময়সীমা	৩২
মনছবির যৌক্তিকতা	৩৩
লক্ষ্যানুরণন	৩৬
সার্বক্ষণিক সম্পৃক্ততা	৩৭
নীরবে কাজ	৩৯
মনছবি প্রক্রিয়া	৪১
মনছবি ও ধর্ম	৪৫
মনছবি পরিবর্তন	৪৭
মনছবি : অন্যান্য	৪৯
অন্যের ব্যাপারে মনছবি	৫১
মনছবি বাস্তবায়নে অন্যের সহযোগিতা	৫২
মনছবিতে আস্থা আনতে পারছি না	৫৩
মনছবি বাস্তবায়িত হচ্ছে না	৬১
জীবন ছবি কেমন হবে	৬৪

শিক্ষায় সাফল্য ৬৯

ভালো রেজাল্ট কেন	৭১
মনোযোগ বাড়াতে	৮০
মনে রাখার জন্যে	৮৬
পরীক্ষায় ভালো করার জন্যে	৮৮
রঙটিনের গুরুত্ব	৯৫
লক্ষ্য ঠিক করা	৯৯
উচ্চশিক্ষা ॥ কী পড়বেন, কোথায় পড়বেন	১০৬
প্রসঙ্গ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি	১০৮
বিদেশে পড়তে যাওয়া	১০৯
ভালো জায়গায় ভর্তি হতে না পারলে	১১১
আলস্য ও দীর্ঘসূত্রিতা কাটাতে	১১৮
ঘুমের সমস্যা	১২৯
মেডিটেশন কেন	১৩২
ফাউন্ডেশনের সাথে একাত্মতা	১৩৫
বন্ধুত্ব ও প্রেম ॥ শিক্ষার্থী জীবনের ফাঁদ	১৩৮

সূচিপত্র

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক	১৪৫
ছাত্রজীবনে ক্ষোভ-অভিমান	১৪৬
কাজ করে পড়ার খরচ যোগানো	১৫০
পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা	১৫৩
ইংলিশ মিডিয়াম	১৫৬
শিক্ষকদের প্রশ্ন	১৫৯
জীবনের মডেল	১৬২

ক্যারিয়ার ১৬৫

চাকরি না স্বাধীন পেশা	১৬৭
সঠিক ক্যারিয়ার	১৭১
ক্যারিয়ার এবং কাজের তৃপ্তি	১৭২
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ক্যারিয়ার	১৭৪
সরকারি চাকরি	১৭৯
শখ কি পেশা হতে পারে?	১৮৪
বিদেশে চাকরি	১৮৫
আইন পেশা	১৮৬
ব্যাংকে চাকরি	১৮৮
মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি	১৯১
ব্যবসা	১৯৪
শেয়ার ব্যবসা	২০৫
কর্মসন্ধান	২০৮
সফল ক্যারিয়ারের সূত্র ॥	
কাজকে ভালবাসা	২১৬
পদ-আনুগত্য ॥	
‘বস ইজ অলওয়েজ রাইট’	২২০
কলিগদের সাথে সম্পর্ক/ পেশাদারিত্ব	২২৫
ক্রম-উৎকর্ষ ॥ দক্ষতা ॥ যোগ্যতা	২২৮
পেশাজীবী ৥ বৃত্তিজীবী	২৩০
চাকরি বদল	২৩৩
পেশা ও নৈতিকতা	২৩৭
ফাউন্ডেশন যখন পেশা	২৪৩
সেলিব্রেটি ক্যারিয়ার	২৪৭
ক্যারিয়ার ॥ সঠিক ধারণা	২৪৮

## সাফল্যের চোরাবালি ২৫৩

অপচয় ॥	
অপচয় কী? কেন?	২৫৫
বিয়েতে অপচয়	২৬৮
প্রসঙ্গ সামাজিক উপহার	২৭২
অন্যের সাহায্যের অপেক্ষায় থাকা	২৮৯
চাওয়া বনাম যোগ্যতা	২৯৩
ধারাবাহিকতা	২৯৬
দূর্দশার বৃত্ত	২৯৮
ঋণের জাল	৩০৪
ক্ষুদ্রঋণ	৩১০
পণ্যঋণ	৩১৮
ব্যবসায় ঋণ	৩১৯
ঋণ করে বাড়ি করা	৩২৭
ঋণ নিয়ে বিয়ে	৩২৮
প্রসঙ্গ ক্রেডিট কার্ড বা কার্ডুলি কার্ড	৩৩০
ঋণ থেকে উত্তরণ	৩৩৩
ঋণ ফেরত	৩৩৫
পেশা যখন ঋণ নিতে উৎসাহিত করা	৩৩৬
বিবিধ	৩৩৭
প্রতারণা ॥	
নেটওয়ার্কিং/ মাল্টিলেভেল মার্কেটিং	৩৩৯
বিদেশে চাকরি	৩৬২
চাকরি দেয়ার নামে প্রতারণা	৩৬৬
টাকা ধার দিয়ে প্রতারণা	৩৭১
আত্মীয়-বন্ধুদের দ্বারা প্রতারণা	৩৭২
কেনাকাটা করতে গিয়ে	৩৭৩
জমি কিনতে গিয়ে প্রতারণা	৩৭৬
সাহায্য করতে গিয়ে	৩৭৭
ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে	৩৭৯
ইন্টারনেট/ মোবাইলে প্রতারণা	৩৮২
প্রেমে প্রতারণা	৩৮৪
বিয়েতে প্রতারণা	৩৯০
প্রতারণা : আরো নানা ধরন	৩৯৪
প্রতারণিত হওয়ার কারণ	৩৯৮
শেয়ার বাজার ॥ জুয়া বাজার	৪০৪

## প্রাচুর্যের পঞ্চসূত্র ৪১১

প্রাচুর্য কী?	৪১৩
প্রাচুর্য ও ধর্ম	৪১৮
প্রাচুর্যের প্রক্রিয়া	৪২০
শুকরিয়া	৪২৬
মনছবি	৪২৯
সেবা বা সাদাকা বা দান	৪২৯
সবর	৪৩১
সজ্জায়ন	৪৩৭
পেতে হলে দিতে হবে	৪৩৯
দান কেন?	৪৪১
দান কি শুধু ধনীরাই করবে?	৪৪৯
দান ॥ কাকে, কীভাবে	৪৫০
দান যখন ভিক্ষা	৪৫৪
কীভাবে ব্যয় হয়	৪৬০
দানে উদ্বুদ্ধ করা	৪৬৩
উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে	
বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা	৪৬৫
মাটির ব্যাংকে দানের প্রক্রিয়া	৪৬৯
প্রসঙ্গ মানত	৪৭৮
নিয়ত পূরণ না হলে	৪৮৪
আত্মিক শিশু ॥ রক্তদান ॥	
মুষ্টিচাল ॥ মৃত্যুবার্ষিকী	৪৮৫
এগিয়ে যান	৪৮৯
সামনে এগুতে হলে	৪৯১
শৃঙ্খলা	৪৯৫
আত্মপর্যালোচনা	৪৯৮
সিদ্ধান্ত	৪৯৯
গ্রাউন্ড জিরো	৫০১
শ্রমানন্দ	৫০৩

## লাখো মানুষের মতো আপনিও বলবেন ...

অন্ধকারকে মানুষ ভয় পায়। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। তাই অজানা আশঙ্কা চেপে বসে তার মনে। ভোরের আলোয় আঁধার কাটতে শুরু করলে অজানা আশঙ্কাও কেটে যায়। সে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। নেমে পড়ে কাজে। এগিয়ে যায় সামনের দিকে।

সকল অন্ধকারের নিকৃষ্ট অন্ধকার অবিদ্যা। অবিদ্যা জন্ম দেয় নেতিবাচকতা অশান্তি লোভ লাম্পট্য শোষণ বঞ্চনা প্রতারণা ব্যর্থতা রোগ শোক হতাশা। অফুরন্ত সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেও তারুণ্য ও যৌবনের শক্তি পরিণত হয় প্রতারক শোষণক লাম্পট শোষিত বা দাসে।

অবিদ্যার অন্ধকার দূর হয় বিদ্যার আলোয়। বিদ্যার সূচনা হয় মুক্ত বিশ্বাস থেকে। আর মুক্ত বিশ্বাসের পথে অন্তরায় হচ্ছে অহেতুক প্রশ্ন। শয়তানের কৌশল হচ্ছে বিশ্বাস থেকে বিরত রাখতে না পারলে সংশয় সৃষ্টি করে দেয়া। আর অহেতুক প্রশ্ন ঢুকে পড়ে মানুষের স্বভাবজাত কৌতূহল বা জানার আগ্রহের সদর দরজা দিয়ে। সৃষ্টি হয় সংশয়।

অবিদ্যার অন্ধকার দূর করার জন্যেই কোয়ান্টাম ডাক দিয়েছে মুক্ত বিশ্বাসের। বলেছে, হে তরণ! শক্তি তোমার মধ্যেই রয়েছে। অন্তরের শক্তিকে জাগ্রত কর। কোনো অভাব থাকবে না। যা দেখে তুমি বিস্মিত হও, সে বিস্ময় সৃষ্টি করার ক্ষমতা তোমার মধ্যেই আছে।

হাজার হাজার মানুষের কৌতূহল আর আগ্রহ সৃষ্টির পাশাপাশি এসেছে হাজারো প্রশ্ন। আর এ প্রশ্নগুলোর জবাব পেতেও তাদের সময় লাগে নি। দ্বিধা সংশয় ভেসে গেছে বাস্তবতা ও বিদ্যার আলোয়। তারা পৌঁছে গেছেন সাফল্যের স্বর্ণদ্বারে।

কোয়ান্টাম মেথড চর্চার গত ২০ বছরের এমনি অসংখ্য প্রশ্নের জবাবের সংকলনই হচ্ছে ‘কোয়ান্টাম ৯ হাজারো প্রশ্নের জবাব’। আপনার মধ্যে সন্দেহ সংশয় বলে যদি কিছু থাকে তা দূর হবে অনায়াসে। কৌতূহল ও জানার আগ্রহ পাবে পূর্ণ তৃপ্তি। আপনি উপলব্ধি করবেন জীবনের আসল সত্য। লাখো মানুষের মতো আপনিও বলবেন—আমিও বিশ্বাস করি! আমিও পারি!



## পর্ব-২ ॥ শিক্ষা-ক্যারিয়ার-সাফল্য

কোয়ান্টাম ॥ হাজারো প্রশ্নের জবাব, পর্ব-১ : মেডিটেশন-এ টেনশন, নেতিবাচকতা, ইতিবাচকতা এবং মেডিটেশন সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আপনাকে প্রশান্তির পথের বাধাগুলো অতিক্রম করতে সহায়তা করবে ব্যাপকভাবে। আপনার জীবনদৃষ্টি ও অনুশীলন পাবে নতুন প্রাণপ্রবাহ।

পর্ব-২ এ উত্তর পাবেন সাফল্য ও প্রাচুর্য সংক্রান্ত প্রশ্নাবলীর। কর্মজীবনের চোরাবালি ও বিধ্বংসী ফাঁদগুলো বিস্তারিতভাবে উঠে এসেছে জবাবে। শিক্ষা, পেশা, ক্যারিয়ারের করণীয়-বর্জনীয়গুলো আপনার কাছে খুব সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। সাফল্যের পরীক্ষিত এই সার্বজনীন সূত্রগুলো অনুসরণ করলে আপনার জীবন হয়ে উঠবে গতিময়, আনন্দময়। ধাপে ধাপে ছন্দে ছন্দে আপনি পা রাখবেন সাফল্যের স্বর্ণদ্বারে।

# সাফল্যের রহস্য



## সফল হতে হলে ...

**প্রশ্ন :** সফলতা বলতে কী বোঝায়?

**উত্তর :** সাফল্য শুধু অর্থ ক্ষমতা শক্তি বা খ্যাতির নাম নয়। সাফল্য হচ্ছে জীবনের এমন এক অবস্থান যেখানে পৌঁছে আপনার মনে হবে, আপনার বেঁচে থাকাটা সার্থক হয়েছে। মনে হবে, নিজের মেধার কিছুটা হলেও স্ফূরণ ঘটাতে পেরেছেন। নিজের এবং মানুষের কিছু হলেও কল্যাণ করতে পেরেছেন। যখন আপনি তৃপ্তির সাথে চোখ বন্ধ করে বলতে পারবেন—আমার যা কিছু করার ছিলো করেছে, যা কিছু দেখার ছিলো দেখেছি, যা কিছু বলার ছিলো বলেছি। আর তখনই বলা যাবে, আপনি একজন সফল মানুষ।

একই সাথে সাফল্যকে আমরা বলতে পারি এমন একটা অনুভূতি, মেধা-ক্ষমতা এবং দক্ষতার এমন এক স্ফূরণ যেখানে প্রতিটি যুক্তিসঙ্গত চাওয়া পাওয়ায় রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। আপনি যা চাচ্ছেন, এই মুহূর্তে আপনি সেটা না-ও পেতে পারেন, কিন্তু পাওয়ার প্রক্রিয়ায় তা প্রবেশ করেছে এবং আজ হোক, কাল হোক তা আপনি পাবেনই। আর নিজের চাওয়াকে পাওয়ায় রূপান্তরিত করার পাশাপাশি আরো বহু মানুষের চাওয়াকে পাওয়ায় রূপান্তরিত করতে সাহায্য করতে পারবেন তখন।

আসলে সাফল্যের ধরন অনেক। মানসিক সাফল্য হলো প্রশান্তি, শারীরিক সাফল্য সুস্বাস্থ্য আর আর্থিক সাফল্য হচ্ছে সচ্ছলতা। আত্মিক সাফল্য হচ্ছে আত্ম উপলব্ধি। অর্থবিত্ত, খ্যাতি-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি সাফল্যের একেকটি উপকরণ হলেও এককভাবে এগুলো কোনোটাই সাফল্য নয়। সাফল্য মানে অভাববোধের অনুপস্থিতি।

সাফল্য এক বিরামহীন প্রক্রিয়া। সফল তিনিই যিনি আপাত ব্যর্থতার ছাই থেকে গড়ে নিতে পারেন নতুন প্রাসাদ। প্রতিটি অর্জনকেই মনে করেন নতুন শুরুর ভিত্তি। প্রতিটি অর্জন শেষে শুরু করেন আরো বড় অর্জনের অভিযাত্রা।

**প্রশ্ন :** সফল হওয়ার জন্যে তো অনেক উপকরণ প্রয়োজন। আমি একজন অভাবী মানুষ। আমার তো কোনো উপকরণ নেই। তাছাড়া আমি জিনিয়াসও নই। আমার কী হবে?

**উত্তর :** এটা একটা সুন্দর প্রশ্ন। আসলে সফল হওয়ার জন্যে উপকরণ অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সে উপকরণগুলো বাইরে কোথাও খুঁজে পাবেন না,

বরং তার সবটাই আছে আপনার নিজের মধ্যে ।

ধরুন, আপনার দেহ । পাঁচ শতাধিক মাংসপেশি, দুই শতাধিক হাড়, ৭০ থেকে ১০০ ট্রিলিয়ন কোষ বা সেলের সমন্বয়ে গঠিত এই শরীরের প্রতিটি সেলে খাবার পৌঁছানোর জন্যে রয়েছে শিরা ও ধমনীর ৬০ হাজার মাইল দীর্ঘ পাইপ লাইন । আর আপনার হার্ট কোনোরকম ক্লান্তি বা প্রতিবাদ ছাড়াই প্রতিদিন এক লক্ষবার স্পন্দনের মাধ্যমে ১৬ শত গ্যালনেরও বেশি রক্ত পাম্প করে দেহকে সচল রাখছে । আর এ সবকিছুই হচ্ছে এক অসাধারণ দক্ষ স্বয়ংক্রিয় সমন্বয়প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে । এরকম বিস্ময়কর কর্মক্ষমতাসম্পন্ন দেহ ধারণ করার পরও যদি আপনি মনে করেন আপনার কোনো উপকরণ নেই, তাহলে এর চেয়ে ভ্রান্তি আর কিছু হতে পারে না ।

আবার আপনি যদি নিজেকে অভাবী মনে করেন, তাহলে আপনার জানা থাকা দরকার যে, মস্তিষ্কে নিউরোসায়েন্টিস্টরা সবচেয়ে আধুনিক কম্পিউটারের চেয়েও কমপক্ষে ১০ লক্ষ গুণ শক্তিশালীরূপে বর্ণনা করেছেন । তাহলে কম্পিউটারের দামের অনুপাতে আপনার ব্রেনের মূল্য কমপক্ষে পাঁচ হাজার কোটি টাকা । পাঁচ হাজার কোটি টাকা পুঁজির মালিক আপনি । এরপরও আপনি অভাবী হন কীভাবে?

মস্তিষ্কের মাত্র একটি বিষয়ও যদি আপনি দেখেন, তাহলেও এর বিশাল কর্মক্ষমতা ও প্রতিটি মানুষের অফুরন্ত সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে পারবেন । মস্তিষ্কের ১০০ বিলিয়ন নিউরোন সেলের প্রতিটি নিউরোন এক হাজার থেকে পাঁচ লক্ষ নিউরোনের সাথে সংযুক্ত । প্রতিমুহূর্তে কমপক্ষে ১০০ ট্রিলিয়ন যোগাযোগ ঘটছে মস্তিষ্কে । প্রতিটি নিউরোন মস্তিষ্কের যেকোনো নিউরোনের সাথে সংযোগ স্থাপনে সক্ষম । কতগুলো সংযোগ সম্ভব? যুক্তরাষ্ট্রে মেডিটেশন সংক্রান্ত গবেষণার অগ্রপথিক হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের প্রফেসর ডা. হার্বার্ট বেনসন খুব চমৎকারভাবে বলেছেন, ‘সংখ্যাটি হবে : ২৫,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ । এটাকে অন্যভাবেও দেখতে পারেন—আপনি আপনার টেবিলে একটার ওপর একটা সাধারণ সাইজের টাইপ করার কাগজ রাখুন । রাখতে থাকুন । এটা উঁচু হতে থাকবে । আপনি যদি আপনার মস্তিষ্কের সম্ভাব্য নিউরোন সংযোগ-সংখ্যার সমসংখ্যক কাগজ রাখতে যান, তাহলে কাগজের ঢিবি উঁচু হতে হতে চাঁদ পার হয়ে সৌরজগৎ পার হয়ে গ্যালাক্সি পার হয়ে যাবে । এমনকি আমাদের জানা মহাবিশ্বের সীমানা—১৬ বিলিয়ন আলোকবর্ষ—পার হয়ে যাবে । তারপরও কাগজ রয়ে যাবে ।’

আর সভ্যতার সবকিছুর পেছনেই রয়েছে এই ব্রেনের ক্ষমতার সৃজনশীল প্রয়োগ। যে মানুষ যাত্রা শুরু করেছিলো গুহা থেকে বা জঙ্গল থেকে, সে মানুষই এখন তৈরি করেছে গগনচুম্বী অট্টালিকা, মহাকাশযান বা সুপার কম্পিউটার। মস্তিষ্কে কাজে লাগিয়ে দেহের কার্যক্ষমতাকেও সে বাড়িয়েছে বহুগুণ। জয় করেছে দেহের সীমাবদ্ধতাগুলো। সময় যত এগুচ্ছে মানুষ মস্তিষ্কের সামর্থ্যকে তত বেশি বেশি কাজে লাগাচ্ছে। প্রযুক্তি শিল্প সাহিত্য—প্রতিটি ক্ষেত্রে তৈরি করেছে নতুন দিগন্ত। তার মানে জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য হচ্ছে, প্রতিটি মানুষ সুপ্ত জিনিয়াস। মেধা তার মস্তিষ্কে ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে। একে জাগিয়ে তুলেই মানুষ আপাত সব অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। আমরা ২০ বছর ধরে যে কথাগুলো বলে এসেছি, গবেষক ডেভিড শ্যাংক-এর সম্প্রতি প্রকাশিত বই ‘জিনিয়াস ইন অল অফ আস’-এ সে কথাকেই একটু ভিন্নভাবে বলা হয়েছে, ‘জন্মের সময় দিয়ে দেয়া হয়েছে—এমন আলাদা কোনো ‘গোল্ডেন জিন’ নেই। বিশেষ মেধা প্রকৃতিগত নয় বরং মেধা হচ্ছে অদম্য ইচ্ছা আর প্রাণান্ত প্রয়াসের ফসল। আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন, অদম্য সাহস আর নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে যে কেউ সফল, খ্যাতিমান ও জিনিয়াস হিসেবে বিখ্যাত হতে পারে।’

অতএব বুঝতেই পারছেন, প্রাচুর্যবান হওয়ার জন্যে যা যা উপকরণ প্রয়োজন সবই আছে আপনার মধ্যে। নিজের ওপর বিশ্বাসে অটল থাকুন, নিরলস পরিশ্রম করুন আর অন্তর্গত শক্তিকে লক্ষ্য অর্জনে কাজে লাগান। আপনি সফল হবেন।

**প্রশ্ন :** গুরুজী, এমন একটি জিনিসের কথা বলুন যেটি সাফল্যের জন্যে প্রথম প্রয়োজন।

**উত্তর :** সাফল্যের জন্যে, মন ও মস্তিষ্কের অফুরন্ত শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্যে প্রথমত প্রয়োজন এর ওপরে বিশ্বাস স্থাপন। বিজ্ঞানীরা বলেন, ‘আমি পারবো, এই দৃঢ় বিশ্বাসই সকল সাফল্যের ভিত্তি’। তারা বলেন, পারবো বলে বিশ্বাস করলে আপনি অবশ্যই পারবেন। আসলে বিশ্বাস হচ্ছে সকল সাফল্য, সকল অর্জনের ভিত্তি। বিশ্বাসই রোগ নিরাময় করে, ব্যর্থতাকে সাফল্যে আর অশান্তিকে প্রশান্তিতে রূপান্তরিত করে। বিশ্বাসই মেধাকে বিকশিত করে, যোগ্যতাকে কাজে লাগায় আর দক্ষতা সৃষ্টি করে।

বিশ্বাস কীভাবে যোগ্যতা ও সাফল্য সৃষ্টি করে তার অসংখ্য উদাহরণ

রয়েছে। হাজার বছর ধরে দৌড়বিদরা মনে করতেন চার মিনিটে এক মাইল দৌড়ানো সম্ভব নয়। বিশেষজ্ঞরা বলতেন যে, মানুষের পায়ের পেশির শক্তি ও ফুসফুসের সামর্থ্য-এ দুটোই এক্ষেত্রে অন্তরায়। এমনকি চেষ্টা করলে সে মারাও যেতে পারে। হাজার বছর পর ইংল্যান্ডের যুবক রজার ব্যানিস্টার প্রথম বিশ্বাস শুরু করলেন, চার মিনিটে এক মাইল দৌড়ানো যাবে। অনুশীলনের পর অনুশীলন। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ১৯৫৩ সালে তিনি চার মিনিটে এক মাইল দৌড়ের রেকর্ড করলেন। তার ১৫ দিনের মাথায় জন ল্যান্ডি চার মিনিটের চেয়ে দুই সেকেন্ড কমে এক মাইল দৌড়ালেন। বিস্ময় কিন্তু ওখানে নয়, বিস্ময় তারপরে। পরবর্তী ৩০ বছরে হাজারেরও বেশি দৌড়বিদ চার মিনিটে এক মাইল দৌড়েছেন। যখন মানুষ বিশ্বাস করতো যে, সম্ভব নয়, কেউ পারে নি। যেদিন রজার ব্যানিস্টার বিশ্বাস করলেন এবং করে দেখিয়ে দিলেন, তারপর হাজার জন পারলেন।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির যে ইতিহাস, এটিও বিশ্বাসের বিজয়ের ইতিহাস। যেকোনো প্রযুক্তি প্রথমে বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেছেন যে, এটি তৈরি করা সম্ভব, এটি বানানো সম্ভব। তারপরে তিনি বানিয়েছেন। আপনি দেখুন, বিমানের ইতিহাস। হাজার বছর ধরে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন যে, বাতাসের চেয়ে ভারী বস্তু আকাশে উড়বে না। ওড়ে নি। প্রথমে রাইট ব্রাদার্স বিশ্বাস শুরু করলেন যে, না, বাতাসের চেয়ে ভারী বস্তু আকাশে উড়বে যদি তার দেহ এবং ডানার অনুপাত ঠিক হয় এবং তাতে গতির সঞ্চর করা যায়। অন্যান্য বিজ্ঞানীরা তাদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করেছেন। কিন্তু রাইট ব্রাদার্স বিশ্বাসে অটল থাকলেন। বিমান তৈরি করলেন। সভ্যতার চেহারা পাণ্টে গেল।

পৃথিবীর যত বড় বড় ধনকুবের, তার শতকরা ৯০ জন খুব সাধারণ অবস্থা থেকে উঠে এসেছেন এই বিশ্বাসকে সম্মল করে। আমেরিকায় তার সময়কার সবচেয়ে বড় ধনকুবের এড্‌লি কার্নেগি বস্তির ছেলে ছিলেন। ১২ বছর যখন তার বয়স তখন তিনি একটি পাবলিক পার্কে ঢুকতে চেয়েছিলেন। দারোয়ান তাকে ঢুকতে দেয় নি তার ময়লা নোংরা পোশাকের জন্যে। কিন্তু সেই ১২ বছর বয়সী ছেলেটির মনে এত প্রত্যয়, এত বিশ্বাস ছিলো যে, সেখানে দাঁড়িয়ে নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যেদিন আমার টাকা হবে, সেদিন এই পার্কটা আমি কিনে ফেলবো। ৩০ বছর পরে এড্‌লি কার্নেগি তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। তিনি সেই পার্কটি কিনেছিলেন। সেখানে একটি নতুন সাইনবোর্ড লাগিয়েছিলেন। সে সাইনবোর্ডে লেখা ছিলো-‘আজ থেকে দিনে বা রাতে, সকালে বা বিকেলে, যেকোনো বয়সের, যেকোনো মানুষ, যেকোনো

পোশাকে এই পার্কে প্রবেশ করতে পারবে’।

বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস-এর যে পার্থক্য, ছোট্ট একটি উদাহরণ দিয়ে আমরা বোঝাতে পারি। আপনার সামনে মেঝেতে যদি ছয় ইঞ্চি চওড়া একটি কাঠের তক্তা বিছিয়ে দেয়া হয় এবং বলা হয়, ভাই বা বোন! এর ওপর দিয়ে একটু হেঁটে যান। আপনি কী করবেন? আপনি দৌড় দেবেন। কারণ আপনি জানেন যে, আপনার পা ফেলার জন্যে ছয় ইঞ্চির চেয়ে বেশি জায়গার দরকার নেই। কারো পায়ের পাতাই ছয় ইঞ্চি চওড়া নয়।

কিন্তু এই তক্তাটাই যদি একটি উঁচু বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে রাস্তার ঐ পারের একটি বিল্ডিংয়ের ছাদে লাগিয়ে দেয়া যায় আর বলা হয় যে, ভাই বা বোন! একটু আগে আপনি কী সুন্দর দৌড় দিয়েছিলেন-এবার দৌড় দিতে হবে না, আস্তে আস্তে টুক টুক করে হেঁটে যান। আপনি কী করবেন? প্রথমে সামনের দিকে তাকাবেন। দেখবেন যে, কত দূর? তারপরে নিচের দিকে তাকাবেন যে, কত উঁচুতে? তারপর মনে হবে যে, যদি পড়ে যাই? এক পা, দুই পা, তিন পা। ব্যস, পড়ে গিয়ে একেবারে আলুর দম হয়ে যাবেন।

প্রথমবার পারলেন, দ্বিতীয়বার পারলেন না কেন? কারণ প্রথমবার আপনার মনে কোনো প্রশ্নই জাগে নি, পড়ে যাওয়ার কোনো চিন্তাই আসে নি। দ্বিতীয়বার আপনার মনে প্রশ্ন ঢুকে গেছে, যদি পড়ে যাই? অথচ সার্কাসে আপনারা দেখেছেন, দড়ির ওপর দিয়ে ১২ বছরের কিশোর দৌড়ে চলে যাচ্ছে। সে পারছে, আপনি পারছেন না কেন? কারণ সে বিশ্বাস করছে যে, সে পারবে। আর আপনার মনে প্রশ্ন জেগে গেছে, যদি পড়ে যাই?

আসলে আমাদের সবকিছুই আছে, অভাব শুধু বিশ্বাসের। আমরা নিজেদেরকে বিশ্বাস করতে পারি না। বিশ্বাস করতে পারি না যে, আমিও পারি। বিশ্বাস করতে পারি না যে, আমিও পারবো। যেদিন বিশ্বাস করতে পারবেন যে, আমিও পারি, সেদিন আপনার প্রতিটি যুক্তিসঙ্গত চাওয়া পাওয়ায় রূপান্তরিত হবে। বিশ্বাসই আপনাকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নেবে।

**প্রশ্ন :** কয়েকবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। চরম হতাশায় ভুগছি। আমার পক্ষে কি সফল হওয়া সম্ভব?

**উত্তর :** অবশ্যই সম্ভব। বরং বলা যেতে পারে, ব্যর্থ হয়েছেন বলেই আপনার সফল হওয়াটা এখন সহজ। কারণ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি সফল মানুষের শুরুটা ব্যর্থতা দিয়েই। জেমস ডাইসন। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নামক যে যন্ত্রটি



এখন আধুনিক মানুষের ঘরবাড়ি, অফিস, হোটেল ও অন্যান্য স্থান পরিষ্কারের এক প্রয়োজনীয় উপকরণ হয়ে গেছে তার আবিষ্কারক। মজার ব্যাপার হলো, এ মেশিনটিকে যথাযথ রূপ দেয়ার আগে জেমস ডাইসনকে ব্যর্থ হতে হয়েছিলো পাঁচ হাজার বারেরও বেশি।

জেমস চাইছিলেন এমন একটা ভ্যাকুয়াম তৈরি করবেন যাতে কোনো ব্যাগ থাকবে না। কারণ ব্যাগ থাকলেই ধুলোবালিতে আচ্ছন্ন হয়ে কিছুদিনের মধ্যেই মেশিন জ্যাম হয়ে যায়। পাফটা নষ্ট হয়ে যায়, ফলে ধুলোবালি টেনে নেয়ার ক্ষমতাটা আর মেশিনের থাকে না। এ লক্ষ্যে জেমস ক্লাস্তিহীনভাবে কাজ করে গেলেন পাঁচ পাঁচটি বছর। গবেষণায় পুরো সময় দেয়ার জন্যে চাকরিটা ছেড়ে দিলেন। স্ত্রীর উপার্জন দিয়েই এ সময় চলতে হয়েছে তাকে। পাঁচ বছরে অনেকবারই এমন অনেক পরিস্থিতি এসেছে যাতে হাল ছেড়ে দেয়াটাই ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু জেমসের কাছে এটা স্রেফ একটা মেশিন আবিষ্কার ছিলো না, এটা ছিলো তার জীবন।

বছর পাঁচেক পর মেশিনটা তৈরি হলো ঠিক। কিন্তু এটাকে কেনার জন্যে কোনো কোম্পানিকে রাজি করানো গেল না। তিনটি বছর তিনি শুধু এক কোম্পানি থেকে আরেক কোম্পানির দরজায় ঘুরেছেন কয়েকটি টাকার বিনিময়ে এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটার লাইসেন্স বিক্রি করার জন্যে। কিন্তু সবাই মেশিনটার কার্যক্ষমতার প্রশংসা করলেও বাজারে চলবে কি না এটা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করতো। কারণ বাজার সয়লাব হয়ে আছে ব্যাগওয়ালা ভ্যাকুয়াম ক্লিনারে। সেখানে এরকম ব্যাগহীন একটা ভ্যাকুয়ামকে ক্রেতার কাঁভাবে নেবে সেটা নিয়েই সবার আশঙ্কা ছিলো।

অবশেষে ১৯৯৩ সালে জেমস নিজেই এটার বাজারজাতকরণের উদ্যোগ শুরু করলেন। মাত্র দেড় বছরের মাথায় ডিসি ০১ হয়ে উঠলো বাজারের সবচেয়ে বেশি বিক্রিত ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। জেমস বলেন, যে ব্যাগ না থাকাকে এর বাজারে মার খাওয়ার কারণ হিসেবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলো সবাই, সেই ব্যাগ না থাকাটাই হয়ে গেল এর জনপ্রিয়তার সবচেয়ে বড় কারণ। আর আমি সেটাই জানতাম। তাই তো প্রথমবার ব্যর্থ হয়ে আমি যেমন থেমে যাই নি, তেমনি ৫০ বার ব্যর্থ হয়েও হতাশ হই নি। হাল ছেড়ে দেই নি পাঁচ হাজার বার ব্যর্থ হয়েও। কারণ আমি জানতাম—এগুলো ব্যর্থতা নয়, বরং এ হলো একটু একটু করে সফলতার দিকে এগুনো।

কাজেই আপনার হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আপনার ব্যর্থতাগুলো আসলে আপনার সাফল্যের পথেরই একেকটি ধাপ।

# মনছবি ॥

## মনছবি কী? কীভাবে কাজ করে?

প্রশ্ন : মনছবি আসলে কী?

উত্তর : মনছবি মনের পর্দায় গভীর বিশ্বাস আর একাত্ম মনোযোগে লালিত সাফল্যের ছবি। অর্থাৎ আপনি যা হতে চান বা পেতে চান তা প্রথমত চাওয়া, পাবো বলে বিশ্বাস করা এবং পাচ্ছি বলে অনুভব করার নাম মনছবি। ইতিহাসে সফল মানুষরা কখনোই বিরাজমান অবস্থাকে মেনে নিতে পারেন নি, অন্যের সাফল্য দেখে বিস্মিত হন নি; বরং বিশ্বাস করেছেন যে বিস্ময় সৃষ্টি করার শক্তি তার নিজের মধ্যেই রয়েছে। পরিবর্তনের ক্রমাগত স্বপ্ন তাদের প্রেরণা যুগিয়েছে জীবন বদলাতে, নতুন বাস্তবতা গড়তে। সচেতন বা অবচেতনভাবে তারা আসলে মনছবিই করেছেন। শুধু আশা নয়, মনছবি হলো বিশ্বাস ও কর্মে লালিত ভবিষ্যতের বাস্তবতা। পাখি যেমন তার গন্তব্যে পৌঁছায় ডানায় ভর করে, মানুষও সাফল্যের শিখরে পৌঁছায় মনছবির ডানা মেলে দিয়ে। এ প্রসঙ্গে একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

১৯০৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর, বেলা ১০টা। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাতাসের চেয়ে ভারী শক্তিশালিত এক যান নিয়ে মানুষ সফলভাবে আকাশে উড়লো, হাজার বছর ধরে যা ছিলো শুধু এক অসম্ভব কল্পনা। আর তা করলেন দুই ভাই—উইলবার রাইট এবং অরভিল রাইট।

মজার ব্যাপার হলো, তারা কেউ কিন্তু কোনো বিজ্ঞানী ছিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অঙ্ক, পদার্থবিজ্ঞান বা এরোনটিকেল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তাদের কোনো উচ্চতর ডিগ্রি ছিলো না, এমনকি হাইস্কুলের গন্ডিও তারা পেরোন নি। ডেটনের দুজন বাইসাইকেল মিস্ত্রি কী করে এই অসম্ভবকে সম্ভব করলেন? এক কথায় তার উত্তর—মনছবি।

ছোটবেলায় বাবার এনে দেয়া একটি উড়ন্ত খেলনা থেকেই দুই ভাইয়ের মাথায় প্রথম উড়ে যাওয়ার চিন্তা জাগে। তারপর বছরের পর বছর ধরে গবেষণা, চেষ্টা, ব্যর্থতার পর তারা লাভ করেন এ সাফল্য। এরপর আপনি যখন কোনো বিমানে চড়বেন বা মাথার ওপর দিয়ে বিমান উড়ে যেতে দেখবেন, আপনি অনুভব করার চেষ্টা করবেন কত সাধারণ একটি ভাবনা থেকেই না এ বাস্তবতার শুরু হয়েছিলো। কারণ মন যা ভাবতে পারে, যা বিশ্বাস করতে পারে; তা অর্জন করতে পারে। এখানেই মনছবির শক্তি।

**প্রশ্ন :** মনছবি কীভাবে কাজ করে?

**উত্তর :** মনছবি গতি পায় কল্পনার শক্তিতে। কাজ করে গাইডেড মিসাইলের মতো। আসলে সাফল্য ও আত্ম উন্নয়নের মূল সূত্র হচ্ছে আপনি বাস্তবে যা হতে চান প্রথমে কল্পনায় তা হোন। কেন? ঔপন্যাসিক কুট ভনেগার্টের ভাষায়, ‘আমরা নিজেদের সম্পর্কে যা কল্পনা করি আমরা আসলে তা-ই’। মস্তিষ্কের ভাষা হচ্ছে ছবি বা ইমেজ। আমাদের চিন্তা প্রধানত আমাদের মনের পর্দায় প্রতিফলিত ছবিগুলোর বিশ্লেষণ মাত্র। আমরা আমাদের নিজেদের ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে যে ছবি মনে মনে আঁকি তা আমাদের অনুভূতি, আচরণ ও কর্মতৎপরতাকে প্রভাবিত করে। ফলে মনে মনে নিজের যে ছবি আঁকি, ধীরে ধীরে আমরা তাতেই পরিণত হই।

আমরা যখন একাত্ম কল্পনায় আমাদের লক্ষ্যের ছবি মনে গোঁথে ফেলি তখন তা ব্রেন ও নার্ভাস সিস্টেমকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লক্ষ্য অর্জনের পথে পরিচালিত করে। অনেকটা স্ব-নিয়ন্ত্রিত মিসাইলের (self guided missile) মতো। এই মিসাইলের টার্গেট আগে থেকে নির্ধারিত থাকে। এর কোনো দিক-নির্দেশনার প্রয়োজন হয় না। এটি নিজের পথে এগিয়ে চলে এবং ইতিবাচক ফিডব্যাক দ্বারা (অর্থাৎ যে ফিডব্যাক বলছে সে সঠিক পথে আছে সেই ফিডব্যাক দ্বারা) প্রভাবিত হয় না।

কিন্তু যখনই সে তার লক্ষ্যপথ থেকে বিচ্যুত হতে শুরু করে তখনই সে প্রাপ্ত নতুন তথ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ মিসাইলের গাইডেন্স সিস্টেম যখন খবর পেলো যে, সে নির্দিষ্ট গতিপথ থেকে বামদিকে সরে গেছে, তখন এর পথ-সংশোধনী যন্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে একে ডানদিকে পরিচালিত করে। ডানদিকে যেতে গিয়ে যদি আবার বেশি ডানে চলে যায়, তাহলে আবার তা বামদিকে গতি পরিবর্তন করে। প্রতিনিয়ত ভুল সংশোধন করতে করতে মিসাইলটি সামনে অগ্রসর হয় এবং একসময় লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে।

মনছবিও কাজ করে একই প্রক্রিয়ায়। মনছবির মাধ্যমে লক্ষ্যের ছবি অবচেতন মনে বসিয়ে দিলে মন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে তার সকল শক্তিকে নিয়োগ করবে। দিবানিশি কাজ করে যাবে। প্রয়োজনে পথ সংশোধন করবে। প্রয়োজনে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিকে পাণ্টে দেবে। আরো চিন্তা গবেষণায় আপনাকে নিয়োজিত করবে। দুর্দমনীয় আগ্রহ ও উদ্যম সৃষ্টি করবে। নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছার জন্যে যা যা করা দরকার তা করার জন্যে ভেতরে একটা তাড়না সৃষ্টি করবে। আপনাকে নিয়ে যাবে লক্ষ্যপানে। একটি

প্রাচীন গল্পের মধ্য দিয়ে এ বিষয়টি আরো ভালোভাবে বোঝা যাবে।

তুরস্কের ইস্তাম্বুলের সমুদ্রপারের তাঁতিকন্যা ফাতিমা-ছোটবেলা থেকেই তার স্বপ্ন ছিলো সে রাজরানী হবে, তার ঐশ্বর্যকে সে ব্যয় করবে দুঃস্থ-বঞ্চিতদের কল্যাণে। এক গরিব তাঁতিকন্যার তুলনায় স্বপ্নটা অনেক বড় বৈকি। কিন্তু সারাদিন কাপড় বুনতে বুনতে সে এ স্বপ্নই দেখে। অবশেষে তার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে বাবা তাকে নিয়ে সমুদ্রপথে যাত্রা করলেন। গন্তব্য মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া। পথিমধ্যে ঝড়ের কবলে পড়ে নৌকাডুবি হলো। ফাতিমা হারিয়ে গেল তার বাবার কাছ থেকে। সমুদ্রতীরে এক বৃদ্ধ জেলে তাকে পেয়ে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে। সেখানে ফাতিমা শিখলো দড়ি পাকিয়ে জাল বুনতে।

কিছুদিন পর আবার তার জীবনে নেমে এলো দুর্বিপাক। জলদস্যুরা তাকে অপহরণ করে বিক্রি করলো বসরার এক সওদাগরের কাছে ক্রীতদাসী হিসেবে। সওদাগরের ছিলো জাভা থেকে কাঠ আমদানি করে নৌকা বানানোর ব্যবসা। সেখানে সে আয়ত্ত করলো কাঠ চেরাই আর মাস্তুল বানানোর প্রক্রিয়া। ইতোমধ্যে কয়েকবার জাহাজডুবিতে সওদাগরের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হলো, লোকজন তাকে ছেড়ে চলে গেল। তখন বুদ্ধিমতী ও বিশ্বস্ত ফাতিমা মনিবের পাশে দাঁড়ালো। মনিব তার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে ব্যবসায়ে অংশীদার করলেন। ফাতিমা কাঠ আনতে সমুদ্র পথে জাহাজ উদ্দেশ্যে রওনা হলো। কিন্তু আবার ঝড়, আবারও নিরুদ্দেশ্যে ভেসে যাওয়া। এবার ফাতিমা গিয়ে পড়লো চীন দেশে। জ্ঞান ফিরে সে দেখলো, মহাসমারোহে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রাজপ্রাসাদে।

ঘটনা ছিলো এরকম-চীনদেশের রাজপুত্রের বিয়ে সম্পর্কে রাজ-জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, হবু কনে পূর্ণিমার রাতে সমুদ্র থেকে আসবে, যার ভাষা, চেহারা হবে আলাদা এবং সে তাঁর বানাতে পারবে। পারিপার্শ্বিক সব মিলে গেল। এবার তাঁর বানাতে হবে। ফাতিমা নেমে পড়লো তাঁর বানাতে। কাপড় বোনার অভিজ্ঞতা থেকে কাপড় বানালো। জাল বানানোর অভিজ্ঞতা থেকে দড়ি বানালো। আর মাস্তুল বানানোর অভিজ্ঞতা থেকে বানালো তাঁবুর খুঁটি। তাঁর তৈরি হলো। রাজা নিশ্চিত হলেন এই সে মেয়ে। পূরণ হলো ফাতিমার আজন্ম লালিত স্বপ্ন।

আসলে এটাই মনছবি। এগিয়ে চলে এরকম জীবনব্যাপী। জীবনের নানা ঘটনা, বাঁকগুলোতে প্রো-একটিভ থেকে একাত্ম বিশ্বাসে নীরবে কাজ করে গেলেই আসে চূড়ান্ত সাফল্য।

**প্রশ্ন :** লক্ষ্য অর্জনের জন্যে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিই কি যথেষ্ট নয়? এর জন্যে বসে বসে কল্পনা করার প্রয়োজন আছে কি?

**উত্তর :** গুনলে হয়তো অবাক লাগতে পারে। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে, কল্পনা ও ইচ্ছার মধ্যে সংঘাত হলে ইচ্ছা পরাজিত হয়। কল্পনা জয়ী হয়।

আসলে যতই ইচ্ছাশক্তি থাকুক মনের সাথে জোর করে পারা যায় না। যেরকম অনেক পুরুষ আছেন, কতবার ইচ্ছা করেছেন ধূমপান ছাড়বেন। মনকে প্রভাবিত করতে পারেন নি, উদ্বুদ্ধ করতে পারেন নি, ধূমপানও ছাড়তে পারেন নি। যতবার ছেড়েছেন ততবার ধরেছেন। এটা প্রধানত কল্পনাশক্তির সাথে ইচ্ছার দ্বন্দ্বের কারণে। কিন্তু যদি মন থেকে জিনিসটা আসতো, মনকে যদি উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন যে, এই কারণে আমার ধূমপান করা উচিত না-মনের মন, তুই আমার কথা শোন-তাহলে ধূমপান ছাড়তে পারতেন।

মনের স্বভাব আর গাধার স্বভাব একই রকম। গাধার গলায় রশি দিয়ে আপনি তাকে যেদিকে টানবেন সেদিকে সে যাবে না। আপনি পূর্বদিকে টানেন, সে অন্য সবদিকে যাবে কিন্তু পূর্বদিকে কিছুতেই যাবে না। যখন আপনি যেদিকে মনোযোগ দিতে চান, মন সেটা ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে ওঠে। অতএব, মনকে দিয়ে যখন আপনি কাজ করাতে চান তখন জোর করতে যাবেন না।

গাধাকে দিয়ে কাজ করানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে তার সামনে একটা মুলা ঝুলিয়ে দেয়া। মুলা যেদিকে যেতে থাকবে গাধাও সেদিকে যেতে থাকবে। টানাটানির কোনো প্রয়োজন নেই। একইভাবে মনের সামনে একটা মুলা ঝুলিয়ে দিতে হবে এবং এই মুলাটা হচ্ছে মনছবি। এই ছবিটা হচ্ছে তোমার লক্ষ্য, এটা তোমাকে পেতে হবে। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত মানুষ সফল হয়েছেন, সবার সামনেই এই ‘মুলা’ অর্থাৎ স্বপ্ন ছিলো। যুক্তি এবং জ্ঞানের চেয়ে স্বপ্ন এবং কল্পনা অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী। স্বপ্ন এবং কল্পনাই সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে।

**প্রশ্ন :** মনছবি আর অলস কল্পনার মধ্যে পার্থক্য কী?

**উত্তর :** মনছবি হচ্ছে যা আপনি বিশ্বাস করেন। যেরকম ১৯৫২ সালে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে। যদি বিশ্বাস না করতাম, জীবন দিতে পারতাম না। রাষ্ট্রভাষা বাংলা-এটা হচ্ছে মনছবি। আর আকাশ কুসুম কল্পনা বা অলস কল্পনা হচ্ছে সেই গোয়ালিনীর চিন্তার মতো। দুধের ঘড়া

মাথায় নিয়ে বাজারে যেতে যেতে সে ডুবে গেল অলস কল্পনায়। ভাবতে লাগলো দুধ বিক্রি করে মুরগি কিনবে, মুরগি কেনার পরে মুরগির বাচ্চা হবে। বাচ্চা বিক্রি করে ছাগল কিনবে। ছাগলের বাচ্চা হবে। ছাগলের বাচ্চা বিক্রি করে গরু কিনবে। এই করে সে অনেক সম্পত্তির মালিক হবে। তারপর রাজার ছেলে তাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবে। কল্পনার এ পর্যায়ে সে মাথা নেড়ে বলে উঠলো ‘নেহি করেঙ্গা’! অর্থাৎ সে রাজি নয়। যে-ই মাথা নেড়েছে—দুধের ঘড়া পড়ে গিয়ে ঘড়াও ভাঙলো, দুধও গড়ালো মাটিতে। এটা হচ্ছে আকাশ-কুসুম কল্পনা যেখানে বিশ্বাস নেই, যা কাজের প্রেরণা সৃষ্টি করে না, যা বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়ার একটি অলস মাধ্যম মাত্র।

**প্রশ্ন :** আপনার প্রদর্শিত পথ আমার জীবনের আমূল পরিবর্তন করেছে, আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। অলীক কল্পনা ও মনছবির মধ্যে পার্থক্য কী অনুগ্রহ করে ব্যাখ্যা করবেন। মনছবি করার ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় অনেক বড় বড় লক্ষ্যকে মনছবি ধরি, যা অনেক সময় অলীক কল্পনাও হতে পারে। অলীক কল্পনা ও মনছবি পাশাপাশি ব্যাখ্যা করলে অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যেতাম। মনছবির সাথে কি ‘যদি’ শব্দটি যুক্ত করলে তা অলীক স্বপ্ন হয়ে যাবে? বর্তমানে আমার গাড়ি ক্রয়ের সামর্থ্য নেই। যদি গাড়ি ক্রয়ের স্বপ্ন দেখি তবে সেটা অলীক কল্পনা হবে কি না।

**উত্তর :** বুঝতে পারছি যে, কোনটা অলীক কল্পনা আর কোনটা মনছবি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। আসলে একটা হচ্ছে অবাস্তব, আরেকটা হচ্ছে আপাত অসম্ভব কিন্তু সম্ভব। যেমন অতীতকে পরিবর্তন করার চিন্তা অবাস্তব, দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ না করে আমি যদি রাজার ঘরে জন্ম নিতাম—এ ধরনের চিন্তা অবাস্তব। আবার ‘আমি যদি প্রেসিডেন্ট হতাম’—এই চিন্তাও অলীক কল্পনা, কারণ আপনি প্রেসিডেন্ট নন।

কিন্তু আমি প্রেসিডেন্ট হবো—এই চিন্তা অলীক কল্পনা নয়, এটা ভবিষ্যৎ। আর বর্তমানের সাথে ভবিষ্যতের কোনো সংঘর্ষ নেই। বরং বিশ্বাস নিয়ে আপনি যখন কল্পনা করছেন আপনি প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছেন, তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে মনছবি। অর্থাৎ আপনি ঠিকই ধরেছেন অলীক কল্পনাকে শনাক্ত করার একটি উপায় হচ্ছে ‘যদি’ শব্দটি।

আর একটা গাড়ি কি খুব বড় কোনো চাওয়া? মোটেই না। বাংলাদেশে কয়েক লক্ষ গাড়ি আছে। যা কয়েক লক্ষ মানুষ করতে পেরেছে সেটা আপনি

কেন করতে পারবেন না? তবে আপনি যদি শুধু কল্পনা করেন যে, আমার যদি একটা গাড়ি হতো-তাহলে আমি কী সুন্দর ড্রাইভ করতাম-এটা হচ্ছে অলীক কল্পনা। আর ‘আমার গাড়ি আমি সুন্দর ড্রাইভ করছি ...’-এ হচ্ছে মনছবি।

**প্রশ্ন :** অটোসাজেশনই কি মনছবি? অটোসাজেশন, প্রত্যয়ন এবং মনছবি-এই তিনটির মধ্যে পার্থক্য কী?

**উত্তর :** ধরুন, আপনি বিশ্বাস করেন না যে, আপনি সাহসী। বিশ্বাস না করেই বলছেন, ‘আমি সাহসী, আমি সাহসী, আমি সাহসী’, এটি হচ্ছে অটোসাজেশন। আবার যখন বিশ্বাস করে বলছেন যে, ‘আমি সাহসী, আমি সাহসী’, এটা হচ্ছে প্রত্যয়ন। অর্থাৎ যখন কথা, বাক্য, শব্দ বা মেসেজের সাথে বিশ্বাস যোগ করছেন তখন এটা হচ্ছে প্রত্যয়ন। আবার আপনি সাহসী হলে আপনাকে যেমন দেখাতো সেই ছবি যখন দেখছেন তখন এটা হলো মনছবি। আমরা বলি, প্রত্যয়ন হচ্ছে অডিও, মনছবি হচ্ছে ভিডিও।

## লক্ষ্য কী হবে

**প্রশ্ন :** পেশাগত সাফল্যকে জীবনের লক্ষ্য করতে চাই। জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ নিয়ে কিছু টিপস দেবেন দয়া করে।

**উত্তর :** আসলে জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত সফল মানুষ হওয়া। সাধারণভাবে আমাদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়া, সিভিল সার্ভিসে যাওয়া, ব্যবসায়ী হওয়া, বিজ্ঞানী হওয়া, অধ্যাপক হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এসব হলেই কি মানুষ হওয়া যায়?

যে ডাক্তার একজন মানুষকে অজ্ঞান করে তার কিডনি বের করে বিক্রি করে দেয়, তাকে কি মানুষ বলা যায়? যে ইঞ্জিনিয়ার পারসেনটেজের পর পারসেনটেজ নিয়ে এমন স্থাপনা গড়ে যা ধ্বংসের কারণ হয়, তাকে কি মানুষ বলা যায়? যে সচিব নিজের দেশের স্বার্থকে বিক্রি করে দেয়, তাকে কি মানুষ বলা যায়?

যে ব্যবসায়ী ড্রাগস, মদ বিক্রি করে, মানুষের জীবন ধ্বংসকারী জিনিস বিক্রি করে তাকে কি মানুষ বলা যায়? যে অভিনেতা-অভিনেত্রী ক্ষতিকর গণ্যের বিজ্ঞাপনে মডেল হয় তাকে কি মানুষ বলা যায়? যে বিজ্ঞানী মানুষ

হত্যার জন্যে মারণাজ্ঞ তৈরি করে তাকে কি মানুষ বলা যায়? যে শিক্ষকের হাতে তার ছাত্রীর সম্ভ্রম নষ্ট হয় তাকে কি মানুষ বলা যায়?

যদি বিদ্যা দ্বারা আমরা আলোকিত হতাম তাহলে জীবনের লক্ষ্য হতো অনন্য মানুষ হওয়া। প্রথমে আমাদের মানুষ হতে হবে। মানুষ হতে হলে তার লক্ষ্য হবে সৃষ্টির সেবা করা, জৈবিক লালসা চরিতার্থ করা নয়। আর সৃষ্টির সেবার জন্যে প্রয়োজন মেধার বিকাশ।

আর পেশা হচ্ছে মেধাকে বিকশিত করার মাধ্যম। আমাদের আমাদের মেধা বিকশিত করতে হবে সৃষ্টির সর্বোত্তম সেবা করার জন্যে, জীবনের লক্ষ্য এটাই হওয়া উচিত। অর্থ, বিত্ত, খ্যাতি-সবই আসবে বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে। কারণ সেবা প্রদান করলে প্রকৃতির নিয়মেই এসব প্রতিদান হিসেবে আসবে। পেশা লক্ষ্য অর্জনের একটি মাধ্যম অর্থাৎ উপলক্ষ। কিন্তু অবিদ্যার কারণে এখন উপলক্ষগুলোই আমাদের লক্ষ্য হয়ে গেছে।

**প্রশ্ন :** কোন কাজের মাধ্যমে জীবনে চূড়ান্ত সার্থকতা অর্জিত হতে পারে? যার ফলে আমরা পাবো অনন্ত প্রশান্তি?

**উত্তর :** আসলে নিজেকে আলোকিত করার কাজ, নিজেকে অবিদ্যা হতে মুক্ত করার কাজ-এর চেয়ে ভালো কাজ আর কিছু হতে পারে বলে আমার জানা নেই। নিজেকে আলোকিত মানুষরূপে গড়ে তুললে আপনি আপনার বেঁচে থাকার কারণ বুঝতে পারবেন। যখন আপনি বুঝতে পারবেন আপনি কেন বেঁচে থাকবেন, কেন কাজ করবেন, তখনই আপনি অনন্ত প্রশান্তি পাবেন।

**প্রশ্ন :** জীবনে প্রথম হওয়া এবং অনন্য মানুষ হওয়া-দুটো কি একই? জীবনে প্রথম যিনি হবেন তার মাঝে কী কী গুণাবলি থাকবে? যারা পৃথিবীতে নিজেদের সফল করেছেন তারাই কি জীবনে প্রথম?

**উত্তর :** জীবনে প্রথম হওয়া একটি সার্বিক সাফল্যের নাম। জীবনে প্রথম হওয়া আর অনন্য মানুষ হওয়া একই। যিনি সৃষ্টির সম্ভ্রমের জন্যে তার মেধাকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে বিকশিত করেছেন আর তা কাজে লাগিয়েছেন সৃষ্টির কল্যাণে, হয়েছেন জ্ঞান আর প্রাচুর্যের আধার আর হাজার মানুষের আশ্রয়স্থল। তিনিই জীবনে প্রথম, তিনিই অনন্য মানুষ।

জীবনে প্রথম যিনি, তার কোনো হতাশা বা অতৃপ্তি থাকতে পারে না। অনন্য মানুষ নিজে তৃপ্ত, শোকরগোজার। তৃপ্তির জন্যে, শান্তির জন্যে তার



কাছে হাজারো মানুষ ছুটে আসে। তিনি হাজারো মানুষের ভরসাস্থল।

কাজেই যিনি পৃথিবীতে নিজেকে পেশায় সফল করেছেন, খ্যাতিমান হয়েছেন, বিত্তবান হয়েছেন তার ভেতরে যদি হতাশা থাকে, দুঃখ থাকে এবং তিনি যদি তৃপ্ত না হন, তাহলে তিনি অনন্য মানুষ হতে পারেন নি। যেমন, অনেক শিল্পকারখানার মালিক রয়েছেন, তাদের অনেক সম্পত্তি আছে, অনেক কর্মচারী আছে, কিন্তু তারা কি সেই কর্মচারীদের আশ্রয়স্থল হতে পেরেছেন? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারেন নি। সেই কর্মচারীরাই তার মৃত্যুতে মনে মনে আনন্দিত হয় যে, একদিন ছুটি পাওয়া গেল। অর্থাৎ জীবনে প্রথম বলতে আপনি যদি শুধু বৈষয়িক সাফল্য বোঝেন তাহলে জীবনে প্রথম আর অনন্য মানুষ এক নয়।

**প্রশ্ন :** জীবনের লক্ষ্য ঠিক করতে পারছি না, একেকবার একেকটা মনে হচ্ছে। কী করবো?

**উত্তর :** আগে মনকে প্রশান্ত করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার মন প্রশান্ত না হচ্ছে আপনি লক্ষ্য স্থির করতে পারবেন না। যে কারণে আমাদের প্রথম চাওয়া হচ্ছে প্রশান্তি। মন প্রশান্ত হলে আপনার অন্তর্গত সত্তা আপনার মধ্যে বিশ্বাস সঞ্চারিত করবে। তখন আপনি লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারবেন।

এজন্যে নিয়মিত মেডিটেশন করুন, মৌনসাধনা অর্থাৎ কোয়ান্টায়ন করুন, সঙ্ঘের সাথে একাত্ম থাকুন। ভালো কাজে যত নিজেকে সংশ্লিষ্ট করবেন মনের অস্থিরতা তত কমতে থাকবে এবং লক্ষ্য স্থির করা সহজ হবে।

## মনছবিতে কী দেখবো ॥ কীভাবে দেখবো

**প্রশ্ন :** মনছবির মেডিটেশনের প্রক্রিয়া দয়া করে জানাবেন।

**উত্তর :** ধরুন, আপনি চাকরির জন্যে মনছবি করতে চান। এক্ষেত্রে আপনি এভাবে চর্চা করতে পারেন :

নিয়মমাফিক মনের বাড়ির দরবার কক্ষে যান। এবার মনছবি দেখুন। খুঁটিনাটিসহ পরিপূর্ণ দৃশ্য তুলে ধরুন একেবারে ভিডিও ছবির মতো। দেখুন, আপনি খুব স্মার্টভাবে বিনয়ের সাথে কর্মকর্তার কাছে চাকরির আবেদনপত্র দিয়েছেন। তিনি আবেদনপত্র উল্টেপাল্টে দেখে পরে আসার জন্যে বললেন।

আপনি পরে গিয়ে জানলেন যে, আপনাকে ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে হাজির হতে হবে। নির্দিষ্ট দিনে ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে আপনি হাজির।

সবাই আপনাকে দেখে উৎফুল্ল হয়েছেন। সবার প্রশ্নের সঠিক জবাব দিচ্ছেন আপনি। কর্মকর্তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আপনার ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাদের নির্দেশে আপনার জন্যে নিয়োগপত্র টাইপ করা হচ্ছে। পদস্থকর্তা নিয়োগপত্র সই করেছেন। নিয়োগপত্র আপনার নামে পাঠানো হচ্ছে। আপনি বাসায় নিয়োগপত্র পেয়েই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। আপনজনেরা আপনাকে অভিনন্দিত করছে। আপনি নিয়োগপত্র নিয়ে অফিসে গিয়েছেন। কাজে যোগদান করেছেন। আপনার জন্যে নির্ধারিত চেয়ার-টেবিলে গিয়ে বসেছেন। আপনার জন্যে নির্ধারিত কাজ বুঝে নিচ্ছেন। পরিপূর্ণ তৃপ্তির সাথে কাজ করতে শুরু করেছেন। এভাবে আপনার যে লক্ষ্য তা পূরণ হবার দৃশ্য খুঁটিনাটিসহ দেখুন।

পুরো ছবিটা আপনাকে সকল ইন্দ্রিয়যোগে অনুভব করতে হবে। বাস্তবে চাকরি পেলে আপনার মধ্যে যে অনুভূতি হতো, মনছবি দেখার সময় নিজের মধ্যে সে অনুভূতিগুলো পুরোপুরি নিয়ে আসুন। চাকরি পাওয়ার পর মা-বাবা ভাই-বোনের মুখে আনন্দের অনুভূতি দেখলে আপনার মধ্যে যে ভাবের উদয় হতো, পুরোপুরি সে ভাব নিয়ে আসুন। প্রিয়জনেরা মিষ্টিমুখ করলে আপনার মধ্যে যে অনুভূতি আসতো, তা-ও সম্পৃক্ত করুন অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির সাথে। চাকরি পাওয়ায় বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আপনার মর্যাদা যেভাবে বেড়ে যেত, তা অনুভূতির সাথে পরিপূর্ণভাবে মিশিয়ে দিন। ঘটনার সাথে ইন্দ্রিয়গুলোকে এমনভাবে সম্পৃক্ত করে ফেলুন, যেন আপনার অবচেতন মন পুরো ঘটনাকেই বাস্তব বলে মনে করে।

আসলে অবচেতন মন বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে কোনো পার্থক্য করতে পারে না। সেজন্যে আমরা সিনেমায় কোনো বিয়োগান্ত বা করুণ দৃশ্য দেখে কেঁদে ফেলি বা কোনো উত্তেজক দৃশ্য দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠি। যদিও জানি যে, আমরা অভিনয় দেখছি মাত্র। তাই বেকারত্ব অবসানে নিজের যে রূপ আপনি দেখতে চান, সে ছবিকে হৃদয়ে ও ইন্দ্রিয়ে পুরোপুরি গেঁথে ফেলুন। আপনি যে চাকরি পেয়ে গেছেন, এটাই সবসময় মনে করতে থাকুন। জাগ্রত অবস্থায়ও আপনি একজন চাকরিজীবীর মতো আচার-আচরণ করুন। বাস্তবে ভান করুন আপনি চাকরি পেয়ে গেছেন, চাকরির বেতন পেয়ে কী কী করছেন, তা-ও কল্পনার চোখে দেখতে থাকুন। সবসময় পূর্ণ অনুভব ও একাত্মতার সাথে চাকরি পাওয়ার মনছবি দেখুন। পূর্ণ বিশ্বাস ও নিশ্চয়তার

সাথে মনছবি দেখুন। ধাপে ধাপে কী করবেন আপনার অবচেতন মনই তা আপনাকে বলে দেবে।

প্রতিদিন নিয়মিত এই অনুশীলন করে যান। কখনোই আলস্য ও গাফলতিকে প্রশ্রয় দেবেন না। মনের বাড়িতে নিজেকে দেয়া সকল অটোসাজেশনসহ অনুশীলন করে যান। বাস্তবে চাকরি পাওয়াটা আপনার জন্যে সময়ের ব্যাপার মাত্র।

**প্রশ্ন :** আমি দেশের জন্যে বড় কিছু করতে চাই। পাশাপাশি সুন্দর পারিবারিক জীবন চাই। আমি এখনো জানি না কোন পথে আমি লক্ষ্যে পৌঁছবো। শুধু লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি এরূপ মনছবি দেখছি। আমার মনছবি কি হচ্ছে?

**উত্তর :** আসলে মনছবি চর্চার জন্যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করাই যথেষ্ট, কোন পথে লক্ষ্যে পৌঁছবেন তার সচেতন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। অবচেতন মন আলাদীনের দৈত্য, আপনার দেয়া মনছবির বাস্তব রূপায়ণে কর্মসূচি ঠিক করার ভার আপনি নিশ্চিত মনে তার ওপর ছেড়ে দিতে পারেন। মনছবিকে মনের গভীরে গাঁথে দিতে পারলে অবচেতন মনই আপনাকে বলে দেবে কোন পথে পৌঁছবেন। আসলে পথে নামলে পথই পথ দেখায়। প্রথম পদক্ষেপ নিলে দ্বিতীয় পদক্ষেপ কী হওয়া উচিত আপনি নিজেই তা বুঝতে পারবেন। প্রত্যাশিত পন্থায় হোক, অপ্রত্যাশিত পন্থায় হোক লক্ষ্যে আপনি পৌঁছাবেনই।

**প্রশ্ন :** মনছবি কি বর্তমানে দেখবো, নাকি ভবিষ্যতে দেখবো? কীভাবে কল্পনা করতে হবে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

**উত্তর :** আসলে মনছবি দেখার সময় আপনার মনছবি যে সময়ে বাস্তবায়িত হতে পারে, সেই সময়কালে আপনাকে চলে যেতে হবে। সেই অবস্থায় গিয়ে নিজেকে দেখতে হবে যে, I have achieved. অর্থাৎ মনছবিতে ভবিষ্যৎটাই বর্তমান হয়ে যাবে।

কারণ লক্ষ্য নিয়ে চিন্তা করলে তা সম্ভাবনারূপে বিরাজ করে, আর লক্ষ্যস্থল থেকে চিন্তা করলে বাস্তবরূপ পায়। লক্ষ্যস্থল থেকে নিষ্কিণ্ড চিন্তাতরঙ্গ সাফল্যকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে। আপনি যদি মনছবিতে অবলোকন করতে পারেন যে, আপনি প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছেন, তখন বাস্তবে প্রেসিডেন্ট হলে আপনার যে অনুভূতি হতো, যে অনুরণন হতো, আপনার

মধ্যে সেই অনুরণন সৃষ্টি হবে। সাফল্যের এই অনুরণন তখন বাস্তবে সাফল্যকে আপনার দিকে আকৃষ্ট করবে। এটাই মনছবির সাফল্যের চালিকাশক্তি। অতএব মনছবিতে ভবিষ্যৎকেই বর্তমান হিসেবে দেখতে হবে।

**প্রশ্ন :** আমি মিউজিশিয়ান হতে চাই। কীভাবে মনছবি তৈরি করবো?

**উত্তর :** এটা তো খুব চমৎকার। দেখবেন লাখ লাখ সিডি বেরিয়েছে। লোকজন লাইন ধরে কিনছে, টিভিতে সেটার ওপরে অনুষ্ঠান হচ্ছে। স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠান হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ দর্শক শ্রোতা সবাই বাহবা দিচ্ছে, হাততালি দিচ্ছে।

**প্রশ্ন :** পরীক্ষার আগে ও পরে কী রকম মনছবি দেখবো?

**উত্তর :** পরীক্ষার সময় মনছবির চেয়েও অটোসাজেশন বেশি কার্যকরী। অটোসাজেশন বইতে লেখাপড়ায় মনোযোগ, স্মৃতি, ঠান্ডা মাথায় পরীক্ষা দেয়া ইত্যাদি নানারকম বিষয়ে চমৎকার অটোসাজেশন আছে। আপনার পছন্দ ও প্রয়োজন অনুসারে যেকোনোটি বেছে নিতে পারেন।

**প্রশ্ন :** জনপ্রিয়তা অর্জন বা ভোট সংগ্রহের জন্যে কীভাবে মনছবি দেখবো?

**উত্তর :** এটা কি বলে দেয়ার প্রয়োজন আছে? দেখুন, আপনি বিরাট মাঠে বক্তৃতা করছেন আর সবাই হাততালি দিচ্ছে। মালা দিচ্ছে। ভোটের দিন সবাই ভোট কেন্দ্রে এসে ভোট দিয়ে চলে যাচ্ছে। আপনি নির্বাচিত হয়েছেন। সবাই আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

**প্রশ্ন :** মেডিটেশনে আমার মনছবি দেখাটা কীরকম হবে? মনের বাড়ির দরবার কক্ষে বসে দেখছি, না ঐ অবস্থায় চলে গেছি?

**উত্তর :** যতক্ষণ মনছবি দেখবেন, ততক্ষণ আপনি মনছবির পরিমন্ডলেই নিজেকে অবলোকন করবেন, সেটা কোনো ড্রইংরুম হোক বা অফিস রুম হোক বা খোলা মাঠ হোক। মনছবি দেখা শেষ হলে আবার মনের বাড়ির দরবার কক্ষে নিজেকে অনুভব করবেন।

**প্রশ্ন :** মনছবি কীভাবে দেখবো? যদি চাকরির মনছবির ক্ষেত্রে আমি দেখি, ভাইভা বোর্ডে নির্বাচকরা যা প্রশ্ন করছেন তা-ই পারছি। আমি তখন বাস্তবে আমার হাত-পা, দেহ যেমন দেখি কিন্তু আমার মুখের পেছনের অংশ দেখি না, ভাইভা বোর্ডে যারা থাকেন তাদেরকে দেখি।

**উত্তর :** ঠিক আছে।

**প্রশ্ন :** মনছবিতে আমি কোনো ঘটনা ঘটাচ্ছি না বরং ঘটনার ছবিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসতে দিচ্ছি। বিষয়টি ভালো করে বুঝতে পারি নি।

**উত্তর :** আসলে বিষয়টি সহজ। এর অর্থ হচ্ছে জোর করে ছবিকে আনার চেষ্টা না করা। অনেক সময় আমরা জোর করে একটা বিষয় দেখতে চাই। ছবি আসছে না কেন, আসতেই হবে। নাক-মুখ কুঁচকে যায়। এটা না করে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত থাকবেন। প্রত্যাশা করতে থাকুন। ছবির কল্পনা করতে থাকুন। ছবি স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলে আসবে।

**প্রশ্ন :** মনছবি ভবিষ্যতের কতদূর পর্যন্ত সময়ের হওয়া ভালো?

**উত্তর :** মনছবি যত দূরেরই হোক কোনো অসুবিধা নেই। সবচেয়ে ভালো হলো আপনার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যকে নিয়ে মনছবি করা। কারণ মধ্যবর্তী ধাপগুলো পার না হয়ে তো আপনি চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন না। চূড়ান্ত লক্ষ্যের ছবি যদি অবচেতনে থাকে, অবচেতন মনই তখন বলে দেবে মধ্যবর্তী ধাপগুলো আপনি কীভাবে পার হবেন।

ধরুন, আপনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় একজন চিকিৎসক হতে চান। চিকিৎসক হতে হলে আপনাকে এমনিতেই এসএসসি, এইচএসসিতে ভালো রেজাল্ট করতে হবে, মেডিকলে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কাজেই আপনি যদি চিকিৎসক হওয়ার মনছবি দেখেন, তাহলে এই প্রত্যেকটি ধাপ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আপনার মনে আসতে থাকবে। যেমন আপনি শীর্ষস্থানীয় সর্বজনশ্রদ্ধেয় একজন চিকিৎসক হয়েছেন, রোগীরা আপনাকে আশ্রয়স্থল গণ্য করছে, আপনার জন্যে প্রাণভরে দোয়া করছে, আপনি সব জায়গায় সম্মানিত হচ্ছেন...। এই ছবিকে মনে গেঁথে ফেলুন। মধ্যবর্তী ধাপগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আসবে।

## একাধিক বিষয়ে মনছবি

**প্রশ্ন :** মনছবিতে কী কী বিষয় আসতে পারে? ব্যক্তিগত জীবন বা পারিবারিক জীবন বা বিদেশ ভ্রমণ নিয়ে কীভাবে মনছবি করবো?

**উত্তর :** ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, বিদেশ ভ্রমণ, প্রতিষ্ঠান পরিচালনা-সবকিছু নিয়েই মনছবি করতে পারেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই যা হতে চান, মনছবিতে দেখবেন তা হয়ে গেছেন। আর সফল হওয়ার আনন্দ-অনুরণন নিজের ভেতরে সঞ্চার করবেন।

**প্রশ্ন :** মনছবিতে পাশাপাশি দুটো লক্ষ্য যদি স্থির করি, অর্থাৎ আমি ব্যবসার পাশাপাশি যদি সফল চাকরিজীবী হতে চাই তাহলে কি অসুবিধা হবে?

**উত্তর :** পাশাপাশি দুটো লক্ষ্য স্থির করতে পারেন যদি পরস্পরবিরোধী না হয়। আপনি সফল চাকরিজীবী এবং সফল গায়ক হওয়ার মনছবি একসাথে দেখতে পারেন। এটা সাংঘর্ষিক নয়। কিন্তু সফল ব্যবসায়ী এবং সফল চাকরিজীবী দুটোই যদি আপনি দেখেন এটা সাংঘর্ষিক হয়ে গেল। কারণ এ দুটো একসাথে হওয়া সম্ভব নয়।

**প্রশ্ন :** আমি তিন বছর যাবত একটি ক্রীড়া সংগঠনে প্র্যাকটিস করি। আমার মনছবি আপাতত দুটি-১. ভালো ক্রিকেটার হওয়া। ২. লেখাপড়া শেষ করে একজন কেবিন ড্রু হওয়া। বর্তমানে আমি ও-লেভেলে পড়ছি। এখন প্রশ্ন হলো, একই সাথে কি দুটি মনছবি দেখা যাবে?

**উত্তর :** একই সাথে দুটি কেন, দুয়ের বেশিও মনছবি দেখা যাবে। কিন্তু শর্ত হলো মনছবিগুলো হতে হবে পরিপূরক। পরস্পরবিরোধী বা সাংঘর্ষিক হতে পারবে না। কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে মনছবিগুলো হয়ে গেছে পরস্পরবিরোধী। যেমন, একজন ভালো ক্রিকেটার হতে হলে আপনাকে পুরো সময়টাই ক্রিকেটের জন্যে দিতে হবে। প্র্যাকটিস করতে হবে, খেলতে হবে, প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হবে এবং একসময় পেশা হিসেবেই ক্রিকেটকে বেছে নিতে হবে।

আবার কেবিন-ড্রু হতে চাইলে আপনাকে মাসের বেশিরভাগ সময় থাকতে হবে বিমানে, আকাশে। তার আগে কেবিন-ড্রু হওয়ার প্রয়োজনীয়

দক্ষতা, কৌশল রপ্ত করতে হবে। জানতে হবে ক্লায়েন্টকে সন্তুষ্ট করার আর্ট। কারণ বিমানে বিভিন্ন ধরনের যাত্রীকে সর্বোত্তম সেবা দেয়া খুবই দায়িত্বপূর্ণ এবং চ্যালেঞ্জিং একটি কাজ। অতএব এই বিপরীতমুখী মনছবি আপনার মস্তিষ্ক গ্রহণ করবে না, বাস্তবায়িত হওয়া তো পরের কথা। আপনাকে এর মধ্য থেকে যেকোনো একটাকে বেছে নিতে হবে এবং মনছবিও দেখতে হবে সেভাবে।

**প্রশ্ন :** মনছবিতে একটি বিষয় দেখার কার্যকারিতা কি একাধিক বিষয় দেখার চেয়ে বেশি শক্তিশালী হবে?

**উত্তর :** আসলে লক্ষ্য যদি একটা থাকে আর সেটার পেছনে আপনি ৩০ মিনিট সময় ব্যয় করেন, আর আলাদা আলাদা পাঁচটা লক্ষ্য মিলিয়ে যদি আপনি ৩০ মিনিট সময় ব্যয় করেন তাহলে লক্ষ্যপ্রতি আপনি প্রথমক্ষেত্রে পাচ্ছেন ৩০ মিনিট আর দ্বিতীয়ক্ষেত্রে পাচ্ছেন ছয় মিনিট। অতএব তাতে কিছু ঘাটতি তো হবেই। তবে লক্ষ্যগুলো যদি পরিপূরক হয় তখন ভিন্ন কথা।

**প্রশ্ন :** একাধিক লক্ষ্য স্থির কি মেডিটেশনের আগেই করে নেবো?

**উত্তর :** অবশ্যই আগে ঠিক করে নেবেন। তা না হলে ওখানে গিয়ে এটা না সেটা করতে করতেই দেখবেন সময় পার হয়ে যাচ্ছে।

**প্রশ্ন :** একাধিক মনছবি কি আলাদাভাবে একটার পর একটা দেখে যাবো?

**উত্তর :** আলাদা আলাদা নয়, আসলে সবচেয়ে ভালো হয় একই মনছবিতে সবগুলো বিষয়কে নিয়ে আসতে পারলে। অর্থাৎ চাওয়া একটাই, কিন্তু তাতে সবই থাকবে। অনেকটা সেই গুরু-শিষ্যের গল্পের মতো।

এক শিষ্য তার গুরুর খুব সেবা-শুশ্রূষা করায় গুরু সন্তুষ্ট হয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন। জানতে চাইলেন তার এমন একটি ইচ্ছার কথা যা তিনি পূরণ করে দেবেন। তবে শর্ত হলো, চাইতে হবে কেবল একটাই, তার বেশি নয়। শিষ্য তখন ভক্তিভরে জানালো যে, তার চাওয়া একটাই। আর তা হলো—‘আমি সাতমহলা বাড়িতে সোনার পালঙ্কে শুয়ে সুস্থ শরীরে নাতিপুতি পরিবেষ্টিত অবস্থায় তৃপ্তির সাথে মারা যেতে চাই।’ গুরু তখন বললেন,

‘চাওয়ার তুমি আর বাকি রাখলে কী?’ তার এ চাওয়ার মধ্যে শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, পারিবারিক এবং আত্মিক—সবই ছিলো।

আসলে চাওয়ার প্রকৃতি এটাই। তাই মনছবি হলো আপনার জীবনের সবগুলো ক্ষেত্রের লক্ষ্যের একটা সমন্বিত রূপ। এটা আপনি একসঙ্গেই দেখতে পারেন।

## কখন, কতবার, কতক্ষণ

**প্রশ্ন :** কোনো একটি মনছবি করলে কি তা বার বার করতে হবে?

**উত্তর :** প্রতিদিন কমপক্ষে দুইবার মেডিটেটিভ লেভেলে মনছবির চর্চা করবেন যতদিন পর্যন্ত তা বাস্তবরূপ না পায়। আর বাস্তবে সারাক্ষণ মনছবির সাথে একাত্ম থাকবেন, যখনই সুযোগ পান মনছবির কথা মনে করবেন।

**প্রশ্ন :** প্রতিবার বিভিন্ন বিষয়ে মনছবি করা যাবে কি?

**উত্তর :** আসলে প্রতিবার যদি বিভিন্ন বিষয়ে মনছবি করেন আপনার মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত হবে। সে কোনটা ছেড়ে কোনটা বাস্তবায়িত করবে বুঝতে পারবে না। অতএব একটি বা নির্দিষ্ট কয়েকটি মনছবির চর্চা করতে থাকুন যতদিন তা বাস্তবায়িত না হয়।

**প্রশ্ন :** মনছবি কখন দেখা ভালো? কমান্ড সেন্টারে যাওয়ার আগে, না পরে?

**উত্তর :** কমান্ড সেন্টারে যাওয়ার আগে।

**প্রশ্ন :** শিথিল প্রক্রিয়ায় শিথিলায়নে মনছবির সময় মাত্র দুই মিনিট। আমি জানতে চাচ্ছি যখন সুরের মাঝে ভেসে বেড়ানোর কথা বলা হয় তখনও কি মনছবি দেখা যাবে?

**উত্তর :** বোঝা যাচ্ছে মনছবি দেখাটা আপনার খুব পছন্দের। শিথিলায়ন ক্যাসেটে যখন সুরের মাঝে ভেসে বেড়ানোর কথা বলা হয় তখন আপনি মনছবি করতে পারেন। চাইলে সুর শেষ হয়ে যাওয়ার পরও মনছবিতে ডুবে থাকতে পারেন। কোনো অসুবিধা নেই।



## দেখতে না পেলে

**প্রশ্ন :** মস্তিষ্ক ছবির ভাষা ভালো বোঝে, কিন্তু আমার কোনো ছবিই আসে না। কল্পনা করি-হচ্ছে। কিন্তু সেরকম ছবি এখনো পাই নি, কী করবো?

**উত্তর :** চর্চা করতে থাকুন। দেখবেন আসবে। বিশেষত সিডি নম্বর ৭-এ কল্পনার মেডিটেশনে অবলোকন বা ভিজুয়ালাইজেশন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে কিছু চর্চা আছে। এগুলো করতে পারেন।

**প্রশ্ন :** মনছবি দেখার সময় এলোমেলো দৃশ্য ভেসে ওঠে। যা নিয়ে মনছবি দেখবো তা আর হয় না, কী করবো? একই প্রত্যয়ন কি বার বার দেয়া যায়?

**উত্তর :** অন্য এলোমেলো দৃশ্য আসার কারণ আপনার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত। তাই মনোযোগটা কেন্দ্রীভূত করতে হবে। এজন্যে অটোসাজেশন দিতে থাকবেন। অন্য এলোমেলো দৃশ্য চলে এলে সেটাকে তওবা তওবা বা বাতিল বাতিল বলে সরিয়ে দেবেন। একই প্রত্যয়ন বার বারই করতে হবে-যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যয়ন বাস্তবায়িত না হচ্ছে।

## মনছবির সময়সীমা

**প্রশ্ন :** মনছবি বাস্তবায়নের সময়সীমা আর মাত্র কয়েক মাস। আমি কি ক্রমাগত কোয়ান্টায়ন করতে থাকবো? নাকি পাশাপাশি বিভিন্ন সেন্টারে একসাথে হিলিং-ও চালিয়ে যেতে থাকবো। এবারই শেষবার। এর আগে তিনবার ব্যর্থ হয়েছি। দয়া করে সুনির্দিষ্ট টিপস দেবেন।

**উত্তর :** মনছবির সময় নির্দিষ্ট করলে আপনার মধ্যেই তা টেনশন সৃষ্টি করবে। আপনি মেডিটেটিভ লেভেলেই যেতে পারবেন না। সীমিত সময়ে লক্ষ্য পূরণের জন্যে বরং অটোসাজেশন ব্যবহার করা ভালো।

আর তিনবার কেন ব্যর্থ হয়েছেন তার কারণ অনুসন্ধান করুন। আপনার হয় প্রস্তুতির অভাব আছে, না হয় আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি আছে বা নিজেকে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে জড়তা আছে। এই ব্যর্থতার কারণকে চিহ্নিত করে তা দূর করার জন্যে বাস্তব পদক্ষেপ নিন। তা না হলে হিলিং বা দোয়া-কোনোটাই কাজ করবে না।

**প্রশ্ন :** জীবনের মনছবি তো আছেই, কিন্তু এ মুহূর্তে আমার লেখাপড়া নিয়ে মনছবি দেখাটা খুব জরুরি। আমি আপাতত সেটাই দেখবো, নাকি অন্য মনছবি দেখবো?

**উত্তর :** পরীক্ষার যেহেতু সময়সীমা আছে সেহেতু এর জন্যে মনছবি না করে অটোসাজেশন দেয়া বেশি কার্যকর।

## মনছবির যৌক্তিকতা

**প্রশ্ন :** বিশ্বাস বা আস্থা মনছবির ক্ষেত্রে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ?

**উত্তর :** মনছবিতে আপনার ১০০% আস্থা থাকতে হবে। যদি আপনি বিশ্বাস করতেই না পারেন তাহলে তা মনছবি থাকবে না, আকাশকুসুম কল্পনা বা দিবাস্বপ্নে পরিণত হবে। মনছবিকে আপনার মস্তিষ্ক বাস্তব বলে গ্রহণ করলে তবেই তা আপনার মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা করবে।

**প্রশ্ন :** মেডিটেশনকালে মনছবির যৌক্তিকতা নিয়ে চিন্তা করা যাবে কি?

**উত্তর :** মনছবির মেডিটেশন করার সময় এটা যৌক্তিক হলো, না অযৌক্তিক হলো তা নিয়ে চিন্তা করা যাবে না। কারণ অযৌক্তিক মনে করলেই সেটা আর মনছবি থাকছে না। যৌক্তিক না অযৌক্তিক—এ চিন্তা করতে হবে মনছবি করার আগে।

**প্রশ্ন :** মনছবি যৌক্তিক ও বাস্তবভিত্তিক হতে হবে। এর মানে কী?

**উত্তর :** আসলে বাস্তবভিত্তিক মনছবি হচ্ছে এমন মনছবি যা অর্জন করা সম্ভব বলে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন। অন্য কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক, আপাতদৃষ্টিতে মনছবির বাস্তবায়ন যতই দুঃসাধ্য মনে হোক—কিছু যায় আসে না। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, আপনি একে সম্ভব বলে বিশ্বাস করেন কি না।

ধরুন, আপনি যদি এখন চিন্তা করেন যে, ঘাঁড়ের কী সুন্দর বাঁকানো শিং! ঠিক আছে—আমি মনছবি দেখি, আমার মাথায় দুটো শিং গজিয়েছে। এটা আপনার মস্তিষ্ক গ্রহণ করবে না। যদি খুব বেশি মনোযোগ দেন সেখানে দুটো

টিউমার হতে পারে। কিন্তু শিং হবে না কারণ আপনার ডিএনএ-র প্রোগ্রামে শিং নেই। এটা হচ্ছে অবাস্তব।

কিংবা ধরুন, আপনি একজন পুলিশ অফিসার। যৌথ অভিযানে গিয়ে দেখলেন যে, পুলিশ অফিসারের চেয়ে আর্মি অফিসারের গুরুত্ব বেশি। আপনি ভাবলেন, মেডিটেশন যখন শিখেছি মনছবি করে চীফ অব আর্মি স্টাফ হবো। এটা আপনার মস্তিষ্ক গ্রহণ করবে না। কারণ আপনি ঐ প্রক্রিয়ায় নেই। কিন্তু আপনি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ হবার মনছবি করতে পারেন, কারণ আপনি প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন।

অথবা ধরুন, আপনি খুব সফল ব্যবসায়ী। ৪০ বছর বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু আপনার এক ফাইল সচিবের ওখানে গিয়ে আটকে গেল। আপনি বুঝলেন যে, আপনার অনেক টাকা থাকতে পারে কিন্তু সচিবের কলম খুব শক্তিশালী। ভাবলেন-সচিব হবো। ব্যবসা বাদ দিয়ে মনছবি করলেন সচিব হওয়ার। এটাও আপনার মস্তিষ্ক গ্রহণ করবে না।

আবার ২০ লাখ টাকা ঋণ হয়ে গেছে, ২০ কোটি টাকার মনছবি করছেন। এটা বাস্তব। ২০ লাখ টাকা ঋণ হচ্ছে আপনার বর্তমান, ২০ কোটি টাকার মনছবি হচ্ছে ভবিষ্যৎ। এখানে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কোনো দ্বন্দ্ব নেই। যেমন, আপনি ১০০ কোটি টাকার মালিক হওয়ার মনছবি করতে পারেন। এটা অবশ্যই যৌক্তিক। কারণ আজকে বাংলাদেশে ১০০ কোটি টাকার মালিক এমন অনেকে আছেন যারা খুব সাধারণ অবস্থা থেকে, হয়তো ১০০ টাকা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন। অতএব ১০০ কোটি টাকা অর্জন কোনো অবাস্তব কিছু নয়। অর্থাৎ আপনার মনছবি যত বড় হোক তাতে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু তা যেন অবাস্তব বা অযৌক্তিক না হয়। আপনি নিজে যেন তা সম্ভব বলে বিশ্বাস করতে পারেন।

তবে এর সাথে সময় এবং সুযোগের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। একবার এক দম্পতি গেলেন ভারত ভ্রমণে। আত্মায় ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে স্ত্রী আত্মা ফোর্ট-এ ‘দরবারে আম’-যেখানে ময়ূর সিংহাসন ছিলো, এখন যেখানে শুধু শ্বেতপাথরের বেদী, সেখানে বসে পড়লেন। দেখে তার স্বামী বললেন, দেখ, তোমার ভাগ্য খুব ভালো। তুমি ৩০০ বছর পর জন্মগ্রহণ করেছে। ৩০০ বছর আগে যদি এই বেদীতে বসতে চাইতে তাহলে হয় তোমার দেহ থেকে মাথা আলাদা হয়ে যেত অথবা বহু মানুষের দেহ থেকে মাথা আলাদা করে তারপর তোমাকে এখানে এসে বসতে হতো। অর্থাৎ সময়েরও একটা ব্যাপার থাকে। আমাদের কাছে আজকে যে সুযোগ রয়েছে ১০০ বছর আগে জন্মগ্রহণ

করলে এই সুযোগ আমাদের সামনে থাকতো না। আপনাকে সময় দেখতে হবে, সুযোগ দেখতে হবে, পারিপার্শ্বিক পরিমন্ডলটা দেখতে হবে—তারপর লক্ষ্য স্থির করতে হবে।

**প্রশ্ন :** আমার মনছবি আমাকে উদ্দীপনা যোগায়, প্রেরণা দেয়, সাহস এবং শক্তি দেয়। তাহলে কি আমার মনছবি ঠিক আছে? আমার মনছবি আকাশ-পাতাল কল্পনা না। তো বিটা লেভেলে মনছবি দেখার সাথে কী অনুভব হবার কথা যাতে বোঝা যায় যে, লক্ষ্য ঠিক আছে?

**উত্তর :** আপনার মনছবি আপনাকে উদ্দীপনা ও প্রেরণা যোগায়, সাহস ও শক্তি দেয়। এগুলো মনছবি অবচেতনে গেঁথে যাওয়ার লক্ষণ। আসলে মনছবি শুধু চাওয়ার নাম নয়, মনছবি হলো চাওয়া এবং একই সাথে পাওয়ার প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হওয়া। আর পাওয়ার প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হলে চাওয়া রূপান্তরিত হয় প্রত্যাশায়। যেমন, আমি মা হবো—এটা এক ধরনের চাওয়া। কিন্তু আমি মা হচ্ছি—I am expecting a baby—এটা একটা প্রক্রিয়া। মনছবির প্রক্রিয়াও একই। এ প্রক্রিয়ায় যারা প্রবেশ করেন তারা মনছবির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক পরিবর্তন অনুভব করেন। আপনি এই পরিবর্তনই অনুভব করছেন। আপনার মনছবি বাস্তবায়িত হওয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

**প্রশ্ন :** আমি বর্তমান বছরটিকে নিজের জন্যে উচ্ছ্বাসের বছর হিসেবে স্মরণীয় করে রাখতে চাই। এরই ধারাবাহিকতায় চাই সফল ক্যারিয়ার গঠন করতে এবং একই সাথে চাই বৈবাহিক জীবনে প্রবেশ করতে। এ দুটো মনছবি পাশাপাশি দেখা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হবে?

**উত্তর :** আপনি বৈবাহিক জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন এটি অবশ্যই কোনো অযৌক্তিক কাজ নয়। যিনি চাকরি করেন—ক্যারিয়ারিস্ট, তিনিও বিয়ে করেন। দুটো আলাদা বিষয়। ক্যারিয়ার এবং বৈবাহিক জীবন—দুটোর মনছবি একত্রে দেখতে কোনো সমস্যা নেই বরং সময়মতো দেখা ভালো। বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে হলে সময়মতো নেয়া উচিত। অনেকে সিদ্ধান্ত নিতে অনেক সময় নেন। বিয়ে করা, না করা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, তবে বিয়ে করলে সময়মতো করবেন। আপনি যেহেতু মনে করছেন বিয়ে করার জন্যে চলতি বছর আপনার জন্যে ভালো সময়, মনছবি দেখতে কোনো অসুবিধা নেই।

## লক্ষ্যানুরণন

**প্রশ্ন :** লক্ষ্যানুরণন বিষয়টি আমি ভালোভাবে বুঝতে পারি নি, দয়া করে বুঝিয়ে বলবেন কি?

**উত্তর :** লক্ষ্যানুরণন হচ্ছে—আপনার লক্ষ্য অর্জিত হলে আপনার মধ্যে যে অনুভূতি হতো সেই অনুভূতি নিজের ভেতর থেকে বিকিরণ করা।

আসলে প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে, যা আপনার ভেতর থেকে বিকিরিত হবে সেটাই আপনার দিকে আকৃষ্ট হবে। কবিতা বিকিরণ করবেন, কবিতা আপনার দিকে আকৃষ্ট হবে। ঘৃণা বিকিরণ করবেন, ঘৃণা আপনার দিকে আকৃষ্ট হবে। মমতা বিকিরণ করবেন, মমতা আপনার দিকে আকৃষ্ট হবে। সাফল্যের অনুভূতি বিকিরণ করবেন, সাফল্য আপনার দিকে আকৃষ্ট হবে।

গাঁজার অনুভূতি বিকিরণ করবেন, গাঁজা আপনার দিকে আকৃষ্ট হবে। ধরুন, আপনি যে গলিতে থাকেন সে গলির মুখেই আছে এক পানের দোকান। আপনি প্রত্যেক দিন সেখান থেকে পান কিনে পান চিবুতে চিবুতে অফিসে যান। ১৫ বছর ধরে এটাই আপনার প্রতিদিনের রুটিন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই দোকানে যে গাঁজা বিক্রি হয়, ১৫ বছর ধরে পান কিনে খেলেও আপনি তা জানেন না। অথচ দিনাজপুর থেকে কোনো এক গাঁজাখোরকে আপনার গলিতে এনে ছেড়ে দেন। প্রথমবার দোকানে এসেই সে দোকানদারের সাথে লেনদেন করে ফেলবে। কোনো ভাষা লাগবে না, চেনাজানা লাগবে না। কেন? কারণ এই গাঁজাখোরের মাথা থেকে শুধু একটাই চিন্তা বিকিরণ হচ্ছে—গাঁজা কোথায়! গাঁজা কোথায়! গাঁজা কোথায়! আর দোকানদারের মাথা থেকে কী বেরোচ্ছে? গাঁজা এইখানে! গাঁজা এইখানে! গাঁজা এইখানে! একজন শুধু আরেকজনের চোখের দিকে তাকাবে, ব্যস, লেনদেন হয়ে যাবে।

অথচ আপনি যে ১৫ বছর ধরে তাকে চেনেন, আপনি তাকে জিজ্ঞেস করে দেখেন, ‘গাঁজা আছে নাকি, একটু দাও তো’। আপনার দিকে সে তাকিয়ে বলবে ‘গাঁজা? কিসের গাঁজা? গাঁজা দিয়া কী করে?’—এমন ভান করবে যেন সে কিছুই জানে না। কারণ গাঁজা শব্দটি আপনার মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে, ব্রেন থেকে বেরোচ্ছে না, মন থেকে বেরোচ্ছে না। সে আপনাকে দেখেই বুঝতে পারছে—গাঁজার ব্যাপারে আপনি দুই নম্বর লোক, আপনার অন্য কোনো মতলব আছে। আপনি গাঁজাখোর না।

অর্থাৎ আপনার ভেতরে যা অনুরণিত হবে সেটাই আপনার দিকে আকৃষ্ট হতে থাকবে। আপনি যদি প্রেসিডেন্ট হতে চান প্রেসিডেন্ট হলে যে রকম সুখ সুখ অনুভূতি হতো সে অনুভূতি ভেতরে নিয়ে আসতে হবে। প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসতে পারলে চেহারায় যে জেল্লা হতো, সেই জেল্লা যদি এখনই কল্পনায় অনুভব করতে পারেন, তাহলে আপনার প্রেসিডেন্ট হওয়া শুধু সময়ের ব্যাপার।

## সার্বক্ষণিক সম্পৃক্ততা

**প্রশ্ন :** মনছবির কার্যকারিতার ৪ নম্বর শর্ত হচ্ছে মনছবির সাথে সার্বক্ষণিক সম্পৃক্ততা অর্জন, মনছবির প্রতি অখন্ড মনোযোগ দান। মনছবির সাথে সার্বক্ষণিক সম্পৃক্ততা কীভাবে অর্জন করবো? অখন্ড মনোযোগ কী? আমার উদ্দেশ্য যদি হয় ১০০ কোটি টাকার মালিক হওয়া তাহলে কী করে তার ওপর মনোযোগ দেবো?

**উত্তর :** সার্বক্ষণিক সম্পৃক্ততার অর্থ শয়নে-স্বপনে আহা-বিহারে সবসময় লক্ষ্যটা চোখের সামনে থাকা। যেমন, আমাদের ছায়াছবির নায়ক যখন বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকা বাইতে বাইতে যায়, নদীর পানিতে কার ছবি দেখে? নায়িকার ছবি। নায়িকা আয়নায় চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে কার ছবি দেখে? নায়কের ছবি। এজন্যে দেখবেন আমাদের ছায়াছবিতে কোনো ব্যর্থতা নেই। কারণ মনছবি এখানে খুব শক্তিশালী।

কাজেই আপনার উদ্দেশ্য যদি হয় ১০০ কোটি টাকার মালিক হওয়া তাহলে আপনাকে সেই মনছবিই দেখতে হবে। দেখুন, আপনি ১০০ কোটি টাকার মালিক হয়ে গেছেন। ১০০ কোটি টাকার মালিক হলে যেভাবে আচরণ করতেন-আপনার ব্যবহার, কর্মপদ্ধতি যেরকম হতো, সেরকম আচরণ করুন। প্রয়োজনে বাস্তবে এরকম একজন ধনীকে দেখে নিন যে, তার আচরণ-কর্মপদ্ধতি কেমন।

নিজেকে সবসময় ১০০ কোটি টাকার মালিক মনে করুন। এটাই সার্বক্ষণিক সম্পৃক্ততা। আর অখন্ড মনোযোগ হচ্ছে, ১০০ কোটি টাকার মালিক যে আপনি-এই বিশ্বাসটাকে দৃঢ় রাখা এবং শয়নে-স্বপনে সবসময় ঐ ভাবনাই ভাবা।

**প্রশ্ন :** একজন দরিদ্র লোকের পক্ষে ধন-ঐশ্বর্যের মনছবি দেখে ধনী লোকের মতো আচরণ করা কীভাবে সম্ভব? কারণ সে তো দরিদ্র। ধনীর মতো খরচ করতে থাকলে তো তার সারা মাসের বাজেট একদিনে খরচ হয়ে যাবে?

**উত্তর :** এখানেই হচ্ছে মজা। আমি নিজেই আমার সীমাবদ্ধতা তৈরি করছি। মনে করছি, আমি দরিদ্র। ধনী হতে পারবো না। অতএব আচরণ করছি গরিবের মতো। কিন্তু ভেবে দেখুন, আপনার অভাববোধ থাকবে কেন? আল্লাহর দুনিয়ায় আপনি নিজেকে কেন সীমিত করে নেবেন?

আপনি বড়লোক হয়ে গেছেন এই আচরণটা বাইরে করবেন না। করবেন মনে। ১০০ কোটি টাকা হলে যে দান-খয়রাত করতেন সেটা আসার আগেই যদি দেয়া শুরু করে দেন, তাহলে ভুল হবে। সুখানুভূতিটা সৃষ্টি করবেন মনে। বড়লোক হলে আপনার মনে যে সুখ আসতো সেই সুখানুভূতি নিয়ে আসুন। ১০০ কোটি টাকার মালিক হলে মানুষের সাথে যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে মিশতেন, সেভাবে মিশুন। দেখুন অর্থ কীভাবে আসে। অর্থাৎ পরিবর্তন আসতে হবে মনে। মনে পরিবর্তন এলে বাস্তবতাও বদলে যাবে।

**প্রশ্ন :** আপনি বললেন যে, মনছবির সাফল্যের জন্যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সংযুক্তি ঘটাতে। কিন্তু আমার অসুবিধা হচ্ছে আমি শুধুমাত্র ধ্যানাবস্থায় মনছবির সাথে একাত্ম হই। অন্যসময় হতে পারি না বা হওয়ার জন্যে তাগিদ অনুভব করি না। তবে কি আমি মনছবির সঙ্গে একাত্ম হচ্ছি না?

**উত্তর :** পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সবগুলো অনুভূতিকেই একত্র করে ব্যবহার করতে হবে। আসলে অন্যসময়ও আপনাকে তাগিদ অনুভব করতে হবে। যখনই সুযোগ পাচ্ছেন, সময় পাচ্ছেন তখনই নিজেকে মনছবির সেই সফল মানুষ হিসেবেই ভাববেন।

**প্রশ্ন :** মনের বাড়িতে যে মনছবি করছি, স্বপ্নও তা-ই দেখছি। আগে তেমন স্বপ্ন দেখতাম না। এখন নিয়মিত মনছবি দেখছি, সেই সাথে স্বপ্নও। এটা কি ইতিবাচক?

**উত্তর :** অবশ্যই ইতিবাচক। এরকম হলে তো কথাই নেই, শয়নে-স্বপনে সবসময় আপনার মনছবি। স্বপ্নেও আপনি মনছবি দেখছেন এজন্যে আপনাকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

## নীরবে কাজ

**প্রশ্ন :** প্রাচুর্যের ক্ষেত্রে নীরবে কাজ করা বলতে যা বোঝানো হচ্ছে মহিলাদের পক্ষে তা পুরোপুরি মানা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ একেক পরিবারের প্রেক্ষাপট একেকরকম। মহিলাদের করণীয় কী হবে বুঝিয়ে বলবেন।

**উত্তর :** নীরবে কাজ মানে গোপনে কাজ নয়। নীরবে কাজের অর্থ—অহেতুক হই চই বা প্রচারণা নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে বরং কাজে মনোনিবেশ করা। জাতিগতভাবে আমরা কথা বেশি বলি, কিন্তু কাজ কম করি। আমরা আমাদের বুদ্ধি কাজের জন্যে না লাগিয়ে, খুব ভালো কাজ করছি এটা বোঝানোর চেষ্টায় ব্যয় করি। এজন্যেই আমরা এত পিছিয়ে আছি। যে কাজ যতটুকু নীরবে করা যায় ঠিক সেভাবেই তা করা উচিত।

বিখ্যাত চিত্রশিল্পী মকবুল ফিদা হুসেন বা এম এফ হুসেন। পাঁচ/ সাত বছর আগেই তার একেকটি পেইন্টিংয়ের মূল্য ছিলো ইন্ডিয়ান রুপির এক কোটি রুপি। সাদা কাগজে তিনি যদি শুধু একটা সিগনেচার করে দিতেন, তার দামও দাঁড়াতো ইন্ডিয়ান রুপির এক লাখ রুপি।

একবার পোলারয়েড ক্যামেরার সাথে প্রতিযোগিতা হয়েছিলো—একটি চেহারা তিনি বেশি দ্রুত আঁকতে পারেন, না ক্যামেরা বেশি দ্রুত ধারণ করতে পারে তা দেখার জন্যে। সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে সেই প্রতিযোগিতায় জয়ী হন হুসেন। শুধু চিত্রশিল্পী নন, চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবেও তিনি সফল। অথচ এম এফ হুসেন কাজ শুরু করেছিলেন সিনেমার হোর্ডিং অর্থাৎ সিনেমার যে বড় বড় পোস্টার, সেই হোর্ডিং পেইন্টারের এসিসটেন্ট হিসেবে।

এম এফ হুসেনের একটা খুব বিখ্যাত উক্তি রয়েছে যে, আমরা সেলিব্রেটি হতে চাই। আমরা চাই যে, লোকজন আমাদের জানুক, আমাদের বুঝুক, আমাদের দেখুক, আমাদের সম্বর্ধনা দিক। আমাদের মালা দিক। কিন্তু সেলিব্রেটি হওয়ার আগে যে ১০/১৫ বছর অবসকিউরিটিতে কাটাতে হয়, নীরবে—নির্জনে সাধনায় কাটাতে হয় তা আমরা চাই না। অর্থাৎ সাফল্য প্রাচুর্য খ্যাতি পাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিতে হবে। নিজেকে যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। প্রচারণা বা কথার চেয়ে কাজে বেশি মনোযোগী হতে হবে।

**প্রশ্ন :** Heroism বা show off যারা করে, মানুষ তাদেরকেই বেশি পছন্দ করে। তারাই সহজে মনোযোগের কেন্দ্রে চলে যায়। নীরবে কাজ করে হয় না। আমি বিভ্রান্ত।



**উত্তর :** শো-অফ করে মনোযোগের কেন্দ্রে যাওয়া যায়, কিন্তু তার স্থায়িত্ব কতক্ষণ? ফানুসের মতোই। ফানুস রাতে আলো ছড়িয়ে আকাশে ওঠে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মিলিয়ে যায়। সেলিব্রেটি হওয়ার জন্যে যে সাধনা দরকার, সেই সাধনা যদি না থাকে, তাহলে সে নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। যেমন, সিনেমার যে নায়ক-নায়িকারা দুতিনটে ছবি করেই তরুণ-তরুণীদের হার্টথ্রব হয়ে যায়, তাদের কজনকে আমরা পরে মনে রাখি? গত ৩০ বছরে বা গত ১০ বছরেও ঢালিউড বা বলিউডে যে নায়ক-নায়িকারা এসেছে তাদের কজনকে আমরা মনে রেখেছি? তারা সাময়িক উন্মাদনার মধ্য দিয়ে ভেসে উঠেছিলো। উন্মাদনায় যখন ভাটা পড়লো তারাও হারিয়ে গেল সাবানের ফেনার মতো। আর এটাই শো-অফ এবং নীরব সাধনার মধ্যে পার্থক্য।

আবার আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যে সাত জন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা বীরশ্রেষ্ঠ হয়েছেন, তাদের কাউকেই আমরা বাস্তবে দেখি নি। কিন্তু আমরা তাদের নাম জানি, তাদেরকে মনে রেখেছি। অথচ '৭০ সাল বা '৭৫ সালের মধ্যে মারা গেছে এমন সাত জন নায়ক-নায়িকার নাম বলতে বললে আমরা কয়জন তা বলতে পারবো? কারণ শো-অফ করে অমর হওয়া যায় না। অমর হতে হলে নীরবে কাজ করতে হয়, সাধনা করতে হয়, আত্মদান করতে হয়।

কোয়ান্টামে আমরা সবসময় নীরবে কাজ করে যাওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী। ফলে প্রচারের ক্ষেত্রে আমরা অন্যদের তুলনায় ১০০ ভাগের এক ভাগও তৎপর নই। কিন্তু তারপরও কোয়ান্টামের বাণী 'দৃষ্টিভঙ্গি বদলান, জীবন বদলে যাবে', 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন', 'সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন' এখন লাখো লাখো মানুষের মুখে। কারণ আলো যখন জ্বলে তখন সবাই দেখে। আর অন্তরে আলো জ্বালানোর জন্যে দরকার নীরবে কাজ। কারণ নীরব মুহূর্তগুলোই জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত, সৃজনশীল মুহূর্ত। নীরব মুহূর্তে যে চিন্তা-ভাবনা-বিশ্বাস ও দৃঢ়তা আসে সেটাই মানুষকে হিরো করে, অমর করে।

**প্রশ্ন :** মনছবি অন্য কাউকে বলা যাবে না কেন?

**উত্তর :** আসলে আপনি যদি এখন সবাইকে বলেন যে, আপনি প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন তাহলে কী হবে? একদল আপনাকে বিশ্বাসই করবে না। হাসাহাসি করবে, টিপ্পনি কাটবে। হয়তো উপহাস করে বলবে, 'ঐ প্রেসিডেন্ট, যা এককাপ চা নিয়ে আয়'। এতে আপনার মনোবল ক্ষুণ্ণ হবে।

আবার হয়তো দেখা যাবে, কেউ কেউ আপনার কথা সিরিয়াসলি নিচ্ছে। তারা হয়তো আপনার পিছে লেগে যাবে যেন আপনি কিছুতেই প্রেসিডেন্ট হতে না পারেন। দরকার কী খামোখা এসব ঝামেলা ডেকে আনার? তার চেয়ে যতদিন মনছবি বাস্তবায়িত না হচ্ছে ততদিন নীরবে কাজ করে যান। বাস্তবায়িত হওয়ার পর সবাই এমনিই জানবে, আপনার বলে বেড়ানোর প্রয়োজন হবে না।

## মনছবি প্রক্রিয়া

**প্রশ্ন :** আমার প্রশ্ন হচ্ছে কী কী করলে মনছবি পূর্ণাঙ্গ হবে? বাস্তবতা সম্পূর্ণ প্রতিকূল হলেও কি মনছবি বাস্তবায়িত হবে?

**উত্তর :** মনছবির পাঁচটি পূর্বশর্ত রয়েছে। এক, লক্ষ্য স্থির করতে হবে। লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট হতে হবে, সুস্পষ্ট হতে হবে যে, আমি প্রফেসর হবো, আমি ধনকুবের হবো বা আমি প্রধানমন্ত্রী হবো। অর্থাৎ যা হতে চান সেই লক্ষ্যকে স্থির করতে হবে।

দুই হচ্ছে, লক্ষ্যে আস্থা। লক্ষ্যটা যে যুক্তিসঙ্গত এ ব্যাপারে আপনার আস্থা থাকতে হবে।

তিন হচ্ছে, লক্ষ্যানুরণন। লক্ষ্য অর্জনের অনুভূতি বিকিরণ। লক্ষ্যটাকে বর্তমান হিসেবে দেখতে হবে। ‘লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেছে’—এই অনুভূতিটা নিজের মধ্যে আনতে হবে।

চার হচ্ছে, লক্ষ্যে একাত্মতা। লক্ষ্যে সবসময় একাত্ম থাকতে হবে।

পাঁচ হচ্ছে, নীরবে কাজ। লক্ষ্য অর্জনের জন্যে নীরবে কাজ করতে হবে।

মনছবির এ পাঁচটি সূত্র অনুসরণ করে যে কেউ আপাত অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে আমরা বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর মানুষটির কথা উল্লেখ করতে পারি। মার্কিন ইতিহাসের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আসলে এই পাঁচটি ধাপকে অতিক্রম করেই আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন।

ওবামার কেনিয়ান বংশোদ্ভূত বাবা আমেরিকায় এসেছিলেন ভাগ্যান্বেষণে। সেখানেই ওবামার মায়ের সাথে তার পরিচয় এবং বিয়ে। কিন্তু ওবামার জন্মের পর পরই তারা আলাদা হয়ে যান এবং দুজনেই আবার বিয়ে করেন। ১৯৬৭ সালে ওবামার বয়স যখন ছয়, তখন শিশু ওবামাকে নিয়ে তার মা

ইন্দোনেশিয়ান স্বামীর সাথে চলে যান জাকার্তায়। দারিদ্র আর প্রতিকূলতার মধ্যে বেড়ে উঠতে লাগলেন তিনি। কিন্তু সেখানেও থাকা হলো না তার। ফিরে এলেন হাওয়াইতে তার নানা-নানীর কাছে। অর্থাৎ মা-বাবাহীন একটি বিচ্ছিন্ন পরিবারের কিশোর হিসেবে বেড়ে উঠতে লাগলেন।

১২ বছর বয়সে বাবার সাথে তার প্রথম এবং শেষবারের মতো দেখা হয়। এরপর শিক্ষাজীবনের ধাপগুলো সাফল্যের সঙ্গে পেরিয়ে ভর্তি হলেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৮০ সালে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তার মায়ের ডিভোর্স হয়ে যায়। আর ১৯৮২ সালে মারা যান তার নিজের বাবা।

১৯৮৮ সালে ঘটলো তার জীবনের বাঁকবদলকারী ঘটনাটি। পিতৃভূমি কেনিয়ায় গিয়ে পিতার পরিবারের সাথে মিলিত হলেন। অনুভব করলেন শেকড়ের শক্তি। দুঃখ, দারিদ্র আর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াইকে দেখলেন কাছ থেকে। তার উপলব্ধি পেলো এক নতুন মাত্রা। পরে তিনি লিখেছেন, The visit united my outward self with my inward self in an important way. অর্থাৎ এ সফরের মধ্য দিয়ে তার ভেতরের সত্তার সাথে বাইরের সত্তার এক গুরুত্বপূর্ণ মিলন ঘটে। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ১৯৯০ সালে কাজ শুরু করেন তিনি। এ বছরই প্রথম আফ্রো-আমেরিকান হিসেবে হার্ভার্ড ল রিভিউ-এর সম্পাদক মনোনীত হন।

১৯৯২ সালে এক অসাধারণ বই রচনা করেন তিনি—‘ড্রিমস ফ্রম মাই ফাদার’, যেখানে তিনি তার শেকড় সন্ধানের সংগ্রামের কথা বলেছেন। ২০০৪ সালে তিনি ইউএস সিনেটের সদস্য হন। ২০০৮ সালে হিলারি ক্লিনটনের মতো প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে দলীয় মনোনয়ন পেলেন এবং অবশেষে জয়ী হয়ে সৃষ্টি করলেন প্রথম ব্ল্যাক আমেরিকান প্রেসিডেন্ট হওয়ার বিরল ইতিহাস।

এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বারাক ওবামা এ অবধি আসতে পেরেছেন কারণ তার মনছবি ছিলো। তিনি কী চান, সেটা তার কাছে স্পষ্ট ছিলো। স্কুলে থাকতেই ক্লাস পরীক্ষায় রচনা লিখেছিলেন—আই ওয়ান্ট টু বি দি প্রেসিডেন্ট অফ আমেরিকা। আর লক্ষ্যের যৌক্তিকতায় কতটা আস্থা থাকলে একজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ সিনেট সদস্য হওয়ার মাত্র দুবছরের মাথায় শুভাকাজক্ষীদের উপদেশ অগ্রাহ্য করে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে নিজের নাম ঘোষণা করতে পারেন তা সহজেই অনুমেয়।

নমিনেশনের জন্যে প্রতিযোগিতা চলাকালে অনেকেই তাকে প্রশ্ন করেছেন আপনার বর্ণের কারণে অনেকেই আপনাকে ভোট দেবেন না, এ নিয়ে কি

আপনার কোনো দুশ্চিন্তা হয় না? ওবামা নিঃশঙ্কচিত্তে বলেছেন, সে তো আমার কান দুটো বেশি বড় বলে মানুষ আমাকে ভোট দিতে না-ও পারে, হিলারি ক্লিনটন নারী বলে তাকে অনেকে ভোট দিতে না-ও পারে, জন এডওয়ার্ডস-এর উচ্চারণে আঞ্চলিকতার ছাপ আছে বলে তাকে কেউ কেউ ভোট না-ও দিতে পারে। বর্ণ নিয়ে এত চিন্তার কী আছে?

ওবামার লক্ষ্যানুগুন কেনেডি পরিবারের সদস্যসহ অনেক প্রভাবশালী ডেমোক্রটিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো হিলারি ক্লিনটনের মতো পরিচিত মুখের পরিবর্তে তাকে সমর্থন করতে।

সারাজীবন তিনি নিজেকে ধাপে ধাপে প্রস্তুত করেছেন তার মনছবির জন্যে। এ কারণে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করার পর অনেক মোটা অঙ্কের চাকরির সুযোগ থাকার পরও প্রথম পেশা হিসেবে বেছে নেন কমিউনিটি সংগঠনকে। দারিদ্র ও বর্ণসমস্যা নিয়ে কাজ শুরু করেন তিনি। সুবিধাবঞ্চিত লক্ষাধিক নাগরিকের ভোটাধিকারের সুযোগ তৈরি করে দেন। হার্ভার্ড থেকে ল' পাশের পরও কাজ করার জন্যে বেছে নেন এমন একটি ফার্মকে, যেটি আকারে ছোট, বেতন অনেক কম, কিন্তু যেখানে প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের সাথে যোগাযোগের সুযোগ আছে।

শুধু বারাক ওবামা নন, যারাই সফল হয়েছেন তারাই জেনে বা না জেনে এই প্রক্রিয়াকেই অনুসরণ করেছেন। অতএব যত বড় স্বপ্নই হোক, দ্বিধা করবেন না। কারণ আপাত অসম্ভবকে সম্ভব করার নামই মনছবি।

**প্রশ্ন :** মাহাথির মোহাম্মদ এবং মালয়েশিয়া প্রসঙ্গে আপনার মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলছি, আপনি কি মনে করেন না ব্যক্তির মতো জাতিরও মনছবির প্রয়োজন আছে?

**উত্তর :** অবশ্যই আছে। জাতিগত মনছবি বাস্তবায়নের একটা উজ্জ্বল উদাহরণ হলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। পৃথিবীর ইতিহাসে মাত্র নয় মাসে বিজয় অর্জনের মতো একটি অসাধারণ ঘটনা সম্ভব হয়েছিলো তিনটি উপাদানের কারণে—মনছবিতে অবিচল বিশ্বাস, সজ্জবদ্ধতা এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টা।

প্রথমত, মনছবিতে অবিচল বিশ্বাস। ২৬ মার্চ থেকে স্বাধীনতার যে স্বপ্নের সাথে সমস্ত বাঙালি একাত্ম হয়ে গিয়েছিলো তাতে বিশ্বাসের কোনো ঘাটতি ছিলো না। আধুনিক সমরাত্মক সজ্জিত নৃশংস পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে বাধ্য হওয়া নিরস্ত্র একটি জাতির বিশ্বাসের এই দৃঢ়তা সত্যিই

অসাধারণ। এমনও হয়েছে, ট্যাংক আসছে শুনে পাখি শিকার করার সামান্য এয়ারগান হাতে একজন মানুষ ছুটছে ট্যাংক মোকাবেলা করার জন্যে।

দ্বিতীয়ত, সম্ভবদ্বতা। এই একটি মনছবিকে সামনে রেখে আমরা যেভাবে সম্ভবদ্বদ্ব হয়েছিলাম, একাত্বতা ও সমমর্মিতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছিলাম তা আমাদের জাতীয় জীবনের এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। একমাত্র হানাদার বাহিনীর ভয় ছাড়া গোটা জনপদে ছিলো না কোনো ভয়, অনিশ্চয়তা বা নিরাপত্তাহীনতা। মা তার তরুণী কন্যাকে নিয়ে একা ঢাকা থেকে গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে গেছেন দিনাজপুর। কোনো ভয় বা আশঙ্কা ছিলো না তার মনে। ঢাকা বা অন্যান্য আক্রান্ত জনপদ থেকে যারাই আশ্রয়ের খোঁজে পথে নেমেছেন তারাই পেয়েছেন এর প্রমাণ। চেনা নেই, জানা নেই এমন মানুষদেরও রাত্রি যাপনের জন্যে নিজের ঘর ছেড়ে দিয়েছেন গ্রামের গৃহস্থ। মধ্যরাতে গরম ভাত, মুরগির গোশত আর সকালে পিঠা খাইয়ে আপ্যায়ন করেছেন। সে সময় সম্ভবদ্বতা এবং সমমর্মিতার দৃষ্টান্ত এমনই ছিলো যে, সম্পূর্ণ অচেনা অজানা একদল মানুষ মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে নিমেষেই হয়ে যেত একে অপরের সবচেয়ে কাছের জন। সহযোদ্ধারা প্রত্যেকেই চাইতো কষ্টের, বিপদের, ঝুঁকির কাজটুকু নিজে করতে আর সঙ্গীদের নিরাপদে রাখতে।

তিন হচ্ছে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা। স্বাধীনতা পাওয়ার জন্যে যা যা করা দরকার এবং যা যা ত্যাগ করা দরকার তার সবই আমরা করেছিলাম। এক কোটি মানুষ দেশ ত্যাগ করেছিলো এবং গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলো আরো তিন কোটি মানুষ। শুধু বাড়ি বা সম্পদ নয়, নিজেকে বিসর্জন দিতেও তাদের কোনো দ্বিধা ছিলো না। যে তরুণরা আরাম-আয়েশ বা বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত ছিলো, তারাই মুক্তিযুদ্ধের জন্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। ট্রেনিং ক্যাম্পের কষ্ট, যুদ্ধে অংশ নিয়ে আহত বা নিহত হওয়ার আশঙ্কা-সবকিছুকেই তারা মেনে নিয়েছে অগ্নান বদনে।

আর বিশ্বাস, সম্ভবদ্বতা এবং সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা যখন কোনো মহৎ লক্ষ্যের জন্যে নিবেদিত হয় তখন তাতে স্রষ্টার রহমতের ধারা সম্পৃক্ত হয়। মুক্তিযুদ্ধ আমরা কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে নয়, সমগ্র জাতির মুক্তির জন্যে করেছিলাম। আমরা ছিলাম জুলুম ও শোষণের বিরুদ্ধে। ন্যায়ের পথে। যার ফলে এত অল্প সময়ে উপকরণের এত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নৃশংস পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ে আমরা সফল হয়েছিলাম।

এত গৌরবোজ্জ্বল সাফল্যের পর আমাদের আজকের এই অবস্থার কারণও

হচ্ছে স্বাধীনতার পর আমরা আর কোনো জাতিগত মনছবি সৃষ্টি করতে পারি নি। কিন্তু ৯০-এর দশক থেকে আমরা জাতিগত মনছবি দেখতে শুরু করেছি-বাংলাদেশ নেতৃত্ব দিচ্ছে আগামী বিশ্বের। আপনিও নিঃসংকোচে এই মনছবিতে शामिल হতে পারেন।

## মনছবি ও ধর্ম

**প্রশ্ন :** মনছবির ব্যাপারে আমার একটু অস্পষ্টতা আছে। বৌদ্ধধর্মে নিষ্কাম কর্মের কথা বলা হয়েছে, কাজের ফলের প্রতি আসক্ত না হয়ে কাজ করতে বলা হয়েছে। গীতায়ও একই কথা বলা হয়েছে। ইসলাম ধর্মেও কাজের কী ফল হবে তার জন্যে আল্লাহর ওপর নির্ভর করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ যা করেন, তা বান্দার মঙ্গলের জন্যেই করেন। কিন্তু মেডিটেশনে আমরা আমাদের কাজের ফল অনেক তীব্রভাবে কামনা করি। আমি মনছবির সাথে ধর্মের দৃষ্টিকোণের মিল বুঝতে পারি নি।

**উত্তর :** আসলে কাজের ফল দেয়ার অধিকার আল্লাহর কিন্তু কাজ করার দায়িত্ব আপনার। যে কারণে আল্লাহ তায়ালা সূরা বালাদ-এর ৪ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে বলেছেন ‘আমি মানুষকে পরিশ্রম ও কষ্টনির্ভর করে সৃষ্টি করেছি।’ অর্থবর্বেদে বলা হয়েছে, ‘হে মানুষ! উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে আন্তরিকতার সাথে পরিশ্রম কর। দারিদ্র ও অসুস্থতা তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে।’ অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষকে পাঠানোই হয়েছে কষ্ট ও পরিশ্রম করার জন্যে। তেমনি ফলাফলের জন্যেও শ্রম দিতে হবে মানুষকেই।

এখন আমরা যদি মনে করি, আমি খাবো কি খাবো না, এটা আল্লাহ নির্ধারিত করে রেখেছেন। এই বলে আমি চালও আনলাম না, রান্নাও করলাম না এবং খাওয়ার উপকরণ যোগাড়ও করলাম না। বসে থাকলাম এই ভেবে যে, আল্লাহ কপালে লিখলে তো খাবোই। কিন্তু আল্লাহ ওভাবে কপালে লিখে রাখেন না। তাহলে আল্লাহ মানুষকে কাজের জন্যে বলতেন না। সূরা জুমআ-এর ১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-‘নামাজ শেষ করে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পদ অনুসন্ধান কর।’ ভগবদ্গীতায় রয়েছে, ‘মানুষের অধিকার শুধু কর্মে। ফলে তার অধিকার নাই। কাজ কর। নিজেকে কর্মের কারক মনে করো না। আবার নিজেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে দিও না।’ অর্থাৎ কর্মের গুরুত্ব সব জায়গায় সব ধর্মে দেয়া হয়েছে, ফলের নয়।

ফলাফলের দায়িত্ব আপনি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিলেন কিন্তু চাইতে তো কোনো দোষ নেই। আল্লাহ চাইতে নিষেধ করেন নি। কোরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে—‘তুমি আমার কাছে চাও, প্রার্থনা কর, আমি কবুল করবো’। আল্লাহ প্রার্থনা খুব পছন্দ করেন, চাওয়াটাকে খুব পছন্দ করেন এবং মনছবি হচ্ছে চাওয়ারই একটা রূপ, চাওয়ার সাথে নিজেকে মিশিয়ে ফেলা। চাওয়া এবং নিজেকে এর সাথে একাকার করে ফেলা হচ্ছে মনছবি যা আল্লাহ পছন্দ করেন। যে কর্ম করেছে আল্লাহ তাকেই ফল দিয়েছেন, যে কর্ম করে নি আল্লাহ তাকে ফল দিলেও সে রাখতে পারে নি, ফল অন্যরা ভোগ করেছে।

ঋগবেদে চমৎকারভাবে বলা আছে, ‘যারা সৎপথে কঠোর পরিশ্রম করে এবং পরস্পরকে সহযোগিতা করে তাদেরকেই প্রভু সাহায্য করেন’। অতএব মনছবির সাথে আপনার বিশ্বাসের কোনো বিরোধ নেই, ধর্মের কোনো বিরোধ নেই। মনছবি হচ্ছে একাত্ম চাওয়া, চাওয়ার সাথে নিজেকে একাকার করে দেয়া। চাওয়া ও চাওয়ার প্রক্রিয়ার সাথে মিশে যাওয়া।

**প্রশ্ন :** ইসলাম এবং অন্য অনেক ধর্মে বড় বড় প্রত্যাশার নিন্দা করা হয়েছে। মানুষকে সর্বদা তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত থাকার শিক্ষা দিয়েছে। কিন্তু মনছবির মাধ্যমে আমরা বড় কিছু অর্জন করার লক্ষ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকার মাধ্যমে কি অর্থ খ্যাতি বা পণ্যের প্রতি আসক্ত হয়ে যেতে পারি না? মনছবির সীমারেখা কোথায় হওয়া উচিত?

**উত্তর :** নিঃসন্দেহে ইসলামসহ সকল ধর্মই তুষ্ট পরিতৃপ্ত ও শোকরগোজার থাকার শিক্ষা দিয়েছে। আমরাও তাই সবসময়ই সবকিছুর জন্যেই বলি শোকর আলহামদুলিল্লাহ! শুকরিয়ার দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, পৃথিবীতে সৃষ্টির জন্যে কল্যাণকর সবকিছুই আল্লাহর নেয়ামত। স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর নেয়ামতের ওপর বিশ্বাসীদেরই অধাধিকার রয়েছে।

কোরআনে বলা হয়েছে, ‘আল্লাহ বিশ্বাসীদের দুনিয়া ও আখেরাত—উভয় স্থানেই প্রতিষ্ঠা দান করেন’। এই জন্যে কোরআনে সালাত কায়েমের পাশাপাশি যাকাত আদায়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিভবান হয়ে যাকাত আদায় নামাজের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। তাই নামাজ শেষ করে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া ও আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পদ অনুসন্ধান করতে বলা হয়েছে।

রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, তুমি সেই ব্যক্তিকে ঈর্ষা করতে পারো যাকে আল্লাহ প্রচুর সম্পদ দিয়েছেন এবং সে তা সৃষ্টির কল্যাণে ব্যয় করে। এখানে

সৃষ্টির কল্যাণে ব্যয় করার জন্যে প্রচুর বিত্তের অধিকারী হওয়ার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শুধু ভোগবিলাসে মত্ত থাকতে নিষেধ করা হয়েছে।

কোরআনের এই শিক্ষা অনুসরণ করেই সাহাবায়ে কেরাম তখনকার জানা পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদার সময় তারা অর্ধেক পৃথিবী শাসন করেছেন। আর আরবের সকল মানুষ যাকাতদাতায় পরিণত হয়েছিলেন।

আত্মিক উন্নতির পাশাপাশি রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের অমানবিকতার পতন ঘটিয়ে তারা একমাত্র পরাশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। অতএব মনছবির লক্ষ্য যদি নিজের ও সৃষ্টির কল্যাণ হয়, তবে এর সীমারেখা হওয়া উচিত কমপক্ষে সারা পৃথিবী। লক্ষ্য মহৎ হলে অর্থ খ্যাতি বা পণ্যের প্রতি আসক্তির প্রশ্নটি অবান্তর। রসুলুল্লাহ (স) ছাড়াও হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলীর জীবন এর জ্বলন্ত উদাহরণ।

**প্রশ্ন :** চাকরির জন্যে মনছবি করেছিলাম কিন্তু যথাসময়ে তা সফল হয় নি। তবে সামনে সুযোগ রয়েছে তাই আবারও কি এর জন্যে মনছবি করতে পারি?

**উত্তর :** এখনো করেন নি কেন, আমি তো আপনাকে সেই প্রশ্ন করবো। যেহেতু সুযোগ আছে অবশ্যই আপনি মনছবি করবেন।

## মনছবি পরিবর্তন

**প্রশ্ন :** কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের সময় যে মনছবি করেছিলাম তা পূর্ববর্তী ভ্রান্ত ধারণাগুলোর ওপর ভিত্তি করে ছিলো। যত মেডিটেশন করছি তত ভ্রান্ত ধারণাগুলো পরিষ্কার হচ্ছে। এর ফলে আমি এখন বুঝতে পারছি, আগে আমি মনছবিতে যা চেয়েছি তা আমার জন্যে সঠিক ছিলো না। এ অবস্থায় মনছবির ব্যাপারে আমার কী করণীয়?

**উত্তর :** স্বাভাবিকভাবেই মনছবি বদলাতে হবে। নতুন পরিস্থিতি-অভিজ্ঞতা-বিশ্বাস-ধারণার আলোকে নতুন মনছবি নির্মাণ করণ।

**প্রশ্ন :** দেশের বাইরে পড়াশোনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু প্রথমে যে দেশ নির্বাচন করে মনছবি দেখেছিলাম, গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণে তা পরিবর্তন করে



অন্য দেশের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আসলে আমার মনছবি ঘন ঘন বদলে যাচ্ছে। মনছবিতে পরিবর্তন কি সাফল্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া আনবে?

**উত্তর :** আসলে পরিবর্তন কিছু কিছু যে করা যাবে না তা নয়। কিন্তু ঘন ঘন পরিবর্তন করলে তা বিরূপ প্রতিক্রিয়া আনতে পারে বৈকি।

ধরুন, আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, প্রফেসর হবেন। ছয় মাস প্রফেসর হওয়ার জন্যে কাজ করলেন। তারপর মনে হলো প্রফেসরের কোনো গ্ল্যামার নেই, তার চেয়ে বরং ‘তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ’ হয়ে যাই, ওখানে গ্ল্যামার আছে। আপনি তার পেছনে লেগে গেলেন। কিন্তু দেখা গেল, বাংলাদেশ আপনাকে আর খুঁজে পাচ্ছে না। তখন ভাবলেন যে, ঠিক আছে, এবার আর এসব কিছু নয়, এবার আমি ডাক্তার হবো। এরকম বার বার লক্ষ্য বদলাতে থাকলে কী হবে? ব্রেন কনফিউজড হয়ে যাবে। বলবে যে, এ আগে ঠিক করুক, তারপর আমি কাজ করবো।

অনেকটা ঐ ঘটনার মতো। একজন খুব বিখ্যাত ডাক্তারের চেম্বারে সবসময় ভিড় লেগে থাকে। এতে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে ডাক্তার সাহেব মোটা বেতন দিয়ে একজন সুবেদার রাখলেন সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে এবং বললেন যে, খবরদার! এই সময়টা আমার বিশ্রামের সময়, এ সময় কাউকে ঢুকতে দেবে না। আর্মির সুবেদার, যেমন হুকুম তার তেমন কাজ। এর মধ্যে কী কারণে কয়েকদিন পরে ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী এসেছেন দেখা করতে। স্ত্রী এসে পরিচয় দিলেন, আমি তার ওয়াইফ। সুবেদার বললেন যে, ম্যাডাম, স্যারের হুকুম নাই। স্ত্রী তো চেম্বারে ঢুকতে পারে নাই। বুঝতেই পারছেন ডাক্তার সাহেব বাসায় যাওয়ার পরে কী অবস্থা হয়েছে!

তিনি পরদিন এসে সুবেদারকে ধরেছেন। সুবেদার বললো যে, স্যার, আপনিই তো বলেছেন কাউকে ঢুকতে দেবে না। তিনি বললেন, আমি বললেই হলো! আমার স্ত্রী আসবে আর তাকে ঢুকতে দেবে না! এখন থেকে আমার স্ত্রী এলে ঢুকতে দেবে। সুবেদার বললো, জী স্যার! তা-ই হবে। দিন ১৫ পরে এবার ডাক্তার সাহেবের শ্বশুর এলেন তার সাথে দেখা করার জন্যে। শ্বশুর তো আরো বয়স্ক মানুষ। সুবেদার বললো যে, এসময় কারো ঢোকার হুকুম নাই শুধু ওনার স্ত্রী ছাড়া। আপনি স্ত্রীর বাবা হোন, তবুও স্যারের হুকুম নাই। হুকুম ছাড়া তো আমি কাউকে ঢুকতে দিতে পারি না। এখন শ্বশুর মশাই তো চলে গেছেন বাসায়। বুঝতেই পারছেন রাত্রে যখন ডাক্তার সাহেব বাসায় গেছেন তখন কী অবস্থা!

পরদিন প্রফেসর সাহেব চেম্বারে এসে আবার বললেন যে, এই ব্যাটা বেআক্কেল, স্ত্রীর বাবা এসেছে তাকে ঢুকতে দাও নি কেন? সুবেদারের গেল মেজাজ খারাপ হয়ে। কারণ তার ট্রেনিং তো শুধু যে কমান্ড পায়, কেবল সেটাকে অনুসরণ করার মধ্যেই সীমিত। বার বার কমান্ড বদলানোয় সে দিশেহারা হয়ে পড়ছিলো। বললো যে, স্যার, আমি আপনার চাকরি করবো না। আপনি একবার বললেন কাউকে ঢুকতে না দিতে, তারপর বললেন শুধু আপনার স্ত্রী-কে ঢুকতে দিতে। আর এখন স্ত্রীর বাবাকে ঢুকতে না দেয়ার জন্যে আমাকে বকছেন। আপনি তো আসলে কমান্ড দিতেই জানেন না। আমি স্যার, আপনার চাকরিই করবো না।

ব্রেন কিন্তু আসলে এই সুবেদারের মতো। এ শুধু কমান্ড বোঝে। অতএব বুঝে শুনে কমান্ড দেবেন, বার বার যদি কমান্ড পরিবর্তন করেন, একবার এদিকে তো আরেকবার ওদিকে দৌড়াতে বলেন, তাহলে এত দ্বিধা-দ্বন্দ্বে তো মস্তিষ্ক সঠিক কর্মপ্রক্রিয়া পাবে না। আপনার মনছবিও কাজ করবে না।

## মনছবি : অন্যান্য

**প্রশ্ন :** আমরা মনছবি দেখি, পূরণ হয়ে গেছে কিন্তু অটোসাজেশন দেই ভবিষ্যতের। যেমন আমি মনছবি দেখি গাড়ি চড়ছি কিন্তু অটোসাজেশন দেই আমার গাড়ি হবে। সঠিক তথ্যটি জানতে চাচ্ছি।

**উত্তর :** দুটোই ঠিক আছে। মনছবিতে ভবিষ্যৎকে বর্তমান হিসেবে দেখতে হবে আর অটোসাজেশন দেয়ার সময় আপনার পছন্দ অনুযায়ী বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কাল-যেকোনোটি ব্যবহার করতে পারেন। এখানে ভবিষ্যৎ কাল যেমন, তেমনি বর্তমান কালজ্ঞাপক অটোসাজেশনও ব্যবহার করতে পারেন।

**প্রশ্ন :** মনছবির ভেতরে বর্তমান অবস্থা চলে আসে যার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের। ধীরে ধীরে তা যদি সরিয়ে দিয়ে আবার যথালক্ষ্যে কল্পনা করি তবে কি তা ঠিক হবে?

**উত্তর :** বর্তমান অবস্থা ঢুকে পড়তে পারে। আস্তে করে ওটাকে সরিয়ে দিয়ে আসলে আপনি যা হতে চাচ্ছেন সে ছবিতেই ফিরে যাবেন।

**প্রশ্ন :** আমি যা মনে মনে ভাবি বা আকাঙ্ক্ষা করি বাস্তবে সবসময় তার উল্টো ফল হতে দেখা যায়। যেমন, কখনো ক্লাসে যেতে দেরি হলে ভাবি আজ নিশ্চয়ই স্যারের বকা খাবো। কিন্তু ক্লাসে গিয়ে দেখি স্যার খুব ফ্লেক্সিবল। অথবা স্যারই তখনো ক্লাসে আসেন নি। আমি লক্ষ্য করেছি, আমার জীবনের প্রতিটি ঘটনা এভাবেই ঘটে। ফলে কাক্ষিত বিষয়ের জন্যে আমাকে উল্টো ভাবতে হয়। এটা মনছবির সাথে সাংঘর্ষিক কি না একটু ব্যাখ্যা করবেন।

**উত্তর :** আসলে এটাও হচ্ছে আপনার একটা দৃষ্টিভঙ্গি। যখন ভাবেন আজকে বকা খাবো, তখন শুধু বকা খাওয়ার কথা ভাবেন না। একই সাথে আবার ভাবেন-না না, সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনার মধ্যে দুটো ভাবনাই সবসময় কাজ করে। এক মন বলে বকা খাবেন, আরেক মন বলে বকা খাবেন না। নেতিবাচক এবং ইতিবাচক দুটো চিন্তাই একসাথে হতে থাকে। আপনি ধরেই নিচ্ছেন-যে নেতিবাচক চিন্তাটা করলেন, বাস্তবে তার উল্টোটা হবে। আর হয়ও তা-ই। এখন থেকে মনছবিকে দৃঢ় করুন। সবসময় ভাববেন যে, যা চিন্তা করবো সে রকমই দেখবো। লক্ষ্যটাকে যত সুস্পষ্ট করবেন এবং লক্ষ্যে যত একাগ্র থাকবেন তত লক্ষ্য অনুসারেই আপনার জীবন পরিচালিত হবে।

**প্রশ্ন :** একসময়ে প্যারিসে বৃত্তি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। বহু বাধার সম্মুখীন হই। তবে শয়নে স্বপনে বইতে পড়া বর্ণনানুযায়ী জায়গায় অবস্থান করতাম। পরে সত্যিই সেখানে গিয়েছিলাম।

**উত্তর :** বাহ! আপনি তো প্রশিক্ষণ ছাড়াই চমৎকার মনছবি করেছেন। আসলে সব সফল মানুষই সচেতনভাবে অথবা সহজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই প্রক্রিয়াকেই অনুসরণ করেছেন। আর আপনি যেহেতু প্রশিক্ষণ ছাড়াই করে ফেলেছেন, প্রশিক্ষণের পরে মনছবি আরো অনেক সুন্দর হবে।

**প্রশ্ন :** মনছবির সময় কোনো কিছু পেতে হলে কি মনে মনে শুধু কল্পনাই করতে হবে যে, আমি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পেয়ে গেছি বা পেতে চাই, না কারো কাছে দয়া ভিক্ষা চাইতে হবে। যেমন আল্লাহর নিকট?

**উত্তর :** আসলে মনছবিতে আপনি দেখবেন যে, আপনি পেয়ে গেছেন। এটা কারো কাছে দয়া ভিক্ষা না। তবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা ভিন্ন কথা। কারণ প্রার্থনা মনছবির প্রাপ্তিকে ত্বরান্বিত করে।

**প্রশ্ন :** আমি এক বছর হলো কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। এতদিনে আমার মনের বাড়ি পরিষ্কার হয়েছে। আর আমার মনছবিও এখন স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। মনছবিটাকে মাঝে মাঝে বাস্তব বলে কল্পনা করি। আমার বিশ্বাস আমার মনছবি বাস্তবে পরিণত হবে। কিন্তু শুধু মনছবি দেখলেই কি সেটা বাস্তবে পরিণত হবে? আপনি হয়তো বলবেন যে, সে অনুযায়ী কাজ করতে। কিন্তু গুরুজী আমার মনছবিটা একটু অন্যরকম। একমাত্র আল্লাহই সেটা বাস্তবে পরিণত করতে পারবেন। দয়া করে এই ব্যাপারটি একটু বলবেন কি?

**উত্তর :** যদি এটা শুধু আল্লাহই বাস্তবায়িত করতে পারেন তাহলে আল্লাহর ওপরে ছেড়ে দিন। এটা নিয়ে আর চিন্তা করার দরকার নেই। কারণ যা শুধু আল্লাহ বাস্তবায়িত করতে পারেন সেখানে প্রার্থনা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। যেটার জন্যে আপনার করার কিছু আছে, সেটা হচ্ছে মনছবি।

## অন্যের ব্যাপারে মনছবি

**প্রশ্ন :** অন্য কারো উন্নতির জন্যে মনছবি করলে সেটা কতটুকু কার্যকর হবে? যেমন স্বামীর ব্যবসায়িক সাফল্য, সন্তানের শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্যের মনছবি কি দেখতে পারি? সেক্ষেত্রে তা কীভাবে বাস্তবায়িত হবে?

**উত্তর :** আসলে মনছবি নিজের জন্যে, অন্যের জন্যে নয়। আর আমরা বিশ্বাস করি যে, আগে আমাদের নিজের কল্যাণ করতে হবে। যখন আপনি নিজের কল্যাণ করতে পারবেন তখন যদি অন্যের কল্যাণ করতে যান সেটা হবে যুক্তিসঙ্গত। আর নিজের কল্যাণ না করে অন্যের কল্যাণ করতে যাওয়াটা অযৌক্তিক। কারণ তার বিশ্বাস বা আস্থা কোনোটাই আপনি পাবেন না।

তবে স্বামীর ব্যবসায়িক সাফল্য, সন্তানের শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্যের জন্যে দোয়া করতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু এ লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্যে মূল প্রচেষ্টা করতে হবে তাদেরকেই। সেক্ষেত্রে আপনার প্রত্যাশা সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। আপনার ইতিবাচক অনুরণন তাদেরকে আরো ইতিবাচক করে তুলবে। তাই নিজে দোয়ার পাশাপাশি তাদেরকেও মনছবি দেখতে ও বাস্তবে চেষ্টা চালাতে উদ্বুদ্ধ করুন। প্রয়োজনে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝান। আবার সবাই মিলেও একসাথে মনছবি দেখতে পারেন।

**প্রশ্ন :** সমষ্টিগত মনছবি সামগ্রিক সাফল্যলাভে কতটা লক্ষ্যভেদ করতে পারে?

**উত্তর :** যিনি সমষ্টিগত সাফল্যের মনছবি দেখবেন, কালক্রমে তিনিই নেতা হবেন। কারণ তিনি শুধু একার জন্যে চিন্তা করছেন না, তিনি অন্যদের জন্যেও চিন্তা করছেন। তিনি যদি তার মেধাকে বিকশিত করতে পারেন তাহলে অন্যরাও তার সাথে সংযুক্ত হবেন এবং সামগ্রিক মনছবি সফল হবে। আসলে মহামানবরা প্রথমে একাই মনছবি দেখেছেন। হযরত ইব্রাহিম (আ) থেকে শুরু করে রসুলুল্লাহ (স) পর্যন্ত সকল মহামানব প্রথমে নিজেই মনছবি দেখেছেন জাতিকে পরিবর্তন করার। কালক্রমে তা সফল হয়েছে।

মাহাথির মোহাম্মদ ১৯৭৫ সালে মনছবি দেখলেন, অনগ্রসর মালয়েশিয়ায় ২০ বছরের মধ্যে গড়ে তুলবেন পৃথিবীর সর্বোচ্চ ভবন। তার একক মনছবি পুরো জাতির মাঝে সঞ্চারিত হলো। ১৯৯৫ সালে তৎকালীন পৃথিবীর সর্বোচ্চ ভবন নির্মিত হলো মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে। অতএব একক মনছবিও অত্যন্ত শক্তিশালী হতে পারে যদি তিনি তার নিজের ভেতরের শক্তিকে বিকশিত করতে পারেন এবং এটা যদি সামগ্রিক স্বার্থে হয়। অতএব একক মনছবি, যদি এটা আন্তরিক হয়, সমষ্টিগত হয়, সামগ্রিক কল্যাণের জন্যে হয় অর্থাৎ সবার উপকারের জন্যে হয়, তবে অবশ্যই তা লক্ষ্যভেদ করতে পারে।

## মনছবি বাস্তবায়নে অন্যের সহযোগিতা

**প্রশ্ন :** মনছবি বাস্তবায়নের অনেক অংশ আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। অনেক কাজের জন্যে অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। এই অবস্থায় নিজের করণীয় সঠিকভাবে সম্পন্ন করার পর কী করবো?

**উত্তর :** যাদের মনছবি বাস্তবায়িত হয়েছে, বাস্তবায়িত হওয়ার আগে অধিকাংশ বিষয়ই তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিলো না। কিন্তু সময় তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, যেহেতু তারা লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন। লক্ষ্য অর্জনের জন্যে যেটুকু কাজ করা সম্ভব সেটুকু তারা করেছেন, বাকিটুকু হয়েছে কারণ তারা প্রকৃতির সহযোগিতা পেয়েছেন। আমাদের প্রত্যেকের মন বিশ্বমনের সাথে সংযুক্ত। আসলে আপনার বিশ্বাস যখন সুদৃঢ় হয়, তখন সামগ্রিক সচেতনতা (collective consciousness) থেকে সহযোগী শক্তি চলে আসে, প্রকৃতির নেপথ্য স্পন্দন কাজ করতে শুরু করে আপনার অনুকূলে।

**প্রশ্ন :** আমার মনছবি যদি অন্য কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয় এবং আমার মনছবিতে সে গুরুত্বপূর্ণ হয় তবে কি এটা অন্যায়?

**উত্তর :** অন্য কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো মনছবি হওয়া উচিত নয়। তবে ধরুন, আপনি একটা প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে চান। এক্ষেত্রে অন্য কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো হচ্ছে না। আপনি প্রথম হতে চাচ্ছেন—কে সেকেন্ড হলো, কে থার্ড হলো এটা নিয়ে আপনার কোনো মাথাব্যথা নেই। এমন হলে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু আপনি যদি মনে করেন অমুককে আমি প্রভাবিত করতে চাই এবং অন্যায়ভাবে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে চাই। তাহলে এটা মনছবি হবে না। এটা ভ্রষ্টাচার বলে গণ্য হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

## মনছবিতে আস্থা আনতে পারছি না

**প্রশ্ন :** আমি যে মনছবি করেছি আমি সেজন্যে জন্মেছি কি না—এই সন্দেহ অনুভূতি থেকে কীভাবে বের হবো? আমি আসলে কী কাজের জন্যে ভালো এটা খুঁজে পাচ্ছি না। এটা না খুঁজে পেয়ে আমি যে জীবনছবি তৈরি করেছি তাতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনে সমস্যা হয়।

**উত্তর :** এই সন্দেহটাই হচ্ছে একজন মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। এজন্যে কোয়ান্টামের জীবনে আমরা যত কাজ করেছি আমরা কোথাও এই সন্দেহের প্রশ্রয় দেই নি। যা মানুষ অসম্ভব মনে করেছে, পরবর্তীতে সেটাই সম্ভব হিসেবে বাস্তবে দেখা গেছে।

কোর্সের কথাই বলি—আমরা যখন শুরু করলাম, আমি যেহেতু আগে সাংবাদিকতা করেছি, এস্ট্রলজি করেছি—আমার নিজস্ব একটা সার্কেল ছিলো। সবাই শুনে বললো, কী বলেন? একজন মানুষ পয়সা দিয়ে আসবে আর চার দিন বসে বসে শুধু আপনার কথা শুনবে! অসম্ভব! আরে মানুষ এককভাবে একটা নাচের প্রোগ্রাম/ গানের প্রোগ্রাম দুই/ তিন ঘণ্টার বেশি করতে পারে না। আর আপনি তো শুধু কথা বলবেন! কতক্ষণ মানুষ শুনবে!

আমি বললাম, আমি তো নিজের কথা বলবো না, আমি তার উপকারের কথা বলবো। আর নিজের উপকার, নিজের ভালো তো পাগলও বোঝে। সেখানে তো যারা আসবেন তারা সব সুস্থ মানুষ, সব ভালো মানুষ, তারা শুনবেন না? বিদ্রূপকারীরা বললেন যে, হ্যাঁ, দেখা যাবে।

আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। হাজার হাজার মানুষ কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে উপকৃত হয়েছেন। কারণ মানুষের ৭৫ ভাগ রোগ হচ্ছে মনোদৈহিক। আর ২৫ ভাগ ইনফেকশন, দৈহিক আঘাত, ওষুধ ও অপারেশনের প্রতিক্রিয়ার কারণে। এই ২৫ ভাগের জন্যে ডাক্তার প্রয়োজন। কিন্তু মনোদৈহিক বা মনের জটের কারণে যে ৭৫ ভাগ রোগ হয় তা ওষুধ দিয়ে ঠিক করা যাবে না। মনকে দিয়ে ঠিক করতে হবে। ধ্যানের স্তরে মন যখন কথাগুলো শুনবে, মনের জট খুলবে এবং তিনি ভালো হবেন।

যে যা-ই বলুক আমরা বিশ্বাসে অটল ছিলাম। তখন তো কোনো উদাহরণ ছিলো না। উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে কোর্স শুরু করার পরে। হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হয়েছে। এখন লাখো মানুষ উপকৃত হচ্ছে। কারণ আমাদের কোনো দ্বিধা ছিলো না।

আমার বক্তৃতা করার কোনো অভিজ্ঞতা ছিলো না। আমি সাইকিয়াট্রিস্ট বা সাইকোলজিস্টও নই। কিন্তু বিশ্বাস করেছি যে, এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ডিগ্রি যদি না-ও থাকে, আমি এই বিষয়টি জানি, আমি এই বিষয়টি বুঝেছি। আল্লাহকে বলেছি যে, আল্লাহ, আমি বক্তা নই। বক্তৃতা জানি না। জীবনে কোনোদিন বক্তৃতা করি নি। কিন্তু আমাকে তো এই সত্য কথাগুলো বলতে হবে। তুমি আমাকে বলার শক্তি দাও। আল্লাহ তায়ীলা শক্তি দিয়েছেন।

আমার সহধর্মিণীও আমার আলোচনা শুনে অবাক হলেন। কারণ আগে উনি বলতেন আমি শুনতাম। আমি শ্রোতা হিসেবে কিন্তু এখনো খুব ভালো। কিন্তু কোর্স শেষে উনি বললেন যে, তুমি যে এত কথা বলতে পারো তা তো আগে বুঝি নি। আমি বললাম, আগে বলার প্রয়োজন হয় নি। এখন বলার প্রয়োজন। আমার বিশ্বাসের কথা তো আমাকেই বলতে হবে। আমার বিশ্বাসের কথা তো আরেকজন আমার মতো করে বলতে পারবে না।

অতএব জীবনে যা করবেন বিশ্বাসের সাথে করবেন। যখন কেউ বিশ্বাস করে ফেলে তখন আল্লাহর করুণা তার ওপরে চলে আসে। আর আপনার বিশ্বাস আপনাকেই করতে হবে। আরেকজন বিশ্বাস করলে আপনার তাতে কোনো লাভ হবে না।

আল্লাহ তায়ীলা প্রত্যেকটা মানুষকে আলাদা আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন। কারো মতো কাউকে সৃষ্টি করেন নি। অতএব আপনাকে যে ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন, আপনাকে যে মস্তিষ্ক আল্লাহ দিয়েছেন, এই মস্তিষ্ককে যদি আপনি কাজে লাগাতে পারেন-আপাত অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবেন। কিন্তু আমরা পারি না কেন? আমাদের চিন্তাগুলো বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত, সন্দেহে

আক্রান্ত। সে জন্যে পারি না। আমরা সজ্জবদ্ধ নই বলে আমরা পারি না। যখন একা থাকবেন দ্বিধা বেশি থাকবে।

যিনি মেধাবী, যার মেধা দেখে আমরা বিস্মিত হই—তার ব্রেন আর আমাদের ব্রেনের মধ্যে মৌলিক কোনো তফাত নেই। আমাদের ব্রেনের নিউরোনগুলো হচ্ছে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত। সংযোগ কম। যিনি মেধাবী তিনি সংযোগটা বাড়াতে থাকেন। আর নিউরোন থেকে নিউরোনে সংযোগ যত বাড়াবেন তত আপনি সফল হবেন। আমাদের সমাজে প্রভাবশালী মানুষ তারাই যারা সজ্জবদ্ধ। যার সাথে যত মানুষের সংযোগ রয়েছে তার শক্তি ক্ষমতা তত বেশি। আপনি একটা অফিসে কাজ করতে যাচ্ছেন, সকাল থেকে বসে আছেন, কোনো কাজ হচ্ছে না। এর মধ্যে যার সামনে বসে আছেন তিনি হয়তো একটা ফোন পেলেন কিছুক্ষণ পর। আপনার সামনেই আরেকজন লোক ঢুকলো। তার কাজটা তৎক্ষণাৎ করে উনি তাকে ছেড়ে দিলেন আর আপনি বসেই আছেন। কেন? সংযোগের জন্যে।

আপনি যত নিউরোনের সংযোগ বাড়াবেন তত আপনার মেধাকে কাজে লাগাতে পারবেন। অতএব বিশ্বাস করতে হবে এবং বিশ্বাসে অটল থাকতে হবে। যখনই বিশ্বাস করবেন—নির্ভেজাল বিশ্বাস করবেন, তখন মস্তিষ্ক কাজ করতে শুরু করবে। তখন করণাময়ের করণা আপনার ওপর বর্ষিত হবে। আসলে সব ধরনের মেধাই মস্তিষ্কে সুপ্ত থাকে। ৭০০ কোটি মানুষ একই ক্ষমতাসম্পন্ন মস্তিষ্ক ধারণ করছে যার জৈব রাসায়নিক গঠনে কোনো পার্থক্য নেই। যে বিষয়ে আপনি আগ্রহী ও বিশ্বাসী হবেন সেই সংক্রান্ত নিউরোনে সংযোগায়ন ও সক্রিয়তা সৃষ্টি হবে। আপনি লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাবেন।

**প্রশ্ন :** মনছবি আছে জীবনে বড় হবার। কিন্তু যেভাবে সবকিছু এগুচ্ছে মনে সন্দেহ জাগে। হতাশ হয়ে পড়ি। সবাই উৎসাহ দেয়। তারপরও সময়ের প্রেক্ষিতে খুব বেশি হতাশ হয়ে পড়ি। কী করতে পারি? মনছবি যা দেখি সেই লক্ষ্যে আমাকে পৌছাতে হবেই হবে। আমার কী করা উচিত?

**উত্তর :** আসলে আমাদের অধিকাংশের সমস্যা এটাই। আমরা বিশ্বাসে অটল থাকতে পারি না। বার বার খালি খোঁচাই। একটা মুরগি ডিম নিয়ে বসেছে, বাচ্চা ফুটতে তো ২১ দিন লাগবে, না ২১ দিনের আগে বাচ্চা ফোটে?

এক ছাত্র তার শিক্ষককে বললো যে, এখন নতুন মেশিন বেরিয়েছে একদিনে বাচ্চা ফোটে। আমি দেখেছি আগের দিন ডিম একদিক দিয়ে



টোকাচ্ছে, আর পরের দিন বাচ্চা অন্যদিক দিয়ে বের করছে। শিক্ষক ভাবলেন, একদিনে বাচ্চা ফোটে! এটা কেমন কথা! এটা তো হয় না। ঠিক আছে, খোঁজ লাগাও। তিনি খোঁজ লাগালেন, যেখানে মেশিনে মুরগির বাচ্চা ফোটানো হয় ওখানে গেলেন। গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, একদিনে নাকি বাচ্চা ফোটে? খোঁজ নিয়ে জানা গেল, হ্যাঁ, ঠিকই আছে। প্রত্যেকদিনই টোকানো হয় প্রত্যেকদিনই বের করা হয়, কিন্তু মাঝখানে ২১টা ফেজ আছে। এই যে ডিমটা গেল, এটা তার পরের দিন দ্বিতীয় চেম্বার, তার পরের দিন তৃতীয় চেম্বার, তার পরের দিন চতুর্থ চেম্বার—এরকম ২০ দিনে ২০টা চেম্বার পার হয়ে ২১ দিনের দিন ডিম থেকে মুরগির বাচ্চা বের হচ্ছে। সে যেটা দেখেছিলো পরদিন সকালে, সেটা ২০ দিন আগে টোকানো হয়েছিলো, আগের দিনেরটা না। তো মুরগির ডিম মেশিনে ফোটান আর মুরগি দিয়ে ফোটান, ২১ দিন সময় তো দিতে হবে! এখন আপনি যদি প্রত্যেকদিন মুরগি উঠিয়ে উঠিয়ে দেখেন যে, বাচ্চা ফুটলো কি না তাহলে কি বাচ্চা হবে, না ডিম নষ্ট হয়ে যাবে? আমাদের মনছবি হয় না এজন্যে। প্রত্যেকদিনই চিন্তা করি হলো কি না! কতদূর হলো দেখি। এ অস্থিরতা না করে বরং বিশ্বাসে অটল থাকতে হবে।

এই যে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া, কী জানি, হবে কি হবে না, পাবো কি পাবো না, রবে কি রবে না—এই সন্দেহটাই হচ্ছে সকল বিনাশের একটা বড় কারণ। সেটা নিজের কাজের ব্যাপারে হোক, সেটা পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে হোক, মনছবির ব্যাপারে হোক, পরিকল্পনার ব্যাপারে হোক—এই সন্দেহের চেয়ে নেতিবাচক শক্তি আর কিছু নেই। এই সংশয় এবং সন্দেহ হচ্ছে একজনকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্যে শয়তানের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। যখনই আপনি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগুচ্ছেন, দৃঢ়তার সাথে চিন্তা করছেন, পরিকল্পনা করছেন, প্রোগ্রাম করছেন, তখনই শয়তান আপনার ভেতরে থাকা নেতিবাচক সম্ভাটাকে উসকে দিচ্ছে। ফলে আপনি যে ১০ ধাপ এগিয়েছিলেন, এক ধাপ পিছিয়ে গেলেন। কারণ আপনার ইতিবাচক শক্তি যেভাবে কাজ করছিলো সেখানে একটা ছেদ পড়ে গেল।

আসলে সন্দেহ হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা ভেতরে থাকলে ক্রমাগত ক্যাস্পারের মতো বাড়তে থাকে। সাধারণ সেল এবং ক্যাস্পার সেল—এর মধ্যে তফাত কোথায়? সাধারণ সেল ভেঙে একটা থেকে দুটো হয়। ক্যাস্পার সেল হয় একটা থেকে চারটা। যার ফলে সাধারণ অঙ্গের চেয়ে এটা বেড়ে যায়। সন্দেহও সেভাবে বাড়তে থাকে। অতএব সন্দেহ-সংশয়কে প্রশ্রয় দেবেন না।

স্রষ্টার ওপর অবিচল বিশ্বাস রাখুন। বিশ্বাস রাখুন তাঁর দেয়া সামর্থ্যের ওপর। নিরলস পরিশ্রম করুন। যুক্তিসঙ্গত কল্যাণকর লক্ষ্যে আপনি পৌঁছবেনই।

**প্রশ্ন :** আমি যে মনছবি দেখছি, সে মনছবিতে আমার পুরোপুরি বিশ্বাস সৃষ্টি হয় না। কারণ আমার মনছবি অনেক বড়। আমার মনে হয়, বাকি জীবনে এই মনছবি বাস্তবে রূপদান করা সম্ভব নয়। এই কারণে সময়কে পুরোপুরি মনছবির লক্ষ্যে কাজে লাগাতে পারছি না। আমার কী করণীয়?

**উত্তর :** আসলে মনছবি সবসময়ই শুরু হয় শূন্য থেকে কিন্তু শেষ হয় পূর্ণতায়। সত্যিকার মনছবির প্রক্রিয়ায় যদি একাত্ম হতে পারেন তাহলে আপাতদৃষ্টে এ মনছবি যত অসম্ভবই মনে হোক বা উপকরণের যত স্বল্পতাই থাকুক, তা অর্জিত হবেই। আপনি শুধু নিয়ত ঠিক করে পথে নামুন। পথই আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আসলে আমাদের সবচেয়ে বড় পুঁজি আমরা নিজেরা। আমাদের যা দেয়া হয়েছে তার যা দাম হবে সেই সমপরিমাণ অর্থবিস্তৃত আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারে নি। যারাই সফল হয়েছেন তারা এই পুঁজিকেই ব্যবহার করেছেন।

আর সেই সাথে প্রয়োজন প্রস্তুতি। মনছবি শুধু চাওয়া নয়—চাওয়া এবং পাওয়ার প্রক্রিয়ার সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়ার নাম মনছবি। যেরকম, একজন গর্ভবতী মা যখন বলেন যে, আই এম এক্সপেক্টিং তখন সেই শিশুকে ধারণ ও লালন করার জন্যে তার যা যা মনোদৈহিক পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হতে থাকে। অর্থাৎ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে যে মনোদৈহিক প্রস্তুতি, সেই প্রস্তুতিটা নিতে হবে। তাহলে আপনার মধ্যে এ সন্দেহটা থাকবে না। আর যদি মনোদৈহিক প্রস্তুতি না থাকে, তাহলেই হতাশায় পড়বেন, সন্দেহ দেখা দেবে।

**প্রশ্ন :** আপনার দেয়া দীক্ষামতে বিশ্বাসই সবকিছুর চাবিকাঠি। আমার প্রশ্ন—মনছবি দেখার ক্ষেত্রে প্রথম থেকে ১০০% দৃঢ়বিশ্বাস থাকতে হবে, না বিশ্বাসে কিছুটা ঘাটতি থাকলেও ক্রমাগত মনছবির চর্চা করে ১০০% দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন সম্ভব? কারণ আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী মনছবি চর্চার মাধ্যমে দৃঢ়বিশ্বাসও অর্জন সম্ভব হয়েছে। দয়া করে পরামর্শ দিন।

**উত্তর :** ভেতরে যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাসের ঘাটতি থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা একটা ইতিবাচক কল্পনা হিসেবে থাকবে। যখন ১০০% দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হবে

তখন এই ইতিবাচক কল্পনা মনছবিতে পরিণত হবে। আসলে বিশ্বাসই হচ্ছে মনছবির বীজ। এখানে কোনোরকম ঘাটতি থাকলে সেটা অন্য কোনো জিনিস দিয়ে পূরণ করা যাবে না। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্বাস দৃঢ় হতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস ছাড়া বার বার মনছবি দেখলে সেটা আপনাকে প্রভাবিত করতে পারবে না। কেননা মনছবিতে লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারলে সেই সাফল্য-অনুরণন বাস্তব সাফল্যকে চারদিক থেকে আপনার দিকে আকৃষ্ট করতে পারে। কিন্তু ভেতরে সংশয় থেকে গেলে মনছবিতে আপনি সে জায়গায় পৌঁছতেই পারবেন না।

বিশ্বাস সৃষ্টি করার জন্যে আপনি অটোসাজেশন চর্চা করতে পারেন, আবার অনেক ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবেও সময়ের সাথে সাথে বিশ্বাস সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু মনছবি বিশ্বাসের ঘাটতি পূরণ করতে পারবে না। বিশ্বাসহীন মনছবি আর আকাশকুসুম কল্পনার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

**প্রশ্ন :** আমার মনছবি দেখতে খুব ভয় হয়। মনছবিকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করলাম কিন্তু হলো না, তখন মন কাচের মতো ভেঙে খানখান হয়ে যায়। আমি ভীষণ দিশেহারা হয়ে পড়ি। অলীক কিছুতে বিশ্বাস করা কি ঠিক?

**উত্তর :** অলীক বিষয়ে বিশ্বাস করা তো ঠিক না। যা আপনি অলীক মনে করবেন, তা কখনোই মনছবি হবে না। কিন্তু অলীক অর্থাৎ অবাস্তব আর আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব এক নয়। বড় কিছুকে চাইতে ভয় পাওয়া উচিত নয়।

আসলে আমাদের ব্যর্থতার একটা প্রধান কারণ-আমরা চাইতে ভয় পাই, কি জানি, কী চেয়ে আবার কোন বিপদে পড়ি। এক বুজুর্গ আজ থেকে ৭০ বছর আগে হজ করে সৌদি আরব থেকে এলেন। তিনি কিছু ঘটনা বলছিলেন-আমরা তরমুজের লাল অংশ খাই, সাদা-সবুজ অংশ ফেলে দিই। তো উনি ওখানে লাল অংশ খেয়ে সাদা অংশ ফেলতে পারতেন না, ফেলার আগে সৌদিরা ক্যাচ ধরে ফেলতো।

এত অভাব, এত দারিদ্র ছিলো যে, তারা ঐ সাদা-সবুজ অংশও খেতো। আজকে কোন সৌদির গাড়ি নেই? শোনা যায়-গাড়ি এক্সিডেন্ট করলে নাকি ওটা সেখানেই ফেলে নতুন গাড়ি কিনে তারা বাসায় চলে যায়। প্রত্যেক সৌদিকে একটা করে গাড়ি দেয়ার পরেও যদি আল্লাহর ভাভারে গাড়ির অভাব না পড়ে, তো প্রত্যেক বাঙালিকে একটা করে গাড়ি দিলে কি আল্লাহর ভাভারে গাড়ির অভাব হবে? অর্থাৎ চাইতে হবে। এই চাওয়ার নাম হচ্ছে মনছবি।

ধরুন, মায়ের তিন ছেলে, জিনিস একটা। কাকে দেন মা? সবচেয়ে

নিরীহ—যে সবসময় মায়ের আঁচল ধরে সাথে সাথে থাকে তাকে? না—যেটাকে না দিলে আজকে রাতে চিৎকার করে ঘুম হারাম করে দেবে তাকে?

যে চিৎকার করে রাতের ঘুম হারাম করে দেবে জিনিসটা তাকেই দেন মা। আর অন্যদেরকে বোঝান যে, ওটা ভালো না, তোমাকে ভালো জিনিস এনে দেবো। তো চাইতে হবে, এই চাওয়ার নাম হচ্ছে মনছবি।

**প্রশ্ন :** যখন কোনো আকাজক্ষা নিয়ে কমান্ড সেন্টার ও মনছবির মেডিটেশন করি, তখন দেখা যায় যে, এর ফল হয় উল্টো। অনেক সময় মন ভেঙে যায়, আস্থা হারিয়ে ফেলি। সে পরিস্থিতিতে আমি কী ভাবে পারি?

**উত্তর :** এত সহজে আস্থা হারানো যাবে না। রবার্ট ব্রুস যদি আস্থা হারিয়ে ফেলতেন তাহলে তিনি আয়ারল্যান্ডকে স্বাধীন করতে পারতেন না। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা যদি মনে করতাম যে, আমরা শেষ হয়ে গেছি—আমাদের পক্ষে দেশ স্বাধীন করা সম্ভব হতো না। অতএব, সবসময় মনে রাখতে হবে যে, কোনো ব্যর্থতাই ব্যর্থতা নয়, যতক্ষণ না আপনি নিজেকে ব্যর্থ মনে করছেন।

যেকোনো সময় যেকোনো অবস্থা থেকে আপনার উত্থান ঘটতে পারে। কোয়ান্টামের শুরুর দিকে ৯৩, ৯৪, ৯৫ সাল পর্যন্ত আমাদের নিয়ে চারপাশের বেশিরভাগ মানুষই উপহাস করেছে। তখন হতাশ হলে আমরা ওখানেই হারিয়ে যেতাম। কিন্তু আমরা আমাদের আস্থায় অটল ছিলাম। জীবনে সাফল্য আসে ধাপে ধাপে। একবারেই আপনি কোটিপতি হয়ে যেতে পারবেন না। আর একবারে যদি আপনি কোটিপতি হয়েও যান তো সে টাকা ধরে রাখতে পারবেন না। কারণ সফল হওয়ার জন্যে যেরকম প্রস্তুতি প্রয়োজন, সাফল্য ধরে রাখার জন্যেও প্রস্তুতি প্রয়োজন।

**প্রশ্ন :** আমি ৩২২ ব্যাচের কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। কোয়ান্টাম হিলিং ও সাইকি ওরিয়েন্টেশন করেছি। মনের দিক থেকে আগের চেয়ে অনেক ভালো আছি। কিন্তু প্রতিদিন মনছবি দেখার পরেও আমার হাতে কোনো কাজ আসছে না। সবাই শুধু আশ্বাস দেয়। এদিকে প্রতিদিন আমার ঋণের পরিমাণ বাড়ছে। সামনে কীভাবে চলবো তা নিয়ে ভয় পাচ্ছি। আমি এখন কী করতে পারি?

**উত্তর :** আপনি প্রতিদিন মনছবি দেখছেন। মনছবি দেখার পরে ‘কী হবে, ভয় হয়’ এগুলো যখন মনে আসছে তখন বোঝা যাচ্ছে মনছবি আপনার ভেতরে

গাঁথে নি। মনছবি যদি আপনার ভেতরে গাঁথে যেত তাহলে উৎকর্ষার পরিবর্তে আপনার মনে আনন্দ সৃষ্টি হতো। আপনার মনে সাফল্যের অনুরণন সৃষ্টি হতো। আর সাফল্যের অনুরণন যখন সৃষ্টি হবে তখন অবশ্যই সাফল্য আসবে। এর আগ পর্যন্ত লোকজন আপনাকে শুধু আশ্বাস দিয়ে যাবে। কারণ আপনার মনে এখনো পরিবর্তন আসে নি। আপনি এখনো মানসিকভাবে ব্যর্থতার সাথেই নিজেকে সংযুক্ত করে রেখেছেন। আগে দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। বিশ্বাস করতে হবে যে, আমি সফল হবো, সাফল্য আমার। সাফল্যের সাথে নিজেকে মানসিকভাবে সংযুক্ত করতে হবে। এরপরই পারিপার্শ্বিকতায় পরিবর্তন শুরু হবে।

**প্রশ্ন :** মনছবি বাস্তবায়ন না হলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী রকম হওয়া উচিত? আমার পরিচিত একজন মেডিটেশন কোর্স সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি যে মনছবি দেখেছেন সে অনুযায়ী কাজ করেও তা বাস্তবায়িত হয় নি। তাই তিনি এ ব্যাপারে অনীহা ও অনাস্থা পোষণ করেন। এ ব্যাপারে কিছু বলুন।

**উত্তর :** আসলে মনছবিতে যদি আপনার নিজের দ্বিধা থাকে, সন্দেহ থাকে, সংকোচ থাকে তাহলে সেটা হবে না। আর মনছবির পথ কখনই সরল পথ নয়। এটা বার্নার মতো আঁকাবাঁকা। মনছবি শুরু হয় শূন্য থেকে, শেষ হয় পূর্ণতায়। কিন্তু আপনাকে বিশ্বাসে প্রবল থাকতে হবে। বাধা আসতে পারে, বার্নার সামনেও বাধা আসে। বাধা এলে বার্না যেরকম বিকল্প পথে অগ্রসর হয়, মনছবিও হচ্ছে সেরকম।

আমরা যখন কোয়ান্টাম মেথড কোর্স শুরু করি, আমাদের মনছবি ছিলো শত শত মানুষ ক্লাসে আসবে, ক্লাস করবে। এটা হচ্ছে বিশ্বাস। কোর্সের প্রথম ব্যাচে যতজন এলেন তাতে হলের ভাড়াই উঠলো না। দ্বিতীয় ব্যাচে এলেন ১১ জন। তৃতীয় ব্যাচে ১২/১৩ জন হবে। চতুর্থ ব্যাচে ১০/১১ জন। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি যে, এখন সবাই বিস্মিত হন যে, কোর্সে এসে এত মানুষ উপকৃত হচ্ছে! কারণ আমাদের বিশ্বাসে কোনো ঘাটতি ছিলো না। আমরা বিশ্বাসে অটল ছিলাম যে, হবে। যখন মানুষ বুঝবে তখন তারা অবশ্যই কোর্সে আসবে। তখন যদি আমরা হতাশ হয়ে যেতাম তাহলে আজকের অবস্থানে আসতে পারতাম না।

মনছবি পূরণ হওয়ার জন্যে বিশ্বাসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সবসময় বলি যে, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলে হবে না। যেমন ইলেকট্রিক সাপ্লাই লাইনে একটা

তারের সাথে আর একটা তারের মাঝে চুল পরিমাণ ফাঁক থাকাই শর্ট সার্কিটের জন্যে যথেষ্ট। এই চুল পরিমাণ সংশয় সন্দেহ যখন আপনার মধ্যে ঢুকে যাবে মনছবি আর বাস্তবায়িত হবে না। তাই যিনি বলছেন তিনি আসলে মনছবি করেন নি। আকাশকুসুম কল্পনা করেছেন। আর আকাশকুসুম কল্পনা এবং মনছবি এক জিনিস নয়।

**প্রশ্ন :** আমি সুবিধাবঞ্চিত ছোট ছোট বাচ্চাদের পড়াচ্ছিলাম। এখন আমি আমার সীমাবদ্ধতাকে টের পাচ্ছি। বাসা থেকে আমাকে জোর করে একটা দোকান নিয়ে বসতে বলছে এবং বিয়ে করার জন্যে চাপ দিচ্ছে। আমি এখন নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মতো অবস্থায় পৌঁছাই নি। মনছবি আঁকছিলাম তবে অবিশ্বাস আমাকে এগুতে দিচ্ছে না। বেঁচে থাকার জন্যে উপার্জন করতে হবে, আমি কি আমার মনছবি বদলাবো?

**উত্তর :** আসলে নিজের ভেতরে বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করতে হবে। আর এই জন্যেই অটোসাজেশন। জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন বই বা সিডির যে অটোসাজেশনগুলো আপনার সমস্যার সমাধান করতে পারবে মনে হয় সেগুলো মুখস্থ করে ফেলবেন এবং প্রতিটি অটোসাজেশনের আলোকে আপনার পরিবর্তন হচ্ছে কি না দেখবেন। যখন একা থাকবেন, নিরিবিলি থাকবেন বা মেডিটেশন করবেন অন্য চিন্তা না করে এই অটোসাজেশনগুলো চর্চা করবেন। যাতে মনছবি আপনি সহজে করতে পারেন, এজন্যেই অটোসাজেশন। আসলে ‘নিয়ত সকল কর্মের অঙ্কুর’, অটোসাজেশন লক্ষ্য বা নিয়তকেই দেয় সুদৃঢ় ভিত্তি।

## মনছবি বাস্তবায়িত হচ্ছে না

**প্রশ্ন :** ধরুন, মনছবির দুটো অংশ। দুটো অংশই সম্পূর্ণ। এখন এক্ষেত্রে প্রথম মনছবিটা বাস্তবায়িত হওয়ার পর দ্বিতীয় অংশটা যদি বাস্তবায়িত না হয় তবে এক্ষেত্রে কী করবো?

**উত্তর :** দ্বিতীয় অংশটা যদি বাস্তবায়িত না হয় মানে? বাস্তবায়িত হবে না কেন? যেখানে দুটো অংশ সম্পর্কিত সেখানে প্রথম মনছবিটা বাস্তবায়িত হওয়ার পর দ্বিতীয় অংশটা যদি বাস্তবায়িত না হয় তাহলে সেটাকে অব্যাহত

রাখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা বাস্তবে না হচ্ছে।

ধরুন, মাটির নিচে একটা বীজ বুনলেন। বোনার পরে সেটা অঙ্কুরোদগম হয়ে গাছ হয়ে ফল দিতে তো আপনাকে সময় দিতে হবে। মনছবিটা হচ্ছে বীজ। এই বীজটা থেকে অঙ্কুরোদগম হয়ে গাছ হয়ে ফল দিতে যে সময় প্রয়োজন তা আপনাকে দিতে হবে। যখনই প্রয়োজনীয় সময় দেবেন আপনি দেখবেন যে, ঘটনা ঘটছে।

**প্রশ্ন :** আমার জীবনের লক্ষ্যে বেশ কতগুলো স্টেপ রয়েছে। এর মধ্যে যদি কোনো স্টেপ বাস্তবায়িত না হয় তখন আমার কী করা উচিত হবে?

**উত্তর :** আসলে মনছবি যদি চূড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে হয় তাহলে মধ্যবর্তী কোনো ধাপ বাস্তবায়িত না হলেও চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ সাফল্য প্রত্যাশিত পন্থায় না এসে অপ্রত্যাশিত পন্থায়ও আসতে পারে। সবসময় মনে রাখতে হবে-চূড়ান্ত লক্ষ্যের ক্ষেত্রে আপনি অনড়। কিন্তু এ লক্ষ্য অর্জনের পথের ক্ষেত্রে আপনাকে নমনীয় হতে হবে। ঝর্না যেমন বাধাকে পাশ কাটিয়ে চলে যায় আপনাকেও তেমনি একটি রাস্তা বন্ধ হলে বিকল্প রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে।

**প্রশ্ন :** মনছবির ক্ষেত্রে যদি কখনো মনে হয় এটা অর্জিত না হলেও সমস্যা নেই, এ ধরনের চিন্তা কি মনছবি বাস্তবায়নের পথে বাধা হতে পারে? হলে এর সমাধান কী?

**উত্তর :** অবশ্যই বাধা হতে পারে। আমি প্রধানমন্ত্রী হলে ভালো হয় এটা কোনো লক্ষ্য নয়, কতকিছু হলেই তো ভালো হয়। আমি প্রধানমন্ত্রী হতে চাই বা আমি প্রধানমন্ত্রী হবো-এটা হচ্ছে লক্ষ্য। আমি প্রফেসর হবো, আমি ডাক্তার হবো, আমি ধনকুবের হবো, আমি ইঞ্জিনিয়ার হবো-এটা হচ্ছে লক্ষ্য।

রসুলুল্লাহ (স)-এর একটি হাদীস, যেটা বোখারী শরীফের প্রথম হাদীস যে, ইন্না মালা আমালু বিন নিয়ত। নিয়ত হচ্ছে সকল আমল অর্থাৎ সকল কাজের অঙ্কুর। বীজ এবং নিয়ত বা অঙ্কুরের পার্থক্য হচ্ছে বীজের মধ্যে বৃক্ষের সম্ভাবনা সুপ্ত থাকে আর অঙ্কুরে বৃক্ষের সম্ভাবনা প্রক্রিয়ার মধ্যে চলে আসে। মনছবি হচ্ছে সাফল্যের অঙ্কুর।

ঐ হাদীসের ব্যাখ্যায় নবীজী (স) নিজেই বলেছেন, যদি কেউ আল্লাহকে পাওয়ার জন্যে হিজরত করে, সে আল্লাহকে পাবে; যদি সে কোনো মহিলাকে

পাওয়ার জন্যে হিজরত করে, তো মহিলাকে পাবে। হিজরত শব্দের মর্মার্থ হচ্ছে সর্বোচ্চ কষ্ট স্বীকার করা। অর্থাৎ মনছবি র জন্যে সর্বোচ্চ কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকলে তবেই তা বাস্তবায়িত হবে। আর যদি মনে হয় ‘না হলেও সমস্যা নেই’-তাহলে বুঝতে হবে আপনি যা ভাবছেন তা হচ্ছে আকাশকুসুম কল্পনা, মনছবি নয়।

**প্রশ্ন :** নিয়মিত মেডিটেশন করছি। কিন্তু অনেক সময় মনছবি সফল না হওয়ায় আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি। সমাধান কী?

**উত্তর :** নিয়মিত মেডিটেশন সঠিক প্রক্রিয়ায় করছেন কি না সেটা আপনাকে খেয়াল করতে হবে। মেডিটেশনের প্রথম ধাপ হলো শিথিলায়ন। আপনি হয়তো মেডিটেশন করছেন, মনের বাড়িতে যাচ্ছেন, কল্পনা করছেন, সবই করছেন। কিন্তু আপনি হয়তো যথাযথভাবে শিথিলই হতে পারেন নি। যদি শিথিল না হতে পারেন আপনার মনের আয়না স্বচ্ছ হবে না।

ছবিটা আঁকতে হবে প্রশান্ত মনে। প্রশান্ত মনে আপনি যে ছবি আঁকবেন সেই ছবি পরিষ্কার হবে, সুস্পষ্ট হবে। যে পর্দায় অনেক লেখা আছে সে পর্দায়ই আপনি যদি নতুন কোনো লেখা লেখেন তাহলে সে লেখা কেউ পড়তে পারবে না। যদি শিথিল না হন তাহলে আপনার মনে যে আয়না, এই আয়নার আঁকিবুকিগুলো থেকে যাবে। নতুন লেখা লিখতে হলে আগে পর্দটাকে পরিষ্কার করতে হবে।

যখন শিথিল অবস্থায় মনছবি দেখবেন তখন মনছবি ভেতরে গুঁথে যাবে, মন আপনাকে বলবে যে, কী করা প্রয়োজন। কী করতে হবে। কী করতে হবে না। আর এভাবে কাজ করার মধ্য দিয়েই দেখবেন যে, আপনার মনছবি সফল হচ্ছে, আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়ছে। আগামী ৪০ দিন দুইবেলা শিথিল পদ্ধতিতে শিথিলায়ন করুন। দেখবেন-শিথিল হওয়া খুব সহজ হয়ে গেছে। লামায় তিন দিনের কোয়ান্টায়ন করুন। ধ্যানের স্তর আরো গভীর হবে। কারণ শিথিলায়নকে আয়ত্ত্ব করতে হবে। আসলে শিথিলায়ন হচ্ছে সকল মেডিটেশনের জননী। শিথিলায়নকে বলতে পারেন মেডিটেশনের ১। অন্য সব মেডিটেশনের মান হচ্ছে শূন্য। ১ এর ডানপাশে যত শূন্য বসাবেন তত সংখ্যামান বাড়তে থাকবে। কিন্তু ১ যদি না থাকে তবে অনেক শূন্য মিলেও সংখ্যামান শূন্যই থেকে যাবে। অতএব শিথিলায়ন আয়ত্ত্ব এলে মনছবি বাস্তবায়িত হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র।



**প্রশ্ন :** মেডিটেশন করে রোগ নিরাময়ে এত বেশি উপকার পেয়েছি যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু মনছবি বাস্তবায়নের সকল শর্ত পূরণ করেও বাস্তবায়ন হয় নি। এ ব্যাপারে আরো জানতে চাই।

**উত্তর :** এর কারণটা হলো-রোগ নিরাময়টা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। প্রতিমুহূর্তে অনুভব করতে পারছেন যে, আপনি উপকার পাচ্ছেন। কিন্তু মনছবি যতদিন পর্যন্ত বাস্তবায়িত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তো আপনি বুঝতে পারছেন না। আর মনছবি বাস্তবায়নের কোনো সময়সীমা নেই। সেজন্যে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।

আমরা আসলে খুব দ্রুত ফল পেতে চাই। আজকে মনছবি দেখলাম-ভাবি, কাল সকালে উঠেই দেখবো-হয়ে গেছে। আসলে মনছবির নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই।

একবার এক ছেলে এলো। তখন সে ক্লাস টেন-এ পড়ে। মেডিটেশন কোর্স করে গেছে মাস দুয়েক আগে। খুবই ক্ষুধা হয়ে জিজেস করছে, গুরুজী, আমার মনছবি তো হলো না। আমি জিজেস করলাম, কী মনছবি ছিলো তোমার? সে বললো, কোর্সের দ্বিতীয় দিনই আমি মনছবি করেছি, আমি ডাক্তার হবো। দুই মাস পার হয়ে গেল, এখনো তো আমি ডাক্তার হলাম না!

এই ছেলেটিকে কী বলবেন? ডাক্তার হওয়ার তো একটা প্রক্রিয়া আছে। সে ক্লাস টেন-এ পড়ছে, এসএসসি পাশ করবে, এইচএসসি পাশ করবে, মেডিকেলে ভর্তি হবে। কমপক্ষে আট বছর সময় তো তাকে দিতে হবে। আর সেশনজট হলে নয় বছর। আর তা না হলে তো তার পক্ষে ডাক্তার হওয়া সম্ভব না। তার আগে সে যদি তার পরিবারের সবাইকে নিয়েও মনছবি করে তাহলেও কোনো লাভ নেই।

## জীবন ছবি কেমন হবে

**প্রশ্ন :** জীবনের লক্ষ্য বলতে কী বোঝায়? কীভাবে তা দেখবো?

**উত্তর :** জীবনের মূল লক্ষ্য হলো পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে আপনার আগমনকে অর্থবহ করা। আর তার উপায় হলো নিজেকে জিজেস করা যে, কেন এসেছি আমি, কী করতে চাই। একটাই তো জীবন। এ জীবনটাকে আমি কীভাবে :

উপভোগ করতে চাই, সময়টাকে কীভাবে ব্যয় করতে চাই, চারপাশের মানুষের কাছ থেকে আমি কী চাই? তাদেরকে কী দিতে চাই? এ প্রশ্নগুলোর উত্তরই হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য, জীবনের মনছবি বা জীবনছবি। এর আরো সহজ উপায় হচ্ছে—আপনি নিজের মৃত্যু সংবাদকে কীভাবে দেখতে চান, শুনতে চান সেটাকে অবলোকন করা। কারণ একজন কীর্তিমান মানুষের মৃত্যু সংবাদেই থাকে তার জীবনের সব অবদানের কথা। আপনার সুবিধার্থে এখানে তেমনি একটি কাল্পনিক সংবাদের বিবরণ দেয়া হলো—

## ডা. তাসনীম জাহান আর নেই

গত ২০ মে রাত ১১টায় ঢাকার গুলশানে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন প্রখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী প্রফেসর ডা. তাসনীম জাহান (ইন্সালিল্লাহে ----- রাজেউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৭০ বছর। উপমহাদেশে কিডনি রোগের চিকিৎসা ও গবেষণার অন্যতম এই দিকপালকে হারিয়ে দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। আজ বাদ জোহর নামাজে জানাযার পর তার লাশ গাজীপুরে তার প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের গোরস্থানে দাফন করা হবে।

## জন্ম ও ছেলেবেলা

প্রফেসর তাসনীম জাহান ১৯৪১ সালে বর্তমান নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরের এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বোন তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। রেলওয়ের একজন সাধারণ কর্মচারী বাবার পক্ষে আট সন্তানকে লেখাপড়া শেখানো সম্ভব ছিলো না। তাই বড় দুই বোনকে অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেন। কিন্তু ছোট তাসনীমের পড়াশোনার প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখে তাদের বড় ছেলেটির সঙ্গে তাকেও স্কুলে পাঠান মা-বাবা। অসাধারণ মেধার পরিচয় দিয়ে অচিরেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শিক্ষকদের। স্কুলের প্রতিটি পরীক্ষায় ফার্স্ট হতেন তিনি। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও নেতৃত্ব দিয়েছেন। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় সহপাঠীদের নিয়ে গড়ে তোলেন কিশোর-কিশোরীদের সংগঠন ‘আমরাও পারি’, যাদের প্রধান কাজ ছিলো কন্যাশিশুদের স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করা।

## শিক্ষা ও কর্মজীবন

মেট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েট—দুই পরীক্ষায়ই ডা. তাসনীম জাহান সম্মিলিত মেধাতালিকায় যথাক্রমে তৃতীয় এবং প্রথম স্থান লাভ করেন। এরপর

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান লাভ করে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। এমবিবিএস সম্পন্নের পর কানাডা সরকারের বৃত্তি নিয়ে তিনি চলে যান বিখ্যাত ম্যাকগিল মেডিকেল স্কুলে। কৃতিত্বের সাথে এমডি ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি যুক্তরাজ্যের খ্যাতনামা দুটি মেডিকেল স্কুল থেকে একইসাথে দুটি পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি সম্পন্ন করেন।

এমআরসিপি-তে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং প্রথম এশীয় হিসেবে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে কিডনি বিশেষজ্ঞ হিসেবে যোগ দেন। এরপর ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ফ্লোরিডা এবং ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটার শিক্ষকতার পর তিনি যোগ দেন মেরিল্যান্ডের জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটির কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট বিভাগে। চিকিৎসাসুবিধা এবং সেবামানের বিবেচনায় জন হপকিন্স মেডিকেল হাসপিটালকে যুক্তরাষ্ট্রে এক নম্বর বিবেচনা করা হয়।

### গবেষণা

চিকিৎসাবিজ্ঞানে তার অনন্য অবদানের জন্যে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ১৯৯১ সালে ম্যাকগিলের নেফ্রোলজি ইনস্টিটিউটে তিনি একটি গবেষণা প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করেন যা বর্তমানে পিএইচডি ডিগ্রিও প্রদান করছে। তার অনেকগুলো গবেষণার একটি হলো কিডনির রক্ত পরীক্ষা। এর আগে কিডনি ফেইলিওরের ঘটনাকে আগেভাগে শনাক্ত করার কোনো উপায় ছিলো না। কিন্তু তার উদ্ভাবিত প্রক্রিয়ায় মারাত্মক পর্যায়ে চলে যাবার আগেই তা শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণের মাধ্যমে বাঁচানো যাচ্ছে মূল্যবান জীবন।

ডা. তাসনীম ছিলেন একজন ব্যতিক্রমী চিকিৎসক। রোগীকে বাহ্যিকভাবে পরীক্ষা করেই সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়ের এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিলো তার। কীভাবে তিনি এটা করেন, জানতে চাওয়ায় প্রফেসর তাসনীম বলেছিলেন রোগীর প্রতি সমর্মিতা, আন্তরিকতা ও মনোযোগই তাকে তথ্য যোগায়।

### দেশে প্রত্যাবর্তন

কিডনি রোগে তার চিকিৎসা ও গবেষণার অভিজ্ঞতাকে দেশের সেবায় কাজে লাগানোর জন্যে বিদেশের সফল ক্যারিয়ার, খ্যাতি, যশ সবকিছুকে উপেক্ষা করে ডা. তাসনীম জাহান ১৯৯৫ সালে ফিরে আসেন দেশে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নেফ্রোলজি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে শুরু করেন দেশে তার নতুন কর্মজীবন। বাংলাদেশে কিডনি চিকিৎসায় পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষার তিনিই পথিকৃৎ। ২০০৫ সালে তার

উদ্যোগে গাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় এশিয়ার বৃহত্তম ‘নির্বাণ কিডনি হাসপাতাল’। এ কাজে তিনি ব্যয় করেন তার গবেষণালব্ধ অর্থের পুরোটাই। সুলভে আধুনিকতম চিকিৎসাসেবার জন্যে এটি এখন বিশ্বখ্যাত একটি প্রতিষ্ঠানের নাম। সেই সাথে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের কাছে কিডনি চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি পীঠস্থান।

দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের জন্যে ডা. তাসনীম ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ চিকিৎসক। প্রতি সপ্তাহে বিনা ফি বা নামমাত্র ফি-তে তিনি দেখতেন শত শত রোগী। বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সারাদেশ ঘুরে আয়োজন করতেন কিডনি মেডিকেল ক্যাম্প।

### সম্মাননা

সেরা কিডনি বিশেষজ্ঞ এবং ৪৫ বছরেরও কম বয়সে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক চিকিৎসাবিষয়ক গবেষণার জন্যে তিনি লাভ করেন দুটি সম্মানজনক পুরস্কার। ১৯৯৩ সালে প্রফেসর তাসনীম জন হপকিন্সের ফিজিশিয়ান অব অনার্স নিযুক্ত হন। তিনিই প্রথম এশীয় যিনি এ সম্মানে ভূষিত হলেন। আর চিকিৎসাবিজ্ঞানে অনন্যসাধারণ অবদানের জন্যে স্বাধীনতা পদকসহ একাডেমি অফ সায়েন্স, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্মারক স্বর্ণপদক, গান্ধী শান্তি পুরস্কার ইত্যাদি অসংখ্য সম্মাননায় ভূষিত হন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম মহিলা জাতীয় অধ্যাপক। পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাভ করেছেন ৪০টিরও বেশি সম্মানসূচক ডক্টরেট।

আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন চিকিৎসাবিষয়ক সেমিনার সিম্পোজিয়ামে তিনি তার গবেষণা ও চিকিৎসা অভিজ্ঞতার ওপর বক্তৃতা দিয়েছেন। মুখোমুখি হয়েছেন বিবিসি, সিএনএন, টাইম ও নিউজউইকসহ বিশ্বখ্যাত টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্রের।

### লেখালেখি

এ পর্যন্ত তার ৩৬০টিরও বেশি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বসেরা সব মেডিকেল জার্নালে। এসব জার্নালের সম্পাদকীয় লেখার দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন বিভিন্ন সময়ে। মেডিকেল স্কুলগুলোতে তার লেখা বই, জার্নাল ছাত্রছাত্রীদের আবশ্যিক পাঠের অন্তর্ভুক্ত। একাডেমিক লেখালেখির পাশাপাশি আত্ম উন্নয়ন বিষয়েও তিনি নিয়মিত লেখালেখি করেছেন। তার জার্নি টুওয়ার্ডস সাকসেস বইটি টানা ২১ সপ্তাহ ধরে নিউইয়র্ক টাইমস বেস্ট সেলার তালিকায় ছিলো।

## সাংগঠনিক জীবন

মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ডা. তাসনীম অসংখ্য পেশাজীবী সংগঠন ছাড়াও দেশি-বিদেশি অনেকগুলো দাতব্য ও কল্যাণমূলক সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। সফট ও এনার্জি ড্রিংকসবিরোধী সচেতনতা আন্দোলনে উপমহাদেশব্যাপী তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিজ্ঞানশিক্ষা ও গবেষণার প্রসার এবং নারীশিক্ষার জন্যেও তিনি কাজ করেছেন। সৃষ্টির সেবায় অনন্য সংগঠন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় সদস্য। অর্থ সময় মেধা ও শ্রম দিয়ে ফাউন্ডেশনের সেবামূলক প্রকল্পগুলোতে অংশ নিতে ব্যস্ততা কখনো তার অজুহাত হয় নি।

## ব্যক্তিজীবন

ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুখী এবং সফল মানুষ। তার স্বামী প্রফেসর ডা. ফওজুল করিম একজন নিউরোলজিস্ট। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউরোসার্জারি বিভাগের সাবেক প্রধান। তার দুই মেয়ে দুই ছেলে। বড় মেয়ে ফারদিন করিম কার্ডিওলজিস্ট, কর্মরত আছেন বাংলাদেশ হৃদরোগ হাসপাতালে। ছোট মেয়ে ফারিয়া করিম একজন খ্যাতনামা আর্কিটেক্ট। বড় ছেলে বুলান্দ করিম একজন তরুণ চিত্রপরিচালক, তার নির্মিত বিকল্প ধারার চলচ্চিত্রগুলো ইতোমধ্যেই বোদ্ধামহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ছোট ছেলে হুসেন করিম একজন পদার্থবিদ।

প্রিয় পাঠক, জীবনছবি কেমন হওয়া উচিত—এটি তার একটি কাল্পনিক উদাহরণ। আপনিও নিজের মতো করে সাজিয়ে নিতে পারেন এ জীবনছবি। তারপর প্রতিদিন মেডিটেশন করতে থাকুন। সেইসাথে লেগে থাকুন প্রাণান্ত প্রয়াসে। সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায়ই আপনি এগুবেন মনছবি বাস্তবায়নের পথে।

# শিক্ষায় সাଫଲ୍ୟ



## ভালো রেজাল্ট কেন

**প্রশ্ন :** আমি দেখতে সুশ্রী নই। চারপাশের মানুষের সাথেও মতের মিল হয় না। মাঝে মাঝেই হীনম্মন্যতায় ভুগি। কোর্স করার পর আমার আত্মবিশ্বাস বেড়েছে কিন্তু পড়াশোনার ক্ষেত্রে বাড়ছে না, এক্ষেত্রে কী করা উচিত?

**উত্তর :** উত্তরটা শুরু করি একটা গল্প দিয়ে—

শান্ত সবুজ এক ছোট্ট গ্রাম। ফসল ভরা মাঠ, গোয়াল ভরা গরু আর উঠোন ভরা হাঁস-মুরগি নিয়ে সচ্ছল গ্রামের প্রতিটি ঘর। এ গ্রামেরই এক গৃহস্থের বাড়িতে একবার এক মুরগি তা দিয়ে ফোটালো অনেকগুলো ছানা। কিন্তু একি! মুরগিছানাদের সঙ্গে ডিম ফুটে বেরোনো ঐ কিছুতকিমাকার ছানাটি কে? দেখতে হাঁসের মতো। কিন্তু কী কুশ্রী আর কদাকার! কী করে এলো এখানে? কেনই বা সে অন্যদের চেয়ে আলাদা?

গৃহস্থ বাড়ির এক চিলতে উঠোনে জীবন শুরু হলো তার। কেউ তাকে ভালবাসে না। সুযোগ পেলেই ছোট ছেলে-মেয়েরা খোঁচায়, মুরগিছানারা তাড়া করে, কাক ভয় দেখায়। খাবার তার আবর্জনা আর গৃহস্থের ফেলে দেয়া বুটাকাঁটা, তা-ও বাকিরা খেয়ে যাবার পর যা পাওয়া যায়। একমাত্র আপন তার মা-মা মুরগি। সব ঝড়-ঝাপটার মধ্যেও এই মায়ের কাছেই খুঁজে পায় একটু আশ্রয়।

এভাবেই চলছিলো জীবন। আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠছে সে। মাঝে মাঝে সে অনুভব করতো জোরে দৌড়াতে গিয়ে সে যেন খানিকটা ভেসেও যেতে পারে। কিন্তু এ নিয়ে আর মাথা ঘামায় নি সে।

একদিনের কথা। কোনো কারণে সব মুরগিছানারা মিলে তাড়া করলো তাকে। প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে এক হ্রদের ধারে গিয়ে থমকে গেল। এখন সে কী করবে? আর একটু এগুলেই যে হ্রদে পড়ে যাবে। কিন্তু সে তো কখনো পানিতে নামে নি। পেছানোরও কোনো উপায় নেই। এদিকে তার মা-মুরগিও পেছন পেছন ছুটে এসেছে।

হঠাৎ পানিতে চোখ গেল তার। নিজের প্রতিবিম্ব দেখে চমকে উঠলো সে। এরপর দৃষ্টি গেল ঐ পাড়ের এক ঝাঁক হাঁসের দিকে। কী আশ্চর্য! হুবহু তার মতোই দেখতে। অবাক বিস্ময়ে সে একবার তাকাচ্ছে ঐ হাঁসদের দিকে, একবার তার মায়ের দিকে, আর একবার হ্রদের পানিতে তার প্রতিবিম্বের দিকে। সে তো তার মায়ের মতো নয়, নয় এতদিন যাদের সাথে কাটিয়েছে



সেই মুরগিছানাদের মতো। বরং মেরুদেশ থেকে হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে আসা ঐ পরিযায়ী পাখিদের একজন সে। শীতাত্ত পরিবেশ থেকে বাঁচতে নাতিশীতোষ্ণমন্ডলে উড়ে আসা এক মা-পাখির ডিম থেকে ঘটনাচক্রে যার জন্ম হয়েছিলো ঐ গৃহস্থের বাড়িতে।

কী অবলীলায় হাঁসগুলো উড়ছে, পানিতে নামছে! সে-ও তো তা-ই পারে! বুঝলো সে-এই তাড়া খাওয়া, আবর্জনা খুঁটে খাওয়ার জীবন তার নয়, নীল আকাশের উঁচুতে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দেয়ার দৈহিক সামর্থ্য নিয়ে জন্মেছে সে।

প্রথমবারের মতো সে নিজেকে জানলো। বুঝলো, গৃহস্থের উঠানের ক্ষুদ্র গন্ডি ছেড়ে তাকে উড়াল দিতে হবে অনন্ত আকাশে। দুইফোঁটা চোখের জল ফেলে মা-মুরগিও তাকে বিদায় জানালো। কারণ ক্ষুদ্র মমতার বন্ধন দিয়ে সে তার ছানার সম্ভাবনাকে গন্ডিবদ্ধ করতে চায় নি। নভোনীলিমায় ডানা মেলে দিলো হাঁসছানা আত্মপরিচয় সৃষ্টির নতুন অভিযাত্রায়।

গল্পটি এজন্যেই বলা যে, এই হাঁসছানাটির জীবনের সঙ্গে আপনিও হয়তো মিল খুঁজে পাবেন। ছোটবেলায় হয়তো ভালো রেজাল্ট করতেন। কিন্তু একসময় খারাপ করার পর থেকে নিজেকে খারাপ ছাত্রছাত্রীদের দলেই মনে করতে লাগলেন আপনি। মা-বাবা, শিক্ষক বা আত্মীয়-বন্ধুদের নেতিবাচক কথায় প্রভাবিত হয়ে হয়তো ভাবতে শুরু করলেন, আমাকে দিয়ে কিছুই হবে না। আর কখনো ভালো করতে পারবো না।

অথচ আপনিও ক্লাসে প্রথম হতে পারেন, পারেন গোল্ডেন এ-প্লাস পেতে, পৃথিবীর খ্যাতনামা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চশিক্ষা নিতে। পারেন পেশাজীবনে যেকোনো আপাত উঁচু লক্ষ্যে পৌঁছতে। যুক্তিসঙ্গত প্রতিটি চাওয়াকে পাওয়ায় রূপান্তরিত করতে।

কীভাবে? তা জানার জন্যেই পড়ে যান পরবর্তী প্রশ্নের উত্তরগুলো।

**প্রশ্ন :** আমি ব্যবসায় বিভাগ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। আমার লক্ষ্য একজন বড় ব্যবসায়ী হওয়া। কিন্তু আমার জানামতে অনেক সফল ব্যবসায়ীরই কোনো উল্লেখযোগ্য শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। তাই লেখাপড়ায় ভালো করা আমার লক্ষ্য অর্জনে কতটা দরকার আমি তা বুঝতে পারছি না। লেখাপড়ায় একাত্মতা আনার জন্যে এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্যে আমি কীভাবে মনোবি দেখবো?

**উত্তর :** প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই—এমন সফল ব্যবসায়ী যেমন আছেন, তেমনি অনেক সফল ব্যবসায়ী আছেন যারা শিক্ষাগত দিক থেকে অত্যন্ত যোগ্য। আমাদের উচিত যাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই তাদের দিকে না তাকিয়ে যাদের আছে তাদের দিকে তাকানো। কারণ যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত, তাদের পক্ষে খুব দক্ষভাবে প্রতিটি ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়ে ব্যবসা গোছানো সহজ।

কিন্তু যে ব্যবসায়ী প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত নন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার কারণ হতে পারে তিনি লেখাপড়ার সুযোগ পান নি এবং খুব অল্প বয়স থেকে তাকে হয়তো ব্যবসার কাজ শুরু করতে হয়েছে এবং অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তিনি আজ একজন সফল ব্যবসায়ী। তারপরও তার এই শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাব কিন্তু থেকেই গেছে। বিশেষ করে তার ব্যবসা যত বিস্তৃত হয়েছে, ততই তার প্রয়োজন হয়েছে আধুনিক বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ এক্সিকিউটিভদের, যাদেরকে দিয়ে তিনি কাজগুলো করান।

এ নিয়ে এক মজার গল্প আছে।

দেশের এক বড় শিল্পপতি। লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু তার অনেক বড় বড় ব্যবসা ছিলো; বিদেশের সাথেও লেনদেন ছিলো। এ রকমই এক বিদেশি ব্যবসায়ীর সঙ্গে এক বৈঠকে তার দরকষাকষি হচ্ছে। ইংরেজি না জানার কারণে তিনি চুপচাপ বসে আছেন। যা কথাবার্তা বলার বা শোনার তা বলছেন ইংরেজি জানা তার দক্ষ ম্যানেজার।

অনেকক্ষণ ধরে কথা বলার পর কিছু না বুঝলেও এটুকু বুঝতে পারলেন যে, অল্প একটুর জন্যে সমঝোতা হচ্ছে না। এখন ‘ইয়েস’ বললেই হয়। তখন তিনি অধৈর্য হয়ে উঠলেন এবং ‘ইয়েস’ বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন। বিদেশি প্রতিনিধি তো উল্লসিত। কারণ সে জিতে গেল। আর এদিকে তার ম্যানেজার বিস্ময়ে হতবাক! কারণ আলোচনাটিকে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসার প্রায় আগ মুহূর্তেই তার মালিক ‘ইয়েস’ বলে ফেলায় তার আর করার কিছু রইলো না এবং ঐ একটি ‘ইয়েস’-এর জন্যে তাদের ব্যবসায়িক ক্ষতি হয়েছিলো মাত্র(!) দেড় কোটি টাকা! পরে অবশ্য তিনি শুনে আফসোস করেছেন। কিন্তু মূল সমস্যাই ছিলো লেখাপড়া না জানার কারণে নিজের ম্যানেজার এবং বিদেশি ব্যবসায়ীর কথোপকথন তিনি বুঝতে পারেন নি এবং ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন।

অর্থাৎ নিজে শিক্ষিত না হলে একজন সফল ব্যবসায়ীও বিড়ম্বনার মুখে পড়েন। আর সফল হওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে অন্যদের তুলনায় যে কত

বাধার সম্মুখীন হতে হয় তার কোনো শেষ নেই। তাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলে সফল ব্যবসায়ী হওয়া নিঃসন্দেহে সহজতর। আর প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি ছাড়াও আপনি স্বশিক্ষিত হতে পারেন। যেকোনোভাবেই হোক, শিক্ষিত হলে আপনার বিড়ম্বনা অনেক কমে যাবে।

আপনার মনছবি হবে—আপনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ভালো করছেন, কারণ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা একজন সফল ব্যবসায়ীকে আরো এগিয়ে নেবে।

**প্রশ্ন :** অল্প পড়াতেই বিরক্ত হয়ে যাই। কীভাবে পড়ায় মনোযোগী হতে পারি?

**উত্তর :** এর সমাধান হলো, কেন আপনি পড়ছেন সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা। যারা ভালো রেজাল্ট করেন তারা কিন্তু কখনো ভাবেন না বা বলেন না যে, পড়তে তাদের বিরক্ত লাগে। কারণ পড়ার সুফলটা তাদের জানা আছে। তারা জানেন, ক্লাসে প্রথম হলে কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে এবং এর জন্যে কষ্ট স্বীকার করতেও তারা প্রস্তুত। আপনাকে জানতে হবে কেন আপনি ভালো করবেন। ভালো রেজাল্ট এমন এক অর্জন যা আপনাকে দেবে সহজ স্বীকৃতি, সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা—অন্যদের যা অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে পেতে হয়। মা-বাবা শিক্ষক ও বন্ধুমহলে যেমন তিনি পান এ গুরুত্ব তেমনি যেকোনো আসরে তিনি হন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

শিক্ষাজীবনে এবং কর্মজীবনে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকার পাশাপাশি জীবনে প্রথম হওয়ার পথ হয় অনেক সহজ। যারা প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ায় ভালো রেজাল্টের মাধ্যমে স্বীকৃতি পায় তারা জীবনে প্রথম হওয়ার পথে অর্ধেক এগিয়ে যায়। কারণ প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি, জ্ঞান ও তথ্য একজন মানুষের চলার পথকে অনেক সহজ করে, ত্বরান্বিত করে। অবশ্য এ জ্ঞান শুধু পুঁথিগত জ্ঞান নয়। কিন্তু একজন ক্লাসে প্রথম হওয়ার পরে এ জ্ঞান অর্জনের সুযোগ স্বাভাবিকভাবেই বেশি।

কাজেই আপনি পড়তে বসে ভাববেন—পড়ে আপনার কী কী লাভ হবে, প্রথম হয়ে আপনি কী কী পাবেন। তখনই দেখবেন পড়তে আপনার বিরক্তি আসছে না, বরং এক পড়ার পর আরেক পড়া নিয়ে বসতে চাইবেন।

**প্রশ্ন :** ছোটবেলা থেকে আমি কখনো ভালো রেজাল্ট করি নি। আমার কাছে মনে হয়, যারা ভালো রেজাল্ট করে তারা বোধ হয় আলাদা কিছু। আমি কি ভালো রেজাল্ট করতে পারবো?

**উত্তর :** কেন পারবেন না? আসলে আমাদের একটা ভুল ধারণা হলো, প্রতিভা গড-গিফটেড একটা ব্যাপার। সামর্থ্যের সর্বোচ্চ চেষ্টা না করেই নিজেদের ক্ষমতা-দক্ষতা-প্রতিভার একটা সীমারেখা টেনে দিই আমরা। বলি, আইনস্টাইন একজনই হয়েছেন। বেটোভেনের মতো সুরস্রষ্টাও আর কেউ হতে পারবে না।

অথচ এটা যে কত ভুল একটি ধারণা, তা নিয়ে রীতিমতো গবেষণাভিত্তিক একটি বই ‘দ্যা জিনিয়াস ইন অল অফ আস’-এ লেখক ডেভিড শ্যাংক দেখিয়েছেন, আসলে ঈশ্বর প্রদত্ত নয়, বরং অদম্য ইচ্ছা আর প্রচেষ্টার ফসলই হলো প্রতিভা। তিনি বলেন, জিনিয়াস হওয়ার জিন সবার মধ্যেই আছে। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে আমরা ভেতরের আলোটা বের করে আনতে পারি না। বিনয় স্বপ্ন ইচ্ছাশক্তি আর লক্ষ্য ছোঁয়ার অটুট সংকল্প থাকলে যেকোনো বয়সে আপনিও হতে পারেন বিশ্বখ্যাত প্রতিভার অধিকারী।

ছোটবেলা থেকে আপনি কখনো ভালো রেজাল্ট করতে পারেন নি। তার মানে এই নয় যে, আপনি আগামীতে ভালো করতে পারবেন না। আসলে ভালো রেজাল্ট করাটা খুবই সহজ, করতে চাইলেই করা যায়। এজন্যে জিনিয়াস বা অসাধারণ মেধাবী বা শ্রুতিধর হওয়ার দরকার নেই। গন্ডায় গন্ডায় প্রাইভেট টিচার বা ভালো স্কুল কিংবা ধনী মা-বাবার সন্তান হওয়াও ভালো রেজাল্টের শর্ত নয়। ভালো রেজাল্টের জন্যে প্রয়োজন মাত্র দুটি জিনিস। এক-আত্মবিশ্বাস, দুই-অদম্য ইচ্ছা।

ড. বি আর আম্বেদকরের কথাই ধরুন। তার জন্ম ১৯ শতকের শেষভাগে, ব্রিটিশ ভারতের মধ্য প্রদেশে এক দরিদ্র পরিবারে। ছিলেন মা-বাবার চতুর্দশ সন্তান। অস্পৃশ্য হরিজন হওয়ায় স্কুলে তাকে বসতে হতো ক্লাসের বাইরে বারান্দায়। এমনকি তেষ্ঠা পেলো স্কুলের উচ্চবর্ণের দণ্ডুরী ছোঁয়া বাঁচিয়ে ওপর থেকে পানি ঢেলে না দেয়া পর্যন্ত পানি পানের অনুমতিটুকুও ছিলো না তার।

এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে ১৯ মাইল দূরের পরীক্ষাকেন্দ্রে যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু মাঝপথে গাড়োয়ান তাকে গরুর গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছিলো অস্পৃশ্য হওয়ার অপরাধে। এতকিছুর পরও হার মানেন নি। দারিদ্র আর রোগ-শোকের বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে যাওয়া মাত্র পাঁচ ভাই-বোনের এক জন ছিলেন আম্বেদকর এবং একমাত্র তিনিই পেরোন হাইস্কুলের গডি।

ভারতের ইতিহাসে তিনিই প্রথম দলিত সম্প্রদায়ের সদস্য যিনি কলেজে ভর্তি হন। পরবর্তীতে কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ও লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স থেকে আইন ও অর্থনীতিতে উচ্চতর ডিগ্রিসহ অর্জন করেন কয়েকটি ডক্টরেট।

দেশে ফিরে একজন প্রতিষ্ঠিত আইনজীবীর পাশাপাশি তিনি হয়ে ওঠেন সমকালীন রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। দলিত সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে জীবনকে উৎসর্গ করেন।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রণয়নের গুরুদায়িত্ব পালন করে ‘বাবা আম্বেদকর’ নামে ভারতবর্ষে তিনি হয়ে ওঠেন সর্বজনশ্রদ্ধেয়। প্রতিবছর তার জন্ম ও মৃত্যুদিবসে হাজারো মানুষ সমবেত হয় তার স্মৃতিসৌধে। আপনার অবস্থা নিশ্চয়ই বাবা আম্বেদকরের চেয়ে খারাপ নয়। তাহলে আপনি কেন পারবেন না?

আসলে আপনি যে পারবেন—সে প্রমাণ দিয়েই আপনি পৃথিবীতে এসেছেন। মাতৃগর্ভে একটি ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে পিতার দেহ থেকে যে ৩০ থেকে ৫০ কোটি শুক্রাণু যাত্রা শুরু করেছিলো, আপনি হচ্ছেন সেই একটিমাত্র শুক্রাণুর বিকশিত রূপ, যে ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হতে পেরেছিলো। ৩০/ ৫০ কোটির সাথে প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছিলেন বলেই আপনি পৃথিবীতে আসতে পেরেছিলেন।

নিজের মনোদৈহিক প্রক্রিয়াকে একটু বুঝতে চেষ্টা করলেই এই আস্থা ও আত্মবিশ্বাস অনেকগুণ বেড়ে যাবে। বিশ্বের সাতশ কোটি মানুষের মধ্যে আপনি অনন্য। তাই ক্লাসে প্রথম হওয়া থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি যুক্তিসঙ্গত চাওয়াকে আপনি পাওয়ায় রূপান্তরিত করতে পারবেন কেবল যদি বিশ্বাস করতে পারেন।

**প্রশ্ন :** আমি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। প্রচুর পড়ালেখা করেও আমি পড়া শেষ করতে পারি না। কী করলে পড়ালেখা শেষ হবে?

**উত্তর :** যারা ভালো রেজাল্ট করেন তারা যে রাতদিন পড়েন তা নয়। তারা আসলে কম সময়ে বেশি পড়েন। কম সময়ে বেশি পড়ার এই টেকনিকই হলো কোয়ান্টা রিডিং। এ পদ্ধতিতে পাঠ্যবইয়ের অপ্রয়োজনীয় শব্দগুলো বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় শব্দগুলোই আপনি পড়বেন এবং মনে রাখবেন। যেমন, নিচের প্যারাগ্রাফটি পড়ুন—

বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের জনগণ নিজ নিজ অঞ্চলের ভাষায় কথা বলে। এগুলো আঞ্চলিক কথ্য ভাষা বা উপভাষা। পৃথিবীর সব ভাষায়ই উপভাষা আছে। এক অঞ্চলের জনগণের মুখের ভাষার সঙ্গে অপর অঞ্চলের জনগণের মুখের ভাষার যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। ফলে এমন হয় যে, এক অঞ্চলের

ভাষা অন্য অঞ্চলের লোকের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাধারণের কথ্য ভাষা দিনাজপুর বা রংপুরের লোকদের জন্যে খুব সহজবোধ্য নয়। এ ধরনের আঞ্চলিক ভাষাকে বলার ও লেখার ভাষা হিসেবে সার্বজনীন স্বীকৃতি দেয়া সুবিধাজনক নয়। কারণ তাতে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাভাষীদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানে অন্তরায় দেখা দিতে পারে। সে কারণে দেশের শিক্ষিত ও পণ্ডিতসমাজ একটি আদর্শ ভাষা ব্যবহার করেন। বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষিত জনগণ এ আদর্শ ভাষাতেই পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও ভাবের আদানপ্রদান করে থাকেন। বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্য ভাষার সমন্বয়ে শিষ্টজনের ব্যবহৃত এ ভাষাই আদর্শ চলিত ভাষা।

এবার পড়ুন নিচের প্যারাগ্রাফটি—

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের জনগণ নিজ অঞ্চলের ভাষায় কথা বলে। এগুলো আঞ্চলিক কথ্য ভাষা বা উপভাষা। পৃথিবীর সব ভাষায়ই উপভাষা আছে। বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। অন্য অঞ্চলের লোকের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের কথ্য ভাষা দিনাজপুর বা রংপুরে সহজবোধ্য নয়। সার্বজনীন স্বীকৃতি দেয়া সুবিধাজনক নয়। ভাবের আদানপ্রদানে অন্তরায় দেখা দিতে পারে। দেশের শিক্ষিত ও পণ্ডিতসমাজ একটি আদর্শ ভাষা ব্যবহার করেন। এ ভাষাই আদর্শ চলিত ভাষা।

প্রথম প্যারাগ্রাফের অপ্রয়োজনীয় শব্দগুলো যা প্রথমবার পড়ার পর আর আপনার পড়ার দরকার নেই সেগুলো বাদ দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে পরের প্যারাগ্রাফটি। খেয়াল করে দেখুন, প্রথম প্যারাগ্রাফ থেকে মনে রাখা দরকার এমন সব কথাই আছে পরের প্যারাগ্রাফে। কোয়ান্টা রিডিংয়ে আপনার পড়ার গতি শুধু বাড়বে তা-ই নয়, বাড়বে মনোযোগ ও বোঝার ক্ষমতা। কারণ ধীরে পড়তে গেলেই মনোযোগ ছুটে যায়।

**প্রশ্ন :** লিখতে গেলে আমার হাত কাঁপে। লেখা খারাপ হয়ে যায়। হাতের লেখা সুন্দর করতে আমি কী অটোসাজেশন অনুশীলন করবো?

**উত্তর :** আপনি মনছবি দেখবেন যে, সুন্দর ও স্বাভাবিকভাবে আপনি লিখতে পারছেন। আপনার হাত কাঁপে কি না—এ নিয়ে ভাবতে যাবেন না। আর অটোসাজেশন দেবেন, ‘আমি সহজ স্বাভাবিকভাবে লিখছি। আমি সবসময় সহজ স্বাভাবিকভাবে লিখবো।’

**প্রশ্ন :** আমি ছোটবেলায় খুব ভালো ছাত্র ছিলাম। কিন্তু ঢাবি-তে ভর্তি হওয়ার পর দীর্ঘদিন মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করি না। পড়ার কথা মনে হলে ভালো লাগে না, পরে পড়বো বলে রেখে দিতে ইচ্ছে করে, কী করতে পারি?

**উত্তর :** আসলে এই যে পরে পড়বো বলে রেখে দেয়া-এখান থেকে আপনাকেই বেরিয়ে আসতে হবে। কারণ কেউ যদি নিজে উদ্যোগী না হয় তার ভালো কেউ করতে পারে না। একটা উদাহরণ দেই।

জন্ম তার সোনার চামচ মুখে নিয়ে। পায়রাবন্দের বিশাল জমিদার বাড়িতে বিলাস উপকরণ আর দাসদাসী পরিবেষ্টিত জীবনে বেড়ে উঠেছেন। কিন্তু যত বড় হচ্ছেন একটু একটু করে বুঝতে পারছিলেন ভাইদের সাথে তার বৈষম্য বাড়ছে। বড় দুভাইকে স্কুলে পাঠালেও তাদের দুবোনকে থাকতে হলো ঘরে। কারণ পড়তে গেলে পর্দা নষ্ট হয়ে যাবে। তারপরও প্রবল আগ্রহের কারণে ভাইয়ের কাছেই পাঠ নিতে লাগলেন। বাংলা পড়া নিষিদ্ধ হলেও লুকিয়ে লুকিয়ে সেটাও আয়ত্ত করে ফেলেন ভাইয়েরই সহযোগিতায়।

১৪ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে গেল। তবে তার স্বামী ছিলেন মুক্তমনা এক আলোকিত মানুষ। মেধার বিকাশে পেয়েছেন স্বামীর পূর্ণ সহযোগিতা। কিন্তু এ সুখ-সৌভাগ্য স্থায়ী হলো না। মাত্র ৩১ বছর বয়সে বিধবা হলেন। দুটো মেয়ে হয়ে মারা গেল শিশুবয়সেই। ব্যক্তিগত শোককে পরিণত করলেন বঞ্চিতের জন্যে কাজ করার শক্তিতে। স্বামীর মৃত্যুর ছয় মাসের মাথায় ভাগলপুরে মাত্র পাঁচ জন ছাত্রী নিয়ে শুরু করলেন মেয়েদের একটি স্কুল। কারণ তিনি বুঝেছিলেন একমাত্র শিক্ষাই পারে বাঙালি মুসলিম নারীকে মুক্তির পথ দেখাতে।

যে সময়ে লেখাপড়াকে মনে করা হতো নারীর পর্দার খেলাপ হিসেবে, সেই সময় এ উদ্যোগ নিতে গিয়ে তাকে কত লড়াই করতে হয়েছিলো তা সহজেই অনুমেয়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রী যোগাড় করেছেন। হাতে কলম তুলে নিয়েছেন এ বৈষম্যের বিরুদ্ধে লেখার জন্যে। সেইসাথে অসাধারণ কিছু গল্প নাটক উপন্যাস আর বিদ্রূপ রচনা দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা সাহিত্যকে। তিনি বেগম রোকেয়া। বাঙালি মুসলিম নারীর মুক্তির অগ্রদূত। বাঙালি নারীদের আজকের যে স্বাধীনতা, যে অধিকার সচেতনতা এটি তার পরিশ্রমেরই ফসল। তিনি পরিশ্রমেই আনন্দ পেতেন। মৃত্যুর আগের দিনও রাত ১১টা পর্যন্ত স্কুলের কাজ করেছেন। নারীর অধিকার শীর্ষক একটি রচনা লিখতে লিখতে লেখার টেবিলেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

একজন নারী হয়ে বেগম রোকেয়া এত বিরুদ্ধ পরিবেশে যেভাবে লড়েছেন তা এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। আসলে উদ্যোগ সবসময় নিজেকেই নিতে হয়। নিজের স্বপ্ন নিজেকেই বাস্তবায়ন করতে হয়। ভালো রেজাল্টের জন্যেও উদ্যোগী হতে হবে আপনাকেই। আপনার মা বাবা ভাই বোন বা প্রাইভেট টিউটর বা অন্য কেউই শত উদ্যোগী হয়েছেও কিছুই করতে পারবে না যদি আপনি নিজে বদলাতে না চান।

**প্রশ্ন :** আমি বুয়েটে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা করতে চাই। কিন্তু সবসময় মনে হয় আমি তা পারবো না। নিজেকে হতাশ ও দুর্দশাগ্রস্ত মনে হয়। আমার উচিত এইচএসসিতে ভালো করা। কিন্তু পরীক্ষা, পড়াশোনা তেমন ভালো হচ্ছে না, কীভাবে এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় দয়া করে বলবেন কি?

**উত্তর :** আপনাকে ইতিবাচক হতে হবে। সবসময় ইতিবাচক কথা বলুন। বাস্তব অবস্থা খারাপ হলেও প্রকাশ করুন ইতিবাচকভাবে। যেমন—‘এত কম নম্বর পেলাম, আমার কিছু হবে না’। না ভেবে ভাবুন ‘আমি নার্ভাস হয়ে পরীক্ষা খারাপ দিয়েছি। অনেক ভুল করেছি। এরপর থেকে আর নার্ভাস হলে চলবে না। ভুলগুলোর দিকে নজর রাখতে হবে। একবারের নম্বর খারাপ নিয়ে ভেবে লাভ নেই। পরের বারের জন্যে তৈরি হতে হবে।’

নিজেকে ভালবাসুন। কী পারেন না বা কত কিছু পারেন নি, তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আপনি কী পারেন এবং এখন কী করতে পারেন তা নিয়ে ভাবুন। ঈর্ষা না করে বা হীনম্মন্যতায় না ভুগে যে গুণ ও দক্ষতার কারণে আরেকজন আপনার চেয়ে প্রিয় হচ্ছে, প্রশংসা পাচ্ছে সেটাকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করুন।

সমস্যা বা বাধা পেলে এড়িয়ে না গিয়ে সমস্যার মুখোমুখি হোন। পালাবেন না। পালালে আপনি আপনার অনন্য ব্রেনকে কোনো সুযোগই দিলেন না। না পারাটাকে পারায় রূপান্তরের জন্যে যা যা করা দরকার তা-ই করুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবেন আপনি পারছেন। আপনার মধ্যে আত্মবিশ্বাস আর আত্ম আবিষ্কারের আনন্দ সৃষ্টি হবে। আর একবার এ প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত হলে আপনি দেখবেন, একের পর এক ভ্রান্ত বিশ্বাসকে ভাঙার এক অনন্ত স্পৃহা আপনার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। কারণ সমস্যার মুখে পালানোর ইচ্ছা মানুষের মনে প্রথম জাগলেও স্বভাবজাতভাবে সে চ্যালেঞ্জকে পছন্দ করে।



## মনোযোগ বাড়াতে

**প্রশ্ন :** পড়তে বসে আমার মনোযোগ কিছুতেই অনেকক্ষণ ধরে রাখতে পারি না। অসংলগ্ন চিন্তা মাথায় ভর করে, যার ফলে মনোযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। কোনো বিষয়ের ওপর অখন্ড মনোযোগ ধরে রাখা কি সত্যিই অসম্ভব?

**উত্তর :** অসম্ভব কেন হবে? অবশ্যই সম্ভব এবং সেটা খুব সহজ। কখন? যখন আপনি জানবেন যে, কেন আপনি পড়ছেন। যখন আপনি বুঝবেন, এই পড়াটা ভালোভাবে করার মাধ্যমেই আপনি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে পারবেন এবং আপনার পক্ষে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব, তখনই আপনি আগ্রহী হবেন। আর আগ্রহ থাকলে যেকোনো কাজে মনোযোগ এমনিতেই আসে। অর্থাৎ আপনাকে জানতে হবে যে, কেন এই কাজটা গুরুত্বপূর্ণ।

সেই সাথে কোয়ান্টাম মেথড বইয়ে উল্লিখিত ‘দুই মিনিট মনোযোগ’ অনুশীলনটি নিয়মিত করতে পারেন। অর্থাৎ একটি ঘড়িকে সামনে নিয়ে ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটায় একটানা দুমিনিট চোখ রাখা এবং এ সময়ের মধ্যে যতবার মন ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা ছাড়া অন্যকিছু ভাবতে চেয়েছে সে সংখ্যাটা হিসেব করা। প্রথমদিকে এই সংখ্যাটা খুব বেশি হতে পারে। এমনও হতে পারে যে, দুমিনিটে ২৫ বার মন বিক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু নিয়মিত চর্চা করতে করতে একটা সময় এমন হবে যে, দুমিনিটে একবারও মন বিক্ষিপ্ত হচ্ছে না। কারণ নির্দিষ্ট বিষয় থেকে সরে গেলেই মনকে আবার ধরে আনা হচ্ছে। ফলে মনোযোগ বজায় রাখাটাই একটা অভ্যাসে পরিণত হয়। এছাড়া মনোযোগ শূন্যায়নের অনুশীলনীও করতে পারেন যা কোয়ান্টাম মেথড বইয়ে আছে। পড়াশোনায় মনোযোগ বৃদ্ধিতে ছাত্রছাত্রীদের জন্যে এ দুটি পদ্ধতি চমৎকারভাবে কাজ করতে পারে।

আর মনোযোগ বাড়ানোর আরেকটি সহজ উপায় হচ্ছে প্রতিটি বিষয়ে স্বাবলম্বী হওয়া। কারণ একজন শিক্ষার্থী যত স্বাবলম্বী হবে তত সে বাজে কাজ, যেমন টেলিফোন রিসিভ করা, টিভি দেখা ইত্যাদি থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারবে। আমরা এটাকে বলি যে, তত খুচরা শয়তান কম ডিস্টার্ব করবে। যে নিজের কাজ নিজে করে তার প্রত্যেকটা ব্যাপারে মনোযোগ আছে-সে ঠিক জানে মোজাটা খুলে সে কোথায় রাখবে, বইটা সে কোথায় রাখবে; কারণ পরে তাকেই আবার খুঁজে বের করতে হবে।

আবার ধরুন, টিচারের কাছে পড়তে যাবো বা টিচার আসবে ঠিক আছে,

কিন্তু আমি আগে একটু দেখে রাখি, এরকম মনোভাব থাকলে এক তো কম সময়ে পড়া যাবে আর দ্বিতীয়ত, টিচারের মনোযোগ আপনার প্রতি বেড়ে যাবে। কেন? কারণ, যাকে ধরেবেঁধে পড়াতে হয় তার প্রতি কিন্তু টিচারের অতটা মনোযোগ থাকে না; কিন্তু যাকে দেখে যে, এ তো অনেক আগ্রহী, এ তো তার পড়া আগে থেকেই করে রেখেছে—তার প্রতি টিচারের মনোযোগ সবসময় বেড়ে যায়। আর তখন আপনি শিখতেও পারবেন বেশি বেশি। অর্থাৎ মূল সূত্রটা হচ্ছে আপনি যত স্বাবলম্বী হবেন, যত নিজে উদ্যোগী হবেন তত আপনার মনোযোগ বাড়বে।

**প্রশ্ন :** আমি যখন গাড়ি চালাই বা ভিডিও গেম খেলি বা বিনোদনমূলক কোনো কাজ করি তখন এমনি এমনি মনোযোগ এসে যায়। এগুলোর জন্যে মেডিটেশন করতে হয় না। কিন্তু একমাত্র পড়াশোনাতেই আমি অমনোযোগী। পড়ার সময় মনোযোগ আসে না কেন? তাড়াতাড়ি মুখস্থই বা হয় না কেন?

**উত্তর :** মনোযোগের ব্যাপারটা বেশ মজার। দেখবেন, এখন অনেক কোচিং সেন্টার খুলছে, যারা বলে—‘এখানে অমনোযোগী ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ যত্ন সহকারে পড়ানো হয়’। তাহলে অমনোযোগী ছাত্রছাত্রী বলে কি বিশেষ কোনো গোষ্ঠী আছে? আসলে তা নয়। মনোযোগ বা মেন্টাল এনার্জি প্রয়োগ করার ক্ষমতা প্রত্যেকেরই আছে। ক্লাসের সবচেয়ে অমনোযোগী ছেলেটা—যে সারাদিন ক্রিকেট নিয়েই থাকে, তাকে দেখুন টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখার সময়। কী মগ্ন আর মনোযোগী! আবার পরীক্ষার আগে যখন চার মাসের পড়া করতে হবে এক সপ্তাহে, তখন কী গভীর আর অখন্ড মনোযোগ দিয়ে আপনি পড়তে পারেন! অর্থাৎ মূল বিষয়টি হচ্ছে আপনি ভিডিও গেমকে যতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন, পড়াশোনাকে ততটা দিচ্ছেন না। কিন্তু পরীক্ষার আগের রাতে আপনার ধ্যান-জ্ঞান হচ্ছে পড়া, তাই তখন আপনি ঠিকই পড়তে পারছেন।

আর তাড়াতাড়ি মুখস্থ করতে চাইলে কখনো তাড়াতাড়ি হয় না। কারণ যে কাজ আপনি তাড়াহুড়া করে করতে যাবেন সেই কাজেই দেরি হবে। অতএব ধীরে ধীরে মুখস্থ করতে হবে। আর ভিডিও গেম, গাড়ি চালানো এবং বিনোদনমূলক কাজে যে আগ্রহ রয়েছে আস্তে আস্তে পড়াশোনায় সেই আগ্রহটা সৃষ্টি করতে হবে, তাহলেই তাড়াতাড়ি মুখস্থ হবে।

**প্রশ্ন :** বাচ্চাদের পড়াতে যদি এক বৃত্তে (কোয়ান্টাম মেথড বইয়ে মনোযোগের জন্যে শেখানো বৃত্ত) কাজ না হয় তখন পর পর কবার করা দরকার হবে?

**উত্তর :** আসলে তাকে প্রথম বোঝাতে হবে পড়াশোনায় মনোযোগের গুরুত্ব। পড়াশোনায় আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। আগ্রহ সৃষ্টি না হলে একটা কেন হাজারটা বৃত্ত এঁকেও কোনো লাভ নেই। তার মনোযোগ ঐ বৃত্ত পর্যন্তই থাকছে। বৃত্তের পরে অন্যদিকে চলে যাবে।

**প্রশ্ন :** লেখাপড়ায় মন বসে না, মন বসানোর জন্যে কী করতে হবে?

**উত্তর :** নিয়মিত মেডিটেশন করতে হবে। সেই সাথে আপনাকে প্রয়োগ করতে হবে মনোযোগ বাড়ানোর কিছু সহজ কৌশল। মনোযোগের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আগ্রহ। পড়তে বসার আগে একটু চিন্তা করুন—কী পড়বেন, কেন পড়বেন, কতক্ষণ ধরে পড়বেন। প্রত্যেকবার পড়ার আগে কিছু টার্গেট ঠিক করে নিন। যেমন, এত পৃষ্ঠা বা এতগুলো অনুশীলনী। দুঃখের হলো, বিষয়ের বৈচিত্র রাখুন। নিত্য নতুন পড়ার কৌশল চিন্তা করুন।

এনার্জি লেভেলের সঙ্গে আগ্রহের একটা সম্পর্ক আছে। এনার্জি যত বেশি, মনোযোগ নিবদ্ধ করার ক্ষমতা তত বেশি হয়। আর অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর দিনের প্রথমভাগেই এনার্জি বেশি থাকে। তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যে পড়াটা দিনে এক ঘণ্টায় পড়তে পারছে সেই একই পড়া পড়তে রাতে দেড় ঘণ্টা লাগছে। তাই কঠিন, বিরক্তিকর ও একঘেয়ে বিষয়গুলো সকালের দিকেই পড়ুন। পছন্দের বিষয়গুলো পড়ুন পরের দিকে। তবে যদি উল্টোটা হয়, অর্থাৎ রাতে পড়তে আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, তাহলে সেভাবেই সাজান আপনার রুটিন।

আরেকটা কাজ করবেন—একটানা না পড়ে বিরতি দিয়ে পড়বেন। কারণ গবেষণায় দেখা গেছে, সাধারণত একটানা ৫০ মিনিটের বেশি একজন মানুষ মনোযোগ দিতে পারে না। তাই একটানা মনোযোগের জন্যে মনের ওপর বল প্রয়োগ না করে প্রতি ৫০ মিনিট পড়ার পর পাঁচ মিনিটের একটা ছোট বিরতি নিতে পারেন। কিন্তু এ বিরতির সময় টিভি, মোবাইল বা কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত হবেন না যা হয়তো পাঁচ মিনিটের নামে দু'ঘণ্টা নিয়ে নিতে পারে।

মনোযোগের জন্যে আপনি কোন ভঙ্গিতে বসছেন সেটি গুরুত্বপূর্ণ। সোজা হয়ে আরামে বসুন। অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া বন্ধ করুন। চেয়ারে এমনভাবে বসুন যাতে পা মেঝেতে লেগে থাকে। টেবিলের দিকে একটু ঝুঁকে বসুন। আপনার চোখ থেকে টেবিলের দূরত্ব নির্দিষ্ট মাত্রায় থাকা উচিত।

পড়তে পড়তে মন যখন উদ্দেশ্যহীনতায় ভেসে বেড়াচ্ছে—জোর করে

তখন বইয়ের দিকে তাকিয়ে না থেকে দাঁড়িয়ে পড়ুন। তবে রুম ছেড়ে যাবেন না। কয়েকবার এ অভ্যাস করলেই দেখবেন আর অন্যমনস্ক হচ্ছেন না।

প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পড়তে বসুন এবং পড়তে বসার আগে কোনো অসমাপ্ত কাজে হাত দেবেন না বা সেটার কথা মনে এলেও পাতা দেবেন না। চিন্তাগুলোকে বরং একটা কাগজে লিখে ফেলুন।

আর সবশেষে, যদি টার্গেটমতো পড়া ঠিকঠাক করতে পারেন, তাহলে নিজেকে পুরস্কৃত করুন, তা যত ছোটই হোক।

**প্রশ্ন :** পড়াশোনায় মনোযোগ ও আত্মবিশ্বাস কীভাবে বাড়াবো?

**উত্তর :** এক হচ্ছে, কোয়ান্টাম নিয়মে পড়াশোনা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থী কার্যক্রমে অংশ নিতে হবে। শিক্ষার্থী কার্যক্রমের কাউন্সিলরদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। কারণ মনোযোগ এবং আত্মবিশ্বাস হচ্ছে একটা ধারাবাহিক ব্যাপার। যত সফল মানুষের সাথে আমরা থাকবো, তত সাফল্য আমাদের দিকে অগ্রসর হবে। আর যত ব্যর্থ মানুষদের সাথে থাকবো ব্যর্থতা আমাদেরকে টানবে।

আমাদের শিক্ষার্থী কার্যক্রম যারা পরিচালনা করেন তারা ছাত্রজীবনে সফল এবং কর্মজীবনেও সফল। তারা পরিপূর্ণভাবে নিবেদিত হয়েছেন আমাদের পড়াশোনায় সহযোগিতা করার জন্যে। তাই মনোযোগ কীভাবে বাড়বে, আত্মবিশ্বাসের সাথে পরীক্ষা দিয়ে কীভাবে প্রথম হওয়া যায়—এটাই তাদের চেষ্টা, তাদের সাধনা। তাদের সাথে যোগাযোগ রাখবেন এবং সেই সাথে নিয়মিত মেডিটেশন তো আছেই।

**প্রশ্ন :** যখন পরীক্ষার কথা ভাবি তখন পড়ার আগ্রহ জাগে কিন্তু যখন টেবিলে পড়ার জন্যে বসি—কিছুক্ষণ পড়ার পর সে আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। এজন্যে আমি কী করতে পারি?

**উত্তর :** পড়ায় মনোযোগ এবং আগ্রহ ধরে রাখার জন্যে আপনাকে পড়ার পরিবেশের ব্যাপারেও সচেতন হতে হবে। যেমন, পড়ার টেবিলটাকে রাখবেন দেয়ালমুখো। ছবি, শো-পিস ইত্যাদি যেসব জিনিস মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করতে পারে সেগুলোকে চোখের সামনে থেকে সরিয়ে রাখুন।

চেষ্টা করুন সবসময় একই জায়গায় পড়ার জন্যে। পড়ার টেবিলটাকে

অন্য আর কোনো কাজে ব্যবহার করবেন না। একইভাবে বিছানায় শুয়ে বা বসে পড়ার অভ্যাস করবেন না। মোবাইল বন্ধ করে রাখুন। সাইলেন্স বা ভাইব্রেশনে রাখলেও একবারে পড়া শেষ করে মোবাইল অন করতে পারেন।

আরেকটি জিনিস মনে রাখবেন। টিভি-র সামনে বসবেন না। পড়ার জায়গায় পর্যাপ্ত আলো যেন থাকে। আলো পড়ার মনোযোগ বাড়ায়। পড়ার কাজে যে জিনিসগুলো লাগবে তার সবগুলোই নিয়ে বসুন যাতে বার বার উঠে গিয়ে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করতে না হয়। বন্ধু রুমমেট বা বাসার কেউ আপনার মনোযোগে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে কি না খেয়াল করুন। তাকে এড়ানোর জন্যে কৌশল অবলম্বন করুন।

পড়ার জন্যে লাইব্রেরি, সেমিনার রুম, রিডিং হল ইত্যাদি যেখানে আরো অনেকেই পড়ছে এবং পুরো পরিবেশটাই পড়ার জন্যে অনুকূল সেগুলোকে বেছে নিতে পারেন। আপনি মনোযোগী হতে পারবেন।

**প্রশ্ন :** আমি যখন পড়তে বসি তখন অনেক ফালতু চিন্তা মাথায় আসে। যতই বাদ দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করি, প্রথমে বাদ হয় পরে আবার চলে আসে। এসব কারণে পড়া মুখস্থ করতে পারি না। যে পড়া আধঘণ্টায় করা সম্ভব, সেটা করতে দুই ঘণ্টা লাগে। এ সমস্যার সমাধান কী?

**উত্তর :** আপনাকে যা করতে হবে তা হলো আপনার পড়ার সময়টাকে কয়েক ভাগ করে একেক ভাগে একেকটা পড়ার কাজ করতে হবে। কারণ মনোযোগ আর সময়কে সুন্দরভাবে কাজে লাগানোর পছন্দ একই। এর জন্যে SQ3R পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন।

SQ3R-এ S মানে Survey, Q মানে Question এবং 3R-এ ১ম R হলো Read, ২য় R হলো Recite এবং ৩য় R হলো Revise. প্রত্যেকটার বিবরণই নিচে দেয়া হলো।

S= Survey-পড়তে বসার আগে যা পড়বেন তাতে কোয়ান্টা রিডিং পদ্ধতিতে দ্রুত একবার চোখ বুলানোই সার্ভে। এক্ষেত্রে যে অধ্যায়টি পড়বেন তার শিরোনাম, উপশিরোনাম, ছবি, ক্যাপশন, গ্রাফ, ডায়াগ্রামগুলোতে চোখ বোলায়। সার্ভের মধ্য দিয়ে আপনি বুঝতে পারবেন কী পড়তে যাচ্ছেন।

Q= Question-চ্যাপ্টারের শিরোনামগুলোকে প্রশ্নে রূপান্তরিত করুন। কী কে কেন কীভাবে কখন অথবা তুলনা কর, পার্থক্য কর, বর্ণনা কর, তালিকা কর ইত্যাদি পরিভাষায় এ প্রশ্ন করা যেতে পারে। যেমন, বইয়ের

শিরোনাম হলো উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান। প্রশ্নে রূপান্তরিত করলে এটি হবে, উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন অবসানের প্রেক্ষাপট বর্ণনা কর। প্রশ্ন করার ফলে আপনি সচেতন হয়ে উঠবেন যে, কী পড়তে যাচ্ছেন।

R= Read-আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর পাবার জন্যে এবার পড়া শুরু করুন। যেমন, অধ্যায়ের নাম-আমাদের শরীরের কথা, উপশিরোনাম-রক্ত এবং SQ3R প্রশ্ন হলো, রক্ত কী? রক্তের উপাদানগুলো কী কী? এদের কাজ কী?

বইয়ে এই প্রশ্নটির উত্তর হিসেবে দেয়া আছে নিচের প্যারাগ্রাফটি :

রক্ত না থাকলে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। সে চেষ্টা হতো তেল ছাড়া গাড়ি চালানোর মতো। রক্তের কাজ হচ্ছে শরীরের সর্বত্র প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ করা। সেইসঙ্গে অপ্রয়োজনীয় বস্তু বের করে দেয়া। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে পাঁচ লিটারের মতো রক্ত থাকে। রক্তে দূরকম কণিকা থাকে : লোহিত কণিকা ও শ্বেত কণিকা। বেশিরভাগ লোহিত কণিকা তৈরি হয় হাড়ের মজ্জায়। শ্বেতকণিকার ভূমিকা হচ্ছে শরীরকে রক্ষা করা। তারা জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করে আর এন্টিবডি নামে রাসায়নিক বস্তু সৃষ্টি করে যার কাজ হচ্ছে আততায়ী জীবাণু ধ্বংস করা। রক্তে প্রতি ঘন মিলিমিটারে ৪০ থেকে ৬০ লক্ষ লোহিতকণিকা থাকে। এরাই প্রয়োজনীয় অক্সিজেন বহন করে আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড অপসারণের ব্যবস্থা করে।

R= Recite-যা পড়েছেন সেগুলোকে জোরে জোরে আওড়ানোই রিসাইট। পড়া-নিজেকে শোনান। ঠিকমতো কি হচ্ছে? না হলে আবার পড়ুন। এতে মনে রাখা সহজ হবে।

R= Revise-এতক্ষণ যা পড়লেন তা বার বার ঝালাই করাই হলো রিভাইস। নিয়মিত বিরতিতে এই রিভিশন দিতে হবে।

**প্রশ্ন :** পড়াশোনার ক্ষেত্রে ক্লাসে উপস্থিতি কতটা গুরুত্বপূর্ণ? অনেকে বলে নিয়মিত ক্লাস না করেও ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব। কথাটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত?

**উত্তর :** এটা ঠিক যে, আমাদের অনেক ছাত্রছাত্রীই নিয়মিত ক্লাস করে না। আবার করলেও ক্লাসটাকে তারা গুরুত্বের সাথে নেয় না। ক্লাসে না পড়ানো পর্যন্ত তারা নিজেরা পড়ে না। তারা মনে করে আগে ক্লাস হোক, তারপর পড়বো। আর এর ফলে ক্লাসের অনেক পড়াই তারা বোঝে না। ক্লাসের

অর্ধেক সময় কাটে অন্যমনস্কতায়, আর বাকি অর্ধেক বিরক্তিতে। আসলে ক্লাস কিন্তু সব পড়া বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে না। ক্লাস হলো শুধুমাত্র যে পড়াগুলো সে বোঝে নি সেগুলো ধরিয়ে দেয়ার জায়গা।

কাজেই পড়ে আসুন ক্লাসে যাওয়ার আগেই। এতে কয়েকটি লাভ হবে। প্রথমত, ক্লাস করে আপনি খুব আনন্দ পাবেন। মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হবে না। দ্বিতীয়ত, আপনার ক্লাস রেসপন্স ভালো হবে, ফলে আপনি শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ হবেন। তৃতীয়ত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—ক্লাসের পর আপনি যখন বিষয়টা পড়তে যাবেন—আপনার অনেক সহজ লাগবে এবং মনে থাকবে অনেকদিন।

## মনে রাখার জন্যে

**প্রশ্ন :** একই পড়া আরেক বান্ধবীও পড়ছে, আমিও পড়ছি। খুঁটিনাটি সবকিছু তার হয়তো অনেক দিন মনে থাকে যা আমার মনে থাকে না। মনোযোগ দিয়ে পড়ার পরও এমন কেন হয়? এ নিয়ে আমি হীনম্মন্যতায় ভুগি। আমি কী করবো?

**উত্তর :** কয়েকটা কারণে এমন হতে পারে। প্রথম কারণটি হতে পারে—আপনার নিজেরই নেতিবাচক প্রেগ্রামিং। এই যে বললেন, আপনার বান্ধবীর মনে থাকে, কিন্তু আপনার থাকে না এবং এটা নিয়ে আপনি হীনম্মন্যতায় ভোগেন। তার মানে কী? আপনি নিজেই ধরে নিচ্ছেন যে, আপনার মনে থাকবে না। ফলে যা-ই আপনি পড়ছেন বা শিখছেন আপনি ভুলে যাচ্ছেন।

দ্বিতীয়ত, আপনি হয়তো মন দিয়ে পড়াটি শেখেন না এবং বার বার ঝালাই করেন না। পরীক্ষায় দেখা গেছে, তথ্যগুলো পরবর্তীতে ব্যবহার না করলে যেকোনো পড়ার একদিনের মাথায়ই এর ৭৫% ভুলে যায় মানুষ।

তৃতীয়ত, বিক্ষিপ্ত এবং অপ্রাসঙ্গিকভাবে শিখলে এবং টেনশন ও দুশ্চিন্তায় মন আচ্ছন্ন থাকলে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা বেশি হয়। আর আপনার ভুলে যাওয়ার আরেকটি কারণ হতে পারে, যেভাবে আপনি শিখেছেন ঠিক সেভাবে হয়তো মনে করতে পারছেন না। পরীক্ষার সময় প্রশ্ন একটু ভিন্নভাবে এলেই আপনি ভাবেন, আপনার কিছুই মনে নেই।

অথচ আমাদের সবাইই মনে রাখার ক্ষমতা সমান। পার্থক্যটা হয় স্মৃতিকে

চর্চা না করার ফলে। ব্রেনের এই মেমোরি ব্যাংকের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। প্রতি সেকেন্ডে হাজারখানেক নতুন তথ্য গ্রহণের ক্ষমতা আছে তার এবং যত নতুন তথ্যই দেই না কেন সে কিন্তু ঠিকই এর জন্যে জায়গা করে দিচ্ছে।

তাহলে কীভাবে আপনার মনে রাখার ক্ষমতাকে বাড়াবেন?

প্রথমত, যা আপনি মনে রাখতে চান তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন বা পড়ুন। একই সময় যদি একটা বিষয়েই মনোযোগ দেন তাহলে এটা সহজ হবে। যে তথ্যগুলো মনে রাখতে চান সেগুলোকে নির্দিষ্ট করুন এবং শুধু তাতেই মনোযোগ দিন। যেমন, বইয়ের যে তথ্যগুলো আপনি নতুন দেখছেন বা কঠিন মনে হচ্ছে সেগুলোই হবে আপনার মনোযোগের বিষয়।

একটি বিষয়কে আপনি যত ভিন্ন দৃষ্টিকোণ এবং ব্যাখ্যা থেকে বুঝবেন তত এটি আপনার মনে রাখা সহজ হবে। যত পুরনো জানা তথ্যের সঙ্গে মিল-অমিল চিন্তা করবেন, তত আপনার মনে থাকবে।

যেমন, আপনি জানলেন—চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনকের নাম হিপোক্রেটিস। প্রথমেই আপনার মনে হলো হিপোক্রেট একটি ইংরেজি শব্দ যার অর্থ হলো ভন্ড বা প্রতারক। কিন্তু আপনার নতুন শেখা এই নামের সঙ্গে এ অর্থের কোনো মিল নেই। বরং উল্টোটাই প্রযোজ্য। কারণ এখনো চিকিৎসকরা পাশ করার পর যে শপথ নেন তাকে বলা হয় ‘হিপোক্রেটিক ওথ’ যার বক্তব্য হলো একজন চিকিৎসক হিসেবে তিনি রোগীকে সাধ্যমতো নিরাময় করার চেষ্টা করবেন, রোগীর গোপন কথা প্রকাশ করবেন না এবং সৎভাবে জীবন যাপন করবেন।

যা মনে রাখতে চান, তাকে একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামোয় রূপান্তরিত করুন। আংশিক না করে বিষয়টি পুরোপুরি শিখতে বা বুঝতে চেষ্টা করুন। মনে রাখার ক্ষেত্রে ছবির ক্ষমতা অনেক বেশি। তাই কোনো জটিল বা ব্যাপক বিষয়কে ছবি, চার্ট বা ডায়াগ্রামে সাজিয়ে নিন।

মনে রাখার জন্যে প্রথমবার পড়ার দুই/ এক দিনের মধ্যেই পড়াকে রিভাইজ করুন। কোয়ান্টা রিডিং পদ্ধতিতে সুযোগ পেলেই চোখ বুলিয়ে নিন। ক্লাস শেষে নিয়মিত ক্লাসনোটে চোখ বোলান।

এছাড়া তৈরি করতে পারেন মনে রাখার নানা ছন্দ। যেমন, মোঘল সাম্রাজ্যের পরম্পরা বোঝাতে ‘বাবার হইলো একবার জ্বর, সারিলো ঔষধে’ ছড়াটি আওড়ালেই বাবর হুমায়ূন আকবর জাহাঙ্গীর সাজাহান আওরঙ্গজেব প্রমুখ মোঘল বাদশাহদের নাম একের পর এক বলে দেয়া যায়। এর সাথে নিয়মিত অটোসাজেশন দিন যে—‘প্রতিদিন আমার স্মৃতিশক্তি বাড়ছে’।



## পরীক্ষায় ভালো করার জন্যে

**প্রশ্ন :** পরীক্ষার প্রশ্ন কমন পড়বে কি না-এ ভয়টা সবসময় কাজ করে। এ থেকে মুক্তির উপায় কী?

**উত্তর :** প্রশ্ন কমন পড়বে কি না-এ ভয় তখনই কাজ করবে যখন প্রস্তুতি সন্তোষজনক না হবে। সারা বছর না পড়ে শুধু পরীক্ষার আগে পড়বে বলে যারা পড়া জমিয়ে রাখে তাদের এ অস্থিরতায় ভোগা স্বাভাবিক।

আবার পরীক্ষার প্রস্তুতি ভালো হওয়ার পরও যদি পরীক্ষাভীতি থাকে, তাহলে নিয়মিত অটোসাজেশন দিতে হবে। আর মূল বিষয়টি হলো দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ ভয় না পেয়ে পরীক্ষাকে ভাবতে হবে আপনার যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ হিসেবে। কারণ আপনি যতই যোগ্যতা অর্জন করুন না কেন, তা প্রমাণের আর কোনো সুযোগ নেই পরীক্ষা ছাড়া এবং এর মাধ্যমেই আপনি এক এক করে ধাপগুলো পেরিয়ে অর্জন করতে পারবেন সাফল্যের স্বীকৃতি।

**প্রশ্ন :** আমার মেয়ের বয়স ১৫ বছর, সে হাউস টিউটর ও ক্লাস টেস্টে ভালো রেজাল্ট করে কিন্তু হল টেস্টে খুব খারাপ করে, এর প্রতিকার কী?

**উত্তর :** এর জন্যে আমাদের শিক্ষার্থী কার্যক্রম রয়েছে। আর পরীক্ষায় ভালো করার টিপসগুলোর গ্রন্থনা নিয়ে প্রকাশিত ‘কোয়ান্টাম শিক্ষার্থী সহায়িকা’ এক্ষেত্রে আপনার মেয়ের খুব কাজে লাগবে। আসলে তার মূল সমস্যাটা হচ্ছে কনফিডেন্সের অভাব, নার্ভাসনেস। এই নার্ভাসনেস একদিনে দূর হবে না, এর জন্যে লেগে থাকতে হবে। তাকে সজে থাকতে হবে এবং সৎসজে যখন থাকবে তখন তার নার্ভাসনেস দূর হয়ে যাবে, আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

**প্রশ্ন :** আজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আমার ২য় বর্ষ পরীক্ষা ছিলো। পরীক্ষা দিয়ে বের হয়ে জানলাম, আজকের বিষয়ের প্রশ্ন আগেই ফাঁস হয়েছে। আমি কোনো সময়েই পরীক্ষার আগে প্রশ্ন নেই না। তো আমি সারা বছর পড়াশোনা করে পাবো ৭০% নম্বর, আর কেউ একদিন পড়ে পাবে ৯০% নম্বর। প্রশ্ন না নেয়াটা কি আমার বোকামি?

**উত্তর :** আসলে এটাও দুর্ভাগ্য যে, আমাদের পরীক্ষায় এ জিনিসগুলো হচ্ছে। এদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত। এখন, আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে?

হতে পারে যে, একদিন পড়েই সে হয়তো ৯০% পাচ্ছে। কিন্তু মনে রাখবেন, জীবনের পরীক্ষা খুব কঠিন। সেখানে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনো সুযোগ নেই এবং সেখানে একদিন পড়ে কখনো ৯০% পাওয়া যায় না। সেখানে প্রথম হতে হলে বছর জুড়ে পরিশ্রম করতে হয়, যোগ্যতার কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে উৎরাতে হয়। আর আপনি সেটাই করছেন।

কাজেই জীবনের পরীক্ষায় আপনারই প্রথম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অতএব কখনো হতাশ হবেন না এই ভেবে যে, অমুকে না পড়ে রেজাল্ট ভালো করছে; আমার তাহলে এত পড়ে লাভ কী! কারণ আপনার জ্ঞান তো আপনাকে ছেড়ে যাবে না। একটা-দুটো পরীক্ষায় ওরা সাময়িক এ সুবিধা পেলেও আপনার কষ্টার্জিত জ্ঞান কাজে লাগবে আপনার সারাজীবন।

**প্রশ্ন :** আমার পরীক্ষার আর দুই মাস বাকি। কিন্তু ক্লাস শুরু হয়েছে মাত্র এক মাস আগে। পরীক্ষার সিলেবাস বিশাল। এত অল্প সময়ে এ বিশাল সিলেবাস পড়ে কি পরীক্ষায় ভালো করতে পারবো?

**উত্তর :** ক্লাস এক মাস আগে শুরু হয়েছে, কিন্তু ভর্তি তো এক মাস আগে হন নি, ভর্তি হয়েছেন আরো আগে। পরীক্ষায় ভালো করার চিন্তা তখন থেকেই করা উচিত ছিলো। ক্লাসের জন্যে অপেক্ষা করলে পরীক্ষা কখনো ভালো হয় না। কারণ আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর দায়িত্ব নেয় না। পড়ার দায়িত্বটা ছাত্রছাত্রীদের নিজেদেরই নিতে হয়। যতদিন না এই শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো যাচ্ছে ততদিন সিস্টেমের সাথেই অভ্যস্ত হতে হবে।

এখন যেহেতু আর দুই মাস সময় আছে, এ সময়টাকেই কাজে লাগানোর জন্যে পরিশ্রম করতে হবে। রুটিন করে নিন। তারপর শুরু করুন। আর অল্প সময়ে পরীক্ষার প্রস্তুতি কীভাবে নেবেন, সে ব্যাপারে আমাদের শিক্ষার্থী কাউন্সিলরদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন। চেষ্টা করলে এই দুই মাস পড়েও আপনি ভালো রেজাল্ট করতে পারবেন।

**প্রশ্ন :** আমি অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছি। আমার একটা পেপার বেশ খারাপ হওয়ায় ভীষণ অস্থিরতায় ভুগছি যে, ফাস্ট ক্লাস পাবো কি না। কারণ আমি খুব চেষ্টা করেছিলাম আর আমার পরিবারের সবাইও এটা চায়। কিন্তু পরীক্ষা খারাপ হওয়ার ফলে এখন আমি খুব টেনশনে আছি।

**উত্তর :** ছেলে বা মেয়ে ভালো করুক-এটা তো সব পরিবারই চায়। আসলে যা কিছু ভালো, আকর্ষণীয় তার প্রতি সবারই আকাঙ্ক্ষা থাকে। কিন্তু পায় কারা? যারা লক্ষ্য স্থির করে এবং সে লক্ষ্যে পরিশ্রম করে। আর এক্ষেত্রে আরো একটি সত্য হচ্ছে মানুষ কাজের মালিক হলেও ফলাফলের মালিক সে নয়। ফলাফলের মালিক হলেন স্রষ্টা।

কাজেই মানুষের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হবে তার সাধ্যমতো চূড়ান্ত চেষ্টা করা এবং তারপর প্রার্থনা করা যেন ফলাফল সুন্দর হয়। টেনশন করে বা নার্ভাসনেসে ভুগে কোনো লাভ নেই। কাজেই আপনি এখন আপনার কাজক্ষত ফলাফলের জন্যে মনছবি দেখুন, প্রার্থনা ও দান করুন। আর সুযোগ থাকলে এখনকার সময়টা ফাউন্ডেশনে ভালো কাজে ব্যয় করুন।

**প্রশ্ন :** দুই বন্ধুর একজন নিয়মিত পড়ে এবং আরেকজন পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে থেকে পড়ালেখা করে এবং সেই ছেলেটি ক্লাসে প্রথম সারিতে থাকে। এর কারণ কী?

**উত্তর :** আসলে এখানে আপনার যেটা মনে হচ্ছে, সেটা ঠিক নয়। কারণ এক সপ্তাহ আগে পড়ে কখনো ক্লাসে প্রথম সারিতে থাকা সম্ভব নয়। সে হয়তো প্রতিদিনের পড়াগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করে রাখতো। অর্থাৎ তার প্রস্তুতিটা এতই নিয়মিত যে, তা আলাদা করে চোখে পড়ে নি। আর আরেক যে বন্ধুর কথা বলেছেন তাকে নিয়মিত পড়তে দেখলেও তার পড়ার মধ্যে সমস্যা রয়েছে। অর্থাৎ অনেক সময় নিয়ে পড়লেও পড়াটা ঠিক কার্যকরী হচ্ছে না। অথবা তার পড়া আর ভালো রেজাল্টের মধ্যে ফাঁকটা হচ্ছে পরীক্ষা।

তার পরীক্ষাগুলো হয়তো ততটা ভালো হচ্ছে না। আর এজন্যে তাকে যেটা করতে হবে তা হলো ভুল থেকে শেখার অভ্যাস করতে হবে। সিরিয়াসলি নিতে হবে মডেল টেস্ট বা ক্লাস টেস্ট বা মক টেস্ট অর্থাৎ মূল পরীক্ষার আগের এই পরীক্ষাগুলোকে। ভালো পরীক্ষার জন্যে উত্তর লেখার সময় অনুসরণ করতেন-সফল শিক্ষার্থীদের এরকম কিছু টিপস নিয়ে গ্রন্থিত আমাদের শিক্ষার্থী কণিকা থেকে কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

□□হলে নিজের আসনে পরীক্ষা শুরুর অন্তত ১৫ মিনিট আগে বসুন।□□

পাঁচ মিনিট মেডিটেশন করুন। অটোসাজেশন দিন-‘যা পড়েছি সব মনে আছে। লেখার সময় সুন্দরভাবে তা মনে চলে আসবে।’

□□প্রশ্নপত্রের উভয়পাঠ ভালোভাবে পড়ুন। নির্দেশনাগুলো খেয়াল করুন।

- প্রতিটি প্রশ্নের জন্যে সময় ভাগ করে ফেলুন। বরাদ্দকৃত সময়ে শেষ না হলে ফাঁকা রেখে পরের প্রশ্নে চলে যান।
- জটিল প্রশ্নের নয়; শুরু করুন ভালোভাবে জানা উত্তরটি দিয়ে।
- শেষ ৫/১০ মিনিট খাতা রিভাইজ করুন।
- কোনো প্রশ্ন ছেড়ে আসবেন না। কারণ দুটো অর্ধেক উত্তর একটি সম্পূর্ণ উত্তরের চেয়ে বেশি নম্বর তুলবে।
- বাধ্যতামূলক না হলে জটিল বা সঠিক উত্তর জানা নেই—এমন প্রশ্ন এড়িয়ে চলুন। কারণ, উত্তরে গৌজামিল থাকলে নম্বর আরো কমে যেতে পারে।
- প্রশ্নের উত্তর তিন ভাগে ভাগ করুন—ভূমিকা, মূল বক্তব্য ও উপসংহার। ভূমিকা ও উপসংহার যত্ন করে লিখুন।
- উত্তরে বৈচিত্র আনতে ডায়াগ্রাম, ছক, চিত্র ব্যবহার করুন।□□লেখক/ বইয়ের কিছু শব্দ/ বাক্য উদ্ধৃত করুন।
- কোন প্রশ্নের উত্তরে কী জানতে চাওয়া হয়েছে তা বুঝে লিখুন। কোন অংশের জন্যে কত নম্বর তা-ও দেখুন।
- কোনো প্রশ্নের উত্তর বা পয়েন্ট মনে করতে না পারলে ফাঁকা জায়গা রেখে পরবর্তী প্রশ্ন বা পয়েন্ট লিখতে থাকুন।
- খাতা জমা দেয়ার সময় নাম, রোল, রেজি. নম্বর ঠিক আছে কি না তা নিশ্চিত হোন। অতিরিক্ত কাগজ নিলে স্টেপলিং বা সুতোর গিঁঠ ঠিকভাবে দিন। নইলে ভালো পরীক্ষা দিয়েও আশানুরূপ ফল না-ও হতে পারে।

সারাবছর পড়াশোনা করেও ভালো না করার কারণ হতে পারে এ টিপসগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ না করা। কাজেই প্রথম বস্তুটির কর্তব্য হবে পরীক্ষা শেষে পর্যালোচনা করা যে, কী কী ভুল সে করেছে, ভুলের ধরন কী এবং কোথায় কোথায় আরো ভালো করা যেত ইত্যাদি। এবং পরের পরীক্ষায় সেগুলোকে শুধরে নিতে হবে।

**প্রশ্ন :** আমি ভাইভা বা ইন্টারভিউ বোর্ডকে খুব ভয় পাই। অনেক সময় জানা প্রশ্নের উত্তরও মনে পড়ে না। এ ভীতি থেকে কীভাবে মুক্তি পাবো?

**উত্তর :** ভাইভা বোর্ডে আসলে একজন পরীক্ষার্থী বা প্রার্থীর মেধা বা জ্ঞানের চাইতেও তার আত্মবিশ্বাস এবং তার ব্যক্তিত্বের সাবলীলতা এবং নিজেকে উপস্থাপন করার দক্ষতা ও কুশলতা যাচাই করা হয়। কারণ ভাইভা বোর্ডে

পরীক্ষক বা প্রশ্নকারী হিসেবে যারা থাকেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের বহুদর্শনের অভিজ্ঞতা দিয়ে অল্প সময়ের ভেতরেই তারা প্রার্থীর এ দক্ষতাগুলোকে যাচাই করে নিতে পারেন। কাজেই নার্ভাস না হয়ে যত শান্ত ও আত্মবিশ্বাসী থাকতে পারবেন, পরিস্থিতিতে তত নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন, অর্জন করবেন আপনার পরীক্ষকদের সুদৃষ্টি।

অতএব সহজ, প্রশান্ত মনে ভাইভায় অংশ নিন। শিক্ষকদের বিচারক না ভেবে সহযোগী ভাবুন। এবং কোনো অবস্থাতেই কন্ট্রাডিকশন-এর মধ্যে যাবেন না, যাতে এটা প্রমাণ হয় যে, হ্যাঁ, টিচারও রাইট, আপনিও রাইট। যাতে টিচার মনে করেন যে, এটা একটা অপিনিয়ন-এটাও চলে, ওটাও চলে। টিচার ভুল-এটা কখনো বক্তব্য থেকে আসতে পারবে না। ফলে ভাইভা বোর্ড বা যেকোনো পরিস্থিতিতে আপনার প্রশান্ত প্রত্যয়, বিনয় আর সাবলীল উপস্থাপনা শিক্ষকদের সপ্রশংস দৃষ্টি কেড়ে নেবে।

আর ইন্টারভিউতে সবসময় মনে রাখবেন-‘বস ইজ অলওয়েজ রাইট’, অর্থাৎ বস যা বলবেন তাতেই সম্মত হবেন। কিন্তু নীতিগত ব্যাপারে বা নিজের বক্তব্যে স্থির থাকবেন-ওখানে আপস করতে যাবেন না। অর্থাৎ নিজের বক্তব্যে বিনয়ী কিন্তু দৃঢ় থাকবেন। এ সূত্রগুলো কাজে লাগানোর জন্যে নিয়মিত অটোসাজেশন দিন, কমান্ড সেন্টারকে ব্যবহার করুন। আর বাস্তব দক্ষতাগুলো অর্জনের জন্যে কাজ করুন।

**প্রশ্ন :** পরীক্ষার সময় ভীতি কাজ করে, পড়া ভুলে যাই। কী করবো?

**উত্তর :** আসলে এই পরীক্ষাভীতির উৎসটা কোথায়? মৌলিক সমস্যাটা আমাদের মধ্যেই-পরীক্ষাকে আমরা খুব সিরিয়াস মনে করি। একটা বিপদ বলে মনে করি। আর তাতেই যত সমস্যা, কারণ বিপজ্জনক জিনিসকে মানুষ ভয় পায়।

অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর জীবনে পরীক্ষা যেন এক মূর্তিমান আতঙ্ক। শুনলেই মনে হয়, এই বুঝি বাঘ হালুম করে হামলে পড়বে ঘাড়ের ওপর! অথচ পরীক্ষা মানে হচ্ছে সুযোগ-নিজের যোগ্যতাকে প্রমাণ করার, ওপরের ক্লাসে উন্নীত হবার। চাকরিতে পরীক্ষা মানে কী? হায়ার গ্রেডে ওঠা। আর পরীক্ষা যদি না থাকতো তাহলে হায়ার গ্রেডে ওঠার জন্যে সাধারণ মানুষের কোনো সুযোগ থাকতো না; যারা তেল দিতে পারতো শুধু তাদেরই সুযোগ থাকতো, কারণ কোনো সিস্টেম নেই।

পরীক্ষাভীতি কাটানোর সহজ পথ কী? এক হচ্ছে, রুটিন করে পড়াশোনা করা; দুই হচ্ছে, মডেল টেস্ট দেয়া আর তিন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, পরীক্ষাকে খুব সহজভাবে গ্রহণ করা। যেমন পরীক্ষাকে নিজের সবচেয়ে প্রিয় পিঠার সাথে তুলনা করুন। একটা পরীক্ষা মানে একটা পিঠা!

আর এটা তখনই সম্ভব হবে যখন আপনার ভেতরে বিশ্বাস সৃষ্টি হবে। আপনি যখন নিয়মিত মেডিটেশন করবেন; নিয়মিত অটোসাজেশন দেবেন, ধীরে ধীরে এই বিশ্বাসটা প্রবল হবে এবং বিশ্বাসটা স্থায়ী করার জন্যে মেডিটেশনের পাশাপাশি নিয়মিত পড়াশোনাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যে বিশ্বাসের সাথে কর্ম যুক্ত হয়, যে প্রার্থনার সাথে কর্ম যুক্ত হয় সেই প্রার্থনাই বাস্তবায়িত হয়। আর যে বিশ্বাসের সাথে কর্ম থাকে না সেটা কখনো স্থায়ী হয় না, বাস্তবায়িত হয় না।

**প্রশ্ন :** নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন কীভাবে বেশি বেশি মনে রাখতে পারবো?

**উত্তর :** নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় ভালো করার জন্যে কয়েকটি নিয়ম অনুসরণ করতে পারেন :

- নির্দেশনাগুলো পড়ুন। দেখুন ভুল উত্তরের জন্যে নম্বর কাটা যাবে কি না।
- সবগুলো অপশন পড়ুন। যেমন, মাইকেল এঞ্জেলো একজন—□

১. প্রখ্যাত ভাস্কর ও স্থাপত্যশিল্পী□

২. প্রখ্যাত চিত্রকর ও স্থাপত্যশিল্পী□

৩. প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী ও চিত্রকর□

৪. প্রখ্যাত চিত্রকর, ভাস্কর ও স্থাপত্যশিল্পী

- প্রশ্নের গুরুত্বপূর্ণ অংশটিতে আন্ডারলাইন করুন বা গোল দাগ দিন। যেমন, কবর নাটকের প্রেক্ষাপট হিসেবে কোন যুক্তিটি সমর্থনযোগ্য?□

১. শিক্ষা আন্দোলন□

২. ভাষা আন্দোলন□

৩. গণ আন্দোলন□

৪. স্বাধীনতা আন্দোলন

- সরাসরি সঠিক উত্তরটি বুঝতে না পারলে বাদ দেয়ার প্রক্রিয়ায় এগোন। যে অপশনগুলো ভুল বলে আপনি নিশ্চিত সেগুলোকে ট্রাসচিহ্ন দিয়ে দিন। এবার বাকিগুলোর মধ্য থেকে বেছে নিন। যেমন, ধূমপান ত্যাগের জন্যে যথেষ্ট কোনটি?□

১. ধূমপায়ীকে শাস্তি □
  ২. ধূমপায়ীকে বয়কট□
  ৩. ধূমপায়ীর ইচ্ছাশাস্তি□
  ৪. ধূমপায়ীকে বন্দি করা
- অনেক সময় প্রশ্নের মধ্যেই সঠিক উত্তরের ইঙ্গিত থাকে। যেমন, আত্মিক মৃত্যু মানে কী?□
১. শিক্ষাদীক্ষা থেকে দূরে থাকা□
  ২. লোভাতুর প্রকৃতির উন্মেষ□
  ৩. সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা□
  ৪. জাগতিক মৃত্যু
- ‘ওপরের সবকটি’ বেছে নেয়ার আগে নিশ্চিত হয়ে নিন যে, সবগুলোই ঠিক। যেমন, পাইকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কোন ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হতে পারে?□
১. এক মালিকানা সংগঠন□
  ২. অংশীদারী সংগঠন□
  ৩. যৌথ মূলধনী কোম্পানি সংগঠন□
  ৪. ওপরের সবকটি
- ‘কোনোটিই নয়’ জাতীয় উত্তর থাকলে নিশ্চিত হয়ে নিন কোনটি বেছে নেবেন? যেমন, কোন হিসাব ব্যবসায়ীদের জন্যে উপযোগী?□
১. চলতি হিসাব□
  ২. সঞ্চয়ী হিসাব□
  ৩. স্থায়ী হিসাব□
  ৪. কোনোটিই নয়

**প্রশ্ন :** আমি যে বিষয় পড়ছি তার প্রশ্ন থাকে আনসিন টাইপের। প্রশ্নোত্তর লিখতে গেলে আমাকে প্রচুর সময় দিতে হয় প্রশ্নোত্তরের কাঠামো তৈরির জন্যে। এছাড়া আমার লেখা ভালো না, গতিও মন্দ। সবকিছু মিলিয়ে আমি একশ পারসেন্ট উত্তর লিখতে পারি না। সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় কী? আর হাতের লেখা ভালো করার উপায় কী?

**উত্তর :** আসলে এরকম ক্ষেত্রে উত্তরটাকে সংক্ষিপ্ত কিন্তু চুম্বক করবেন। আরেকজন যদি সাত পৃষ্ঠা লেখে আপনি পাঁচ পৃষ্ঠায় আপনার উত্তর লিখবেন।

কিন্তু সবগুলো পয়েন্টস ওটার মধ্যে ঠেসে দেবেন। লিখবেন কম কিন্তু বিষয়বস্তু বেশি। যেমন আমাদের কণিকা। কণিকাতে আমরা যে মেসেজটা দিয়েছি এটাকে কিন্তু আমরা অনেক বড় করেও দিতে পারতাম। কিন্তু তা না করে আমরা কেবল নির্ঘাসটা দিয়েছি। তাই এটা পড়তেও অনেক ভালো লাগে। তো আপনিও ওরকম নির্ঘাস করে ফেলবেন এবং দেখবেন যে, চমৎকার উত্তর দিতে পারছেন।

আর হাতের লেখা খুব গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষার খাতায় আপনার হাতের লেখাই পরীক্ষকের সাথে কথা বলবে। খারাপ হাতের লেখায় ভালো উত্তর এবং ভালো হাতের লেখায় খারাপ উত্তর-এ দুটোর মধ্যে নম্বর বেশি পাবে কিন্তু পরেরটাই।

তাই বলে আপনাকে যে মুক্তোর মতো হাতের লেখা লিখতে হবে তা কিন্তু নয়। কয়েকটি কৌশল জানলেই হাতের লেখা ভালো করা যায় : আঁকাবাঁকা না করে লাইনটাকে সোজা রাখার চেষ্টা করুন। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা হয় মাত্র দুই/ তিনটি অক্ষর নিয়ে, যেগুলোকে আমরা কখনো ঠিকভাবে লিখি না। ঐ অক্ষরগুলোর দিকে নজর দিন। তৃতীয়ত, শব্দগুলোর মাঝে পর্যাপ্ত গ্যাপ দিন যাতে দেখতে গোছানো লাগে। চতুর্থত এবং সর্বশেষ হচ্ছে প্র্যাকটিস। সুন্দর কোনো হাতের লেখা দেখে অনুশীলন করুন। সচেতন হোন যে, আপনি সুন্দরভাবে লিখবেন। আপনি পারবেন।

## রঙটিনের গুরুত্ব

**প্রশ্ন :** কোয়ান্টা ভঙ্গি করে পড়তে বসলাম, ঠিক করলাম আর নড়বো না। এমন সময় বড় কেউ এসে প্রশ্ন করলো বা কোনো কাজ দিয়ে দিলো। কাজটা করবো না বলার উপায় নেই। ফোন এলো, ফোন ধরারও কেউ নেই। এখন কী করবো? রঙটিনও করতে পারি না। রঙটিন মতো কাজও করতে পারি না।

**উত্তর :** আসলে আপনাকে সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। চিন্তা করুন এমন একটা ব্যাংক যেখান থেকে প্রতিদিন সকালে আপনাকে ৮৬,৪০০ টাকা দেয়া হয়। টাকাটা থেকে আপনি ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারবেন। কিন্তু শর্ত হলো যা খরচ করতে পারবেন না, দিন শেষে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। এরকম হলে আপনি কী করতেন? নিশ্চয়ই পুরো টাকা কাজে লাগানোর জন্যে উঠে-পড়ে লাগতেন। কিন্তু সময়কে নিয়ে কি এভাবে



ভাবেন? অথচ সময়ই কিন্তু আপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ। কারণ একটি দিনে থাকে মোট ৮৬,৪০০ সেকেন্ড যা আজকে চলে গেলে আর কোনোদিনই ফিরে পাবেন না আপনি।

ছাত্রছাত্রীদের সময় মোটামুটি চার ধরনের কাজ করে কাটে :

১. জরুরি (দরজা খোলা, ফোন ধরা বা কোনো অনিবার্য বাধা-বিঘ্ন)

২. গুরুত্বপূর্ণ (ক্লাসের আগে পড়া, নোট তৈরি করা, পরীক্ষার পূর্বপ্রস্তুতি, নিয়মিত ব্যায়াম, মেডিটেশন)

৩. জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ (পরীক্ষার পড়া, বাড়ির কাজ, প্র্যাকটিক্যাল বা কোনো এসাইনমেন্ট)

৪. জরুরি না, গুরুত্বপূর্ণও না (যেমন, টিভি দেখা, কম্পিউটার গেম খেলা, মোবাইলে কথা বলা, আড্ডা, বেড়ানো বা অসময়ে অতিরিক্ত ঘুম)

সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বেশিরভাগ সময় কাটে ৩ এবং ৪ নম্বর কাজে। কিন্তু একজন অনন্য ছাত্র হিসেবে আপনাকে সবচেয়ে বেশি সময় দিতে হবে ২ এবং ৩ নম্বর কাজে। ১ নম্বর কাজগুলো যাতে খুব বেশি সময় নিয়ে না নেয় সে ব্যাপারে সচেতন হতে হবে এবং ৪ নম্বর কাজগুলো থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করতে হবে। এজন্যেই রুটিন করতে হবে। চলুন দেখা যাক আপনি কীভাবে রুটিন করবেন—

রুটিন করার প্রথম ধাপ হচ্ছে আপনার পরীক্ষার শিডিউল, এসাইনমেন্ট, রিপোর্ট ইত্যাদির তালিকা আপনার পড়ার টেবিলের সামনে এমন এক জায়গায় স্টেটে রাখুন যেন ঢুকলেই চোখে পড়ে। আরেক সেট রাখবেন আপনার সঙ্গেই। বইয়ের ব্যাগ বা মানিব্যাগ বা ভ্যানিটি ব্যাগে।

বাঁধা-ধরা যে কাজগুলো প্রতি সপ্তাহে আপনাকে করতে হয় তা ঐ সূচিতে লিখে অনেকগুলো ফটোকপি করবেন। কারণ প্রতি সপ্তাহেই আপনি এর একটি করে কপি ব্যবহার করবেন। সাপ্তাহিক এই রুটিনকে এরপর দৈনিক রুটিনে রূপান্তরিত করতে হবে। কারণ তাহলেই আপনার সারাদিনকে রুটিনের আওতায় আনতে পারবেন। প্রতিদিন ঘুমানোর আগে করতে হবে এই দৈনিক রুটিন।

রুটিনের ক্ষেত্রে বাস্তববাদী হোন। রুটিন করার ক্ষেত্রে এমন লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করবেন না যা বাস্তবভিত্তিক নয়। প্রথমদিকে বিষয়টি বুঝতে একটু সময় লাগতে পারে। কিন্তু কয়েকদিন চেষ্টা করলেই এটি আপনি আয়ত্ত করতে পারবেন এবং অনুভব করবেন রুটিনের আনন্দকে।

দিনের শুরুটা করুন ‘শোকর আলহামদুলিল্লাহ’ বলে পরিকল্পিতভাবে।

তাহলে সারাদিনই বজায় রাখতে পারবেন সুন্দর কর্মছন্দ ।

লক্ষ করুন দিন-রাতের কোন সময়ে আপনি বেশি মনোযোগী ও সক্রিয় ।  
রুটিনের কঠিন, অপছন্দনীয় এবং একঘেয়ে বিষয়গুলোকে সেভাবে সাজান ।

রুটিনে একই ধরনের বিষয় পর পর না রেখে বিষয়ের বৈচিত্র রাখুন ।  
এতে মনোযোগ ধরে রাখা সহজ হবে ।

আপনি কত ঘণ্টা পড়লেন সেটা মূখ্য নয়, বরাদ্দকৃত সময়ে আপনি কতটা  
মনোযোগ দিয়ে পড়লেন রুটিন পর্যালোচনায় এটাই গুরুত্বপূর্ণ ।

রুটিন অনুসরণে কখনো ছেদ পড়লেও হতাশ হবেন না । পরের  
ঘণ্টাগুলোর জন্যে ফিরে আসুন রুটিনে । কারণ রুটিনের ৮০% অনুসরণ  
করতে পারলেও গড়পড়তা ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে আপনি এগিয়ে যাচ্ছেন ।

**প্রশ্ন :** আগে যারা সময়কে কাজে লাগায় নি । অথচ সামনে তার হাতে সময়  
খুব কম । এক্ষেত্রে সময়কে কীভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে?

**উত্তর :** যে সময় চলে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে, তা আর ফেরত আসবে না ।  
কাজেই ওটা নিয়ে আফসোস করে কোনো লাভ নেই । এখন যেটুকু সময়  
আছে সেটাকে কাজে লাগান । রুটিন করে নিন । চিন্তা করে ঠিক করুন  
সময়কে কীভাবে কাজে লাগাবেন ।

আমরা বলি যে ব্যস্ত । কিন্তু সমস্যাটা হলো আমরা আসলে সময়কে কাজে  
লাগাই না । অতএব এখন যেটুকুই সময় আছে, সেটাকেই পরিকল্পিতভাবে  
কাজে লাগান ।

**প্রশ্ন :** প্রতিদিন সময়ের পেছনে ছুটছি তো ছুটছি-ভোর ৫টা থেকে রাত  
১২টা । তবুও যেন আরো সময় দরকার । দিনের শেষে মনে হয় আর একটু  
দিন দরকার । রাতের শেষে মনে হয় আর একটু রাত দরকার ।

**উত্তর :** আপনি কবিতা লিখলে ভালো করবেন । সময়ের ব্যাপারে এই অতৃপ্তি  
থাকাটা ভালো । তার মানে আপনি পরিশ্রম করছেন । কিন্তু পরিশ্রমটা করতে  
হবে সুপরিকল্পিতভাবে, সুবিন্যাসায়নের মাধ্যমে । তাহলে আপনি ভালো ফল  
লাভ করবেন এবং কাজের সময়ও দেখবেন আরো বাড়াতে পারছেন । যেমন,  
আপনাকে ঘুমাতে হবে । কিন্তু আপনি যেমন চার ঘণ্টা ঘুমাতে পারেন আবার  
১০ ঘণ্টাও ঘুমাতে পারেন । কতক্ষণ ঘুমাবেন এটা আপনার অভ্যাসের ওপর

নির্ভর করবে এবং এটাই নির্ধারণ করে দেবে যে, দিনে কতটা বেশি কর্মঘণ্টা আপনি যোগ করতে পারবেন আপনার সময়ের সাথে। কারণ দিনকে তো আপনি বাড়াতে পারছেন না। অতএব নির্ধারিত ২৪ ঘণ্টাকেই সুবিন্যাসায়নের মাধ্যমে কাজে লাগাতে হবে। আপনি সময় এবং কাজের তৃপ্তি পাবেন।

**প্রশ্ন :** আমি শিক্ষার্থী ওরিয়েন্টেশন করেছি। কিন্তু রুটিন তৈরি করতে পারছি না। আবার করলে তা মানতেও পারছি না। ফলে পড়াশোনা ভালো হচ্ছে না। এখন আমি কী করতে পারি?

**উত্তর :** আমাদের শিক্ষার্থী কাউন্সিলরদের সাথে আলাপ করবেন। ফাউন্ডেশনের সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখবেন। একজনকে গাইড হিসেবে গ্রহণ করুন যার কাছে আপনি পড়াশোনার ব্যাপারে জবাবদিহি করবেন। রুটিন কেন অনুসরণ করতে পারলেন না সে ব্যাপারে তার কাছে জবাবদিহি করবেন। তিনি আপনার বাবা হতে পারেন, মা হতে পারেন, বন্ধু হতে পারেন। কারণ জবাবদিহিতা ছাড়া কেউ আসলে এগুতে পারে না। কেউ কেউ আবার নিজের কাছে নিজে জবাবদিহি করতে পারে। আপনি যেহেতু নিজে পারছেন না, একজনকে গাইড হিসেবে নিন। তাহলেই দেখবেন যে, আপনি রুটিন অনুসরণ করতে পারছেন, নিজেকে বদলাতে পারছেন।

**প্রশ্ন :** পড়াশোনার পাশাপাশি একজন শিক্ষার্থী কীভাবে আল্লাহকে ডাকলে তার ডাকাটা ঠিক হবে? পড়াশোনার সময় এমনও হয়—নামাজের সময় হয়েছে, অনেক মনোযোগ, উঠতে ইচ্ছে করছে না। আবার নামাজটা নিয়মিত পড়তেও ইচ্ছে করে।

**উত্তর :** আসলে জীবনে সবকিছুর জন্যেই থাকতে হবে একটা শৃঙ্খলা, একটা রুটিন। সেটা পড়াশোনার জন্যে যেমন, তেমনি খাওয়া, গোসল ও ইবাদতের জন্যেও। আপনি যত রুটিন মেনে এ কাজগুলো করবেন, দেখবেন সময় হলেই সে কাজটি করার আগ্রহ, মনোযোগ, সুযোগ—সবকিছুই প্রস্তুত হয়ে গেছে। কারণ মন তখন এর জন্যে অটোমেটিক প্রস্তুত হয়ে যায়। যেমন, যারা সময়মতো খায়, দেখবেন ঠিক ঐ সময়ই তাদের ক্ষুধা লাগে, তার আগে নয়। অতএব নামাজ কখন পড়বেন, সেটাও আপনার রুটিনে অন্তর্ভুক্ত করে নিন। দেখবেন, সমাধান হয়ে গেছে।

## লক্ষ্য ঠিক করা

**প্রশ্ন :** আসলে আমার জীবনের লক্ষ্য কী তা আমি কিছুতেই স্থির করতে পারছি না। নিজেই সবসময় হতাশা ও দুর্দশাগ্রস্ত মনে হয়। এজন্যে পরীক্ষাও তেমন ভালো হচ্ছে না। কীভাবে এই হতাশা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়?

**উত্তর :** আমাদের সমস্যা কিন্তু এখানেই যে, আমরা অধিকাংশই জীবনের লক্ষ্য ঠিক করতে পারি না। এ কারণে আমাদের মধ্যে হতাশা চলে আসে। জীবনের লক্ষ্য যদি একজন মানুষ ঠিক করতে পারে, তার জীবনে কখনো হতাশা আসে না; অনেক বাঁক, অনেক মোড় পরিবর্তন করেও তার মধ্যে কোনো হতাশা আসে না।

তাই আপনাকে মনছবি করতে হবে। পাখি যেমন তার গন্তব্যে পৌঁছায় ডানায় ভর করে, আপনিও সাফল্যের শিখরে পৌঁছবেন মনছবির ডানা মেলে দিয়ে। আপনি ঠিক করুন, আপনি কী হবেন? আগামী পরীক্ষায় আপনি কত নম্বর পেতে চান? এইচএসসি-র পর ভর্তি হবেন কোথায় তা ঠিক করুন। আপনার মনছবি হতে হবে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট। ‘আগামী পরীক্ষায় আমি ভালো করবো’-এটা মনছবি নয়। মনছবি হলো-‘আগামী পরীক্ষায় প্রতিটি সাবজেক্টে আমি ৯০+ পেয়ে জিপিএ-৫ পাবো’।

লক্ষ্য হতে হবে বাস্তবসম্মত, তবে অবশ্যই বড়। টিলটা যদি চাঁদকে লক্ষ্য করে ছোঁড়েন, কমপক্ষে তা তো গাছের মগডালে গিয়ে লাগবে। যতটা সম্ভব খুঁটিনাটিসহ মনছবি দেখুন। যত বিস্তারিত দেখবেন আপনার অনুভূতি তত জীবন্ত হবে। আর এ অনুভূতিই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনাকে নিয়ে যাবে মনছবি বাস্তবায়নের দিকে।

তবে মনছবি যা-ই হোক না কেন, মূল লক্ষ্য হতে হবে মানুষের কল্যাণ এবং সৃষ্টির কল্যাণ; সমস্ত সৃষ্টি-গাছ, পশুপাখি, জীবজন্তু সবকিছুর কল্যাণ। আর সেই সাথে নিজের কল্যাণ তো আছেই। আমরা যত নিজের ও মানুষের কল্যাণ করবো তত দেখবো প্রকৃতি আমাদের সমস্ত কল্যাণের প্রতিদান দিচ্ছে, বহুগুণ প্রতিদান দিচ্ছে।

আসলে প্রকৃতি যে কীভাবে প্রতিদান দেয়, তার একটা বাস্তব উদাহরণ দেই। বান্দরবানের লামার কোয়ান্টামমে আমাদের একটা নতুন জায়গাকে আগাছামুক্ত করছিলেন কর্মীরা। আগাছা সাফ করতে করতে হঠাৎ তারা সীমানার একটা গাছের কাছে এসে থমকে গেলেন। ছোট একটা গাছ সবে

দিগন্তপানে মেলে দিয়েছে তার ডালপালা। পরিষ্কার করতে হলে গাছটা কেটে ফেলাই যুক্তিযুক্ত, কিন্তু কাটতে এত মায়া লাগলো তাদের যে, একটু অসুবিধা হলেও গাছটা রেখে দেয়ার সিদ্ধান্তই নিলেন তারা। আর এর এক সপ্তাহের মধ্যেই এমন এক অভাবিত ঘটনা ঘটলো যাতে প্রকৃতির এই প্রতিদানের ব্যাপারটা আবারও নতুন করে অনুধাবন করলেন সবাই।

সন্ধ্যার একটু পরে লামার ধ্যানযাত্রীদের নিয়ে একটি জিপ রওনা দিয়েছিলো আমিরাবাদে ঢাকাগামী বাসের উদ্দেশ্যে। কিন্তু কিছুদূর যেতেই বৃষ্টিভেজা পিচ্ছিল পথে পাহাড়ে কিছুটা ওঠার পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিচের দিকে গড়াতে শুরু করলো জিপ এবং ব্রিজের রেলিংয়ের কোণা ভেঙে ওপর থেকে খাদে পড়বার ঠিক আগমুহূর্তে আটকে গেল একটা গাছ। পাঠক অনুমান করুন কোন গাছ। এটা সেই গাছ, যে গাছটাকে কাটতে গিয়েও কোয়ান্টামমের কর্মীরা কাটেন নি। এত সরু কান্ডওয়ালা একটা গাছে যে একটা জিপ আটকাতে পারে, তা চোখে দেখার আগে কেউ বিশ্বাস করেন নি।

**প্রশ্ন :** আমি কেমিকেল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা করছি। আমার লক্ষ্য ছিলো ক্লাসে প্রথম হওয়া। কিন্তু আপনি বলেছেন, লক্ষ্য হওয়া উচিত জীবনে প্রথম হওয়া। তাহলে এ মুহূর্তে করণীয় কী?

**উত্তর :** জীবনে প্রথম হওয়াটা লক্ষ্য, আর ক্লাসে প্রথম হওয়াটা উপলক্ষ। ক্লাসে প্রথম হলে জীবনে প্রথম হওয়াটা সহজ। এটাকে বাদ দেয়া যাবে না।

**প্রশ্ন :** আমি ব্যবসায় বিভাগের ছাত্রী। আমার জীবনের লক্ষ্য বা মনছবি কী হওয়া উচিত?

**উত্তর :** লক্ষ্য হওয়া উচিত, আমি যে সাবজেক্ট-এ যাই, যা-ই আমি পড়ি, যা-ই আমি করি, আমি যেন আমার এ জ্ঞানটাকে মানুষের সেবায় কাজে লাগাতে পারি। কারণ আপনি যদি মানুষের সেবা, জাতির সেবা, দেশের সেবায় আপনার জ্ঞানকে কাজে লাগান, আপনার কোনোকিছুর অভাব হবে না। অর্থ যেমন পাবেন, সেই সাথে পাবেন বিত্ত-খ্যাতি-প্রতিপত্তি।

আমরা যদি এ পি জে আব্দুল কালামের কথা ধরি, দেখবো যে, তার জীবনের লক্ষ্য ছিলো বিজ্ঞানী হয়ে দেশের সেবায় সে জ্ঞানটাকে কাজে লাগানো। উনি বিদেশে যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হতে পারতেন,

বিদেশি গবেষণাগারে গিয়ে গবেষণা করতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি চান নি, শুধু দেশের সেবা করতে চেয়েছেন। এ কারণে তার দেশ এবং জাতি তার আন্তরিক সেবার প্রতিদান দিয়েছে তাকে দেশের রাষ্ট্রপতি করে। একজন মাঝির ছেলে হয়েও ভারতের ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে থাকবেন। কিন্তু তার সমসাময়িক তো আরো কয়েক হাজার বিজ্ঞানী ছিলেন, তাদের কথা কি ভারতের লোকজন স্মরণ করবে? করবে না, কারণ তারা হয়তো বিদেশে গিয়ে বড় লেকচারার বা গবেষক হয়েছেন, দেশকে কিছু দিতে চান নি।

অতএব জীবনের লক্ষ্যটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনি আগে স্থির করুন যে, আপনি জীবন থেকে কী চান। আপনার লক্ষ্য যদি হয় মোটা বেতনের চাকরি-বাড়ি-গাড়ি-টাকা, তাহলে বুঝতে হবে আপনি পণ্যদাসত্বের মরীচিকার পেছনে ছুটছেন। আর উপার্জনই কিন্তু সব নয়। একজন মানুষ ৫০ হাজার টাকা উপার্জন করলো, কিন্তু মাসে তার খরচ হয়ে গেল ৬০ হাজার টাকা, ব্যালেন্স কী হলো? মাইনাস ১০ হাজার টাকা। যেমন, এক এমবিএ-র কথা বলি। মাসে বেতন পায় ৪০ হাজার টাকা। কিন্তু তার নিজের চোখের চিকিৎসার জন্যে ৬০ হাজার টাকা লাগবে। সে টাকা তাকে নিতে হচ্ছে তার মায়ের কাছ থেকে। তিন বছর চাকরি করার পরেও যদি তার এ অবস্থা হয়, তার মানে কী?

আর একজন মানুষ যদি ১০ হাজার টাকা উপার্জন করে এক হাজার টাকা জমাতে পারে তাহলে কী হলো? প্লাস ওয়ান থাউজেন্ড, সে কিন্তু ঋণী নয়, সে স্বাধীন। অতএব জীবন আসলে অনেক বড় এবং এটা একটাই। সেজন্যে আপনাকে এক জীবনেই প্রথম হতে হবে। মেধার বিকাশ ঘটতে হবে। আবার আপনি একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে নিজের মেধাকে সেবায় পরিণত করতে পারেন। সে অনুযায়ী মনছবি দেখুন।

**প্রশ্ন :** জীবনে প্রথম হওয়াটা একটু বুঝিয়ে বলবেন কি?

**উত্তর :** আসলে আমরা দেখেছি-ক্লাসে প্রথম হওয়া-এটি একটি লক্ষ্যের অংশ, একটি ক্ষুদ্র লক্ষ্য মাত্র। শুধুমাত্র ক্লাসে যারা প্রথম হয়েছে তাদের অধিকাংশই জীবনে প্রথম হতে পারে নি, ব্যর্থ হয়েছে। তাই আমাদেরকে জীবনে প্রথম হতে হবে। জীবনে যে প্রথম হয়েছে সে-ই আসলে সফল।

আর এ শিক্ষা আমাদের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাওয়া যায় না। কারণ জীবনে প্রথম হওয়ার জন্যে পাঠ্যপুস্তক বিশেষ কায়দায় মুখস্থ করা

যথেষ্ট নয়। জীবনে প্রথম হওয়ার জন্যে আরো কিছু গুণাবলি এবং নিজের আরো কিছু মেধা বিকশিত করা প্রয়োজন।

আর এটা হচ্ছে বাস্তবতা যে, ক্লাসে প্রথম হলেও জীবনে যদি আপনি প্রথম হতে না পারেন, তাহলে আপনার এ প্রাপ্তি অর্থহীন হয়ে যাবে। জীবনে প্রথম হওয়ার সূত্রটাকে আমরা এভাবে দেখতে পারি :

জীবনে ১ম = দক্ষতা + সততা + মানবিকতা + সম্ভবদ্বিতা > আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু > সবার আশ্রয় ও ভরসাস্থল।

আর জীবনে প্রথম হওয়ার মনছবিকে যারা লালন করবে তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব দেবে-শুধু দেশে নয়, বিদেশেও। আপনারা দেখুন, সারা বিশ্বে এখন একটি স্থবিরতা চলছে। নেতৃত্বের সংকট চলছে। ৫০ বছর আগে যে মাপের নেতারা ছিলেন, বিশ বছর আগেও যে মাপের নেতারা ছিলেন সে মাপের নেতা এখন আর সারা বিশ্বে নেই। সেই ধরনের নেতার অভ্যুদয় হবে আগামী ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে। প্রস্তুতি নিলে, নিজের মেধাকে বিকশিত করলে সেই মাপের নেতা হতে পারবেন আপনারাই।

**প্রশ্ন :** পড়ালেখায় বার বার রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে কিন্তু আমিও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এদিকে আমার বন্ধুবান্ধবরা কেউ ব্যবসায় কেউ চাকরিতে যুক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে আমার কী করা উচিত?

**উত্তর :** আপনার জীবনের লক্ষ্যটা কী এটা গুরুত্বপূর্ণ। লেখাপড়ার ফল এখন খারাপ হচ্ছে। কিন্তু ভালো করে তারপর কী করবেন? এজন্যে আপনার পেশাগত লক্ষ্যটা আপনার কাছে পরিষ্কার থাকা উচিত। তাহলে আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যে, আপনার কী করা উচিত।

আর রেজাল্ট খারাপ হলেই যে আপনি জীবনে সফল হতে পারবেন না, তা নয়। অনেক মানুষই আছেন যারা হয়তো একাডেমিক জীবনে ব্যর্থ। কিন্তু জীবনে সফল। সম্প্রতি আমেরিকার ফোর্বস সাময়িকী বিশ্বসেরা ১২৫ ধনীর তালিকা প্রকাশ করেছিলো। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এদের ৭৩ জনেরই কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। এদের মধ্যে বিল গেটস, মাইকেল ডেল, রিচার্ড ব্র্যানসনের মতো বিশ্বসেরা প্রযুক্তিবিদও আছেন।

**প্রশ্ন :** পরীক্ষায় ভালো করার জন্যে পড়াটাই কি সব? এছাড়া বাড়তি কিছু জানার কি কোনো দরকার নেই?

**উত্তর :** আসলে আমরা পড়াশোনাকে দুভাগে ভাগ করতে পারি। একটি হলো জ্ঞানার্জন, আরেকটি পরীক্ষায় ভালো করা। এ দুই পড়াশোনা কিন্তু দুধরনের। জ্ঞানার্জনের জন্যে একভাবে আর পরীক্ষায় ভালো করার জন্যে আরেকভাবে পড়াশোনা করতে হবে।

যেমন, পরীক্ষায় ভালো করার জন্যে প্রয়োজন বিশেষ কিছু কায়দায় লেখাপড়া করা। কিন্তু জ্ঞানার্জনের জন্যে প্রয়োজন জীবনের পাঠ গ্রহণ। এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও একজন মানুষ জ্ঞানী হতে পারেন। আর আমাদের জন্যে দুটিই প্রয়োজন। পরীক্ষায় ভালো করতে হবে। জ্ঞানার্জনেও আগ্রহী হতে হবে। নবীজী (স)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো—সবচেয়ে ভালো ও বড় দান কী? তিনি বললেন, জ্ঞান অর্জন কর ও দান কর। এটিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় দান। এর চেয়ে বড় দান আর কিছুই নেই।

আমাদের প্রিয় নবী (স) জ্ঞানকে যত গুরুত্ব দিয়েছেন পৃথিবীতে আর কেউ জ্ঞানকে এত গুরুত্ব দেন নি। আমরা অনেক সময় মনে করি—শহীদ হতে পারলেই বেহেশতে চলে যাবো অথচ নবীজী (স) বলেছেন, জ্ঞানী ব্যক্তির কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র। কারণ জ্ঞান যার হাতে থাকে নেতৃত্ব তার হাতেই থাকে। আমরা আজ পাশ্চাত্যের দিকে তাকিয়ে আছি কেন? কারণ বৈষয়িক জ্ঞান ও প্রযুক্তি তাদের হাতে।

একসময় জ্ঞান ও প্রযুক্তি এশিয়াতে ছিলো, এশিয়া তখন সারা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। মাঝে নিয়ন্ত্রণ চলে গেল পাশ্চাত্যের হাতে। এখন কিন্তু আবার উল্টো হাওয়া বইতে শুরু করেছে—সুপার পাওয়ার আমেরিকা কিন্তু জ্ঞানের দিক থেকে দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়ারও একই অবস্থা। তারা এখন এশিয়া থেকে মেধা নিয়ে যাচ্ছে। এশিয়ার যত ভালো ছাত্রছাত্রী আছে তাদের আমেরিকা স্কলারশিপ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ থেকে কী প্রমাণ হয়? তাদের জ্ঞানের দীনতা! তারা একসময় শ্রমিক নিয়ে যেত, এখন তারা নিজেরাই শ্রমিক হচ্ছে।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, ঋণ করে কেউ কখনো বড়লোক হতে পারে না; তেমনি ধার করেও কেউ বেশিদিন কর্তৃত্ব করতে পারে না। পাশ্চাত্যের পতন শুরু হয়েছে আর আমাদের উত্থানের সময় এসেছে। আমাদের উত্থানের জন্যে প্রয়োজন হলো মেধাকে বিকশিত করা।

মানুষ সবসময়ই জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত। পৃথিবীতে সবসময় মেধা রাজত্ব করে। মেধাকে যত বিকশিত করবেন তত নেতৃত্ব আপনার হাতে আসবে। আর এজন্যে প্রথম যেটি প্রয়োজন তা হলো জ্ঞানার্জন।



এখন প্রশ্ন হতে পারে, আমরা প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার প্রতি এত জোর দিচ্ছি কেন? কারণ শিক্ষাজীবনে এগিয়ে থাকলে জীবনে প্রথম হওয়ার পথ হয় অনেক সহজ। যারা প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ায় ভালো রেজাল্টের মাধ্যমে স্বীকৃতি পায় তারা জীবনে প্রথম হওয়ার পথে অর্ধেক এগিয়ে যায়। কারণ জ্ঞান ও তথ্য একজন মানুষের চলার পথকে অনেক সহজ করে, ত্বরান্বিত করে। অবশ্য এ জ্ঞান শুধু পুঁথিগত জ্ঞান নয়। ক্লাসে যে প্রথম হয় তার পক্ষে এ জ্ঞান অর্জনের সুযোগ স্বাভাবিকভাবেই বেশি।

**প্রশ্ন :** ২০১১ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় ৩.৩০ পেয়েছি কিন্তু '১২-তে আবার এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছি গোল্ডেন এ-প্লাস পাওয়ার উদ্দেশ্যে। এটা কি অলীক কল্পনার মধ্যে পড়ে? আমি কি গোল্ডেন এ পাওয়ার চিন্তা বাদ দেবো?  
[বিশেষ দ্রষ্টব্য : পরীক্ষার সময় শারীরিক-মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলাম]

**উত্তর :** যেটা বাস্তব, যেখানে কয়েক হাজার এ-প্লাস পাচ্ছে, সেটা কেন আপনি অলীক মনে করবেন? পরিশ্রম করলে যেটা অর্জন করা সম্ভব সেটা অলীক কল্পনা নয়, সেটা সবসময় বাস্তবতা। যদি আপনি এ-প্লাস পাওয়ার জন্যে নিয়মিত পড়াশোনা করেন, পরিশ্রম করেন, তবে এটা হচ্ছে বাস্তবতা।

**প্রশ্ন :** অনার্সে এসে রেজাল্ট খুব একটা ভালো হলো না। এটাকে গ্রাউন্ড জিরো ধরে ইচ্ছা হলো মাস্টার্সে খুব ভালো একটা ইউনিভার্সিটি থেকে ভালো একটা রেজাল্ট করবো। এদিকে ভালো ভার্সিটিতে মাস্টার্সে ভর্তি হতে হলে অনার্সে ভালো রেজাল্ট দরকার। সেক্ষেত্রে কী করা উচিত?

**উত্তর :** আসলে এটা এক ধরনের বোকামি! আপনাকে বাস্তবানুগ হতে হবে, বোকার মতো চাইলে হবে না। যেখানে রেজাল্ট ভালো ইউনিভার্সিটিতে ঢোকান অনুকূল নয়, সেখানে আপনি কীভাবে চাইবেন যে, ভালো ভার্সিটিতে পড়ালেখা করবেন? আপনাকে যেকোনো ভার্সিটিতে ঢুকতে হবে এবং সেখান থেকেই রেজাল্ট ভালো করতে হবে।

**প্রশ্ন :** ভালো ছাত্রদের কিছু খ্যাতির বিড়ম্বনা আছে। তারা কীভাবে এটা রিসিভ করবে? এ সময় কিছু সমস্যা পড়তে হয়। এটা মেইনটেইন করার উপায় বলে দিন।

**উত্তর :** খ্যাতির বিড়ম্বনা বলে কিছু নেই। এটাও এক ধরনের ভান, বিশেষত ছাত্র অবস্থায় খ্যাতি পেলে কেউ বিড়ম্বিত বোধ করে না, ভেতরটা বেশ স্ফীত হয়ে ওঠে যে, অমুকে অটোগ্রাফের জন্যে আসছে, অমুকে ভাইয়া/ আপা বলছে। সবাই পছন্দ করে। এক আধজন ব্যতিক্রম হয়তো থাকতে পারেন। এটাকে সহজভাবে গ্রহণ করবেন।

আপনি ভালো হয়েছেন, আপনাকে সবাই চিনছে তার মানে কী? আপনাকে তারা গুরুত্ব দিচ্ছে এবং একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট হিসেবে আপনার তখন করণীয় হচ্ছে—ভালো ছাত্র হওয়ার জন্যে তাদেরকে উৎসাহিত করা। তাহলে দেখবেন যে, এ খ্যাতিটা বিড়ম্বনা হচ্ছে না, খ্যাতিটা আপনার জন্যে আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে।

আপনার তখন সঙ্গী বাড়তে থাকবে, অনুসারী বাড়তে থাকবে। আসলে ভক্ত এবং অনুসারীর মধ্যে পার্থক্য আছে। ভক্তরা স্টারকে নাচায়, আর অনুসারীরা স্টারকে অনুসরণ করে। তারা আপনার অনুসারী হবে যদি আপনার চারপাশে যারা আসছে তাদের প্রতি আপনি একটু মমতা দেন, তাদেরকে যদি একটু উদ্বুদ্ধ করেন। তারাও যে আপনার মতো খ্যাতিমান হতে পারে, ভালো ছাত্র হতে পারে এটাকে যদি আপনি বোঝান।

**প্রশ্ন :** সারাক্ষণই পড়াশোনা নিয়ে এত বেশি টেনশনে থাকি যে, মাঝে মাঝে নিজেকে খুব স্ট্রেসড মনে হয়। এ সময় পড়াও ভালো হয় না। সমাধান কী?

**উত্তর :** সারাক্ষণ পড়াশোনা নিয়ে চিন্তা করে নিজের ওপর মাত্রাতিরিক্ত স্ট্রেস নেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল তাদের এক গবেষণায় দেখতে পায়, স্কুল-কলেজের পড়াশোনা একজন মানুষের দক্ষতার মাত্র ১৫% তৈরি করে। বাকি ৮৫%-ই তাকে শিখতে হয় জীবনের স্কুল থেকে।

যেমন বিল গেটস। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শেষ না করলেও তিনি হয়েছিলেন মাইক্রোসফটের কর্ণধার। হয়েছেন বিশ্বের এক নম্বর ধনী। কাজেই একটা পরীক্ষায় একটু কম ভালো হলেই আপনার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে না। একজন অনন্য শিক্ষার্থী পড়বেন জ্ঞানের জন্যে। নম্বর হবে তার বাই-প্রোডাক্ট।

অন্যের সাথে প্রতিযোগিতার কোনো শেষ নেই। আপনি যত ভালো ফলাফলই করুন, সবসময়ই কেউ না কেউ কোনো না কোনোভাবে আপনার চেয়ে এগিয়ে থাকবে। তাই প্রতিযোগিতায় নামুন—অন্যের সাথে নয়, নিজের

সাথে। ফার্স্ট টার্মে ৭০% নম্বর পেলে সেকেন্ড টার্মে চেষ্টা করুন এর চেয়ে বেশি পেতে। তাহলেই আপনি স্ট্রেসকে এড়াতে পারবেন।

‘এত অল্প সময়ে এত পড়া পড়বো কীভাবে’ ইত্যাদি ভেবে খামোখা স্ট্রেসড না হয়ে কাগজ-কলম নিয়ে বসে যান। প্ল্যান করুন কত সময় আছে, আর পড়া বাকি কতটা? তারপরই পড়তে বসুন। যত এগুতে থাকবেন তত স্ট্রেস কমতে থাকবে। মনে রাখবেন দীর্ঘসূত্রিতা স্ট্রেসের একটা বড় কারণ।

জীবনের জন্যে পড়াশোনা, পড়াশোনার জন্যে জীবন নয়। তাই পড়াশোনার পাশাপাশি বাস্তব জীবনের সাথেও সম্পৃক্ত থাকুন। সুযোগমতো বাসায় মাকে সাহায্য করুন, কাঁচাবাজারের ভারটা নিজেই নিয়ে নিন। সপ্তাহে অন্তত একদিন ফাউন্ডেশনে সময় দিন। মাটির ব্যাংক বা হিলিংয়ের কথা একজন বন্ধুকে বলুন। দেখবেন স্ট্রেসের প্রভাব কমে গেছে।

## উচ্চশিক্ষা ॥ কী পড়বেন, কোথায় পড়বেন

**প্রশ্ন :** আমি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করতে চাই, কিন্তু আমার স্কোর খুব ভালো না। আমি এ বিষয়ে কীভাবে সাফল্য পেতে পারি?

**উত্তর :** আসলে নর্থ সাউথ ভার্সিটিতে পড়া খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। কোনো ভার্সিটিতে পড়াটাই গুরুত্বপূর্ণ নয়, যদি আপনি রেজাল্ট ভালো না করেন। অতএব ভার্সিটি নয় বরং পড়াশোনার দিকে মন দিতে হবে।

**প্রশ্ন :** আমি ভবিষ্যতে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করতে চাই। এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

**উত্তর :** এখন আইন বিষয়ে কেন পড়াশোনা করতে চান এটা আপনার কাছে পরিষ্কার থাকতে হবে। আইন বিষয়ে পড়াশোনা করে কী হবে? আইনজীবী হবেন অথবা বিচারক হবেন। কী হতে চান সেটার ওপর নির্ভর করছে আইন বিষয়ে পড়বেন কি না। মানুষের উপকারে আইনের জ্ঞানকে কাজে লাগালে, ভালো কাজ করলে ঠিক আছে। আপনি আইন পড়তে পারেন।

**প্রশ্ন :** আমি ছাত্রত্বকেই ক্যারিয়ার হিসেবে ধরে নিয়েছি। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘খ’ ইউনিটে পরীক্ষা দিতে চাই। কিন্তু ইংলিশে আমার ভয়।

**উত্তর :** কিছু না, ইংলিশটা শিখে ফেললেই হলো। আর এখন তো ছাত্রত্বই ক্যারিয়ার। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হবে। পাশ করতে হবে, তারপর অন্য ক্যারিয়ারে যাবেন।

**প্রশ্ন :** আপনি একবার বলেছেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের কোনো ভ্যালু নেই। আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই বিষয়ে এমএ করেছি। এটুকু নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, বর্তমান যুগের শাসকদের থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গি আমার যথেষ্ট উন্নত। আমি এই ব্যাপারে আপনার মন্তব্য আশা করি।

**উত্তর :** আপনি যদি তা-ই মনে করেন তাহলে তো আপনার হতাশ হওয়া উচিত নয়। এটা খুব ভালো। তবে শুধু ইসলামের ইতিহাস পড়ে নয়, ইসলামের ইতিহাসের বাইরেও আরো অনেক কিছু পড়ে আপনার মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে। কারণ সাধারণভাবে এখানে যা পড়ানো হয়, যেভাবে পড়ানো হয় এসব জ্ঞান কোনো কাজে আসে না। এবং কোনো বিষয়ের ওপর এই দখল, জ্ঞানের এই গভীরতা অন্য বিষয়ের ছাত্র হয়েও অর্জন করা যেতে পারে।

আমরা বলছি ব্রাহ্ম দৃষ্টিভঙ্গির কথা, অন্য কোথাও ভর্তির সুযোগ না পেয়ে এখানে ভর্তি হলাম যাতে লোকজনকে বলতে পারবো যে, আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি। আর পড়াশোনা না করে পরীক্ষার আগে আগে কিছু নোটস কিনে মুখস্থ করলাম, পরীক্ষায় পাস করলাম। আমরা এই ব্যবস্থার নিন্দা করি। আমরা বলি সাবজেক্ট কোনোটাই খারাপ নয় যদি আপনি সেই সাবজেক্টে এক্সপার্ট হতে পারেন।

কিন্তু ইসলামের ইতিহাস পড়তে হবে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় আমার নামটা থাকতে পারে—এটা কোনো লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় নাম ছিলো না এমন বহু মানুষ ইতিহাসে বিখ্যাত হয়েছেন। তাদের নাম ইতিহাসে যুক্ত হয়েছে।

আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন কিন্তু অখ্যাত-অজ্ঞাত থেকেই পৃথিবী থেকে চলে গেছেন—এমন অনেক মানুষই আছেন। অতএব হতাশ হওয়ার কিছু নেই। যদি দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক হয় এবং বর্তমান যুগের শাসকদের চেয়ে শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার জ্ঞান আরো প্রগাঢ় থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে ভালো করবেন।

## প্রসঙ্গ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি

**প্রশ্ন :** আপনি বলেন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়ছে তাদের কোনো আশা নেই। তাহলে আমরা যারা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি আমাদের কী হবে? আমাদের জন্যে কি কোনো আশার বাণী নেই?

**উত্তর :** অধিকাংশ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে আশার বাণী শোনাতে পারলে আমাদেরও ভালো লাগতো। কিন্তু সেটা পারছি না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পারলে অধিকাংশ ছেলে-মেয়ে মা-বাবাকে বাধ্য করে তাদেরকে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ানোর জন্যে। মা-বাবা অনেক কষ্টে অর্থ সংগ্রহ করে পড়ান। কিন্তু এই অর্থ এবং সময় ব্যয় করায় কোনো লাভ নেই।

আসলে কোনো কোনো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ার চেয়ে ডিগ্রি পাস কোর্স পড়াও অনেক ভালো। কারণ সাধারণ কলেজে ডিগ্রি পাস করলে অন্তত ছোটখাটো একটা চাকরি পাবেন। আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ পাশ করে চাকরি নিতে গেলে চাকরিদাতা প্রথমই মনে করবেন—এ তো থাকবে না। তাই একে রাখার দরকার নেই। আবার যারা প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ পড়ছে তাদের সাথে আপনি পারবেন না।

কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর সবগুলোতে শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্যে, ‘আমি অমুক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি’ বলতে পারার জন্যে পড়ছে ছেলে-মেয়েরা। এখন ঢাকাতেই প্রায় ৫০টির মতো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। কিছুদিন পরে এগুলোর সংখ্যা কেজি স্কুলের মতো হয়ে যাবে। হাতে গোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি চাকরির ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। বাকিগুলোতে পড়া পুরোপুরি অর্থহীন।

কাজেই যারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন, হয়তো সেকেন্ড ইয়ার বা থার্ড ইয়ারে আছেন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত যেখানে পড়ছেন, সেখান থেকেই আর কী কী করা যায়। হয়তো ওরা পড়াবে না। কিন্তু আপনার দৃষ্টিভঙ্গি হবে—এই তথ্য এই প্রযুক্তিজ্ঞান আমাকেই অর্জন করতে হবে—নিজের উদ্যোগে, নিজের চেষ্টায়। আর এখন মুক্ত তথ্যপ্রবাহের এ যুগে নানান ধরনের নতুন জ্ঞান শেখার সুযোগ সবারই হাতের নাগালে। এই মনোভাব নিয়ে যদি আপনি পড়েন, তাহলেই আপনি ভালো ফলাফল করতে পারবেন এবং যোগ্য হয়ে উঠবেন।

## বিদেশে পড়তে যাওয়া

**প্রশ্ন :** অনার্স পড়েই চাকরিতে ঢুকে পড়েছি, ভালোও করছি। কিন্তু আমার দেশের বাইরে মাস্টার্স করার স্বপ্ন বহুদিনের। সব যোগ্যতা থাকার পরও দুবার পিছিয়ে আসতে হয়েছে নিজের রক্ত সম্পর্কের কারো লাখ লাখ টাকা না থাকার কারণে। আমি স্কলারশিপও পেয়েছি। কিন্তু বাকি টাকাটা ধার করতে হবে। যদিও জানি ঋণ ভালো সমাধান নয়। আমি এখন কী করবো?

**উত্তর :** আপনি অনার্স করেই চাকরিতে ঢুকেছেন। ভালোও করছেন। এ অবস্থায় কেন মাস্টার্স করবেন—সেটা প্রথমে পরিস্কার হওয়া দরকার। তাও আবার ঋণ করে বিদেশে গিয়ে! এটা কি আপনার চাকরির কোনো প্রয়োজনে? আপনার প্রশ্ন পড়ে কিন্তু তেমনটা মনে হচ্ছে না।

আসলে এটা এক ধরনের হুজুগ যে, আমি বিদেশে গিয়ে মাস্টার্স করবো! অনেকে মনে করে বিদেশ থেকে মাস্টার্স করে এলেই বোধ হয় অনেক টাকা বেতনের চাকরি পাওয়া যাবে। এটা খুবই ভুল ধারণা। মাঝখান থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ করে আপনি বিপদে পড়বেন। কাজেই এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আপনাকে ঠান্ডা মাথায় আরো ভাবতে হবে। শুধু মাস্টার্স করার জন্যে ঋণ করে বিদেশে যাওয়াটা একটা আহাম্মকি ছাড়া আর কিছু হবে না। আর আপনি যেহেতু ইতোমধ্যে পেশাজীবনে প্রবেশ করেছেন, দেশেই আপনি মাস্টার্স করে নিতে পারেন।

আর হাঁ, পুরো স্কলারশিপ পেলে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে বিদেশে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ঋণ করে নয়। ঋণ করে যারাই উচ্চশিক্ষার জন্যে বিদেশে গেছেন, পরবর্তীতে তাদের অনুশোচনা করতে হয়েছে।

**প্রশ্ন :** আমার মেধা মধ্যম মানের, আর্থিক সঙ্গতিও তেমন নেই, কিন্তু দেশের বাইরের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে চাই।

**উত্তর :** আপনার মেধা মধ্যম মানের, আর্থিক সঙ্গতিও তেমন নেই, তাহলে বিদেশের উচ্চশিক্ষা দিয়ে কী হবে? আপনার দেশের রেজাল্ট যদি ভালো হতো, তাহলেও ঠিক ছিলো যে, বিদেশে গিয়ে আমি একটা পিএইচডি করে এলাম। আপনি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক হতেন তাহলে এতে হয়তো আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর হতে সুবিধা হতো। কিন্তু আপনার দেশেই

রেজাল্ট খারাপ, আর্থিক সঙ্কতি নেই, বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে কী হবে?

আসলে এগুলো হচ্ছে কিছু কিছু অবিদ্যা, যা আমাদের মাথার মধ্যে ঢুকে আছে। এই অবিদ্যাগুলো থেকে মুক্ত থাকতে হবে। বিদেশে আমাদের চেয়ে ভালো পড়ায় না। সেখানে হাই-বাই অনেক কিছু আপনি শিখতে পারবেন। কিন্তু পড়ার মান আমাদের চেয়ে ভালো না।

**প্রশ্ন :** সবসময় আমার ইচ্ছে ইংল্যান্ডে এমবিএ করার। কিন্তু টিউশন ফি বেশি হওয়ায় আমাকে অল্টারনেটিভ চিন্তা করতে হচ্ছে। কীভাবে আমি এ লক্ষ্যে অবিচল থাকবো?

**উত্তর :** ইংল্যান্ডে গিয়ে এমবিএ করা—এটা কোনো লক্ষ্য হতে পারে না। ওখানে এমবিএ করা আর বাংলাদেশে এমবিএ করার মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। জীবনে প্রথম হওয়ার জন্যে এটা আবশ্যিক নয়।

**প্রশ্ন :** আমার বিবিএ পড়া শেষ হয়েছে কিছুদিন হলো, আমি এখন বিদেশে যেতে আগ্রহী। আমার ইচ্ছে ছিলো এমবিএ-র জন্য ইউকে যাবো এবং সেখানে এমবিএ শেষে চাকরি করবো। কিন্তু এখন বাংলাদেশ থেকে স্টুডেন্টরা যেভাবে সেখানে এমবিএ করতে যাচ্ছে তাতে এর মান পড়ে যায় কি না বুঝতে পারছি না। এখন সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না—ইউকে, অস্ট্রেলিয়া বা কানাডার মধ্যে কোথায় যাওয়ার চেষ্টা করা আমার জন্যে কল্যাণকর হবে।

**উত্তর :** আসলে একেক সময় একেকটা ক্রেজ শুরু হয়। ইংল্যান্ডে, ইউরোপে গিয়ে এমবিএ করা এবং এরপরে সাধারণ চাকরি পাওয়াও খুব কঠিন হয়ে যায়। কারণ এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই হচ্ছে বাণিজ্যনির্ভর। এগুলোর অধিকাংশের ডিগ্রিরই কোনো মূল্য নেই। দ্বিতীয়ত, ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করতে যাওয়ার জন্যে এত বিজ্ঞাপন দেয়ার কারণ তাদের এখন অর্থনৈতিক মন্দা চলছে। আপনি এক বছরের যে কোর্স ফি দিলেন এটাই তাদের লাভ। তারাও জানে যে, আপনি এখানে পড়তে আসছেন না, চাকরি করতে আসছেন। আপনি পড়াশোনাও করবেন না আর ওখানে গিয়ে কোনো চাকরিও পাবেন না। এখন ইংল্যান্ডে অড জব পাওয়াও মুশকিল। বাঙালিদের অধিকাংশই যারা যাচ্ছে তাদের থাকার জায়গা নেই, মসজিদে থাকে এবং রাত্রে পার্কের বেঞ্চে ঘুমায়। উপার্জনের জন্যে কোনো কাজ নেই। অতএব

সত্যিকারের পড়াশোনার জন্যে যদি যান, যদি আপনার পরিবারের সামর্থ্য থাকে, আপনি ভালো ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনার জন্যে যেতে পারেন। কিন্তু ওখানে চাকরি করে পড়াশোনা করবেন—এ উদ্দেশ্যে না যাওয়াই ভালো। এর চেয়ে ঐ টাকা দিয়ে দেশেই অনেক ভালো কিছু করতে পারবেন।

## ভালো জায়গায় ভর্তি হতে না পারলে

**প্রশ্ন :** আমি এ বছর এইচএসসি পাশ করেছি। বেশ কটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েও প্রথমসারির বিষয় পাই নি। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ইচ্ছা আমার বহুদিনের। তাহলে কি এখন যেকোনো বিষয়ে ভর্তি হয়ে যাবো নাকি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবো?

**উত্তর :** যেকোনো মূল্যে ‘অমুক বিশ্ববিদ্যালয়ে’ পড়তে হবে—এটা ছাত্রছাত্রীদের জীবনের একটা বড় অবিদ্যা। কারণ সত্যিকারের জ্ঞানার্জনের জন্যে না হয়ে যদি ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি’—শুধু এই গর্বের জন্যে যেকোনো একটি বিষয়ে ভর্তি হতে হবে—এ দৃষ্টিভঙ্গি কোনো শিক্ষার্থীর থাকে, তাহলে এই লেখাপড়া তার জীবনে কোনো কাজে লাগবে না।

আবার যদি প্রথম হতে পারেন, তাহলে নৃবিজ্ঞানের মতো বিষয়ে লেখাপড়া করে কৃতী ছাত্রী হিসেবে বিদেশের মাটিতে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এমন উদাহরণও আছে। নিজের পড়াশোনা বা পেশার বিষয় বাণিজ্য হলেও ইতিহাসে গভীর জ্ঞানের কারণে জনপ্রিয় বক্তা হিসেবে সমাদৃত হয়েছেন এমন ব্যক্তিও রয়েছেন।

কাজেই নিজের বিষয়কে ভালবাসতে না পারলে শুধু কোনোরকমে পাশ করার মনোবৃত্তি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে কোনো লাভ নেই। তার চেয়ে পাস কোর্সে ভর্তি হওয়া অনেক ভালো। আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে বলা যায়, দু’একটি ছাড়া অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় একেকটি বড় আকারের কোচিং সেন্টার ছাড়া আর কিছুই নয়। বিপুল অর্থের তুলনায় এখানে যে লেখাপড়া, শিক্ষা উপাদান, অবকাঠামো এবং শিক্ষক মান রয়েছে তার বিচারে এগুলো অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত হওয়ার উপযুক্ত নয়। এখান থেকে ডিগ্রি নিয়ে পরবর্তীতে অনেক ক্ষেত্রেই ছাত্রছাত্রীরা চাকরির বাজারে ব্যর্থ হয়।

তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে না পড়লে জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে এ দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ



করুন এবং যে বিষয়েই পড়েন না কেন সে বিষয়েই প্রথম হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে চেষ্টা করুন। দেখবেন, আপনি ব্যতিক্রমী হিসেবে সফল হবেন।

**প্রশ্ন :** কাক্সিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারি নি। অথচ এটাই ছিলো আমার মনছবি। তাই গত তিন মাস ধরে মনছবি দেখছি না। এখন আমি লক্ষ্যহীন। কী করবো?

**উত্তর :** লক্ষ্যহীন হয়ে তো কোনো লাভ হয় নি বরং নিজেকে আরো পিছিয়ে ফেলেছেন। আসলে মনছবি বর্ণাধারার মতো এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই এতে আমি কীভাবে পৌছবো এটা সবসময় আমার নির্ধারিত পথের ওপর নির্ভর করে না। ফলে সাময়িক ব্যর্থতা এলেও তাতে নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। হয়তো এ ব্যর্থতাই আপনাকে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু। জন্মেছিলেন ময়মনসিংহে। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বিএ করার পর মেডিসিন নিয়ে পড়তে যান বিলেতে। কিন্তু অসুস্থতার কারণে এক বছর পড়েও ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। দেশে ফিরে শুরু করেন অধ্যাপনা। কিন্তু আবারো বাধা। প্রেসিডেন্সি কলেজে তখনকার নিয়ম ছিলো বাঙালি হলে তার বেতন হবে ইংরেজ অধ্যাপকের বেতনের তিন ভাগের দুই ভাগ। আর নতুন যোগদান করেছেন বলে জগদীশের বেতন হলো মাত্র এক ভাগ।

এ বৈষম্যের প্রতিবাদে টানা তিনটি বছর জগদীশ চন্দ্র বসু কলেজ থেকে কোনো বেতন নেন নি। শেষ পর্যন্ত তার ব্যক্তিত্বের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হলো কর্তৃপক্ষ। নিয়ম তো পাল্টালোই আর চাকরিতে যোগদানের তারিখ থেকে পুরো তিন বছরের বেতন পুরোপুরি বুঝিয়ে দিলো তাকে। বেতার যন্ত্র, গাছের প্রাণ ইত্যাদি আবিষ্কারসহ আধুনিক সভ্যতায় তার অবদান অনেক। মেডিকেল স্কুল থেকে ঝরে না পড়লে আজ আমরা বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুকে না পেয়ে পেতাম জনৈক ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র বসুকে!

অতএব বিকল্প পথ খুঁজে বের করুন। কাক্সিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেন নি তো কী হয়েছে? ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়েছে তারা সবাই কি ফাস্ট হয়েছে? সবাই জীবনে প্রথম হয়েছে? নিশ্চয়ই না। এমন অনেকে আছে যারা ফেল করেছে, খারাপ রেজাল্ট করেছে। কারণ হয়তো তারা সাময়িক সাফল্যের গর্বে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। অতএব হতাশায় ভোগার কিছু নেই। মনছবি বাস্তবায়নের পথে কোনো পদক্ষেপ ব্যর্থ হলেও শোকরগোজার

থাকবেন। কারণ সেই না হওয়াটাই হয়তো আপনার মনছবিকে আরো ত্বরান্বিত করবে।

**প্রশ্ন :** ফাউন্ডেশনে শুনে এসেছি, আনন্দ নিয়ে পড়া যায় বা স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে কাজ করা যায়—এমন বিষয়ই বেছে নেয়া উচিত। আমার খুব আগ্রহ ছিলো সেনা কর্মকর্তা অথবা ডাক্তার হওয়ার। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ালো আমার কালার ব্লাইন্ডনেস। সেনাবাহিনীতে হলো না। জানলাম মেডিকেলও হবে না। এখন আমি কী করবো বুঝতে পারছি না। অন্য কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহ পাচ্ছি না। হয়তো ভর্তি পরীক্ষায় যেখানে টিকবো সেখানেই ভালো কোনো সাবজেক্টে ভর্তি হবো। কিন্তু আগ্রহ পাচ্ছি না একেবারেই।

**উত্তর :** সেনা কর্মকর্তা বা ডাক্তার হতে পারবেন না—এটা নিয়ে হতাশার কী আছে! কালার ব্লাইন্ডনেস আপনার বাধা নয়। বরং এটাই আপনার শক্তি হতে পারে যদি এ নিয়ে কোনো হীনম্মন্যতায় না ভোগেন। জীবন অনেক বড়। আগ্রহ সৃষ্টি করুন। এজন্যে অটোসাজেশন দিন। আগ্রহ সৃষ্টি হলে, প্রথম হতে পারলে প্রতিটি সাবজেক্টই ভালো।

ছোট্ট উদাহরণ দেই—রাজশাহীতে আমরা যখন কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করছিলাম, এক মেয়ে কোর্স শেষে আমাকে এসে বললো—তার খুব দুঃখ, কারণ সে কোনো ভালো সাবজেক্ট পায় নি, পেয়েছে নৃ-বিজ্ঞান। যেটাকে সে ‘মরা সাবজেক্ট’ বলে আখ্যায়িত করলো। আমি বললাম যে, মা, সাবজেক্ট মরা না, এটা খুব জীবন্ত সাবজেক্ট। এটাতে ফাস্ট হওয়ার চেষ্টা কর, রেজাল্ট ভালো কর এবং আজকে থেকে এই সাবজেক্টকে ভালবাসো যে, এটাতে আমি প্রথম হবো। এর প্রতি মনোযোগী হও। সে বললো যে, আপনি বলছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি বলছি।

সেই মেয়ে অনার্স থার্ড ইয়ারে পড়তে পড়তেই আমেরিকা থেকে একমাসের জন্যে ঘুরে এলো। কারণ তার সাবজেক্টে তখন সে ফাস্টক্লাস ফাস্ট। আমেরিকাতে এনথ্রোপলজির ওপরে সেমিনার হবে, সেরা ছাত্রী হিসেবে সে গেল সেখানে। সে অনার্সে ফাস্ট হলো, মাস্টার্সে ফাস্ট হলো এবং এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। অর্থাৎ কোনো সাবজেক্ট খারাপ না যদি আপনি ভালো হন। আর আপনি যদি খারাপ হন—সব সাবজেক্টে খারাপ।

আপনি এমবিএ-র মতো একটা ভালো সাবজেক্টে চান্স পেলেন, কিন্তু রেজাল্ট করলেন থার্ড ক্লাস নাইনথ। আপনি তো কেরানির চাকরিও পাবেন

না। পিয়ন হিসেবে কেউ আপনাকে নেবে না। আবার অফিসারও হতে পারবেন না।

অতএব সাবজেক্টটা কী এটা গুরুত্বপূর্ণ না, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আপনি সাবজেক্টটা ভালবাসেন কি না। আপনি যদি সাবজেক্টটাকে ভালবাসতে পারেন, যদি সাবজেক্টে মনোযোগ দিতে পারেন, যে সাবজেক্টই পড়েন আপনি ভালো করবেন। আপনি ঐটাতে বিশেষজ্ঞ হয়ে যান। যখনই কোনো কিছুতে আপনি বিশেষজ্ঞ হবেন, আপনাকে পেছন দিকে তাকাতে হবে না।

**প্রশ্ন :** আমি এসএসসি পরীক্ষা দেবো। একজন বলেছে, তুমি সব সাবজেক্টে ভালো করলেও ইংলিশে এ-প্লাস পাবে না। কিন্তু আমি ইংলিশে খারাপ না। আমি জানি এবং বিশ্বাস করি যে, আমি এ-প্লাস পাবো। কিন্তু তবুও হীনম্মন্যতায় ভুগছি। কী করবো?

**উত্তর :** এই হীনম্মন্যতাই হচ্ছে আপনার জন্যে ক্ষতিকর। কারণ হীনম্মন্যতা একটা সময় আপনার মধ্যে ভ্রান্ত বিশ্বাস সৃষ্টি করবে যা আপনার ব্যর্থতার কারণ হবে।

আসলে বিশ্বাস একটা মজার ব্যাপার। সফল মানুষ এবং ব্যর্থ মানুষ—দুয়েরই বিশ্বাস আছে। কিন্তু বিশ্বাসের প্যাটার্নটা একদম আলাদা। বিশ্বাস আসলে চিন্তার যোগাযোগ। যেমন ধরুন, আপনি যখন স্কুলে পড়তেন, পরীক্ষা এলেই জ্বর, মাথাব্যথা, পেটব্যথা, পাতলা পায়খানা বা অন্য কোনো না কোনো অসুখ দেখা দিতো। আপনার বাবা বললেন, পরীক্ষা এলেই দেখি তোমার অসুখ-বিসুখ হয়। আপনার প্রথম নিউরোকানেকশন তৈরি হলো।

মা হয়তো তখন বললেন, আমিও এরকম ছিলাম। ওষুধ খেয়ে ভাইভা দিতে যেতাম। আপনার ধারণাটা সমৃদ্ধ হলো, কারণ নিজেকে বোঝালেন যে, পারিবারিকভাবে আপনি হয়তো ব্যাপারটা পেয়েছেন। পরীক্ষা মিস করার পর মা যখন আপনাকে নিয়ে স্কুলে গেলেন, ক্লাসমেটরা বলতে লাগলো, তুমি পরীক্ষাকে ভয় পাও? উত্তরটা মনে মনেই দিলেন যে, হ্যাঁ, ভয় পাই। টিচার বললো, কি বাপু! পরীক্ষা এলেই দেখি খালি অসুখ-বিসুখ। আপনার মধ্যে বিশ্বাস জন্মালো যে, আপনার মধ্যে পরীক্ষাভীতি আছে। এরপর থেকে পরীক্ষা এলেই আপনি অস্থির হয়ে ওঠেন। কোনো না কোনোভাবে এড়াতে চান। অবশেষে অসুস্থ হয়ে পড়েন। বড় ক্লাসে উঠলেও পরীক্ষা মানেই আপনার কাছে মূর্তিমান আতঙ্ক। অর্থাৎ বিশ্বাসটা শূন্য থেকে আসে নি।

আপনার অভিজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিক প্রতিক্রিয়া, দৃষ্টিভঙ্গি, এ সবকিছুর একটা যোগাযোগের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে এ বিশ্বাস, ভ্রান্ত বিশ্বাস।

একজন মানুষ সফল হয় বা ব্যর্থ হয় তার বিশ্বাসের কারণে। মুক্ত বিশ্বাস যেমন তাকে সফল করে, তেমনি ভ্রান্ত বিশ্বাস তাকে শৃঙ্খলিত করে, পিছিয়ে দেয়। কাজেই কে কী বলছে না বলছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনি নিজে কী বিশ্বাস করছেন। আর নিজে যা বিশ্বাস করছেন—একজন কেন, শতজন বললেও তা দ্বারা প্রভাবিত হবেন না।

**প্রশ্ন :** ইচ্ছে ছিলো মেডিকেল পড়ে সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত হওয়ার। কিন্তু ০.৫ নম্বরের জন্যে ব্যর্থ হয়েছি। আবার শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং সেই লক্ষ্যেই পড়াশোনা শুরু করেছি। আমি ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হতে চাই। ২৫ বছর পর নিজেকে নিউরোসায়েন্টিস্টরূপে দেখতে চাই। আমি কি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি? মনছবি পূরণের যে আশা করছি, তা কি আমার পক্ষে সম্ভব?

**উত্তর :** অবশ্যই সম্ভব। আসলে পৃথিবীতে মানুষ যা পেরেছে এবং মানুষ যা পারবে তা কোনো কিছুই করা অসম্ভব নয়। আর এমন তো নয় যে, আপনার আগে আর কেউ মেডিকেল ভর্তি হয় নি, আপনি প্রথমবার হবেন। খোঁজ নিন, দেখবেন পরিচিত অনেকেই দ্বিতীয়বারে ভর্তি হতে পেরেছে। অতএব সিদ্ধান্তের ব্যাপারে নিজের ভেতর কোনো দ্বিধা থাকা উচিত না। ‘আমি কি পারবো? সিদ্ধান্তটা কি ঠিক হলো?’—এই দ্বিধা বা সংশয় মনছবির পথে বাধা সৃষ্টি করে দেয়।

অতএব সবসময় সিদ্ধান্ত নেবেন শতভাগ আত্মবিশ্বাসের সাথে। দ্বিধা, সংকোচ বা বিশ্বাসে কোনো ঘাটতি রাখবেন না। পরিশ্রমে কোনো ত্রুটি রাখবেন না। নিজের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখবেন, কোনো প্রতিকূলতাই যেন এ বিশ্বাসকে টলাতে না পারে। ইনশাআল্লাহ, আপনি অবশ্যই সফল হবেন।

**প্রশ্ন :** এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় আমার রেজাল্ট ভালো, কিন্তু ভালো জায়গায় ভর্তি হতে পারি নি। ফলে সবাই আমার ব্যর্থতা নিয়ে কথা বলে। দিন দিন আমি এতে প্রভাবিত হয়ে যাচ্ছি। এখন দৃষ্টিভঙ্গিটা কেমন হওয়া উচিত?

**উত্তর :** আপনি খারাপ করেছেন তার মানে এই নয় যে, আপনি আর কখনো

ভালো করতে পারবেন না। আজকে যারা সফল, তাদের জীবনে কি ব্যর্থতা আসে নি? বিজ্ঞানী টমাস এডিসনকে স্কুলে তার শিক্ষকরা মূর্খ বলে ডাকতেন পড়া পারতেন না বলে। আইনস্টাইনের কিছু মনে থাকতো না। ফলে স্কুলে ভর্তি হতে হতে তার বয়স নয় বছর হয়ে গিয়েছিলো। ফোর্ড মটরসের আগে হেনরি ফোর্ড তার দু-দুটো গাড়ির ব্যবসায় ব্যর্থ হন।

কম্পিউটার নিয়ে নাড়াচাড়া করলে আপনি নিশ্চয়ই এইচপি বা হিউলেট-প্যাকার্ড নামটির সাথে পরিচিত। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ এই টেকনোলজি কোম্পানিটির প্রতিষ্ঠাতা বিল হিউলেট এবং ডেভিড প্যাকার্ড তাদের জীবিকা শুরু করেছিলেন লেটুস পাতা তোলা এবং ওজন কমানোর মেশিনের দুটো আইডিয়া নিয়ে। কিন্তু তা-ও ব্যর্থ।

সামান্য রোজগারের জন্যে এনিমেশনের জনক ওয়াল্ট ডিজনির দিনের পর দিন ঘুরতে হয়েছে একজন অভিনেতা বা খবরের কাগজের আর্টিস্ট এবং অবশেষে একজন ড্রাইভার হওয়ার আশায়। হয় নি কোনোটাই। মুখের ওপর সম্পাদক বলে দিয়েছেন এরকম বাজে আইডিয়া নিয়ে আর্টিস্টের চাকরি তিনি পাবেন না।

আসলে এরকম বহু উদাহরণ দেয়া যায়। কাজেই সাময়িক ব্যর্থতা কখনোই সাফল্যের পথে অন্তরায় নয়। লক্ষ্যে যদি অবিচল থাকেন তো লক্ষ্যে আপনি পৌছবেনই। এটাই হওয়া উচিত সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি।

**প্রশ্ন :** আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিএ পড়ার স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু এর জন্যে আমার পরিশ্রমের সাথে সাথে অনেক মেধাবী হওয়াও প্রয়োজন। কিন্তু আমার মেধা মধ্যম মানের। তাহলে অন্যান্য প্রতিভাবান প্রতিযোগীর সাথে আমি কীভাবে পেরে উঠবো?

**উত্তর :** আসলে আমরা মনে করি, মেধা থাকলে সাফল্য এমনিতেই পাওয়া যায়। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, তুখোড় মেধাবী হলেও অধ্যবসায় ছাড়া সফলতা লাভ সম্ভব নয়। কীরকম?

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক মনীষী ইবনে সিনা। চিকিৎসাবিজ্ঞান থেকে শুরু করে জ্যোতির্বিজ্ঞান রসায়ন গণিত ভূগোল দর্শন মনোবিজ্ঞান যুক্তিবিজ্ঞান সাহিত্য এবং ইসলামি শাস্ত্রসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখায়ই তিনি তার অবদান রেখেছেন। অসাধারণ মেধা এবং স্মরণশক্তির জন্যে মাত্র ১৪ বছর বয়সেই শিখে ফেলেন তার শিক্ষকদের সবকিছু।

এরপর শুরু করেন বাইরের দুনিয়ায় যা আছে তা জানার চেষ্টা। কিন্তু নিজে পড়ে বোঝা এত সহজ হলো না। এরিস্টটলের মেটাফিজিক্স বুঝতে গিয়ে পড়লেন গভীর সমস্যায়! একবার দুইবার করে ৪০ বার পড়ে ঝাড়া মুখস্থ হয়ে গেল। কিন্তু বুঝতে পারলেন না একবর্ণ।

যখনই কঠিন কিছু বুঝতে পারতেন না, ইবনে সিনার অভ্যাস ছিলো মসজিদে চলে যাওয়া। অজু করে নামাজে গভীর প্রার্থনায় ডুবে যেতেন। মানুষের কল্যাণে যে জ্ঞান তিনি আয়ত্ত করতে চাচ্ছেন তা বোঝার সামর্থ্য যাতে পরম প্রভু তাকে দেন সেজন্যে। উঠতেন তখনই যখন মনে হতো—প্রভু তার প্রার্থনা শুনেছেন। এবারো ব্যতিক্রম হলো না।

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন বাজারে গিয়ে খুঁজে পেলেন মেটাফিজিক্সের ওপর জ্ঞানের আরেক দিকপাল আল ফারাবীর ব্যাখ্যাসম্বলিত একখানা বই। তিন দিরহাম দিয়ে সে বইটি কিনে ছুটে ছুটে ইবনে সিনা চলে এসেছিলেন মসজিদে আল্লাহর কাছে শুরিয়া জানানোর উদ্দেশ্যে।

অতএব ঐরকম ‘৪০ বার পড়ার’ অধ্যবসায় যদি না থাকে তো মেধা কোনো কাজে আসবে না। কারণ বলা হয় খরগোশের চেয়ে কচ্ছপ ভালো। খরগোশ একলাফে ছুটে গিয়ে এগুতে পারলেও একটানা হেঁটে ধীরগতির কচ্ছপই সবসময় গন্তব্যে পৌঁছে যায় আগে। আপনি হয়তো ভাবতে পারেন, আমার ব্রেনটা তো অত ভালো না। দেরিতে বুঝি। মনে থাকে আরো কম। অমুক তুখোড় মেধাবীদের মতো কি আমি পারবো? আপনিই পারবেন। সাধারণ মেধার বলেই আপনার পক্ষে ভালো করার সম্ভাবনা বেশি। আপনি কচ্ছপের মতো লেগে থাকতে পারবেন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে ধারাবাহিক কাজের মাধ্যমে লাভ করবেন সাফল্য।

**প্রশ্ন :** ভালো কলেজে ভর্তি হতে পারি নি বলে অনেকে অনেক কথা বলে। এই কলেজে এটা নেই, সেটা নেই—এরকম অনেক কিছু। আমি তাদের কথায় কান দিতে চাই না। কিন্তু ক্রমাগত শুনতে শুনতে আমারও মনে হচ্ছে এখান থেকে ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব না। গুরুজী, যাদের এসব সুযোগ-সুবিধা নেই, তাদের পক্ষে কি বড় কিছু করা সম্ভব?

**উত্তর :** জীবনে প্রথম হওয়ার পথে যে জিনিসগুলো সবচেয়ে বেশি বাধার সৃষ্টি করে সেগুলো নিজেরই অন্তর্গত বাধা। অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকতায় আমার প্রতিক্রিয়া। কোনো বিশেষ কলেজে বা বিশেষ জায়গায় সুযোগ না পাওয়া

সাফল্যের পথে কোনো সমস্যাই না। আমি যদি ভালো রেজাল্ট করতে চাই, যেকোনো জায়গা থেকে আমি তা করতে পারি।

এখন আমরা দেখি প্রতি বছর এসএসসি, এইচএসসি-তে এমন অনেক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এ-প্লাস পাচ্ছে যাদের নাম কেউ এর আগে শোনে নি এবং এমন অনেক দরিদ্র যাদের পড়াশোনার তেমন কোনো সুযোগ ছিলো না, তারা এ-প্লাস পাচ্ছে। কেন? কারণ সাফল্য আসলে নির্ভর করে নিজের ওপর। এটা ঠিক যে, ভালো স্কুলের সুযোগ-সুবিধা বেশি থাকে। সফল হওয়ার সুযোগটা বেশি থাকে। কিন্তু একজন মানুষ যেকোনো জায়গা থেকে সফল হতে পারে।

যেকোনো জায়গা থেকে সফল হওয়ার যে শক্তি, এই শক্তিটাই হচ্ছে একজন মানুষের আসল শক্তি—আমি অনুকূল পরিবেশে যা করবো, প্রতিকূল পরিবেশেও আমি তা-ই করবো। প্রতিকূল পরিবেশে আমার হয়তো পরিশ্রম একটু বেশি হবে, কষ্ট একটু বেশি হবে কিন্তু ফল তা-ই হবে, যা আমার করা উচিত। কাজেই ফলাফলটা কিন্তু স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নির্ভর করে না। ফলাফল নির্ভর করে যে সাবজেঞ্চে আমি যাচ্ছি সেই সাবজেঞ্চে ভালো করার ওপরে। কী সাবজেঞ্চে আপনি পড়ছেন তা নয়, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কী রেজাল্ট আপনি করছেন।

## আলস্য ও দীর্ঘসূত্রিতা কাটাতে

**প্রশ্ন :** ছুটি পেলে এত অলস হয়ে যাই যে, এরপর পড়ায় মনোযোগ বসাতে খুব কষ্ট হয়। এ থেকে মুক্তির উপায় কী?

**উত্তর :** আসলে কাজপ্রিয় জাতিরাই যুগে যুগে পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাপানের কথাই ধরুন। আজ থেকে ৪০ বছর আগে জাপানের অর্থনীতি এত সমৃদ্ধ হয়ে গেল, সরকার বাধ্য হয়ে সাপ্তাহিক ছুটি একদিনের বদলে দুদিন করলো। কারণ ছয় দিন কাজ করলে যে বিপুল পরিমাণ উৎপাদন হতো তা বিক্রি করা সমস্যা হয়ে যাচ্ছিলো। তখন জাপানি শ্রমিকরা মিছিল করলো—ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এক অভিনব দাবি জানিয়ে। আর তা হলো—বাড়তি ছুটির দিনটিতে তারা কী করবে তা যেন তাদের বলে দেয়া হয়! অর্থাৎ কাজটাই ছিলো তাদের ধ্যান জ্ঞান বিনোদন সবকিছু। আর এজন্যেই তারা হতে পেরেছে অর্থনৈতিক পরাশক্তি।

আসলে আমাদের মস্তিষ্কের ধরনই এমন যে, একে যত কাজ দেয়া হয় তত তা শাণিত হতে থাকে। আর কাজ না দিলেই বরং তাতে মরচে ধরে যায় এবং পুনরায় কর্মক্ষম হতে অনেক সময় লাগে। তাই যারা বুদ্ধিমান তারা কখনো ছুটি নেয় না। একটা কাজ শেষ হতে না হতেই তারা গুরু করে নতুন কাজের পরিকল্পনা। অতএব, ছুটি নেয়ার দরকারটা কী! স্কুল-কলেজ ছুটি হতে পারে কিন্তু আমার পড়া থেকে তো আমার ছুটি নেই। তাই ছুটি পেলেও সে সময়ের জন্যে একটা পরিকল্পনা করে নেবেন যে, এ সময়ে আমি এই কাজগুলো করবো। আর সেভাবেই কাজ করতে থাকুন। দেখবেন কোনো আলস্য বা জড়তা আসছে না।

**প্রশ্ন :** আমি আমার জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। বিশেষ করে ফার্স্টক্লাস অবশ্যই পেতে চাই। কিন্তু পড়াশোনা একদম হচ্ছে না, শুধু ঘুরি আর সময় নষ্ট করি। এজন্যে আমার করণীয় কী?

**উত্তর :** যদি ‘ঘুরি আর সময় নষ্ট করি’-তাহলে কী হবে? শেষ পর্যন্ত অবস্থা হবে-ঘুরি আর গল্প করি/ লাফ দিয়ে সমুদ্রে পড়ি! আসলে অধিকাংশ মানুষের কাছে সফল হতে চাওয়াটা শুধু চাওয়াতেই সীমাবদ্ধ। তারা চান মাঝে মাঝে পড়ালেখা করবো, টিভি-সিনেমা দেখবো, আড্ডা দেবো, গান শুনবো, গল্পের বই পড়বো। তারপর যদি এ-প্লাস না পাই তাহলে কী আর করা! জীবনটাকে তো উপভোগ করতে হবে! কিন্তু একজন ফার্স্টবয় কি এভাবে ভাবে? ভাবে না। তার কাছে ফার্স্ট হওয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্যে যা করা দরকার, যেভাবে করা দরকার এবং যা বর্জন করা দরকার সে তা-ই করে।

নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, যে সাফল্যের মনছবি আমি দেখছি সে সাফল্যকে বরণের প্রস্তুতি কি আমি নিচ্ছি?

আসলে আমাদের সমস্যা হলো-আমরা জানি, কিন্তু মানি না। জানাকে যদি নিজের কল্যাণে, অন্যের কল্যাণে ব্যবহার করতে না পারি তবে সে জানা নিজের জন্যেই ক্ষতিকর হতে পারে। এ নিয়ে মসনবীর একটি গল্প আছে।

গল্পটি এরকম-একদিন এক যুবক হযরত মুসা (আ)-র কাছে এসে বললো, হে মুসা, তুমি তো আল্লাহর প্রতিনিধি। তুমি সমস্ত জ্ঞান জানো, বোঝো। আমার পশুপাখির ভাষা বোঝার খুব শখ। তুমি আমাকে এই ভাষা বোঝার ক্ষমতা দাও।

মুসা (আ) তাকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করলেন। কারণ তিনি বুঝতে



পারছিলেন, এ বিদ্যা জানার পর যুবকটি নিজের উপকারের চেয়ে ক্ষতিই করবে বেশি। কিন্তু মুসা যত নিরুৎসাহিত করছেন তত যুবকের আগ্রহ বেড়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সে বললো, আর কিছু না হোক, আমি অন্তত আমার গৃহপালিত পশুপাখিদের ভাষা বুঝতে চাই।

অগত্যা মুসা (আ) আল্লাহকে বললেন। আল্লাহ প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। যুবক মহাখুশি। সে বাড়িতে চলে গেল। প্রথম দিনই ভাবলো, যে জ্ঞান পেয়েছি এটাকে পরীক্ষা করতে হবে। ভোরবেলা সে উঠলো। তখন বাড়ির গৃহকর্মী উঠানে দস্তুরখান পরিষ্কার করছিলো। দস্তুরখান থেকে আগের দিনের খাওয়া রুটির অবশিষ্ট এক টুকরা পড়ে গেল। দেখেই ঘরের কুকুর-মোরগ দৌড়ে এলো। কিন্তু কুকুর ধরার আগেই মোরগ ঠোকর দিয়ে রুটির টুকরাটা নিয়ে গাছের ডালে উঠে গেল। কুকুর মোরগকে বোঝানোর চেষ্টা করলো, দেখ, তুমি তো কত কিছুই খেতে পারো। শস্যদানা খেতে পারো, ধান খেতে পারো, চাল খেতে পারো। আমি তো ধান, চাল খেতে পারি না। এই রুটির ওপর আমার অধিকার বেশি। তুমি আমাকে এটা দিয়ে দাও। মোরগ বললো, তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই। কাল আমাদের মালিকের ছাগলটা মারা যাবে। তুমি মৃত ছাগলের হাড় খেতে পারবে।

যুবকটি যেহেতু এখন পশুপাখির ভাষা বুঝতে পারে, কুকুর এবং মোরগের এই কথোপকথন শুনে সে ভাবলো, আরে, তাই নাকি? তাহলে তো আজই ছাগলটাকে বাজারে নিয়ে বিক্রি করে আসতে হয়। মারা গেলে অন্যের বাড়িতে গিয়ে মারা যাক, আমি কেন লোকসান গুনবো?

যেই ভাবা সেই কাজ। সে ছাগল বিক্রি করে নগদ টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো। পরদিন সকালবেলা আবারো দস্তুরখান থেকে রুটির টুকরা পড়েছে। আজকেও মোরগ সেটা ঠোকর দিয়ে নিয়ে গেল। কুকুর বোঝালো, তুমি তো কাজটা ভালো করলে না। কাল আমাকে ছাগলের লোভ দেখিয়ে রুটিটা খেলে আবার আজকের রুটিটাও নিয়ে গেলে! বলেছিলে আজ ছাগলটা মারা যাবে, আমি তো ছাগলই দেখছি না।

মোরগ বললো, তুমি মন খারাপ করো না। আগামীকাল মালিকের গাধাটা মারা যাবে। গাধা মারা গেলে তুমি কয়েকদিন এর মাংস খেতে পারবে। যথারীতি আজও তাদের কথা যুবকের কানে গেল। শুনে তো সে হা হা করে উঠলো। সেদিনই সে বাজারে গিয়ে গাধাটাকে বিক্রি করে এলো।

তৃতীয়দিন সকাল বেলাও যখন কুকুর না পেলো গাধার মাংস, না পেলো রুটির টুকরা, সে খুব ক্ষেপে গেল। পারলে মোরগের ওপর তখনই বাঁপিয়ে

পড়ে। মোরগ তখন কোনোমতে বললো, দেখ বন্ধু, আমাকে মেরে তো তোমার লাভ নেই। তার চেয়ে আমার কথা শোনো। আগামীকাল আমাদের মালিকের ঘোড়াটা মারা যাবে। দয়া করে আর একটা দিন ধৈর্য ধর। কালকেই তুমি আরাম করে ঘোড়ার মাংস খেতে পারবে।

যথারীতি পরদিন ঘোড়াও নেই। মালিক শুনে বিক্রি করে ফেললো। সেদিনও যখন রণটির টুকরাটা মোরগ নিয়ে গেল, কুকুর তখন মোরগকে বললো, তোমার মতো মিথ্যাবাদী আর হয় না। তুমি ভবিষ্যৎ বলতে পারো ভেবে আমি প্রতিদিনই তোমার কথায় বিশ্বাস করছি। আর তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েই যাচ্ছে।

মোরগ বললো, দেখ আমার কী দোষ! আমি তো ঠিক কথাই বলছি। এখন মালিক যদি ওগুলো বিক্রি করে ফেলে তো আমি কী করতে পারি? যা-ই হোক আর তোমার চিন্তা নেই। এবার আমাদের মালিক নিজেই মারা যাবে। তার শেষকৃত্য উপলক্ষে যে ভোজ হবে, তার উচ্ছিষ্ট খাবার তুমি একমাস খেয়েও শেষ করতে পারবে না।

এবার তো যুবকের দিশেহারা অবস্থা। এখন সে কী করবে? অন্যগুলোকে বিক্রি করে যেভাবে ক্ষতি পুষিয়ে নিয়েছে এখন তো আর তা করতে পারবে না। দৌড়ে গেল সে মুসার কাছে। ঘটনা খুলে বললো। মুসাকে বললো, আমাকে বাঁচাও।

মুসা বললেন, দেখ, আমার এখন কিছু করার নেই। তোমার নিজের ক্ষতি তুমি নিজেই করেছো। তুমি ক্ষুদ্র লাভের জন্যে বৃহত্তর লাভকে জলাঞ্জলি দিয়েছো। কারণ ছাগলটা ছিলো তোমার গাধার সদকা, গাধাটা ঘোড়ার সদকা আর ঘোড়াটা ছিলো তোমার সদকা। যদি ছাগলকে মৃত্যুর হাতে ছেড়ে দিতে তবে গাধা, ঘোড়া এবং তুমি বাঁচতে। ছোটটিকে যেহেতু ছাড়তে পারো নি, এখন তোমার আর কোনো উপায় নেই। একথা শুনে সে মৃত্যু যন্ত্রণায় সেখানেই কাতরাতে লাগলো। তাকে আত্মীয়স্বজনরা খাটিয়ায় করে নিয়ে এলো। পরদিন সকালে সে মারা গেল।

অর্থাৎ আমাদের সমস্যা হচ্ছে, আমরা চাই কিন্তু সে চাওয়ার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করি না। ছোট ছোট জিনিসগুলোকে ছাড়তে পারি না। অথচ এ যোগ্যতা সৃষ্টি করাটাই হচ্ছে যেকোনো পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থাৎ আমাকে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারতে হবে-আমি এটা চাই, এবং আমি এর উপযুক্ত। তাহলে প্রকৃতির নিয়মেই আপনি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন।

**প্রশ্ন :** আমি কল্পনাবিলাসী। প্রায় সারাদিনই কল্পনা করি, পড়তে বসলেও মন অন্যদিকে চলে যায়, অন্য কিছু কল্পনা করে। কিন্তু আমি সবসময় ভালো-ভালো জিনিস-ই কল্পনা করি। এটা কি আমার মনছবি?

**উত্তর :** অলস কল্পনা, দিবাস্বপ্ন আর মনছবিতে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যটা যে বুঝতে পারে সে-ই আসলে বড় হয়। যারা এ পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছেন তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন আমাদের খুব পরিচিত নাম-ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালাম। তার একটা বিখ্যাত বই হলো 'Wings of Fire'। এ বইয়ে তিনি স্বপ্নের সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যা দেখে সেটা আসলে স্বপ্ন নয়, আসল স্বপ্ন হচ্ছে যা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না। অর্থাৎ স্বপ্ন আপনাকে সবসময় কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দেবে, কাজ ছাড়া আপনি কিছু বুঝবেন না। ঘুমটা তখন কাজেরই একটা অংশ হয়ে যায়।

যেমন, যে ছেলে বা মেয়ে এ-প্লাস পাওয়ার স্বপ্ন দেখে, সে কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এ-প্লাস পাওয়ার চিন্তা করে, না অনবরত চেষ্টা করে? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলে সে এ-প্লাস পাবে কখনো? কখনো না। কারণ এ-প্লাস-এর স্বপ্ন যদি মাথায় ঢুকে যায়, তখন দেখবেন, পড়ার সময় আর ঘুমই আসছে না। কাজেই আপনি যত ভালো কল্পনাই করুন না কেন, এটা স্রেফ সময় নষ্ট হবে-যতক্ষণ না আপনি স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করছেন।

আপনি হয়তো জানেন, গাধাকে দিয়ে কাজ করানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে তার সামনে একটা মুলা ঝুলিয়ে দেয়া। মুলা যেদিকে যেতে থাকবে গাধাও সেদিকে যেতে থাকবে। একইভাবে, মনকে জোর করা যাবে না, তাকে বোঝাতে হবে। আর সামনে একটা লক্ষ্য স্থির করতে হবে। মনের সামনে একটা মুলা ঝুলিয়ে দিতে হবে। বলতে হবে, এই মুলাটা হচ্ছে তোমার লক্ষ্য, তোমাকে পেতে হবে। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত মানুষ সফল হয়েছেন, সবার সামনেই একটা স্বপ্ন ছিলো। একটা মনছবি ছিলো।

**প্রশ্ন :** আমার একটি প্রধান সমস্যা হলো অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস। এর কারণে আমি দীর্ঘসূত্রিতায় জড়িয়ে পড়ছি। বিশেষ করে পড়াশোনার ক্ষেত্রে। এই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের দুষ্টচক্র থেকে আমি কীভাবে রক্ষা পাবো?

**উত্তর :** আসলে এটা কখন হয়? যখন আমি মনে করি যে, আমি সব পারি, আমার আর শেখার কী দরকার!

এই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস নিয়েও গল্প আছে।

একের পর এক প্রতিযোগিতায় জিতে, খ্যাতি পুরস্কার আর ভক্ত অনুরক্তের ভিড়ে যুবক তীরন্দাজ এত বেশি অহংকারী হয়ে উঠলো যে, গুরুকেও চ্যালেঞ্জ করে বসলো। বহুদূর থেকে নিশানার ঠিক মাঝখানে তীর ছোঁড়ার পর দ্বিতীয় তীর ছুঁড়ে সেটাকেও দুভাগ করে ফেলতে পারে সে। দৃষ্টভঙ্গিতে গুরুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি এমনটি পারবেন? গুরু কিছুই বললেন না। একদিন শিষ্যকে নিয়ে তিনি চললেন পাহাড়ের দিকে।

অনেকটা পথ যাওয়ার পর এসে থামলেন পাহাড়ের ওপরের একেবারে শেষ মাথায়। এগুতে হলে এখন যেতে হবে ঐ দূরের পাহাড়ে। কিন্তু মাঝখানে এক খরস্রোতা নদী, ভয়ংকর গর্জনে বয়ে চলেছে অজানার উদ্দেশ্যে। একটাই উপায়—দুই পাহাড়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে যে গাছের কাণ্ডটি তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া। অমসৃণ এবং গোলাকার নড়বড়ে ঐ গাছের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতেও যেকোনো বীরপুরুষের আত্মা খাঁচাছাড়া হয়ে যাবে। সেখানে শিষ্যকে বিস্মিত করে দিয়ে গুরু গাছের মাঝখানে চলে গেলেন এবং স্থির দাঁড়িয়ে নিশানা করলেন বহুদূরের এক গাছের আগার এক ছোট ডালকে। মুহূর্তেই গিয়ে বিঁধলো নিশানায়। গুরু এবার আমন্ত্রণ জানালেন শিষ্যকে।

কিন্তু এভাবে নিশানা করা দূরে থাক গাছের ওপর গিয়ে পৌঁছবে কীভাবে তা ভেবেই সে কাঁপতে লাগলো ভয়ে। গুরু তখন বললেন, হাতের ওপর তোমার দখল এসেছে ঠিকই, কিন্তু মনের ওপর নয়। দক্ষ তীরন্দাজ হতে হলে তোমাকে আরো সাধনা করতে হবে। মনের ওপর দখল আনতে হবে।

অতএব, এই ‘দুষ্টচক্র’ থেকে বেরোতে হলে আগে নিজের মনকে স্থির করতে হবে। আপনি নিয়মিত মেডিটেশন করুন, জীবনের লক্ষ্য স্থির করুন, আত্মজাগরণের অটোসাজেশন শুনুন। দেখবেন আর দীর্ঘসূত্রিতায় ভুগছেন না। কারণ আপনার শেখার এখনো অনেক বাকি।

**প্রশ্ন :** আমি কোনো কাজই ধারাবাহিকভাবে করতে পারি না। খুব উৎসাহ নিয়ে শুরু করি, কিন্তু এই উদ্যমটা ধরে রাখতে পারি না। আমার কী করণীয়?

**উত্তর :** আসলে ধারাবাহিকতাটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ধারাবাহিকভাবে না হলে সাফল্যও স্বীকৃতি পায় না। যেরকম, দেখবেন একজনই কিন্তু ঘুরে

ফিরে ক্লাসে ফাস্ট হচ্ছে। আর কেউ যদি হুট করে ফাস্ট হয়ে যায়, তখন? যেমন, একজন ক্লাস-টু তে ফাস্ট হলো, কিন্তু থ্রি তে গিয়ে কোনোরকম পাশ করলো বা তার রোল নম্বর হয়ে গেল ১৩ বা ৩০; এই ফাস্ট হওয়াটা কি কেউ মনে রাখে? না, বরং বলে যে, ঝড়ে বক মরেছে—কোনোরকমে ফাস্ট হয়ে গেছে, আসলে ছাত্রটা বাজে! বোধহয় কোনো লাইন-টাইন ছিলো, তাই কমন পড়ে গেছে! অর্থাৎ আপনি তখনই সম্মান পাবেন, যখন মানুষ দেখবে যে, আপনি ক্রমাগত সফল হচ্ছেন, আপনার মধ্যে ধারাবাহিকতা আছে।

এজন্যে কাজে কখনো ছেদ দেবেন না, ছন্দের কখনো পতন ঘটতে দেবেন না। একবার ছন্দপতন ঘটলে সে ছন্দটা তুলতে অনেক সময় লাগে। আমরা ধারাবাহিকতা রাখতে পারি না কেন? ‘আচ্ছা, করবো নে’, ‘একটু পরে করবো। এখন একটু গল্প করি’, ‘এখন একটু কার্টুন দেখি’। ঐটা দেখার পর আবার—‘আচ্ছা, এটা তো দেখলাম, এর পরেরটাতে কী করে দেখি’—এসব খেয়ালিপনার কারণেই কিন্তু কাজে ধারাবাহিকতার অভাব ঘটে, উৎসাহ-উদ্যমটা আমরা আর ধরে রাখতে পারি না। এজন্যে সবসময় রপটিন অনুসারে কাজ করতে হবে এবং হতে হবে কচ্ছপের মতো। চট করে মনে হতে পারে খরগোশ ভালো। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বুঝবেন আসলে কচ্ছপই ভালো। কারণ একলাফে ছুটে গিয়ে খরগোশ এগুতে পারলেও, গন্তব্যে আগে পৌঁছে কিন্তু কচ্ছপই। ধীরগতির হলেও ধারাবাহিকতার কারণে কচ্ছপই সবসময় এগিয়ে থাকে। অতএব লক্ষ্যটাকে সবসময় সামনে রাখতে হবে। প্রত্যেকদিন মেডিটেশনে তো দেখবেনই, আয়নায় যখন চুল আঁচড়াতে দাঁড়াবেন তখনো যেন ঐ ছবিটাকেই আয়নাতে দেখতে পান। তাহলে কখনো ধারাবাহিকতার অভাব ঘটবে না, কাজে কখনো ছন্দপতন ঘটবে না।

**প্রশ্ন :** আমি সব কাজেই দীর্ঘসূত্রী। সবচেয়ে বড় সমস্যা আমি পড়তে বসতে পারি না, বসবো বসবো করেও বসা হয় না। এরকম করতে করতে পরীক্ষা চলে আসে। কী করবো?

**উত্তর :** এটাকে বলা হয়—শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়া করে কাজ করার অভ্যাস। এজন্যে কী করবেন? ‘বসবো বসবো’ না করে এখনই বসে পড়ুন, পড়তে শুরু করে দিন। এই শুরু করাটা সবসময়ই একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। কারণ শুরু মানেই এতদিনের পরিচিত আরামবলয় ভেঙে অনিশ্চয়তার পথে যাত্রা। শুরু মানেই আপাত আনন্দ, অলস বিনোদনের অভ্যাসকে বিসর্জন দিয়ে কষ্টের

পথে বাঁপিয়ে পড়া। অধিকাংশ মানুষ তাই শুরু করার পরীক্ষাতেই পাশ করতে পারে না। তারা ভাবে-আরেকটু অপেক্ষা করি, ইচ্ছেটা আরো চাঙ্গা হোক, তারপর করবো। আসলে আগে কাজ শুরু করে দিতে হয়, ইচ্ছে চাঙ্গা হয় তারপর। আর শুরু করার জন্যে এ মুহূর্তটাই হচ্ছে সর্বোত্তম।

তাই এখনই শুরু করুন। বই নিয়ে বসে যান; প্রতিজ্ঞা করুন, যত অস্থিরই লাগুক, অন্তত ১৫ মিনিট ধরে আপনি বইটি নিয়ে বসে থাকবেন। কোনো অজুহাতকেই পাত্তা দেবেন না। মনে রাখবেন, যত দেরি করবেন, শুরু করতে দেরি হবে ততটাই। নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করুন যে, যখন কোনো কাজ শুরু করবেন আপনি তা শেষ করবেনই।

বড় কাজকে ভেঙে ছোট ছোট কাজে ভাগ করে ফেলুন। সময়কে এই ছোট ছোট কাজের মধ্যে বন্টন করে দিন। প্রত্যেকটি পারার জন্যে নিজেকে পুরস্কৃত করুন এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, কাজটি সেরে উঠে যাবার আগে পরের কাজটি খানিকটা শুরু করে দিয়ে যান। তাহলে এসে আপনি নিজেকে কিছুটা এগুনো দেখতে পাবেন এবং শুরু করার জড়তায় ভুগবেন না। একসময় দেখবেন আর দীর্ঘসূত্রিতায় পড়বেন না।

**প্রশ্ন :** আমি কোনো কাজ ধারাবাহিকভাবে করতে পারি না। কোনো দিন সকালে মেডিটেশন করলে রাতে করতে ইচ্ছা করে না বা কখনো হয় তার উল্টো। আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা পড়তে বসতে পারি না। বসবো বসবো করেও বসা হয় না। কী করবো?

**উত্তর :** আসলে এই যে দীর্ঘসূত্রিতা-এর কিছু কারণ আছে। ইউনিভার্সিটি অফ কালগ্যারির অধ্যাপক পিয়ার্স স্টিল তার ১০ বছরের গবেষণার ফল প্রকাশ করেন। যাতে দেখা যায়, দীর্ঘসূত্রিতার একটি প্রধান কারণ হলো, কাজটি আমি পারবো এ বিশ্বাস করতে না পারা। যখন একজন শিক্ষার্থী কোনো বিশেষ বিষয়ে নিজেকে দুর্বল মনে করে, সেটি শুরু করা হয় তার জন্যে চ্যালেঞ্জিং। যেমন লেখালেখির ব্যাপারে হয়তো আপনার মধ্যে জড়তা আছে। এখন যদি এমন কোনো এসাইনমেন্ট থাকে যাতে নিজের আইডিয়াগুলোকে লিখে প্রকাশ করতে হবে, তাহলে আপনার মধ্যে গড়িমসি দেখা যাবে।

এক্ষেত্রে মেডিটেশনের মাধ্যমে আপনার অবচেতন মনের ভয় বা অনিশ্চয়তাকে বের করে আনার চেষ্টা করুন। সমস্যাগুলোকে শনাক্ত করুন। অটোসাজেশন এবং মনছবির মাধ্যমে আপনার ইতিবাচক অবস্থাকে

অবলোকন করুন এবং বাস্তবে আপনার পক্ষে যা যা করা সম্ভব তা-ই করুন। প্রয়োজনে নতুন যোগ্যতা, দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করুন। এ ব্যাপারে যারা সাহায্য করতে পারবে তাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আপনার চেয়ে কম মেধার অনেক মানুষ যদি এটা পেরে থাকে আপনি কেন পারবেন না?

আবার অন্যের চাপিয়ে দেয়া লক্ষ্যের ক্ষেত্রে আমরা দীর্ঘসূত্রিতায় ভুগি। অর্থাৎ যে কাজের জন্যে আমরা নিজেরা উদ্বুদ্ধ হতে পারি না বা যেটা করে আমার কী লাভ তা বুঝতে পারি না সেটা করার প্রতি আমাদের আগ্রহও সেভাবে হয় না। ব্যাপারটা অনেক সময় অবচেতনভাবেও হয়। যেমন, আপনার মা চান আপনি ডাক্তার হোন। কিন্তু আপনার ডাক্তারি পছন্দ নয়। আপনি হয়তো এমন বিষয়গুলো ইচ্ছে করেই খারাপ করেন যেগুলোতে ভালো করলে আপনি ডাক্তারিতে সুযোগ পেয়ে যাবেন। সেগুলোতে আপনি হয়তো খারাপ করার জন্যে অবচেতনভাবেই দীর্ঘসূত্রিতায় ভোগেন।

তারপর চিন্তা করুন—কেন আপনি এ কাজটা করতে চান। এটা করলে কী কী লাভ হবে আপনার? পড়া যদি হয়, তাহলে ভাবুন এই পড়া থেকে কী কী ভাবে আপনি লাভবান হবেন।

অনেক সময় ব্যর্থতা বা সাফল্যের ভয় থেকেও হয় দীর্ঘসূত্রিতা। যেমন, কেউ হয়তো মনে করলো, এত চেষ্টার পরও যদি কাজটিতে ফেল করি! তার চেয়ে চেষ্টা না করাই ভালো। তাহলে তো অন্তত এটা বলতে পারবো যে, তেমন চেষ্টা করি নি।

আবার এটাও হতে পারে যে, সাফল্যের ভয়। অর্থাৎ একবার সফল হলে পরের বার আপনার ব্যাপারে প্রত্যাশা আরো বেড়ে যাবে বা আপনাকে লাইম-লাইটে চলে আসতে হবে যা আপনি চান না। এটি আপনার দীর্ঘসূত্রিতার কারণ হলে বুঝতে হবে আপনি আসলে আপনার জীবনের ব্যাপারে সিরিয়াস নন। আর কিছু করার নেই তাই পড়ছি—এরকম একটি ব্যাপার। মেডিটেশনের মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গি বদলের চেষ্টা করুন।

দীর্ঘসূত্রিতার আরেকটা কারণ হতে পারে—নিখুঁতভাবে করতে হবে, সেরা হতে হবে—এই মানসিকতা। এখানেই নিখুঁত করতে চাওয়াদের দীর্ঘসূত্রিতা। তারা প্রতিটি কাজই নিখুঁতভাবে করতে চায় এবং এর সাথে জড়িয়ে ফেলে আত্মমর্যাদাকে। এরা প্রতিটি জিনিসকেই হয় একেবারে নিখুঁত অথবা কিছুই না—এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। কোনো কাজে ব্যর্থ হলে এরা নিজেদেরকেই ব্যর্থ বলে ভাবে। মনে করে পুরোপুরি না পারলেই শেষ হয়ে গেলাম।

এক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। আপনার কী করা উচিত তা না ভেবে

কতটুকু করতে পারেন, তা নিয়ে ভাবুন। ১০০ তে ৯০ পেলেও এ-প্লাস তো আপনি পাচ্ছেনই। তাহলে ১০০ না পাবার দুঃখকে বড় করে কেন অশান্তি ডেকে আনবেন? আর কোনো মানুষই নিখুঁত নয়। তাই কোনো কাজই নিখুঁত হতে পারে না। টেবিলের ওপর আধাবেলা সব এলোমেলো করে রাখুন। পোশাকে একটু খুঁত থাকুক না একবেলা। যখন দেখবেন এর ফলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না তখনই আপনি শিখবেন—নিখুঁত নয়, সুন্দরভাবে সময়মতো কাজ করাটাই গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রশ্ন :** একজন ভালো ছাত্রের দৈনিক রুটিন কীরকম হওয়া উচিত এবং সেখানে বিনোদনের জন্যে কতটুকু সময় রাখা উচিত?

**উত্তর :** একজন ভালো ছাত্রের রুটিন কী রকম হওয়া উচিত এটা নিয়ে আমাদের শিক্ষার্থী কার্যক্রমের যারা মডারেটর আছেন, কাউন্সিলর আছেন তাদের সাথে কথা বলতে পারেন।

আর বিনোদনের এই ধারণাটি আসলে পুঁজিবাদী শোষণের ধারণা। আমরা বিনোদন বলতে বুঝি টিভি দেখা, সিনেমা দেখা, নন্দন পার্কে যাওয়া। আবার ইদানীংকার বিনোদন হচ্ছে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ফাস্ট ফুড খেতে যাওয়া, কিংবা পয়সা বেশি থাকলে পাঁচতারা হোটেলে খেতে যাওয়া। অর্থাৎ পয়সা খরচ করা, সময় নষ্ট করা, ক্লান্ত হওয়া আর তারপর কাজে বিরক্তি আর অনাগ্রহ।

অথচ বিনোদন তো হওয়া উচিত ছিলো প্রশান্তির জন্যে, আনন্দের জন্যে। কিন্তু তথাকথিত এ বিনোদন দিয়ে কি প্রশান্তি হয়, আনন্দ হয়?

পাশ্চাত্য সমাজে উইকএন্ড হলো শনি-রবি। সোমবার তাদের সপ্তাহের শুরু। ফ্যাক্টরির উৎপাদন পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, সপ্তাহের সবচেয়ে কম প্রডাক্টিভিটি থাকে সোমবার এবং সেদিন পণ্যের উৎপাদন মানও থাকে সবচেয়ে খারাপ। এটা এতই ব্যাপক একটা প্রবণতা যে, এটাকে তারা বলে ‘মানডে হ্যাং আউট’। অর্থাৎ শনি-রবিবারে ছুটি কাটিয়ে সোমবারে সে এতটাই অবসন্ন থাকে যে, তার আর কাজে কোনো মন থাকে না।

যেমন, স্কুলে যেতে সবচেয়ে বেশি আলস্য লাগে কখন? সাপ্তাহিক বা মাসিক বন্ধের পর যেদিন স্কুলে যেতে হয়। কেন? কারণ ছুটি কাটাতে কাটাতে এতটাই আলস্য জড়িয়ে যায় যে, কাজ করার প্রতি তার আর আগ্রহ থাকে না। যে বিনোদন, যে কাজ মানুষকে ক্লান্ত করে ফেলে, কর্মবিমুখ করে দেয় আমরা সে বিনোদনের পক্ষে নই। আমরা বলি, কাজটাই হচ্ছে একজন



মানুষের শ্রেষ্ঠ বিনোদন যদি সেই কাজে আপনি আনন্দ খুঁজে পান। অতএব এমন কাজ খুঁজে বের করুন যেটাতে আপনি আনন্দ পান। সেটাই হবে আপনার জন্যে সবচেয়ে বড় বিনোদন।

**প্রশ্ন :** অবসর সময়ে টিভি দেখা বা বিনোদনমূলক কাজও কি আলস্যের মধ্যে পড়ে?

**উত্তর :** আসলে বিনোদন কার দরকার?—যার জীবনে কোনো লক্ষ্য নেই। কারণ সামনে যখন লক্ষ্য থাকবে তখন তথাকথিত বিনোদনের সময়ই পাওয়া যাবে না। একটির পর একটি—একটি কাজ থেকে আরেকটি কাজ; কাজই হবে তখন সত্যিকারের বিনোদন। নিজের পড়া শেষ করে আরেকজনকে পড়াচ্ছি—এটাই তো বিনোদন। যত পরিশ্রম করবেন তত আপনি লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবেন, মস্তিষ্কে খুচরা শয়তান ঢোকার পথ বন্ধ হবে। অলস থাকলেই শয়তান আমাদের বেশি পেয়ে বসে। এজন্যে যখনই পরীক্ষা শেষ হয়ে যায় তখন কী করছি? হয় আড্ডা দিচ্ছি, না হয় ‘আহাম্মকের বাক্স’—টিভির সামনে বসে আছি। হিন্দি সিরিয়াল দেখছি!

মস্তিষ্ক এবং সময়ের—এর চেয়ে বড় অপচয় আর কোনো কিছু দিয়ে হয় না। কারণ ওখানে শিক্ষণীয় কিছু নেই। গীবত-ঈর্ষা-চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র দেখে কী শেখার আছে? শাশুড়ি বউয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, বৌ শাশুড়ির বিরুদ্ধে, দেবর ননদের বিরুদ্ধে—ননদ দেবরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। আবার পরকীয়া করার জন্যে একজন আরেকজনের স্ত্রীকে মেরে ফেলছে—এটা দেখে কী শেখার আছে? এটা থেকে কেবল মনের অশান্তিই বাড়বে। আর এটা যে আমরা বুঝি না, তা-ও না। কিন্তু বুঝেও এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারি না।

যেমন একজন ড্রাগ-এডিক্ট কিন্ত জানে যে, এ ড্রাগটা তার জন্যে খারাপ। তেমন হিন্দি সিরিয়াল বা টিভির ব্যাপারটাও হচ্ছে এক ধরনের এডিকশন। ড্রাগ বা সিগারেটের এডিকশন যেরকম খারাপ, টিভির এডিকশনও একই রকম খারাপ। এ বৃত্তকে ভাঙতে হবে।

আসলে তরুণদের কাছ থেকে যখন এরকম প্রশ্ন পাই, আমার মনে পড়ে যায় বহু বছর আগে সাইকোলজি টুডে পত্রিকায় দেখা একটা ছবির কথা। এক তরুণ এবং এক বৃদ্ধ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। তরুণটির পিঠে ব্যাগ। বোঝা যাচ্ছে সে দীর্ঘ ভ্রমণের জন্যে বেরোচ্ছে। আর বৃদ্ধের হাতে লাঠি। ঘর থেকে উঠান পর্যন্ত বেরোনোই তার জন্যে অনেক। তরুণ বৃদ্ধের দিকে

তাকিয়ে ভাবছে, কবে এই বৃদ্ধের মতো হবে। বয়স, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান সবকিছুতে সমৃদ্ধ হবে। আর বৃদ্ধ তরুণের দিকে তাকিয়ে ভাবছে, সে যদি আবার এই তরুণের মতো কর্মোদ্দীপনাময় হতে পারতো, তাহলে তার সব অপূর্ণ স্বপ্নগুলোর বাস্তবায়ন সে করতে পারতো। তরুণের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলেও বৃদ্ধের স্বপ্ন কখনো বাস্তবায়িত হওয়ার নয়। কারণ যে সময় চলে গেছে তা আর কখনো ফিরে আসবে না। কাজেই অমূল্য এ সময়ের যথাযথ ব্যবহার করতে হবে।

**প্রশ্ন :** পড়ার চাপ না থাকলে আমার পড়া হয় না। যার জন্যে পরীক্ষার সময় ভালো পড়া হয়। পড়ার চাপ সৃষ্টি করার জন্যে বা প্রতিদিন অল্প অল্প করে পড়ার জন্যে আমি কী করতে পারি?

**উত্তর :** আমাদের অনেকেরই শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়া করে কাজ করার অভ্যাস আছে। ডেডলাইন এগিয়ে না এলে আমরা কাজের জন্যে উদ্যমী হতে পারি না। পরীক্ষার রুটিন না পেলে বা সময় নেই, পরীক্ষা আর পেছানো যাবে না এ অবস্থা না হলে আমরা পড়ায় আগ্রহ বা মনোযোগ পাই না। ফলে আমরা অনেকেই পরীক্ষার আগের রাতে পড়ে পরীক্ষা দিতে যাই। এতে আমরা পাশ করতে পারি বটে। কিন্তু ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব হয় না। আর ছোট ক্লাসে এ প্রক্রিয়ায় পার পেয়ে গেলেও বড় ক্লাসে যখন অনেক পড়া তখন আর তাল সামলানো যায় না। অনেকে আবার পড়ার এত চাপ সামলাতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

এটি অভ্যাস নয়, বদভ্যাস-যার কোনো ভালো দিক নেই। চাপের মুখে কাজ সবাই করতে পারে। কিন্তু চাপের আগে কাজ করতে পারাটাই দক্ষতার লক্ষণ। তাই নিয়মিত পড়ার অভ্যাস করুন। ভালো ছাত্রদের সাথে কথা বলে দেখবেন, তারা প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে পড়ে। যত ব্যস্ততাই থাকুক বা যত ঝামেলাই থাকুক, এর ব্যত্যয় তারা করে না।

## ঘুমের সমস্যা

**প্রশ্ন :** পড়তে বসলে কিছুক্ষণ পর খুব ঘুম পায়। আবার রাতে নিজের রুমে একা একা পড়ার সময় অজানা এক ভয় আমার ভেতর কাজ করে। এক্ষেত্রে কী করতে পারি?

**উত্তর :** রাতে একা একা পড়তে বসলে অনেক সময় এরকম ভয় লাগা স্বাভাবিক। হয়তো মনে হয় এই বুঝি ভূত এলো বা জ্বিন-পরী এলো। কিন্তু আপনি যেহেতু একজন কোয়ান্টাম থ্রাজুয়েট, তাই আপনার বায়বীয় কোনোকিছুকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আপনি এগুলো থেকে সুরক্ষিত। নিশ্চিত মনে পড়তে বসবেন। আর পড়তে বসে ঘুম এলে চোখে পানির ঝাপটা দিতে পারেন। এতে কাজ না হলে চা খেতে পারেন। যদি এতেও কাজ না হয়, তাহলে নিজের জন্যে শান্তির ব্যবস্থা করতে পারেন। নিজেই নিজের দুগালে এমনভাবে চড় মারান-যাতে অনেকক্ষণ জ্বলে। আর ভাবুন যে, চড়টা নিজেকে মারছেন না, মারছেন খুচরা শয়তানকে, যে ঘুমের অজুহাতে আপনাকে পড়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে।

আসল ব্যাপার হচ্ছে নিজের দৃঢ় ইচ্ছা, যেভাবেই হোক আমাকে আমার পড়া শেষ করতে হবে আমার রুটিন অনুযায়ী। আর এই রুটিনটাকে যখন নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন, তখন দেখবেন নির্দিষ্ট সময়ের আগে চাইলেও আপনি ঘুমাতে পারছেন না। কারণ ছাত্রজীবনে অধ্যবসায়ী হওয়ার পথে একটা বড় বাধাই হলো অতি ঘুম। ঘুমকে যদি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন দেখবেন কাজ করার জন্যে সারাদিনে অনেকটা সময় আপনি পেয়ে যাচ্ছেন।

**প্রশ্ন :** রাতে আমার খুব ঘুম পায় এবং ভোরে উঠতে পারি না। কীভাবে আমি দিনে চার ঘণ্টা ঘুমিয়ে সুস্থভাবে পড়ালেখা ও অন্যান্য কাজ করতে পারবো?

**উত্তর :** যারা মেডিটেশন করেন তাদের জন্যে চার/ পাঁচ ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট। কারণ আধঘণ্টার মেডিটেশনে দুই ঘণ্টা ঘুমের সমান উপকার হয়। তবে আপনার যদি আট/ নয় ঘণ্টা ঘুমের অভ্যাস থাকে, তাহলে একদিনেই আপনি চার/ পাঁচ ঘণ্টা ঘুমের অভ্যাস করতে পারবেন না। ধাপে ধাপে প্রতি মাসে আধঘণ্টা করে ঘুম কমাতে হবে।

আর আপনার যদি রাতে ঘুম পায়, তার মানে আপনি দিনে বা সকালে বেশি কর্মক্ষম থাকেন। সেক্ষেত্রে রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে সকালে ওঠার অভ্যাস আপনার করা উচিত। কারণ সকালের ঐ সময়টায় আপনি সতেজ মন নিয়ে যা পড়তে পারবেন তা হয়তো দিনের অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ আপনাকে আপনার দেহহৃন্দের সাথে মিলিয়ে রুটিন করতে হবে এবং তা অনুসরণের চেষ্টা করতে হবে।

**প্রশ্ন :** মাঝে মাঝে সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারি। মাঝে মাঝে পারি না। কী করলে নিশ্চিতভাবে সময়মতো ঘুম থেকে উঠতে পারবো?

**উত্তর :** নিয়মিত মেডিটেশন করতে হবে। আর যেদিন সময়মতো ঘুম থেকে ওঠা যাবে না সেদিন একবেলা খাওয়ার টাকা মাটির ব্যাংকে দান করবেন। প্রতিজ্ঞাটা হলো, ঘুম থেকে যখন সময়মতো উঠতে পারি নি, অতএব দুপুরে খাবো না। দেখবেন, এক দুপুরের খিদেই আপনাকে ঘুম থেকে তুলে দিচ্ছে। কারণ ব্রেনে খবর চলে গেছে যে, ঘুম থেকে সময়মতো না উঠলে দুপুরের খাবার হবে না। অর্থাৎ যখন কোনো অনিয়মের জন্যে আপনি শাস্তির ব্যবস্থা করেন, সে সমস্যার একটি কার্যকরী সমাধানের পথ তখন তৈরি হয়।

**প্রশ্ন :** উল্লেখ্য, বার বার চেষ্টা করেও টেবিলে ঘুমিয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না, অটোসাজেশনেও কাজ হচ্ছে না।

**উত্তর :** কী করবেন, পড়তে বসলে যখন ঘুমিয়ে পড়েন তখন পড়তে বসবেনই না। পড়তে দাঁড়াবেন। অথবা হাঁটতে হাঁটতে পড়বেন। অর্থাৎ সবসময় বিকল্প চিন্তা করবেন। আচ্ছা, এভাবে এটা হয়, তাহলে এভাবে করে দেখি না। অর্থাৎ হেরে যাওয়া যাবে না। জীবনের সাথে যতবার হারবেন ততবার উঠে দাঁড়াবেন, যেরকম একটা শিশু যতবার পড়ে ততবার সে উঠে দাঁড়ায়। যতবার মনে হবে যে, পারলাম না-আবার নতুন করে শুরু করবেন।

কারণ জীবন একটাই, কিন্তু শুরু করতে হয় বার বার। ভুল হতে পারে, পাপ হতে পারে, অন্যায় হতে পারে। একবার হতে পারে। বার বারও হতে পারে। কিন্তু সেই ভুলকে শোধরানোর জন্যে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে বার বার। একটা ভুল করলাম, অন্যায় করলাম বা দোষ করলাম, এখন এই ভুলটা নিয়েই যদি বসে থাকি তাহলে আমি এগুবো কখন? কাজেই এই পাপটাকে মুছে ফেলে অনুশোচনা করে আবার দাঁড়াতে হবে, শুরু করতে হবে।

**প্রশ্ন :** আমি যখন একটানা পড়তে থাকি, তখন দুপুরের লাঞ্ছের পরে ঘুম ঘুম ভাব চলে আসে এবং ঘুমিয়ে পড়ি। উত্তরণের উপায় কী?

**উত্তর :** লাঞ্ছের পর ১৫ মিনিট বজ্রাসন করবেন এবং বজ্রাসনে একটু ঘুমিয়ে নেবেন। বজ্রাসনও হলো, ঘুমও হলো। তারপরেও বসলে যদি ঘুম ঘুম পায় তখন বসবেন না, পড়ার জন্যে দাঁড়াবেন, পড়তে দাঁড়াবেন।

## মেডিটেশন কেন

**প্রশ্ন :** লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে লেখাপড়া করা খুব দরকার। আমি কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট নই। কিন্তু মেডিটেশন করি। তারপরও পড়তে পারি না কেন?

**উত্তর :** মেডিটেশনের লেভেলটা ঠিক হচ্ছে কি না দেখতে হবে। আপনি এখনো কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নেন নি। কোর্সে অংশ নিতে হবে। অনেক সময় দেখবেন, কেউ কেউ ডাক্তারের সহযোগিতা করতে করতে ডাক্তার হয়ে গেছে—মাঝে মাঝে তারা খুব সাকসেসফুল অপারেশন করে ফেলেন। কিন্তু অপারেশনে যদি ভুল হয়—এ ভুল তিনি ধরতে পারবেন না, যা একজন সার্জন খুব সহজেই পারবেন এবং সংশোধন করতে পারবেন। আপনি যদি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নেন তাহলে আপনার মেডিটেশন লেভেল সম্পর্কে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন। একা একা চর্চা করেও আপনি এগুতে পারবেন। সময় লাগবে, কিন্তু চার দিনের কোর্সে দ্রুত সে স্তরে পৌঁছে যাবেন।

**প্রশ্ন :** সময় স্বল্পতার কারণে শিথিলায়ন মেডিটেশন পাঁচ মিনিটে করে কি চর্চা বজায় রাখা সম্ভব?

**উত্তর :** আসলে সময় স্বল্পতা বলে কিছু নেই। প্রতিটি মানুষের জন্যেই সমপরিমাণ ঘণ্টা-মিনিট-সেকেন্ড বরাদ্দ। মূল বিষয় হলো, তিনি কীভাবে তার সময়কে ব্যয় করছেন। অর্থাৎ আপনি সে কাজেই সময় ব্যয় করবেন যা গুরুত্বপূর্ণ বা উপকারি বলে মনে করেন। যেমন, কেন মেডিটেশন করা দরকার—সেটা যদি ঠিক করতে পারেন তাহলে হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও আপনি ঠিকই আধঘণ্টা করে দিনে দুবেলা মেডিটেশনের জন্যে সময় বের করে নিতে পারবেন। কারণ আপনি জানেন যে, কাজগুলো সুন্দরভাবে করা এবং কাজের ফসল ঘরে তোলা—এ দুয়ের জন্যেই মেডিটেশন। আবার ব্যস্ততার অজুহাত দিয়ে আমরা অনেক কিছু করি না। কিন্তু একজন সফল মানুষ ব্যস্ততার মধ্য দিয়েই সব কাজ করে নেন।

একবার এক অফিসের বড় কর্তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, তার অফিসে কোনো নতুন কাজ করাতে হলে তিনি কাকে দায়িত্ব দেন। তিনি বলেছিলেন, অফিসে যে লোকটি সবচেয়ে ব্যস্ত, তিনি তাকেই দায়িত্ব দেন। এই ব্যস্ততার

মধ্যেই সে কাজ করে দেবে। কারণ সময়ের মধ্যে কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করার দক্ষতা সে আয়ত্ত করেছে। আর যে লোকটি অলস সময় কাটায়, সে তার এই অফুরন্ত অবসর নিয়েও কাজটি করতে পারবে না। কারণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা তার নেই।

আর সুন্দরভাবে সময়কে কাজে লাগানোর চাবিকাঠি হলো মেডিটেশন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক ঘণ্টা মেডিটেশনে ব্যয় করলে বাকি ২৩ ঘণ্টাকেও আপনি সুন্দরভাবে ব্যয় করতে পারবেন। আর চাবিকাঠি যদি ফেলে দেন তাহলে বাকি ২৩ ঘণ্টার অনেকটা এমনিতেই নষ্ট হয়ে যায়। মেডিটেশন করলে ব্যস্ততা যেমন বাড়বে, তেমনি ব্যস্ততার ফসলকে ঘরেও তুলবে মেডিটেশন। মেডিটেশন করে সময় নষ্ট হলে আমরা নিজেরাও মেডিটেশন করতাম না এবং অন্যদেরও তা করতে বলতাম না। কিন্তু আমরা চাই ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে প্রথম এবং জীবনে প্রথম হোক। যার উপায় হলো সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানো; সেজন্যে নিয়মিত মেডিটেশন করতে হবে।

**প্রশ্ন :** আমরা যারা ছাত্র তাদের কেন দুবেলা মেডিটেশন করা উচিত?

**উত্তর :** যদি সুযোগ থাকতো তাহলে ছাত্রছাত্রীদের বলতাম তিনবেলা/চারবেলা মেডিটেশন করতে—শিক্ষার্থীদের জন্যে মেডিটেশন এতটাই গুরুত্বপূর্ণ। প্রশান্ত প্রত্যয়ের পাশাপাশি মনোযোগ এবং স্মৃতিশক্তি বাড়াতে মেডিটেশন এতটাই কার্যকরী যে, যে শিক্ষার্থীরাই নিয়মিত মেডিটেশন করেছেন, তারাই ভালো ছাত্রছাত্রী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। গবেষকদের গবেষণা দ্বারাই এটা এখন প্রমাণিত।

২০০৭ সালে চীনের ৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে এক গবেষণা করেন ড. জাং এবং তার সহযোগীরা। প্রতিদিন ২০ মিনিট করে মোট পাঁচ দিন এদেরকে মেডিটেশন করানো হয়। পাঁচ দিন পর মনোযোগের পরীক্ষা নিয়ে দেখা গেল, সবারই মনোযোগের উন্নতি ঘটেছে। শুধু তা-ই নয়, মেডিটেশনের ফলে তাদের দুশ্চিন্তা বিষণ্ণতা রাগ অবসাদ কমেছে এবং মানসিক উদ্দীপনা বেড়েছে। দেহে কর্টিসল নামে স্ট্রেস হরমোনের নিঃসরণ কমেছে। বেড়েছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা।

২০০৫ সালে ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের গবেষক সারাহ লেজার ও তার সহকর্মীরা এক গবেষণায় দেখতে পান যে, মেডিটেশন মানুষের মস্তিষ্কের গঠন বদলে দেয়। তারা দেখতে পান নিয়মিত মেডিটেশনে

মনোযোগের সাথে সম্পর্কযুক্ত মস্তিষ্কের অংশ প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স এবং রাইট এ্যান্টেরিয়র ইনসুলা-এ দুটোর পুরাত্ন বৃদ্ধি পায়।

এমরি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক পাগননি এবং সেকিক দেখান যে, মস্তিষ্কের গ্রে ম্যাটারের পুটামেন অংশ, যা আসলে মনোযোগের কলকাঠি নাড়ায় তার কার্যক্ষমতা বেড়েছে মেডিটেশনের মাধ্যমে।

উইসকনসিন মেডিকেল কলেজের গবেষক ব্রিফজিনস্কি-লুইস এবং অন্যান্যরা দেখেছেন বিক্ষিপ্ত চিন্তা ও আবেগ সৃষ্টি হয় ব্রেনের যে তৎপরতার কারণে মেডিটেশনের সময় তা কম সক্রিয় থাকে। তখন বরং মনোযোগ সৃষ্টিকারী তৎপরতা সক্রিয় হয়। গবেষক লাজ দেখেছেন, নিয়মিত মেডিটেশনে মনোযোগ এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং আবেগগত ভারসাম্য বজায় থাকে।

তাছাড়া মেডিটেশনের সময় ব্রেনে আলফা ওয়েভ বিরাজ করে যা মনোযোগ বৃদ্ধির জন্যে সহায়ক। ১৯৭০ সালে বিজ্ঞানী ডেভিড ওরমে জনসন এবং তার সহযোগীরা আবিষ্কার করেন, ব্রেনের বলয়গুলোর ভারসাম্যের সাথে সৃজনশীলতার সম্পর্ক আছে। আর ওরমে জনসন, ডিলবেক, ওয়ালেস, ট্রাভিস এবং অন্যান্য সবার গবেষণাতেই আলাদা আলাদাভাবে এটা দেখা যায় যে, মেডিটেশন এই ভারসাম্যকেই বাড়ায়।

গবেষকরা আরো দেখেন, মেডিটেশন স্মৃতিশক্তি বাড়ায়। ২০০৪ সালে লিভারপুল ইউনিভার্সিটির গবেষক ওয়াকস্টাফ তার এক গবেষণায় দেখেন, মেডিটেশন করার ফলে অতীত ঘটনা মনে করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে-খুব বেশি স্মৃতি হাতড়াতে হয় নি। ২০০৪ সালেরই আরেকটি গবেষণায় বিজ্ঞানী মঞ্জুনাথ ১১ থেকে ১৬ বছর বয়সী ৬০ জন শিশুকে ৩০ জন করে দুটো গ্রুপে ভাগ করেন। এক গ্রুপকে মেডিটেশন, যোগব্যায়ামের কিছু আসন ও দমচর্চা করানো হয়। আরেক গ্রুপকে একটি চিত্রশিল্প প্রদর্শনীতে ঘুরিয়ে আনা হয়। দুটো গ্রুপকেই এই অভিজ্ঞতার আগে ও পরে স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা করা হয়। দেখা গেল, ২য় গ্রুপটি অর্থাৎ যারা চিত্রশিল্প প্রদর্শনী থেকে ঘুরে এসেছে তাদের স্মৃতিশক্তির কোনো পরিবর্তন হয় নি। অথচ ১ম গ্রুপটির মনে রাখার ক্ষমতা বেড়েছে ৪৩%।

আসলে ছাত্রাবস্থায় মেডিটেশনের যে মজা, যে আনন্দ, যে লেভেল, বুড়ো বয়সে এ মজা কেউ কখনো পাবে না। একজন কিশোর বা একজন তরুণের নিজের জীবন গঠন করার যে বিশাল সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে একজন বৃদ্ধের তা নেই। আপনার বয়স যদি ২০ বছর হয় তাহলে আরো ৫০ বছরকে

ফলপ্রসূ করার জন্যে মেডিটেশন করা উচিত। সুযোগ হলে তিনবার করা উচিত। এতে করে খুচরা শয়তান দূরে থাকবে, মন প্রশান্ত থাকবে, মনোযোগ সূচগ্র হবে, আত্মগঠন ও আত্মনির্মাণ সহজ হবে।

## ফাউন্ডেশনের সাথে একাত্মতা

**প্রশ্ন :** কোর্স করার পর কিছুদিন বেশ ইতিবাচক ছিলাম। কিন্তু ইদানীং বান্ধবী বা সহপাঠীদের অনেকের কথায় প্রভাবিত হয়ে যাই। আমি কী করবো?

**উত্তর :** আপনি সবসময় সজ্জে থাকবেন, ফাউন্ডেশনে থাকবেন। সবসময় সেন্টার/ শাখা/ সেলে যাবেন। কার্যক্রমগুলোর সাথে সংযুক্ত হবেন। প্রতিমাসের প্রথম বুধবার প্রজ্ঞা জালালি প্রোথামে আসবেন। যত আপনি ফাউন্ডেশনের সাথে থাকবেন, তত দেখবেন নেতিবাচক কোনো কিছু আপনাকে আর প্রভাবিত করছে না।

আপনি হয়তো বলবেন, আমি তো শিক্ষার্থী, এত কিছুতে সময় কীভাবে দেবো। আসলে আপনি সজ্জের সাথে যত একাত্ম থাকবেন, তত আপনার জীবনে শৃঙ্খলা থাকবে, রুটিন থাকবে এবং সুবিন্যাসায়ন করার দক্ষতা বাড়বে। ফলে পরীক্ষায় আপনার প্রথম হওয়ার সম্ভাবনাও বাড়বে। আমাদের কোয়ান্টিয়ারদের অনেকেই তাদের শিক্ষাজীবনেও ছিলেন অত্যন্ত সফল, প্রথম সারির কৃতি শিক্ষার্থী। ফাউন্ডেশনে প্রচুর সময় দিয়েছেন। তারা কেন পেরেছেন? কারণ ফাউন্ডেশন তাদের সময়ানুবর্তিতার, সুবিন্যাসায়নের শিক্ষা দিয়েছে। ভালো রেজাল্ট করার অনুপ্রেরণা-দিকনির্দেশনা যুগিয়েছে। সুযোগ দিয়েছে সময়কে ভালো ভালো কাজে লাগাবার।

আসলে কেউ কেউ আছেন পড়ালেখার দোহাই দিয়ে ফাউন্ডেশনের কোনো প্রোথামেই আসেন না। এমনকি শুক্রবার এক ঘণ্টার সাদাকায়নে আসতেও তাদের অনেকরকম অজুহাত। বাস্তবতা হচ্ছে, এই এক ঘণ্টার বিনিময়ে যে প্রাপ্তি তার হতো, তা বুঝতে পারলে কিছুতেই এটা তিনি মিস করতেন না।

**প্রশ্ন :** ফাইনাল পরীক্ষার সময়ে আলোকায়ন, সাদাকায়ন, যৌথ হিলিং ইত্যাদি প্রোথামে অংশগ্রহণ করা কি জরুরি? চেষ্টা করেও ফল ভালো না হলে তখন কী করবো?



**উত্তর :** একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষার্থীদের জন্যে ফাইনাল পরীক্ষা হচ্ছে সবচেয়ে জরুরি আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পরীক্ষায় প্রথম হওয়া। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জন্যে পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে ফরজ। পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার নিশ্চয়তা যদি থাকে তাহলে সাদাকায়ন, আলোকায়নসহ যেকোনো প্রোগ্রামে আপনি অংশ নিতে পারেন। কিন্তু আপনাকে আগে পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

যখনই এরকম পরীক্ষার সময় হবে, সবসময় আগে থেকেই শাখা বা সেলের মোমেন্টিয়ারকে জানাবেন এবং ঐ সময়ে আপনি ছুটি নিয়ে নেবেন। তবে চেষ্টা করবেন অন্তত সাদাকায়নে অংশ নিতে। কারণ আপনি তো সারাক্ষণ পড়ছেন না। বরং সাদাকায়নে যৌথ মেডিটেশনে অংশ নেয়া পড়ায় মনোযোগ বাড়াতে সাহায্য করবে।

আর তারপর মনে রাখবেন—কর্ম আপনার, চেষ্টা আপনার; অর্থাৎ প্রথম হওয়ার জন্যে চেষ্টা করা আপনার জন্যে ফরজ কিন্তু ফলাফল আল্লাহর হাতে, এই জায়গাটায় আবার ভুল করবেন না। আল্লাহ যে ফলই দেন—বলবেন, শোকর আলহামদুলিল্লাহ! সন্তুষ্টি হচ্ছে যে, প্রথম হওয়ার জন্যে আপনি চেষ্টা করেছেন। এরপর পরবর্তী ধাপের চেষ্টায় নেমে পড়বেন।

**প্রশ্ন :** আমি হলে থাকি। ছোটবেলা থেকেই আমি চুপচাপ ধরনের। বহু বিচিত্র মানুষের সাথে মিশতে পেরেছি এখানে। আমাদের রুমের আপুরা পরচর্চা আর অন্যের সমালোচনায় সবসময় মুখর থাকেন। তাদের রচি, কথাবার্তা আমার ভালো লাগে না। আমি তাদের আলোচনায় কখনোই অংশগ্রহণ করি না, ফলে রুমের অন্যদের থেকে আমি মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন। আমি তাদের থেকে অনুপ্রেরণার কিছু পাই না। আমি তাদের সাথে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথা বলি না। আমি জানি, এর জন্যে তারা আমার পেছনে কথা বলে। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি আমার অবস্থানে ঠিক। আমার কী করা উচিত?

**উত্তর :** আপনি আসলেই খুব ভাগ্যবান। আপনার ভেতরের ভালো মানুষটি এখনো খুব সুন্দর অবস্থায় আছে, ভালো অবস্থায় আছে। এখন যাদের চিন্তা-চেতনার সাথে মিল হয়, যাদেরকে মনে করেন যে, এরাও আমার মতো ভালো থাকতে চায়, তাদের সাথে মিশতে হবে। আপনি যেহেতু কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট-ফাউন্ডেশনের কোয়ান্টিয়ার, গ্রাজুয়েট এদের সাথে মিশবেন।

সাধারণ মানুষ ভালো কাউকে দেখলে প্রথমে তাকে অবহেলা করে, খারাপ ব্যবহার করে। কিন্তু তারপরও যখন দেখে যে, সবার প্রতি তার আচরণ একইরকম তখন ধীরে ধীরে তাকে পছন্দ করতে শুরু করে। তাকে শ্রদ্ধা করে, নিজেদের আশ্রয়স্থল বানাতে চেষ্টা করে। অতএব এই ভালোত্বটাকে আরো বাড়াতে হবে। আপনি যে ভালো আছেন, এই ভালো থাকাটাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। একটা সময় আসবে, যারা এখন আপনার পেছনে কথা বলে, তারা আপনাকে সম্মান করতে শুরু করবে।

আপনি নিয়মিত মেডিটেশন করবেন। শুক্রবার সাদাকায়ন অথবা মঙ্গলবার আলোকায়নে আসবেন এবং আপনার রুমমেটদেরও আস্তে আস্তে মেডিটেশনের পথে নিয়ে আসুন। আসলে একজন মানুষ অন্যের কথা বেশি বলে যখন সে নিজের দোষগুলোকে চাপা দিয়ে রাখতে চায়। অন্যের অক্ষমতা, অন্যের দোষ সে বার বার বলে এক ধরনের তৃপ্তি পায়। নিজের মনকে এই প্রবোধ দিতে চায় যে, এ দোষগুলো অন্যের, অন্যরা খারাপ, সে আসলে খারাপ নয়। যখন আপনি আরো ভালো হবেন এবং ওদেরকে ভালোর পথে আনার চেষ্টা করবেন, তারাও যখন আত্মনিমগ্ন হবে তখন তারা প্রশান্তি পাবে এবং আপনার দলেরই একজন হয়ে যাবে।

**প্রশ্ন :** কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সাথে থাকতে ভালো লাগে। এমনকি পড়ালেখার চেয়েও বেশি। বড় আপা, ভাইয়া সুন্দর করে বললে না এসে থাকতে পারি না। কিন্তু রেজাল্ট আশানুরূপ হচ্ছে না। কী করবো?

**উত্তর :** বড় আপা, ভাইয়া সুন্দর করে বললে তাদেরকে আবার বলবেন, দেখেন, আপনারা বললেও আসতে পারছি না। রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে। সবসময় মনে রাখবেন, আপনার রেজাল্ট ভালো হওয়াটা শুধু আপনার জন্যেই না ফাউন্ডেশনের জন্যেও প্রয়োজন। তাহলে আপনি ফাউন্ডেশনের অ্যাসেস্ট হবেন। ফাউন্ডেশন চায় যে, আপনি ভালো রেজাল্ট করেন। অবশ্যই ফাউন্ডেশনে আসবেন, কিন্তু ব্যালেন্স করে। ফাউন্ডেশনে সময় দিলে রেজাল্টের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে যদি আপনি ব্যালেন্স করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম হয়েছেন এমন ছাত্রছাত্রীরাও ব্যালেন্স করে সময় দিয়েছেন। তারা সফল হয়েছেন।

**প্রশ্ন :** মেডিটেশনের পাশাপাশি পড়াশোনার স্পিড কীভাবে ধরে রাখবো?

**উত্তর :** সবসময় মনে রাখবেন, সজ্জ হচ্ছে স্পিড ধরে রাখার জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ফাউন্ডেশনের সাথে সবসময় সংযুক্ত থাকবেন। যত ব্যালেন্সডভাবে ফাউন্ডেশনের সাথে সংযুক্ত থাকবেন, তত পড়াশোনার স্পিড আপনি ধরে রাখতে পারবেন।

**প্রশ্ন :** আমার যখন কলেজ বন্ধ থাকে অবসর সময় বেশি থাকায় কোনো রুটিন অনুসরণ করতে পারি না। আর অল্পদিন বলে কোয়ান্টিয়ার হিসেবে কাজ করতে যাই না।

**উত্তর :** আর অল্পদিন মানে কী? দুইদিন হলেও কোয়ান্টিয়ার হয়ে যাবেন। একদিন হলেও হবেন। ফাউন্ডেশনে চলে আসবেন। আপু বা ভাইয়াদেরকে বলবেন, ‘আমাকে কিছু কাজ দেন’। তা না হলে ঐ অলস সময়ে শয়তান চলে আসবে। এবং শয়তান আপনাকে যে কাজ দেবে সে কাজটা আপনার জন্যে খুব ক্ষতিকর হবে।

## বন্ধুত্ব ও প্রেম ॥ শিক্ষার্থী জীবনের ফাঁদ

**প্রশ্ন :** পড়ালেখার ক্ষেত্রে কখনো কখনো এমন হয় যে, টিমওয়ার্ক বা গ্রুপস্টাডি আবশ্যিক। সেক্ষেত্রে কীভাবে পার্টনার বাছাই করবো?

**উত্তর :** আসলে স্টাডি পার্টনার প্রয়োজন কিন্তু অপরিহার্য নয়। কারণ গ্রুপ স্টাডির নামে অনেক সময়ই দেখা যায় আড্ডাবাজি, পরচর্চা বা অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় নষ্ট করা হচ্ছে। আর স্টাডি পার্টনার যদি এমন কেউ হয় যে, হিংসুক, স্বার্থপর, প্রেম-আড্ডায় আসক্ত বা যার সাথে প্রায়ই ভুল বোঝাবুঝি হয় অথবা যে তার ব্যক্তিগত সমস্যার কথা বলে বলে আপনার মানসিক অশান্তির কারণ ঘটায়, তাহলে সে আপনার জন্যে কল্যাণকর নয় বরং আরো ক্ষতিকর।

অতএব তাকেই স্টাডি পার্টনার হিসেবে নির্বাচন করবেন যে মেধাবী সং সহযোগিতাপরায়ণ এবং সর্বোপরি আপনার চিন্তা-চেতনার সঙ্গে একাত্ম। আর গ্রুপমেট নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এই বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচ্য। তবে এ ব্যাপারে কিছুটা নমনীয় থাকা ভালো। কারণ অনেক সময় এমন অনেকের সাথে গ্রুপ

গড়তে হয় যারা সবাই হয়তো এ সবগুলো গুণে গুণান্বিত না-ও হতে পারে। সেক্ষেত্রে তাদের সাথে কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ এবং বোঝাপড়া থাকাটা বাঞ্ছনীয়।

**প্রশ্ন :** এমন কিছু কোর্স আছে যেখানে টিম ওয়ার্ক বা গ্রুপ-পার্টনার আবশ্যিক। সেক্ষেত্রে টিম করার ব্যাপারে বাঁধাধরা যদি অন্য কোনো নিয়ম না থাকে তখন কীভাবে টিম মেম্বার নির্বাচন করবো বা গ্রুপ তৈরি করবো? কোন দিকটি বেশি খেয়াল রাখবো?

**উত্তর :** সবাই আন্তরিক হলে গ্রুপস্টাডির আইডিয়াটা ভালো। যখন একা একা পড়া বুঝতে কষ্ট হয়, নোট বা লেকচার তুলতে সমস্যা হয় কিংবা উৎসাহ ধরে রাখা যায় না, তখন গ্রুপস্টাডিই সবচেয়ে সহজ সমাধান। কিন্তু সচেতন না থাকলে এই গ্রুপই হতে পারে আড্ডা আর সময় নষ্টের আখড়া।

গ্রুপের সদস্য সংখ্যা চার/ পাঁচ জনের বেশি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এরা হবে এমন ছাত্রছাত্রী যারা ভালো রেজাল্ট করতে চায় এবং ভালো বোঝে। তাকে হতে হবে দায়িত্বশীল এবং গ্রুপের সবার সাথে মানিয়ে চলার মতো সহনশীল। এবং অতি অবশ্যই সবাই সবাইকে পছন্দ করবে।

গ্রুপের একজন লিডার থাকতে হবে যিনি গ্রুপের উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার বিষয়টি খেয়াল রাখবেন। সবাই সমান কাজ করছে কি না, পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক আছে কি না এগুলো যেমন খেয়াল রাখবেন তেমনি অপ্রাসঙ্গিক গল্প, পরচর্চা বা স্ট্রেফ ঠাট্টা/ তামাশাতেই সময় কেটে যাচ্ছে কি না সেটাও দেখবেন। সপ্তাহে দুই/ তিন বার বসতে পারে গ্রুপ-সেশন। বসার জায়গাটা হতে হবে মোটামুটি নিরিবিলি, যেখানে বিক্ষিপ্ত হওয়ার সুযোগ কম।

**প্রশ্ন :** সহপাঠী, শিক্ষক বা অভিভাবকের সাথে দ্বন্দ্ব হলে পড়াশোনার ক্ষতি হয়। সমস্যা সমাধানের জন্যে মেডিটেশনে কি তাদের বুঝিয়ে বলবো, না সরাসরি নির্দেশ দেবো যে, ‘এটা কর’?

**উত্তর :** নির্দেশ দিলে আজকাল গৃহকর্মীরাও বিদ্রোহ করে, অমান্য করে। কিন্তু বুঝিয়ে বললে তা হয় না। তাই নির্দেশ নয়, মেডিটেশনে তাদের বোঝাবেন, উদ্বুদ্ধ করবেন-মমতা দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে। আর অভিভাবকদের সাথে দ্বন্দ্ব-বিতর্ক এড়িয়ে চলবেন। তারা যখন বলছেন, তখন আপনি চুপ করে থাকুন।

পাল্টা জবাব দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তাদের কথা আপনার পছন্দ না হলেও চুপচাপ শুনতে তো কোনো অসুবিধা নেই। আপনি দু-তিন দিন অপেক্ষা করুন। তারপর সুযোগমতো তাকে বোঝাবেন।

আসলে সাথে সাথে প্রতিবাদ করা অর্থহীন। কারণ অন্যপক্ষ তখন রেগে আছে। নিজের যুক্তিই তার কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য। সে সময় আপনি যত যুক্তি-ব্যখ্যাই দিন তার প্রভাব পড়ে না। কিন্তু যখন কিছুক্ষণ পর বা কয়েকদিন পর বোঝাতে যাবেন, দেখবেন আপনি তা পারছেন।

কাজেই সহপাঠী, মা-বাবা বা অভিভাবক-সবার সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি নিরসনে আপনি বাস্তবে এ প্রক্রিয়াকে কাজে লাগাতে পারেন। আর এর আগে বোঝাবেন মেডিটেটিভ লেভেলে। কিন্তু সেটাও স্ফোভের সাথে নয়, মমতার সাথে, শ্রদ্ধার সাথে। কারণ স্ফোভ নিয়ে বোঝাতে গেলে তা আরো দূরে সরিয়ে দেয়।

**প্রশ্ন :** আমার সহপাঠী আমাকে নেতিকথা শোনায়। ক্লাসে গেলে ওর সাথে আমাকে মিশতেই হয়। ওর সঙ্গ ত্যাগ করতে আমার কী করণীয়?

**উত্তর :** যে সহপাঠী নেতিকথা বলে তার সাথে ‘মিশতেই হবে’ কেন? নেতিকথা বলার দুটো কারণ থাকতে পারে। এক হতে পারে সে বুঝতে পারছে না যে, এ কথার কী প্রভাব আপনার ওপর পড়বে। দ্বিতীয়ত তার কথায় যাতে আপনি হীনম্মন্য হয়ে পড়েন এবং প্রতিযোগিতায় তার সাথে টিকতে না পারেন। অতএব যে নেতিকথা বলে সে কখনো আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী নয়। তাকে আস্তে আস্তে বাদ দিয়ে দিন। মিশুন ইতিবাচক সহপাঠীদের সাথে।

**প্রশ্ন :** বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় বন্ধুত্ব কি এক ধরনের মেডিকেশন হিসেবে কাজ করে না? তাহলে আপনারা একতরফাভাবে এর বিরুদ্ধে কেন?

**উত্তর :** আসলে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে আমাদের চিন্তা খুব পরিষ্কার। বন্ধুত্ব কার সাথে হয়? যে সমমনা এবং সমচেতনায় উদ্ভূত। এ ধরনের বন্ধুত্ব সবসময়ই প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে। আমরা কেন সঙ্কবদ্ধ? কারণ আমরা সমমনা। আমাদের চেতনা লক্ষ্য উদ্দেশ্য এক। এটাও কি বন্ধুত্ব নয়?

অর্থাৎ সমমনা এবং সমচেতনা না হলে আসলে বন্ধুত্ব হয় না। যেরকম—একজন ড্রাগ-এডিক্টের সাথে একজন সাধারণ মানুষের বন্ধুত্ব হবে না, আর হলেও সেটা টিকবে না। কারণ সে আপনাকে সবসময় এক্সপ্লয়েট করবে, এবং চেষ্টা করবে আপনাকে ড্রাগসের মধ্যে নিয়ে যেতে। আসলে আমরা একতরফাভাবে বিরোধিতা করছি না, বরং এই ব্যাপারগুলোকে তুলে ধরছি যাতে বন্ধুত্বে জড়িয়ে আপনারা ক্ষতিগ্রস্ত না হন।

**প্রশ্ন :** সহপাঠীদের সাথে আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত? বন্ধুদের সাথে মেশার ক্ষেত্রে কতটুকু সীমাবদ্ধতা অবলম্বন করতে হবে?

**উত্তর :** আসলে সহপাঠী মানেই বন্ধু নয়। সুসম্পর্ক থাকবে সবার সাথে কিন্তু বন্ধুত্ব হবে তাদের সাথেই যাদের জীবন চেতনা ও লক্ষ্যের সাথে আপনার মিল রয়েছে। আপনার বন্ধুরা যদি মেধাবী, সহানুভূতিশীল, সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়, তাহলে আপনারও তা অর্জন করার সম্ভাবনা থাকবে। আর বন্ধুরা যদি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বা রুঢ় আচরণে অভ্যস্ত হয়, লক্ষ্যহীন জীবনে ভেসে বেড়াতে থাকে, ড্রাগ, ধূমপান ও অন্যান্য বদ অভ্যাসে লিপ্ত থাকে বা মাস্তান ও সন্ত্রাসীদের সাথে জড়িত থাকে, তাহলে তারা জীবনের সুমহান লক্ষ্য থেকে আপনাকে বিচ্যুত করতে পারে।

কোনো বন্ধু যদি আপনার জন্যে আনন্দের কারণ না হয়, যদি বেশিরভাগ সময়ই তার সাথে তর্ক-বিতর্কে কেটে যায়, তাহলে আপনার আচরণে কিছু পরিবর্তন আনা উচিত। হয় তার সাথে দেখা করার সময় কমিয়ে দিন বা কীভাবে তার সাথে মতৈক্য সৃষ্টি করা যায় তা খুঁজে বের করুন। কারণ, ক্রমাগত মতানৈক্য আপনার মানসিক প্রশান্তি বিনষ্টের কারণ হতে পারে।

আসলে এই বন্ধু, বান্ধবী—এরা সব দুধের মাছি। যতক্ষণ আপনি তাদের খাওয়াতে পারছেন, উপহার দিচ্ছেন, ততক্ষণই তারা থাকবে। খাওয়ানো, নোট দেয়া—এগুলো একবার বন্ধ করে দেখুন কজন থাকে।

**প্রশ্ন :** বাসায় পড়াশোনার সময় ঘনিষ্ঠ বন্ধু বেড়াতে এলে কীভাবে আমি আমার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবো?

**উত্তর :** এক্ষেত্রে বন্ধুকে খুব স্বাভাবিকভাবে বলতে হবে—দেখ বন্ধু, এখন হয়তো তোমার বেড়ানোর সময়, কিন্তু এটা আমার পড়ার সময়। অতএব

আমাকে পড়তে হবে, কিছু মনে করো না। সামনের অমুক দিন আমি ফ্রি আছি, তখন তোমার সাথে গল্প করবো, ঘুরে বেড়াবো, কিন্তু আজ নয়। অর্থাৎ তাকে বুঝিয়ে দেয়া যে, পড়ালেখার ক্ষেত্রে আপনি কোনো ছাড় দিতে রাজি নন। যত ঘনিষ্ঠই হোক না কেন, পড়ার সময় কেউ আপনার বন্ধু না।

তাছাড়া আপনি যদি যুক্তিসঙ্গত কারণে ‘না’ বলতে না পারেন, সবাইই মনোরঞ্জন করতে চান, তাহলে আপনি দীর্ঘসূত্রিতায় ভুগবেন। না পারবেন লেখাপড়া শেষ করতে, না পারবেন সবাইকে খুশি করতে। তাই আপনাকে বিনয়ের সাথে ‘না’ বলতে শিখতে হবে।

সবসময় হাতে সময় ও কাজ কতটা আছে বিবেচনা করে হ্যাঁ বলুন। এ সপ্তাহে করতে না পারলে আগামী সপ্তাহে আসতে বলুন। যতটুকু করতে পারবেন ততটুকুই বলুন। আপনি সুখী হবেন, অন্যরাও আনন্দ পাবে।

**প্রশ্ন :** আমি জানি যে, ছাত্রজীবনে প্রেম হলো একটা অবিদ্যা। কিন্তু তারপরও বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না। কী করবো?

**উত্তর :** এই যে ‘জানার পরও বেরিয়ে আসতে পারছি না’—কেন? কারণ অবিদ্যার একটা আকর্ষণ আছে। যা সহজে আয়ত্ত করা যায়, যা অর্জনের জন্যে মনোযোগের তেমন প্রয়োজন নেই, তার প্রতি আকর্ষণটা সবসময় বেশিই থাকে। অন্যদিকে বিদ্যা অর্জন করাটা কঠিন এবং সেটা পালন করা আরো কষ্টকর। ফলে বিদ্যার চেয়ে অবিদ্যা আমাদের প্রভাবিত করে বেশি।

মনকে বোঝাতে হবে যে, মন, এখন আমার জীবন গড়ার সময়। প্রেম করার জন্যে সামনে অনেক সময় আছে। এখন যদি কষ্ট স্বীকার করি তাহলে আমার শেষ ভালো হবে। তখন এ কষ্ট শতগুণে আমার আনন্দের কারণ হবে। কিন্তু এখন শ্রেফ পড়াশোনা।

একটু কষ্ট হবে, কিন্তু যারা বুদ্ধিমান তারা ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির জন্যে এই কষ্টকে স্বীকার করে নেয়। আর যারা নির্বোধ তারা এই মুহূর্তের কষ্টকে স্বীকার করতে চায় না। তারা ক্ষণিকের আনন্দটাই বড় করে দেখে। কারণ তার সামনে বড় কোনো স্বপ্ন নেই। ধরুন, বড় মাছ যে ধরতে চায়—ছোট মাছ ছিঁপে এলেও সে কিন্তু তোলে না, ছেড়ে দেয়। কারণ এটা তার প্রয়োজন নেই। এটা নিতে গেলে সময় নষ্ট হবে, এর মধ্যে বড় মাছটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। অতএব, বড় মাছ যার লক্ষ্য সে ছোট ছোট মাছ কখনো ধরে না। যে বাঘ শিকার করতে চায়, সে কখনো চড়ুই মারে না।

লতা মুঙ্গেশকর-কত বড় গায়িকা! আজও তার গলা সেই কিশোরী কণ্ঠের মতো! কেন এটা সম্ভব হয়েছে? তার সাধনা, সংগীতের প্রতি তার ভালবাসার কারণেই লতা আজকে লতা মুঙ্গেশকর হতে পেরেছেন।

তাই জীবনে প্রথম হওয়ার যে আনন্দ, সে আনন্দ যদি পেতে হয় তাহলে এখনকার ছোট ছোট আনন্দগুলোকে বর্জন করতে হবে। আমরা যেটাকে রোমান্স বলি, যেটাকে প্রেম বলি, তার চেয়ে জীবন অনেক বড়। জীবনের সেই বড় দিকগুলোকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

**প্রশ্ন :** গত ছয় মাস যাবত আমি কারো দ্বারা প্রভাবিত। আর বুঝতে পারছি যে, অন্যায় করছি। কিন্তু তার প্রতি আকর্ষণ কমাতে পারছি না। সারাক্ষণ এই চিন্তায় পড়াশোনা হচ্ছে না। কী করে এ আকর্ষণ কমাবো?

**উত্তর :** এ বয়সে আকর্ষণটা স্বাভাবিক এবং বোঝাই যাচ্ছে এটা বিপরীত লিঙ্গের কারো প্রতি। কারণ সমলিঙ্গে সাধারণত এরকম আকর্ষণ হয় না। যেহেতু আকর্ষণটা বিপরীত লিঙ্গের কারো প্রতি এবং এটা পড়াশোনা নষ্ট করছে, কাজেই আপনাকে চিন্তা করতে হবে, এই আকর্ষণে আপনার কী লাভ হচ্ছে? হয়তো যুক্তি দিয়ে এ আকর্ষণ থেকে বেরিয়ে আসা যাবে না। তাই অন্য কোনোকিছুর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করতে হবে। একটা আকর্ষণকে কাটাতে হয় অন্য আকর্ষণ দিয়ে। যেমন, ভোলার চেষ্টা করে কোনো লাভ হয় না। তখন আরো বেশি বেশি করে মনে পড়ে। বরং আকর্ষণটাকে তখন বদলে ফেলতে হয়। যখন অন্যকিছু নিয়ে আপনি মনোযোগী হবেন, ভিন্ন কিছুর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করবেন-আপনি ভুলতে পারবেন।

আসলে এই প্রেম, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আসক্তি এসব কারণে এখন ইউরোপ-আমেরিকার ছেলে-মেয়েরাও পড়াশোনায়, জ্ঞানে অনেক পিছিয়ে গেছে। ইউরোপ-আমেরিকাতে আজ থেকে ১০০ বছর আগে যে মাপের প্রতিভা ছিলো, ৫০ বছর আগেও যে মাপের প্রতিভা ছিলো, যে মাপের নেতৃত্ব ছিলো, সে মাপের নেতৃত্ব বা প্রতিভা এখন নেই। এর অন্যতম প্রধান কারণ-এই প্রেমরোগ, জৈবিকতার প্রতি আসক্তি।

**প্রশ্ন :** আমার সাথে মেডিকেল কলেজে পড়ে এক বান্ধবী গত তিন বছর যাবৎ একটি ছেলেকে পছন্দ করতো। কিন্তু কিছু বাজে ছেলে সেই ছেলেটিকে আমার বান্ধবী সম্পর্কে নানারকম কথা বলে যা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এসব শোনার



পর ছেলেটি আমার বান্ধবীর সাথে সবরকম যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। ফলে ও এখন লেখাপড়াসহ সবক্ষেত্রে নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ও কোয়ান্টাম সম্পর্কে জানে। আমাকে সবসময় বলে, আমি যেন কমান্ড সেন্টারে এনে সেই ছেলেটিকে বোঝাই এবং ওর সাথে আবার যোগাযোগ করতে বলি। গুরুজী, আমি হিলিং ও সাইকি ওরিয়েন্টেশন করেছি। আমি কি হিলিংয়ের সময় ছেলেটিকে বোঝাবো? এছাড়া আমার আর কী করণীয় আছে?

**উত্তর :** এসব ক্ষেত্রে জড়িত হওয়াটা হচ্ছে আহাম্মকি। আহাম্মক হবেন না। কোনো ছেলে যদি কোনো মেয়েকে আরেকজনের কথা শুনে অবিশ্বাস করে, আপনার পক্ষে তো তাকে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝানো সম্ভব না। এ ধরনের কাজের মধ্যে কখনো যাবেন না। আর এগুলো তো কাজ নয়, অকাজ। আপনার বন্ধুর লেখাপড়াসহ সবক্ষেত্রে নানারকম সমস্যা হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। কারণ, যারাই লেখাপড়া করতে গিয়ে বিপথে চলে যায়, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, বিভিন্ন রকম সমস্যাকে তারা নিজেরাই নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করে।

আপনি মেডিকেলে পড়াশোনা করতে গেছেন, মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করুন। আপনার লক্ষ্য হবে ভালো ডাক্তার হওয়া, মানুষের রোগের চিকিৎসা করা। বান্ধবীর প্রেমরোগের চিকিৎসা করা আপনার কাজ না।

**প্রশ্ন :** আমি ঠিক করেছি যে, কখনো প্রেম করবো না। কিন্তু আমার ছেলে ও মেয়েবন্ধু-উভয়ই আছে। আমার বাসার মানুষ অনেক সময় সন্দেহ করে যে, আমার বোধহয় কারো সাথে সম্পর্ক আছে। এর ফলে যদি কখনো বন্ধুদের সাথে ফোনে কথা বলি তাহলে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমি কখনো এ রকম সম্পর্কে জড়াবো না বলে ঠিক করেছি। তারপরেও যে সমস্যা হচ্ছে এর সমাধান কী?

**উত্তর :** আসলে প্রত্যেক তরুণ-তরুণী প্রেমে পড়ার আগে সিদ্ধান্ত নেয় যে, সে কখনো প্রেমে পড়বে না। অথচ সে যে কখন প্রেমে পড়ে যায়, সে নিজেও তা বোঝে অনেক পরে। আর ৪০ বছর ধরে আমি দেখছি যে, বিপরীত লিঙ্গে কখনো বন্ধুত্ব হয় না। প্রথমে যদি হয়ও, একটা সময় তা প্রেম হবে, না হয় দৈহিক সম্পর্ক হবে। এটা আগে থেকে কেউ টের পায় না। আর যখন টের পায় তখন অনেক দেরি হয়ে যায়।

অতএব, বিপরীত লিঙ্গের সাথে কখনো বন্ধুত্ব হয় না, সুসম্পর্ক হয়। কাজের প্রয়োজনে একজন সহপাঠীর সাথে যে সম্পর্ক থাকা দরকার, বিপরীত লিঙ্গের হলেও ততটুকুই থাকতে পারে। কিন্তু বন্ধুত্ব করতে যাবেন না। কারণ বন্ধুত্বের সাথে আবেগ জড়িত থাকে। আর বিপরীত লিঙ্গের সাথে যখন আবেগ জড়িত হয়, এই আবেগের পরিণতি হয় প্রেম অথবা দৈহিক সম্পর্ক অথবা বিয়ে হলেও হতে পারে। কিন্তু এটি কখনো শুধু বন্ধুত্বে সীমিত থাকে না। অতএব আমরা কেউ যেন এ কথা না বলি, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, প্রেম করবো না। কারণ কেউ সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রেম করে না।

## ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

**প্রশ্ন :** ক্লাসে স্যার খুব দ্রুত পড়ান। এত দ্রুত যে, আমরা ঠিকমতো লেকচার তুলতে পারি না। আবার ভালো বোঝাতেও পারেন না। কিন্তু কোনো প্রশ্ন করলে বকাবকি করেন। এক্ষেত্রে আমরা কীভাবে মনোযোগী হবো?

**উত্তর :** আসলে এটা ঠিক যে, এরকম শিক্ষকের ক্লাসকে এনজয় করা কিছুটা কঠিন। কিন্তু এটা মনে নিতে হবে যে, পরীক্ষার খাতা যদি তিনি দেখেন তো তার দ্বারস্থ আপনাকে হতেই হবে। অতএব স্যার/ ম্যাডাম ভালো-এ দৃষ্টিভঙ্গিটাই নিজের মধ্যে নিয়ে আসুন। বাস্তবে যদি না পারেন, মেডিটেশনের সাহায্য নিন। কারণ ছাত্রছাত্রীদের একটি সাধারণ প্রবণতা হলো টিচারকে বিপক্ষ মনে করা। সচেতন বা অবচেতনভাবে যে শিক্ষকদের তারা অপছন্দ করে, সুযোগ পেলেই তার আড়ালে নিজেদের মধ্যে তাকে নিয়ে সমালোচনা করে বা তার কোনো আচরণের নিন্দা করে। অনেকসময় তার কোনো মুদ্রাদোষ থাকলে সেটা নিয়ে ক্যারিকেচার করার প্রবণতাও দেখা যায় তাদের মধ্যে। আর এ সবকিছুর অবচেতন একটা প্রভাব পড়ে ঐ শিক্ষকের ওপর। দেখা যায়, বাস্তবে শুধু তার সাথেই ঝামেলা হচ্ছে।

শিক্ষক ভালো-এ দৃষ্টিভঙ্গি আপনার নিজের জন্যেই প্রয়োজন। আপনি যদি টিচারকে বিপক্ষ মনে করেন, তাহলে তিনি কেন আপনাকে পক্ষ মনে করবেন? তাই সাধারণদের মতো সারাক্ষণ শিক্ষকের সমালোচনায় মুখর না থেকে তার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করুন। সুযোগ-সুবিধামতো প্রশ্ন করুন, ক্লাসে বা ক্লাসের বাইরেও হতে পারে। আপনার পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়বে। পাবেন শিক্ষকের ভালবাসা, সহযোগিতা ও আনুকূল্য।

## ছাত্রজীবনে ক্ষোভ-অভিমান

**প্রশ্ন :** মনে হয় আমার মা-বাবা আমাকে বোঝে না। আমার সবকিছুতেই তাদের ‘না’। ফলে তাদের সাথে গ্যাপ অনেক বেশি। কী করা যায়?

**উত্তর :** আমার মা-বাবা আমাকে বোঝে না, ভালবাসে না, আমার স্বাধীন বিকাশের পথে অন্তরায়, কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলার নিগড়ে বন্দি করে রেখেছে—মা-বাবাকে নিয়ে এরকম অভিযোগ আমরা অনেকেই করি। অনেক সময় তা সঙ্গতও। তারা হয়তো তাদের চিন্তাটা সন্তানের ওপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছেন বা নিজের অপূর্ণ স্বপ্নের বাস্তবায়ন দেখতে চাচ্ছেন সন্তানকে দিয়ে তার চাওয়া বা পরিবর্তিত সময়ের কথা মাথায় না রেখে।

কিন্তু এই ক্ষোভের নেট রেজাল্ট কী? আরো ক্ষোভ, আরো ব্যর্থতা এবং আরো হতাশা। ব্যাপারটাকে এভাবে দেখুন—মা-বাবা থ্রেটস্ট হতে পারেন, কিন্তু আপনি হলেন লেটস্ট। লেটস্টের দায়িত্ব বেশি, তাই মা-বাবা যদি আপনাকে বুঝতে না পারেন, বোঝানোর দায়িত্ব আপনার। তাদের বোঝাতে হবে সেই ভাষায় যে ভাষা তারা বোঝেন। আর তা হলো শ্রদ্ধার ভাষা, মমতার ভাষা, ভালবাসার ভাষা—যে ভাষার কোনো জেনারেশন গ্যাপ নেই।

আর যদি এমন হয়—সমবয়সী বা মিডিয়ার চাকচিক্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে আপনার এ চাহিদা এবং যা দেয়ার সামর্থ্য তাদের নেই, তাহলে তাদের অক্ষমতাকে আপনার মেনে নেয়া উচিত।

আসলে বাইরে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে বা ক্লাসে সহপাঠীদের সাথে আমরা খুব সুন্দর আচরণ করি—‘এত ভালো ছেলে, এত ভালো মেয়ে আর হয় না’! কিন্তু বাসায়? সাধারণভাবে বাসায় আমাদের মেজাজ খুব খারাপ থাকে। রাগের স্বরে কথা বলি—‘ঝাড়ি’ দেয়া ছাড়া তো কোনো কথাই নেই। আর এখানেই ভুলটা করি।

বলা হয়, উচ্চস্বরের শব্দ কানে প্রবেশ করে, আর যে শব্দ ধীর-স্থির ভাবে, আস্তে আস্তে করা হয় সে শব্দ হৃদয়ে প্রবেশ করে। ফলে যত আস্তে কথা বলবেন সেটি মা-বাবার হৃদয়ে ঢুকবে, আর যত জোরে বলবেন সেটি এক কান দিয়ে ঢুকবে, অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যাবে!

কারণ তারা মনে করছেন এটা সন্তানের বয়সের দোষ, আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে—এটাকে কিন্তু তারা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আর ওদিকে সন্তান মনে করে যে, যতটুকু দেয়া দরকার ততটুকু মনোযোগ মা-বাবা তার প্রতি দিচ্ছেন

না। ফলে উত্তেজিত হয়ে শোরগোল করে এমন সব আচরণ করছে যা তাকে মা-বাবার মনোযোগ থেকে আরো দূরে সরিয়ে নিচ্ছে।

আসলে মা-বাবা হচ্ছেন গাছের মতো যার ফল আর ছায়ায় বেড়ে ওঠে সম্ভানের জীবন। সম্ভানের জন্যে অনেক মা-বাবাই গাছের মতোই নীরবে নিঃশেষ করে দেন নিজেকে।

গাছের একটি প্রাচীন গল্প আমাদের চোখ খুলে দিতে পারে। অনেক কাল আগে এক গ্রামে ছিলো বিশাল এক আমগাছ। একটি শিশু রোজ এসে সেই গাছের ডালে ঝুলে খেলা করতো। আম পেড়ে খেতো। দুপুরবেলা ক্লান্ত হয়ে সেই গাছের নিচেই খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিতো। গাছও শিশুটির এই আনন্দে যোগ দিতো। গাছটি তাকে গ্রহণ করলো বন্ধু হিসেবে। কিন্তু একদিন সে এলো না। অপেক্ষা করে করে গাছ বুঝলো আজ আর সে আসবে না।

এভাবে কেটে গেল অনেকদিন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল একটি বালক মন খারাপ করে বসে আছে গাছের গোড়ায়। সেই শিশু এখন বালক হয়েছে।

গাছ জিজ্ঞেস করলো—কী হয়েছে প্রিয় বন্ধু আমার? কেন তুমি এতদিন আসো নি? ছেলেটি বললো, আমি এখন বড় হয়েছি। গাছ নিয়ে খেলতে আর আমার ভালো লাগে না। আমার এখন খেলনা দরকার। কিন্তু আমার কাছে টাকা নেই। গাছ বললো, আহা! কিন্তু বন্ধু, টাকা তো আমার কাছেও নেই। তুমি না হয় আমার আমগুলো সব পেড়ে নিয়ে যাও। এগুলো বিক্রি করলে নিশ্চয়ই কিছু টাকা পাবে। বালকটি তা-ই করলো। কিন্তু এরপর আর সে এলো না। গাছ অপেক্ষা করছে।

অনেকদিন পর এক সুঠাম দেহের যুবক এলো সেখানে। গাছ চিনতে পারলো তাকে। খুশিতে আঁটখানা হয়ে বললো, এসো বন্ধু! আমরা আবার আগের মতো খেলি। রক্ষস্বরে যুবকটি জবাব দিলো—না, না, খেলার সময় আমার নেই। আমাকে এখন সংসারের জন্যে রঞ্জি-রোজগার করতে হয়। আমার এখন একটা ঘর দরকার। গাছটি বললো, ও আচ্ছা, কিন্তু ঘর তো আমার নেই। তুমি বরং আমার ডালগুলো সব কেটে নিয়ে যাও। এগুলো দিয়েই বানাতে পারবে তোমার ঘর। যুবকটি তা-ই করলো। যুবককে খুশি দেখে গাছের মনও আনন্দে নেচে উঠলো।

কেটে গেল আবারো অনেকদিন। নিঃসঙ্গ গাছটি এখনো অপেক্ষা করে প্রিয় বন্ধুকে দেখার আশায়। অনেক বছর পর এক মধ্যবয়সী পুরুষ এসে দাঁড়ালো গাছের নিচে। গাছ তাকে দেখে আনন্দিত হলো। প্রিয় বন্ধু এসেছে।

মন খারাপ দেখে জিজ্ঞেস করলো—কী ঘটনা? সে বললো, সংসারের ধকল সামলাতে সামলাতে আমি ক্লান্ত। মনটাকে চাঙ্গা করার জন্যে আমি এখন সমুদ্রে বেরিয়ে পড়তে চাই। কিন্তু আমার যে কোনো নৌকা নেই। গাছ বললো, ভাবনা কি বন্ধু! আমার কান্ডখানা নিয়ে যাও। এটা দিয়েই নৌকা বানাতে পারবে তুমি। প্রাচীন গাছের বিশাল কান্ড ঠেলায় চাপিয়ে নিয়ে চলে গেল সে মধ্যবয়সী পুরুষ।

অনেক বছর পর লাঠিতে ভর করে ধীর পায়ে গাছের সেই জায়গায় এসে দাঁড়ালো বয়সের ভারে নুয়ে পড়া এক বৃদ্ধ। মৃতপ্রায় শেকড়ের একটা টিবি ছাড়া গাছের কিছুই আজ আর অবশিষ্ট নেই। তবুও সে বলে উঠলো, এসেছো বন্ধু! কিন্তু তোমাকে দেয়ার মতো আমার যে আর কিছু নেই। ফল নেই, ডাল নেই, কান্ড নেই। কী দিয়ে আমি তোমার সেবা করবো বল?

বৃদ্ধ বললো, ওসব দিয়ে আজ আর আমার কোনো কাজ নেই। আমি এখন ক্লান্ত অবসন্ন। বিশ্রামের একটু জায়গাই এখন আমার চাওয়া। গাছ বললো, বন্ধু, বুড়ো গাছের মরা শেকড়ের চেয়ে বিশ্রামের ভালো জায়গা আর কী হতে পারে? ঠেস দিয়ে বসো। সব ভাবনা ভুলে নিশ্চিন্তে আরাম কর।

বৃদ্ধ তা-ই করলো। অনেকদিন পর হাসলো নিঃসঙ্গ গাছ। কাঁদলোও। তবে এ কান্না আনন্দের। হারানো প্রিয়জনকে কাছে ফিরে পাওয়ার খুশিতে।

এই শিশু থেকে বৃদ্ধে পরিণত হওয়া মানুষটিকে কি আপনার নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে? অকৃতজ্ঞ মনে হচ্ছে? তাহলে মনে করে দেখুন তো—আপনার মাকে কি আপনি কখনো ধন্যবাদ দিয়েছেন—আপনাকে ধারণ, লালন এবং পালনের খুঁটিনাটি কাজগুলো বছরের পর বছর ধরে অম্লান বদনে করে যাওয়ার জন্যে? বাবাকে কি কখনো থ্যাংকস জানিয়েছেন কষ্টার্জিত উপার্জনে আপনাকে আজকের অবস্থান গড়ে দেয়ার জন্যে? শাসনের আড়ালে স্নেহপূর্ণ মন নিয়ে আপনাকে সঠিক পথ-নির্দেশনার জন্যে?

হয়তো আপনি মনে করতে পারবেন না। কারণ মা-বাবা আমাদের জন্যে যা কিছু করেন আমরা ধরে নিই যে, এটা তো তাদের দায়িত্ব। কিন্তু ভেবে দেখুন, এর যেকোনো একটি ক্ষেত্রেও যদি তারা দায়িত্বটি পালন না করতেন, কী অবস্থা হতো আপনার! কত অসহায় হয়ে পড়তেন আপনি!

**প্রশ্ন :** জীবনে লক্ষ্য আছে, লক্ষ্যে যাবার সামর্থ্যও আছে; কিন্তু মন খারাপ থাকলে বই ছুঁয়েও দেখতে ইচ্ছে করে না। ক্ষতি হচ্ছে জানি, কিন্তু দিনের পর দিন পড়া হয় না। মুড ঠিক করার জন্যে কী করবো দয়া করে বলবেন?

**উত্তর :** আমাদের সময় সবচেয়ে বেশি অপচয় হয় এই মন খারাপ বা মুড অফ থাকার ছলে। ভেবে দেখুন, জীবনের কতটা সময় আপনি শুধু মন খারাপের জন্যে মনোযোগ দিয়ে পড়তে পারেন নি। পরীক্ষা খারাপ দিয়েছেন। কী লাভ হয়েছে তাতে? মন পরে ভালো হয়েছে ঠিকই। কিন্তু যে পরীক্ষা খারাপ হয়েছে বা অভিমান করে যে সুযোগ হাতছাড়া করেছেন তা তো আর ফিরে আসে নি।

আসলে যারা দুঃখবিলাসী তারা তেমন কোনো কারণ ছাড়াই দুঃখ পায়, কষ্ট পায়। এটা তাদের এক ধরনের রোগ। কিন্তু জীবনের বাস্তবতার মুখোমুখি হলে অনেক সময়ই পালিয়ে যায় তাদের এ দুঃখবিলাস।

একবার নাসিরুদ্দিন হোজা দেখলো, এক লোক পথের ওপর বসে আছে খুব বিমর্ষ হয়ে। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই লোকটি বললো, তার অনেক ধন-সম্পত্তি। খাওয়া-পরা নিয়ে কোনো ভাবনা নেই। কিন্তু তার কিছুই ভালো লাগে না। জীবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। ঘর-বাড়ি, স্ত্রী-সন্তান কোনোকিছুই আর তাকে আকর্ষণ করে না। এ অস্থিরতা সইতে না পেরে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে সে।

হোজা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। হঠাৎ কিছু না বলেই পাশে রাখা লোকটির কাপড়ের বোচকা নিয়ে দিলেন এক ছুট এবং নিমেষে হয়ে গেলেন চোখের আড়াল। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই লোকটিও পিছু ধাওয়া করলো। কিন্তু হোজাকে পায় কে?

অনেকদূর যাওয়ার পর রাস্তার ওপর এক জায়গায় বোচকাটি রেখে গাছের আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগলো হোজা। এদিকে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত অবসন্ন উদ্বিগ্ন লোকটি যখন এখানে এসে তার বোচকা খুঁজে পেলো, আনন্দে চিৎকার করে সে বলে উঠলো, পেয়েছি! পেয়েছি! এইতো আমার বোচকা। বহুদিন সে এত খুশি হতে পারে নি। হোজা আড়াল থেকে হেসে বললেন, দুঃখবিলাসীদের এভাবেই শায়েস্তা করতে হয়।

আসলে আপনার যা আছে তা নিয়ে তৃপ্ত হোন। ভাবুন তাদের কথা যারা আপনার চেয়েও খারাপ অবস্থায় আছে। শুকরিয়া করুন যে, তাদের চেয়ে ভালো আছেন। আপনার মন খারাপ হবে না। আর প্রত্যাশা করবেন না। কী পাচ্ছেন নয়, কী দিতে পারেন তা নিয়ে ভাবুন। আপনার কষ্ট থাকবে না।

মানুষকে ভালবাসুন। অন্যদের ক্রটিগুলো খুঁজে না বেড়িয়ে কী কী গুণ তাদের আছে তা নিয়ে ভাবুন। প্রশংসা করুন, সাফল্যের জন্যে অভিনন্দিত করুন। মেডিটেশনে কল্যাণ কামনা করুন। আপনার প্রশান্তি বেড়ে যাবে।

অহেতুক মুড অফ বা মন খারাপকে এড়ানোর জন্যে ব্যস্ত থাকুন। পড়ালেখার পরও যে সময়গুলো কিছু করার নেই, দুঃখবিলাসে না কাটিয়ে মানুষের জন্যে কাজ করুন। আসলে স্ফোভ-কষ্টকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখবো স্ফোভের তুলনায় ঘটনাটা অনেক তুচ্ছ। এটা অবশ্য বয়সের কারণে। তরুণ বয়সটাই এমন যে, এ বয়সে স্ফোভটা একটু বেশিই থাকে।

কিন্তু মানসিক বয়সকে আমরা অনেক দ্রুত বাড়িয়ে নিতে পারি। মানসিক বয়স বাড়াতে পারলে দেখবো, এখন যে কথায় দুঃখ পাচ্ছি, কাঁদছি, সে কথাগুলো অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে, মা-বাবা, আত্মীয়স্বজনের সাথে একাত্মতা বাড়ছে। পারিপার্শ্বিক নেতিচিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে না। মাইন্ড করছি না।

## কাজ করে পড়ার খরচ যোগানো

**প্রশ্ন :** শিক্ষাজীবনে পড়াশোনার পাশাপাশি পার্ট টাইম জব কি গ্রহণযোগ্য? এক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে?

**উত্তর :** পড়াশোনার পাশাপাশি পার্ট টাইম জব করা যেতে পারে যদি সে কাজ পড়াশোনাকে ব্যাহত না করে। বরং বলা যায়, এভাবে কাজ করলে ভালো রেজাল্ট করার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কারণ অন্যরা যে সময়টাকে আড্ডাবাজি বা বন্ধুত্বের নামে অহেতুক নষ্ট করছে সেটাকেই আপনি কাজে লাগাচ্ছেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে যারা খ্যাতিমান হয়েছেন, সফল মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, তাদের অধিকাংশই খুব সাধারণ অবস্থা থেকে তিল তিল পরিশ্রমে আজকের অবস্থানে পৌঁছেছেন। আর তাদের লেখাপড়ার সুযোগ যে এত সহজলভ্য ছিলো না, তা তো বলাই বাহুল্য। অনেকেই নিজের লেখাপড়ার খরচ যোগানোর জন্যে যেকোনো কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক আলাউদ্দিন আল আজাদের উদাহরণ দেয়া যায়। গ্রামের এক সাধারণ পরিবারের সন্তান ছিলেন তিনি। মাত্র দেড় বছর বয়সে মা-কে হারান। বাবাকে হারান ১০ বছর বয়সে। সহায় সম্পত্তি যা ছিলো আত্মীয়স্বজনরা সব দখল করে বিতাড়িত করলো তাকে। নিঃস্ব আলাউদ্দিন যেন অনেকটা উপলব্ধি করলেন, সকল প্রতিকূলতাকে পরাস্ত করে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের একমাত্র অস্ত্র হলো শিক্ষা। বইয়ের মধ্যে খুঁজে পেলেন রোমাঞ্চের জগৎ। হাইস্কুল থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষার শেষ পর্যন্ত ক্লাসের

প্রথম স্থানটি ছিলো তার জন্যে নির্ধারিত। বলাবাহুল্য, নিজের পড়ার খরচ যোগাড় করতে হতো তার নিজেকেই। কখনো টিউশনি, কখনো খবরের কাগজের অফিসে পার্টটাইম-এই করেই চলতে হতো তাকে।

মা-বাবাকে হারিয়ে যে দাদীমার কাছে বড় হয়েছিলেন, বিনা চিকিৎসায় তাকে মারা যেতে দেখে চেয়েছিলেন ডাক্তার হতে। কিন্তু অর্থাভাবে তা-ও হলো না। ভর্তি হলেন বাংলায়। ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হলেন। এমএ-তেও তা-ই। স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্যে গেলেন বৃটেনে। লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করলেন। ৭০ সালে তিনি হয়েছিলেন রয়েল সোসাইটির ফেলো। আমেরিকা ভাষা সমিতির সদস্যও হয়েছিলেন তিনি। অসাধারণ মেধাবী ও সৃজনশীল রচনার জন্যে দেশে-বিদেশে তিনি খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিলেন। উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, কাব্য, শিশুতোষ রচনা, ভ্রমণকাহিনী, জীবনীগ্রন্থ-অর্থাৎ সাহিত্যের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে তার অনন্য সৃজনের স্পর্শ লাগে নি।

কাজেই পড়াশোনার পাশাপাশি খন্ডকালীন কাজ করতে পারেন যদি প্রয়োজন হয়।

**প্রশ্ন :** আমি একজন ছাত্র। আমার বড় ভাই-বোনেরা আমাকে কোনো সহযোগিতা করে না। আত্মসম্মানের জন্যে তাদের কাছে চাইতেও পারি না। এজন্যে তাদের ওপর আমার অনেক রাগ। এমতাবস্থায় আমার কী করণীয়?

**উত্তর :** আত্মসম্মানের কথা বলেছেন আপনি। সত্যিকারের আত্মসম্মানবোধ যদি থাকতো তাহলে বড় ভাই-বোন সহযোগিতা করছে না এজন্যে আপনি রাগ করতেন না। বরং চিন্তা করতেন-কীভাবে আপনি তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারেন। অন্যদের কাছ থেকে পাওয়া নয়, আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মানুষ সবসময় চিন্তা করে অন্যদের কীভাবে সে সহযোগিতা করতে পারে। আর ছাত্র হলেই যে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে, সহযোগিতা নিতে হবে তা নয়। অনেক ছাত্রছাত্রী আছেন যারা টিউশনি করে শুধু নিজের পড়া নয়, পরিবারকেও চালিয়েছেন। কাজেই বড় ভাই-বোনদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাচ্ছেন না-এজন্যে রাগ করার যৌক্তিকতা নেই।

**প্রশ্ন :** প্রতিদিন সন্ধ্যার পর পড়াশোনা করতে ইচ্ছা করে কিন্তু প্রায়ই কাজের চাপে পড়াশোনা করতে পারি না। রাতে শোবার আগে মন খারাপ হয় এজন্যে যে, সব কাজই হয়, কেবল পড়াশোনাটাই হয় না। ইদানীং নামাজও



হয়, মেডিটেশনও করা হয় দুইবার; কিন্তু পড়াশোনা হয় না মনের মতো করে। এভাবে জ্ঞান অর্জনে সারাজীবনই বাধার সম্মুখীন হচ্ছি। এখন আমার কী করণীয়?

**উত্তর :** আসলে পড়াশোনায় পরিশ্রম বেশি কিন্তু সফলতা কম—এই জাতীয় কোনো চিন্তা আপনার মনের গভীরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এজন্যেই কেবল পড়াশোনাতেই বাধাটা আসছে। এখন আপনি প্রোগ্রাম করে ফেলুন যে, এই সময়টুকু আমি পড়বো। এই সময় বন্ধুবান্ধব, মা-বাবা যে-ই আসুক, যে-ই ডাকুক, আমি উঠবো না, আমি পড়বো। অর্থাৎ আপনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবেন যে, আমি পড়বোই।

আর সন্ধ্যার সময় আপনি কিছু না কিছু তো করছেন। যা করছেন ঐ সময় সেটা প্রায়োরিটি পাচ্ছে, পড়াশোনা না। যদি পড়াশোনাটা প্রায়োরিটি হতো তাহলে আপনি ঠিকই পড়াশোনা করতেন। আসলে কাজ না করার জন্যে অনেক অজুহাত আছে। কিন্তু কাজ করার জন্যে একটা অজুহাতই যথেষ্ট—আমি কাজটা করবো।

**প্রশ্ন :** আমি একজন ছাত্র। আমি আমার মামার সাথে থাকি। সে ব্যাংকার ও ব্যবসা শুরু করবে। সে আমাকে দিয়ে তার কাজ করিয়ে নেয়। বিনিময়ে কোনো স্বীকৃতি ও গুরুত্ব দেয় না। আমি টিউশনি করি, তাতে খুব ভালোভাবে চলতে পারি। তাই ভাবি—অন্য কারো সাথে গিয়ে থাকবো। সে আমাকে শুধু তার স্বার্থে ব্যবহার করে। তার মনমতো উঠতে হয়, খেতে হয়, চলতে হয়। সে বলে, কোয়ান্টাম যা বলে তা জানি এবং প্রায়ই দেখি আমি যা করি সে তার বিপরীত করে ও চলে। কিন্তু যখন স্বার্থ থাকে, তখন তোষামোদ করে। আমার পড়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়, কিন্তু সময় দেয় না।

**উত্তর :** আপনার মামার ব্যাপারে আপনার অভিযোগ আছে, কিন্তু প্রশ্ন থেকে মনে হচ্ছে তার প্রতি আপনার দুর্বলতাও আছে। আর একটি ব্যাপার হলো যদি তার সাথে থাকেন তাহলে তার কথামতোই চলতে হবে। কিন্তু আপনি যেহেতু বলছেন যে, টিউশনি করেন এবং তাতে খুব ভালোভাবে চলতে পারেন তাহলে আর তার সাথে থাকার প্রয়োজনটা কী? স্বাবলম্বী হোন, নিজেকে গুছিয়ে নিন। সুযোগ থাকলে আলাদা থাকার ব্যবস্থা করুন। তাহলে হয়তো আপনার আর এই ক্ষোভ ও কষ্ট থাকবে না।

## পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা

**প্রশ্ন :** আমার পড়াশোনার খরচ চালাতে আমাকে কাজ করতে হয়। কিন্তু কাজ করতে আমাকে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়। ফলে পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু কাজটা বাদ দিলে পড়ালেখাও বন্ধ থাকছে। এ অবস্থায় কী করবো?

**উত্তর :** আসলে আমাদের সমস্যা হলো আমরা খুব অল্পতেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। অথচ যারা বড় হয়েছেন, এর চেয়ে অনেক বড় বড় প্রতিকূলতার মুখেও তারা ছিলেন প্রো-একটিভ। সবরের সাথে নীরবে শুধু কাজ করেই গেছেন। অস্থির হন নি, না-শোকর হন নি। সময়ের পরিক্রমায় তারাই সফল হয়েছেন।

অমর সুরস্রষ্টা বেটোভেনের কথা ধরুন। ১৭৭০ সালে জার্মানিতে জন্ম। শিশুবয়স থেকেই মদ্যপ আর বদমেজাজী বাবার অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। সংগীতে জন্মগত প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে যে ছেলে তাকে ‘বিস্ময়বালক’ হিসেবে উপস্থাপন করে অর্থ উপার্জনের জন্যে পিয়ানো-বাদক বাবা ছোট্ট বেটোভেনের ওপর চালাতেন শেখানোর অত্যাচার। একটু বড় হতেই বুঝলেন দায়িত্বজ্ঞানহীন বাবার কাছ থেকে মা আর ছোট দুটি ভাইয়ের অভিভাবকত্বটা তাকেই নিতে হবে। এজন্যে অনেক সুযোগও হাতছাড়া করেছেন। সংগীতে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্যে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ প্রদত্ত বৃত্তি নিয়ে ভিয়েনায় গেলেও মাত্র দুই সপ্তাহের মাথায় ফিরে আসেন মায়ের অসুস্থতার কথা শুনে। অল্পদিন পরই অবশ্য মা মারা যান। এদিকে ভাই-দুটোকে রেখে বেটোভেনেরও আর যাওয়া হলো না।

এ সবকিছুর মধ্য দিয়েই চলছিলো সুরস্রষ্টির কাজ। কিন্তু বেটোভেনের জীবনে সবচেয়ে বড় ট্রাজেডির সূচনা হয় যখন মাত্র ২৬ বছর বয়সে তিনি হারাতে শুরু করেন তার শ্রবণশক্তি। জীবনের শেষ ১৫টি বছর তিনি পুরোপুরি বধির ছিলেন। ভাবা যায়-একজন মানুষ কী অসাধারণ সব সংগীত সৃষ্টি করে চলেছেন, অথচ নিজে শুনছেন না কিছুই! তার অমর সৃষ্টি নাইনথ্ সিমফোনির প্রথম প্রদর্শনীর দিন বাজনা শেষে মন্ত্রমুগ্ধ দর্শক যখন কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো তখন বেটোভেন দেখলেন কেউ হাততালি দিচ্ছে না। মনে করলেন, শ্রোতারা বোধ হয় তার বাজনা পছন্দ করে নি। ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি।

বাজানোর সময় বেটোভেন লোহার একটা লম্বা রড কামড়ে থাকতেন যার

আরেক মাথা লাগানো থাকতো পিয়ানোর সাউন্ডবোর্ডে। লোহার রডের মধ্য দিয়ে বাজনার কম্পন নিজের চোয়ালে অনুভব করে তিনি নিয়ন্ত্রণ করতেন সুরের বৈচিত্র্যকে।

নিজেকে কিছুক্ষণের জন্যে বেটোভেনের জায়গায় বসিয়ে কল্পনা করণ। শুকরিয়া আদায় না করে আপনি পারবেন না। তখন আর এই ছোটখাটো বিষয়গুলোকে কিছুই মনে হবে না। আপনাকে তো টিউশনি করে খরচ যোগাতে হয়। তা-ও কেবল নিজের খরচ। কিন্তু এমন ছাত্রও আছে যাকে দিনমজুরের কাজ করে নিজের পড়ার খরচ তো বটেই, সংসারের খরচও যোগাতে হয়েছে, তারপরও তারা এ-প্লাস পেয়েছে।

তেমনি একজন দিনমজুর হাসান। কুড়িগ্রামের এই শিক্ষার্থী ২০০৯ সালে এসএসসিতে এ-প্লাস পেয়েছে। কিন্তু হকার বাবার উপার্জনে সংসার না চলায় পড়ার সময় কমিয়ে তাকে নিতে হয়েছে দিনমজুরের কাজ। দিনভর ধানকাটা, নিড়ানির কাজ করে রাতে যে একটু নিরিবিলি পড়বে সে জো নেই, কারণ কেরোসিন কেনার পয়সা নেই। ফলে দিনের আলোয় যতটুকু পারতো সেটুকুই পড়তো। একটামাত্র ঘরে গাদাগাদি করে থাকতে হতো বলে গোয়ালঘরে বেড়া দিয়ে থাকতো সে।

আপনার অবস্থা নিশ্চয়ই এই হাসানের চেয়ে ভালো। অতএব শুকরিয়া আদায় করণ এবং এর মধ্য দিয়েই ভালো করার উদ্যোগ নিন।

**প্রশ্ন :** আমার বাড়িতে মেহমান থাকে সবসময় তাই পড়াশোনায় বিঘ্ন হয়। লাইব্রেরিতে যেয়ে পড়ার উপায় নেই, বাড়িতে কোলাহল থাকে, বাবা থাকে। এ বিষয়ে কিছু বলার সাহস আজ পর্যন্ত হয় নি। আমি এখন কী করতে পারি?

**উত্তর :** পরিবেশ-পরিস্থিতি নয়, মানুষ প্রথম হেরে যায় তার মনের কাছে। আর প্রতিকূলতা আপনাকে গড়ার প্রয়োজনেই। কারণ সমস্যা-বাধার মুখে না পড়লে আপনার অন্তর্গত শক্তি জেগে ওঠার পথ পাবে না। এটাই সফল হওয়ার প্রক্রিয়া।

সফল হতে হলে তাই-বাসায় পড়ার পরিবেশ নেই, হোস্টেলে সিট সমস্যা, আর্থিক টানাপোড়েন, টিউশনি করতে ভালো লাগে না, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, ভালো সাবজেঞ্চে চান্স পাই নি, টিচার ভালো না বা উৎসাহ দেয়ার কেউ নেই-এ জাতীয় অজুহাত না দিয়ে প্রতিটিকেই গ্রহণ করণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে, ভুল থেকে শেখার সুযোগ হিসেবে।

আসলে প্রতিকূলতা অনেক সময় গাধার মগজও খুলে দেয়। এ নিয়ে একটি মজার গল্প আছে—

কৃষকের বুড়ো গাধাটি পা ফসকে পড়ে গেল বাড়ির পাশের মজে যাওয়া কুয়োয়। পড়েই জুড়ে দিলো তারস্বরে চিৎকার। দিনরাত শুধু ব্যা-ব্যা চিৎকার। কৃষকের ঘুম হারাম হয়ে গেল। বাড়িতে লোকজন থাকতে পারছে না, ছেলে-মেয়েরা পড়তে পারছে না, প্রতিবেশীরা শান্তিতে কাজ করতে পারছে না।

মহাবিরক্ত হয়ে কৃষক সিদ্ধান্ত নিলো কুয়োটা বুজিয়ে ফেলবে। এতে বুড়ো গাধাটা মরবে। জায়গাটাও কাজে লাগবে। কিন্তু এত মাটি কোথায় পাবে? শেষমেশ প্রতিবেশীদের শরণাপন্ন হলো।

বাড়ি বাড়ি গিয়ে বললো—যার যত ময়লা-আবর্জনা আছে সব যেন বুড়ি ভরে নিয়ে আসে তার বাড়ির কুয়োতে ফেলার জন্যে। সবাই মহা উৎসাহে বাড়ির আনাচে-কানাচে যত আবর্জনা আছে সব এনে ধামায় ভরে ফেলতে লাগলো কুয়োয়।

প্রথম কিছুক্ষণ গাধা বুঝলোই না কী ঘটতে চলেছে। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই সে বুঝলো—সবাই মিলে তাকে ময়লাচাপা দিতে চাইছে। সে-ও দমবার পাত্র না। বুদ্ধি ঠিক করে ফেললো। একেক গামলাভর্তি ময়লা পড়ে আর গাধা পিঠ ঝাঁকিয়ে ময়লাটুকু ঝেড়ে তার ওপরে উঠে দাঁড়ায়। এই করে করে একসময় কুয়োটি যখন প্রায় ভরে গেল একলাফে গাধা বেরিয়ে এলো বাইরে। যে ময়লা ফেলা হচ্ছিলো তাকে কবর দেয়ার জন্যে সে ময়লাকেই সে ব্যবহার করলো মুক্তির অবলম্বন হিসেবে।

তাই প্রতিকূলতাকে ইতিবাচকভাবে নিন। বুদ্ধি শাণিত হবে। আপনি হয়ে উঠবেন শক্তিমান। ভাবুন মুন্সীগঞ্জের শাহীন মিয়ার কথা। যার মা বিয়েবাড়িতে মসলা বেটে, থালাবাসন ধুয়ে সংসার চালান। বিয়েবাড়ির উচ্ছিষ্ট খাবার জুটলে খুশিমনে নিয়ে আসেন বাড়িতে তিন সন্তানকে খাওয়াবার আশায়। থাকেন ভাড়া করা একটা ছোট্ট টং ঘরে। ঘরে একটি চৌকি ও একটি টেবিল পাতা। মেঝেতে মা-বাবা আর চৌকিতে তিন ভাই-বোন জড়াজড়ি করে ঘুমায়। টেবিলটাতে ওরা পালা করে লেখাপড়া করে। ঘরের ভাড়া দিতে হয় মাসে ৭০০ টাকা। এত প্রতিকূলতার মধ্যেও শাহীন লেখাপড়া চালিয়ে গেছে। ক্লাস এইটে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে এসএসসিতে। এখন স্বপ্ন দেখছে উচ্চশিক্ষা নিয়ে আরো এগিয়ে যাবার। নিঃসন্দেহে আপনার অবস্থা শাহীন মিয়ার চেয়ে ভালো।

## ইংলিশ মিডিয়াম

**প্রশ্ন :** আমার বোনকে আমি মা-বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে ইংলিশ মিডিয়ামে দিয়েছি। কারণ সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে আইবিএ, বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুবিধা হবে। সে মাত্র প্লে গ্রুপে পড়ছে। আমি কি ভুল করেছি? এখন কি ওকে বাংলা মিডিয়ামে ট্রান্সফার করবো?

**উত্তর :** সন্তানকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানোর অর্থহীন প্রতিযোগিতায় ইদানীং আমাদের সমাজের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোও যেভাবে शामिल হয়েছে তারই একটি উদাহরণ আপনার ঘটনাটি।

একটা সময় ছিলো যখন অটেল অর্থবিত্তের অধিকারী উচ্চবিত্ত সমাজের মানুষ মনে করতো দেশে কোনো শিক্ষাব্যবস্থা নেই, নেই কোনো ভবিষ্যৎ। দেশে পড়াটাকে এদের ছেলে-মেয়েরা খুব অপমানজনক মনে করতো। তাদের চাহিদাতেই গড়ে উঠলো ইংলিশ মিডিয়াম নামের এক খাপছাড়া শিক্ষাব্যবস্থা। যেখানে একটি শিশু তার মাতৃভাষা ঠিকমতো বলতে শেখার আগেই পড়তে শিখছে ইংরেজি রাইম, মুখস্থ করছে বৃটেনের ইতিহাস।

কিন্তু পরিহাস হলো, অতি উচ্চ বেতনের এসব অভিজাত স্কুলে পাঠিয়ে সন্তানকে কোয়ালিটি এডুকেশন দিতে পারছেন বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার আগেই এই অভিভাবকরা টের পেতে শুরু করলেন এর বিষফোঁড়ার যন্ত্রণা।

পাশ্চাত্য শিক্ষার পাশাপাশি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির খোলামেলা আচরণেও অভ্যস্ত হয়ে উঠলো এই নব্য শিক্ষাব্যবস্থায় দীক্ষিত নতুন প্রজন্ম। কোয়ালিটি এডুকেশন আয়ত্ত করতে পারুক না পারুক, ড্রাগ সেক্স আর অশিষ্টাচারের পাশ্চাত্যশিক্ষা নিতে তাদের একটুও দেরি হয় নি।

আর এখন এই প্রতিযোগিতায় शामिल হয়েছে আমাদের সমাজের নব্য ধনিক শ্রেণী-দুর্নীতি ও অবৈধ উপার্জনের মাধ্যমে যারা গড়ে তুলেছে বিশাল সম্পদের পাহাড়। সন্তানকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানোটা তাদের ফুটানিরই একটা অংশ। ছেলে-মেয়েরা ইংরেজিতে কথা বলছে, উগ্র পোশাক পরছে, গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরছে-তাদের কাছে যাতে ওঠার এটাই মাপকাঠি। এই সন্তানরা না হচ্ছে ইংলিশ, না হচ্ছে বাঙালি। মাঝখান থেকে বাংলা কালচারে অভ্যস্ত এক বিভ্রান্ত প্রজন্ম। এবং বাস্তবতা হচ্ছে বুয়েট বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারি মেডিকলে এদের কজন চাস পায়? অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলা মিডিয়ামের ছাত্রছাত্রীদের সাথে প্রতিযোগিতায় এরা তো

দাঁড়াতেই পারে না। এদের ভরসা হয় বিদেশ, নয়তো দেশে ব্যাণ্ডের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা কিছু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি। কাজেই ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রছাত্রীরা বাংলা মিডিয়ামের ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে বেশি জানে এই ধারণা যারা পোষণ করেন তারা আহাম্মকের স্বর্গে বাস করছেন।

আর ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানোর সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব আমাদের সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে পড়তে শুরু করেছে। কারণ এই ছেলে-মেয়েরা না পারবে তাদের উচ্চবিত্ত সহপাঠীদের লাইফস্টাইলে অভ্যস্ত হতে, না পারবে ইংলিশ মিডিয়ামে ভালো রেজাল্ট করতে, না পারবে দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিতে। মাঝখান থেকে হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত হয়ে নিজের যতটুকু সম্ভাবনা ছিলো সেটাকেও নষ্ট করে ফেলবে।

তবে আমরা কিন্তু ইংরেজির বিরুদ্ধে না, আমরা ইংরেজির পক্ষে। কারণ ইংরেজি যদি আপনি আয়ত্ত করতে না পারেন, তবে প্রযুক্তিতে অগ্রসর হতে পারবেন না। ভবিষ্যতে কাজ করা আপনার জন্যে খুব মুশকিল হবে। এজন্যে সবচেয়ে ভালো হয় ইংরেজি ভার্সন (জাতীয় কারিকুলাম) আয়ত্ত করা। কাজেই এ প্রেক্ষাপটগুলো মাথায় রেখেই যদি আপনি আপনার বোনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন, সেটাই যথার্থ হবে।

**প্রশ্ন :** ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে শিক্ষার চেয়ে অবিদ্যাই শেখাচ্ছে। সমাজে এর খারাপ প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সাধারণ স্কুলে পড়ানোর ব্যবস্থা কি গড়ে উঠেছে? এ অবস্থায় কীভাবে সমস্যা এড়ানো যায়?

**উত্তর :** আমরা চাহিদা সৃষ্টি করেছি বলেই ব্যাণ্ডের ছাতার মতো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো গড়ে উঠেছে। একটা সূত্রমতে শুধু ঢাকা শহরেই এ ধরনের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সংখ্যা এখন সাত হাজার। এগুলো স্কুল নয়, ব্যবসাকেন্দ্র। এখন অলিগলিতে যত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে এগুলো মানের দিক থেকে অত্যন্ত নিম্নমানের।

ভালো রেজাল্টের জন্যে ইংলিশ স্কুলের কোনো প্রয়োজন নেই। ছেলে-মেয়েকে ইংলিশ স্কুলে পড়িয়ে যে পরিমাণ অর্থ সময় এবং শ্রম দেন সেটা যদি সাধারণ স্কুলে পড়িয়ে দিতেন তাহলে এর চেয়ে ভালো রেজাল্ট হতো। ভালো ফলাফলের জন্যে স্কুল কোনো শর্ত নয়।

এখন গ্রামের ছেলে-মেয়েরা এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাচ্ছে।

তাদের ঘড়ি ছিলো না, সূর্য দেখে সময় ঠিক করেছে। পরীক্ষার ফিস দিয়েছে জমি বন্ধক রেখে। অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। তাহলেই তথাকথিত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের দৌরাত্ম্য কমবে।

**প্রশ্ন :** আমার বাচ্চারা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। আমি কি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল বাদ দিয়ে ওদের বাংলা মিডিয়ামে পড়াবো?

**উত্তর :** এ ব্যাপারে রি-একটিভ হওয়ার প্রয়োজন নেই। ইংলিশ মিডিয়ামের যেসব খারাপ প্রবণতার কথা বললাম সেটা যে সবার মধ্যেই আছে, তা নয়। আবার বাংলা মিডিয়ামের ছেলে-মেয়েদের মধ্যেও যে এসব সমস্যা নেই তা-ও নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে বাচ্চা কী করছে, কাদের সাথে মিশছে তা খেয়াল রাখা।

তবে দেশে যদি মাস্টার্স পর্যন্ত পড়াতে চান তাহলে ইংলিশ মিডিয়ামে না পড়ানোটাই বরং বেশি লাভজনক। দেশে পড়াতে হলে ও-লেভেল, এ-লেভেলের কোনো দরকার নেই। আর ও-লেভেল পড়িয়ে কোনো ছেলে-মেয়েকে বিদেশে পাঠানো উচিত নয়, মাস্টার্স পড়া ছাড়া। ৯০% ক্ষেত্রেই তাদের উচ্চশিক্ষা হয় না। সবসময় বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে বিকল্প কী করবেন তা চিন্তা করবেন। ইংলিশ মিডিয়াম নয়, ইংলিশ ভাষানে ন্যাশনাল কারিকুলামের শিক্ষা আয়ত্ত করাই আমাদের জন্যে ভালো।

**প্রশ্ন :** ইংলিশ মিডিয়াম থেকে এ-লেভেল করছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া কঠিন। প্রাইভেট কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বো নাকি বিদেশে চলে যাবো?

**উত্তর :** ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াকে কিন্তু আমরা দোষের কিছু মনে করি না। আমরা যেটা বলি যে, ইংলিশ কালচার যেন আপনাকে স্পর্শ না করে। ইংরেজি ভাষার আমাদের এখনো প্রয়োজন আছে, ইংলিশ কালচার-এর আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আর এ বয়সে বাইরে যাওয়াটা আরো ঝুঁকিপূর্ণ। কাজেই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির মধ্যে পড়াশোনার মান আসলেই যেখানে ভালো, খোঁজখবর নিয়ে সেখানে ভর্তি হতে চেষ্টা করুন। আর এ-লেভেল থেকে যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায় না তা না, ভর্তি হওয়া গেছে। হয়তো কঠিন, কিন্তু তাতে কী? কঠিন কাজ করার জন্যেই তো কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট।

**প্রশ্ন :** আমাদের দেশে বিভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে। ইদানীং কিছু স্কুল-কলেজে ইংলিশ মিডিয়ামের পাশাপাশি দেশীয় কারিকুলামে ইংলিশ ভার্সন চালু হয়েছে। এখন বাংলা মাধ্যম এবং ইংলিশ মাধ্যম এ দুটির মধ্যে কোনটি বেশি উপযুক্ত?

**উত্তর :** এখন ইংরেজি মাধ্যমে যে দেশীয় কারিকুলাম চালু রয়েছে এটা ভালো। কারণ এখন পৃথিবীতে চলতে হলে ইংরেজিতে আপনার দক্ষতা প্রয়োজন এবং আপনার সন্তানকে ইংরেজিতে দক্ষ করতে হবে। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। বাংলা আমরা অবশ্যই জানবো, বাংলা ব্যবহার করবো, কিন্তু ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তাই দেশীয় কারিকুলামে ইংরেজি ভার্সনটা বেশি কার্যকরী বলে আমরা মনে করি।

## শিক্ষকদের প্রশ্ন

**প্রশ্ন :** আমি ঢাকার একটি পরিচিত কলেজের একাউন্টিংয়ের লেকচারার, কিছু ইন্টারনাল কারণে কলেজে প্রায়ই ক্লাস হয় না। হলেও উপস্থিতি ভালো থাকে না। ফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক হিসেবে নিজের মেধা ও যোগ্যতার বিকাশ ঘটাতে পারছি না; ছাত্রদেরও কিছু দিতে পারছি না, নিজেও কিছু শিখতে পারছি না। এমন সব অযোগ্য ক্ষমতাধর লোকগুলো ওপরের পোস্টে বসে আছে যাদের এসব কথা বললেও লাভ হয় না। তাছাড়া আমি একটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে বিবিএ-র ক্লাস নেই। সেখানেও দেখা যায়, যেসব টিচার বেশি পড়ায় বা আদর্শ-সততার কথা বলে এসব টিচারের ক্লাস ছাত্ররা কম পছন্দ করে। ফলে প্রশাসন তাদের ব্যাপারে আগ্রহ কম দেখায়। এরকম পরিস্থিতিতে নিজের বিবেকের কাছে ছোট হয়ে পড়ছি। কীভাবে নিজেকে একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি?

**উত্তর :** আসলে বাস্তবতাটাকে আমাদের মেনে নিতে হবে। এক নম্বর হচ্ছে, এখন আমাদের দেশে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির নামে যে শিক্ষাব্যবস্থা চলছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেখানে শিক্ষা হচ্ছে একটা পণ্য। আর এ পণ্যের ক্রেতা হচ্ছে এসব জায়গায় ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীরা (যারা সাধারণত সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মেধার প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হতে পারে নি)। আর কোনো পণ্যের কেনাবেচা যেমন নির্ভর করে ক্রেতার পছন্দের ওপর, তেমনি এই



প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোও পরিচালিত হয় এর ছাত্রছাত্রীদের ভালোলাগা-মন্দলাগার ভিত্তিতে। স্বাভাবিকভাবেই এখানে যারা পড়াবেন তাদের মূল্যায়নটাও হবে এই মাপকাঠিতেই। তাদের চাকরি নির্ভর করবে ছাত্রদের র‍্যাংকিংয়ের ওপর, ইন্ডালুয়েশনের ওপর। ছাত্ররা তাকে কতটুকু পছন্দ করছে, বেশি নম্বর দিয়ে বা কম পড়িয়ে তিনি কতটা তাদের প্রিয়ভাজন হতে পারছেন ইত্যাদির ওপর। এটাই বাস্তবতা।

কারণ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোর কাছে তাদের কোটি টাকা বিনিয়োগের রিটার্নটা গুরুত্বপূর্ণ, ছাত্রদের স্ট্যান্ডার্ড নয়। কোনোভাবে ৩.৫ পাইয়ে দিতে পারলেই তারা খুব খুশি। আর কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এখানে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের কাছেও সম্ভান কতটা জ্ঞানার্জন করলো বা নীতি-নৈতিকতায় দীক্ষিত হলো তার চেয়ে ডিগ্রিটা গুরুত্বপূর্ণ, ভালো গ্রেডিংটা গুরুত্বপূর্ণ। ভালো সিজিপিএ পেলেই তারা খুশি।

অতএব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে গেলে ঐ পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে চললেই ছাত্ররা আপনার ভক্ত হবে। আর আপনি যদি কিছু করতে চান, সততা-নৈতিকতা নিয়ে চলতে চান, তাহলে আপনাকে শূন্য থেকে শুরু করতে হবে। কষ্ট করতে হবে। নিজেই একটা ইনস্টিটিউট গড়ে তুলতে হবে। কষ্ট হবে, কিন্তু একটা সময় আসবে যখন আপনি তৃপ্তি পাবেন।

**প্রশ্ন :** আমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষক। যদিও আমি ছাত্রছাত্রীদের আমার মেধা, দক্ষতা এবং সেবা সর্বোত্তমভাবে দেয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু এদের আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা অসম্ভব। তাহলে শিক্ষক হিসেবে আমার ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত?

**উত্তর :** ‘এদেরকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা অসম্ভব’-আমরা এই অসম্ভব কাজটাকেই সম্ভব করতে চাই। নবীজী (স) বলেছেন, প্রতিটি মানুষ প্রকৃতির ধর্মে জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ প্রতিটি মানুষ জন্মগতভাবেই ভালোত্বের প্রকৃতি নিয়ে আসে। পরিবেশ-পরিস্থিতি বা অবিদ্যার প্রভাবে সে অসৎ-অনৈতিক হয়।

আমরা মনে করি-একজন মানুষ যেকোনো সময় ভালো হতে পারে। তার ভালো গুণগুলো অনেক নিচে চাপা পড়ে থাকতে পারে। কিন্তু সেটাকেই যদি আমরা একটু হাত বুলিয়ে দেই তাহলে তার মধ্যেও ভালো মানুষ জেগে উঠতে পারে।

এ নিয়ে একটি সত্য ঘটনা আছে। ১২/১৩ বছর বয়সী এক কিশোর। দুবার সফলভাবে ব্যাংক ডাকাতি করার পর তৃতীয়বারে সে ধরা পড়লো। এর মধ্যে সে তিনটা খুনও করেছে। কিশোরকে সংশোধন কেন্দ্রে নিয়ে আসা হলো। সেখানকার দায়িত্বে ছিলেন উদারমনস্ক একজন ফাদার। প্রথম যেদিন কিশোরটির সাথে দেখা করতে গেলেন ফাদার, সে খুব উদ্ধত ভঙ্গিতে বসে ছিলো। হাতে ছিলো সিগারেট। ফাদার তার সামনে এসে বসতেই কিশোর মুখভর্তি ধোঁয়া ছেড়ে দিলো তার মুখের ওপর।

ফাদার কিছুই বললেন না। বরং তার হাতেপায়ে বেড়ি লাগানো ছিলো-সেটা খুলে দিতে বললেন। এরপর থেকে প্রতিদিনই ফাদার কিশোরটির সাথে কথা বলতে আসেন। কিন্তু না তাকে দিয়ে কিছু বলানো যায়, না তার সাথে কোনো কথা বলা যায়। ভালো কিছু বলতে গেলেই কিশোরটি খুব রেগে উঠে বলতো, আমাকে এসব বলে কোনো লাভ নেই। এসবই আমি জানি। কিন্তু ফাদার বিরক্ত হন না। বরং আরো ধৈর্য ধরে তার সাথে কথা বলেন, তার ঔদ্ধত্যগুলো সহ্য করেন।

বেশ কিছুদিন কেটে গেল এভাবে। আন্তে আন্তে ছেলেটির ঔদ্ধত্য যেন কিছুটা কমে এলো। একদিন ফাদার বললেন, তুমি কি লেখাপড়া শিখবে? আমার মনে হয় তুমি লেখাপড়ায় খুব ভালো করতে পারবে। কারণ তুমি খুব ভালো ছাত্র।

এই প্রথমবারের মতো কিশোরটি মুখ খুললো। বললো, ফাদার, আমি তো আপনাকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু সেই আপনিও মিথ্যা কথা বলছেন আমার সঙ্গে? আমি লেখাপড়া শিখি নি। ছোটবেলায় একবার স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু পাশ করতে পারি নি বলে সেই স্কুল থেকেও আমাকে বের করে দেয়া হয়েছিলো। সেই আমাকেই কি না আপনি বলছেন ভালো ছাত্র! এটা মিথ্যাবাদিতা ছাড়া আর কী?

ফাদার বললেন, তুমি অবশ্যই ভালো ছাত্র। কারণ তুমি তোমার শিক্ষকদের কথাকে সবসময় অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছো। কিন্তু তোমার শিক্ষকরা খারাপ ছিলো। তারা কেউ ছিলো চোর, কেউ হাইজ্যাকার, কেউ খুনী। তারা তোমাকে যা যা বলেছে তুমি তা-ই করেছো। তা না হলে তুমি তিনটা খুন করতে পারতে না, দুবার সফলভাবে ব্যাংক ডাকাতি করতে পারতে না। এখন তুমি যদি শিক্ষক পরিবর্তন কর, ভালো শিক্ষকের কাছে যাও তাহলে তোমার জীবনও বদলে যাবে।

শুনে কিশোরের চোখ দিয়ে এই প্রথমবার পানি গড়িয়ে পড়লো। সে

ফাদারকে তার শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করলো। পরবর্তীতে সে-ও একজন ধর্মযাজকে পরিণত হয়েছিলো।

অর্থাৎ মানুষের পরিবর্তন যে কখন আসবে, কীভাবে আসবে কেউ বলতে পারে না। আর মানুষকে বিচারের দায়িত্ব স্রষ্টা কোনো ব্যক্তিকে দেন নি। স্রষ্টা মানুষকে আলোকিত করার চেষ্টা করতে বলেছেন। হবে কি হবে না-এটা স্রষ্টার হাতে। শিক্ষক হিসেবে আমাদের কাজ হচ্ছে তাকে আলোকিত করার চেষ্টা করা। আপনি আপনার জ্ঞান, বুদ্ধি দিয়ে চেষ্টা করবেন।

আসলে যারা ডেটিং বা ঐ ধরনের অস্থিরতার মধ্যে লিপ্ত তাদের জীবনে শান্তি থাকলে হয়তো তারা এসবে জড়াতো না। মা-বাবার হয়তো অনেক টাকা আছে। কিন্তু তাকে দেয়ার মতো সময় তাদের নেই। সন্তানের পেছনে কাঁড়ি কাঁড়ি খরচ করেই তারা দায়িত্ব পালন করেছেন বলে মনে করেন। ফলে এত বিস্ত-বৈভবের মধ্যে থাকতে থাকতে সন্তানরাও হয়ে উঠেছে উচ্ছৃঙ্খল আর দুর্বিনীত। অবিদ্যা আর অনৈতিকতায় গা ভাসিয়ে দিচ্ছে।

সেইসাথে এখনকার মিডিয়া, তাদের পারিপার্শ্বিকতা সবকিছু থেকেই সে শিখছে-এই অনাচার করাটাই স্মার্টনেসের প্রতীক। কাজেই জীবন যে অনেক বড়, অনেক মহান, অনেক কিছু করার আছে-সেটা তার সামনে নেই। এই জ্ঞান, এই বিদ্যার আলোয় আলোকিত করার কাজটাই আপনাকে করতে হবে। আপনার ভূমিকা হবে একজন ভালো শিক্ষকের।

## জীবনের মডেল

**প্রশ্ন :** জীবনে মডেল বা অনুসরণীয় ব্যক্তির কি আসলে কোনো গুরুত্ব আছে? মডেল বলতে তো আমরা রূপালী পর্দার সেলিব্রেটিদেরই বুঝি। আমরা তো এমনিতেই তাদের ভক্ত। অন্য মডেলের আর প্রয়োজন কী?

**উত্তর :** আপনি যে মডেল বা জীবনাদর্শকে নির্বাচন করবেন, আপনার জীবনটা তার মতোই হবে। এই যেমন মাইকেল জ্যাকসন। তারকার মতো উজ্জ্বল এবং ছাইয়ের মতো নিঃশেষ। সবচেয়ে বড় স্টার-মেগাস্টার ছিলেন। কিন্তু পতন হতে কতক্ষণ?

তার আইকন ছিলো এলভিস প্রিসলি। এলভিস প্রিসলির জীবন দেখুন- ৪২ বছর বয়সে মারা যান। কারণ, তার মা মারা গিয়েছিলেন ৪২ বছর বয়সে। তিনি মনে করতেন যে, তিনিও ৪২ বছর বয়সে মারা যাবেন। ফলে

ব্রেনে নেগেটিভ প্রোগ্রাম হয়ে গেল। কীভাবে মারা গিয়েছিলেন তিনি? মাদকাসক্ত অবস্থায়। তো যার আইকন এলভিস প্রিসলি তার পরিণতিটা কী হবে? মাইকেল জ্যাকসন ৫০ বছর বয়সে মারা গেলেন। হয়তো আট বছর বেশি বেঁচে ছিলেন। কিন্তু গত ১০ বছরে তার তেমন কোনো কর্মকান্ড ছিলো না। পরিণতিটা কত করুণ!

তার শ্যামলা চেহারাই তো কত গ্ল্যামারাস ছিলো। সেটাকে প্লাস্টিক সার্জারির পর সার্জারি কেন? এলভিস প্রিসলি ফর্সা ছিলেন, তাকেও ফর্সা হতে হবে। কারণ ঐ যে, আইকন।

এই যে যাদেরকে নিয়ে তরুণ-তরুণীরা লাফালাফি করে, নায়ক-নায়িকা হোক বা মডেল-এদের কাউকেই কি শ্রদ্ধা করা যায়? কারণ যাকে কেনা যায় সে হচ্ছে একটা প্রোডাক্ট। তাকে কেউ কখনো শ্রদ্ধা করে না। তার জীবনে কোনো শান্তি থাকে না। কিছুদিন আগে এমটিভির এক ঘোষিকা-নাফিসা সুইসাইড করলো। মেয়েরা অনেকেই নাফিসা হওয়ার কল্পনা করেছে। অনেক ছেলে ভেবেছে যে, আমার কল্পনার নারী হচ্ছে নাফিসা-নাফিসাকে যদি বিয়ে করা যেত! বাস্তবে কী জীবন তাদের? তাদের জীবনে কোনো শান্তি নেই।

আবার ভালো ‘প্রোডাক্ট’ হতে হলেও কী করতে হবে? সেখানেও পরিশ্রম ছাড়া কোনো উপায় নেই। নায়িকাদের যে কী পরিমাণ কষ্ট করতে হয়! তারা যে কী পরিমাণ না খেয়ে থাকে! খাবার দেখে, কিন্তু খেতে পারে না। এমনকি লুকিয়েও না। কারণ নিজেকে যতদিন ফিট রাখতে পারবে ততদিন পয়সা আছে। ফিটনেস নাই, পয়সা নাই। কখনো কখনো নিজের মায়ের কাছেও সে প্রোডাক্ট! অতএব মা-ও তাকে খাবার দেয় না। একদম খাঁচার পাখিকে যেরকম করে খাবার দেয়া হয় তাদের জীবনও তা-ই। পর্দায় খুব হাসতে হাসতে আসে কিন্তু পর্দার বাইরে তাদের জীবন হচ্ছে সাধারণভাবে দুঃখের। এইতো কয়েকদিন আগে গায়িকা হুইটনি হিউস্টনের মৃতদেহ পাওয়া গেল বাথটাবে-মাদকাসক্তির পরিণতি।

আর এই প্রোডাক্ট যদি আমাদের মডেল হয়, আমরা কী করবো? আমরাও প্রোডাক্টে রূপান্তরিত হবো এবং তাদের মতো অশান্তিতে ভুগবো।

তাই আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে, আপনি প্রোডাক্ট হবেন, না ব্যতিক্রম হবেন। ট্রেন্ডকে ফলো করবেন, না ট্রেন্ড-সেটার হবেন? কারণ জীবন একটাই। যা কিছু করার এ জীবনেই করতে হবে। তাই এটা পাওয়ার জন্যে ট্রেন্ডকে ফলো করলে হবে না। অর্থাৎ প্রচলিত ধারায় চললে হবে না। আপনাকে ব্যতিক্রম হতে হবে। ট্রেন্ড-সেটার হতে হবে।

বর্তমান অবিদ্যা আক্রান্ত সমাজে ট্রেড-সেটার হতে হলে আপনাকে মেধাবী দক্ষ ভালো মানুষ হতে হবে। আলোকিত মানুষ হতে হবে। আর আলোকিত মানুষ হতে হলে আলোকিত মানুষকেই মডেল বা অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। যখন আপনি আলোকিত বরণ্য মানুষকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করবেন, অবচেতনভাবেই তার ভালো দিকগুলো আপনাকে উদ্বুদ্ধ করবে, অনুপ্রাণিত করবে। সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায় আপনি পরিতৃপ্ত জীবনের পথে এগিয়ে যাবেন।

# ক্যারিয়ার



## চাকরি না স্বাধীন পেশা

**প্রশ্ন :** স্বাধীন পেশায় যাওয়া বোকামি না তো? ক্যারিয়ার হিসেবে কী গ্রহণ করা উচিত-চাকরি না স্বাধীন পেশা? আমরা তো কেরানিগিরিতে অভ্যস্ত। আমাদের দ্বারা কি শিল্প বা ব্যবসায় ভালো করা সম্ভব?

**উত্তর :** স্বাধীন প্রতিটি পেশা-শিল্প ব্যবসা কৃষি-সবকিছুতেই ভালো করা সম্ভব। মুনু সিরামিকস বিশ্বে সিরামিকসের ক্ষেত্রে তিন নম্বর প্রতিষ্ঠান। আমাদের গার্মেন্টস শিল্প এখন বৈদেশিক আয়ের মূল উৎস। পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়ার পরও আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আজ থেকে ৪০০ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রধানত তিনটি পেশায় নিয়োজিত ছিলেন-ব্যবসা, শিল্প এবং কৃষি। কৃষিতে তাদের মেধা এত বিকশিত হয়েছিলো যে, ৩৫০ প্রজাতির ধান উৎপাদন করতেন তারা। যত ধরনের সুগন্ধি মশলা আছে সবই তারা উৎপাদন করতেন। শিল্পে তারা মেধাকে এত বিকশিত করেছিলেন যে, মসলিনের মতো সূক্ষ্ম কাপড় তৈরি করতেন। টেক্সটাইল টেকনোলজির সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন এই মসলিন। আজ পর্যন্ত তুলা থেকে এর চেয়ে মিহি কাপড় তৈরি করা সম্ভব হয় নি। পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ আঁশের তুলা উৎপাদিত হতো যশোর ও বরেন্দ্র এলাকায়।

আমাদের সওদাগরেরা সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিতেন। চট্টগ্রামে জাহাজ তৈরি হতো। চট্টগ্রামে যে ‘বহদার হাট’ রয়েছে সেটি ছিলো ‘বহরদার’ অর্থাৎ নৌবহরের দার বা প্রধানের জায়গা। আমাদের কারিগররা জাহাজ বানাতেন। সেই জাহাজে তারা জাভা, সুমাত্রা, মালদ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি স্থানে যেতেন। বালিতে রামায়ণের নাটক অভিনয় তাদের সংস্কৃতির অংশে পরিণত হয়েছে। কারণ তাদের পূর্বপুরুষরা এই বাংলা থেকে গিয়েছিলেন। বাংলার বীর বিজয় সিংহ সিংহলের পত্তন করেন, সিংহল নাম তার নামানুসারেই। মধ্যযুগে ভাইকিংদের সাথে নৌযুদ্ধে এই বাংলা থেকে জাহাজ গিয়েছিলো। সমুদ্রযাত্রা আমাদের সংস্কৃতির এত অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিলো যে, চাঁদ সওদাগরের কাহিনীর মতো লোকসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিলো।

ফলশ্রুতিতে সেসময় আমাদের এই উপমহাদেশের জিডিপি ছিলো বিশ্বের জিডিপির ২২-২৩%। আর তখন ইংল্যান্ডের জিডিপি ছিলো বিশ্ব জিডিপির এক শতাংশ মাত্র। মুর্শিদাবাদ ছিলো লন্ডনের চেয়েও বড় শহর। লাহোরের অধিবাসীর সংখ্যা ছিলো ২০ লক্ষ। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকে



আমাদের পেশা সংক্রান্ত ধ্যানধারণা পরিবর্তিত হতে শুরু করলো। আমাদের মধ্যে ধারণা সৃষ্টি হলো যে, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সৃজনশীল কাজগুলো করার কোনো ক্ষমতাই আমাদের নেই। আমাদের অবস্থা দাঁড়ালো খাঁচায় আবদ্ধ পাখির মতো। এন্ট্রিপ্রিনিউরাল স্পিরিট (entrepreneurial spirit) হারিয়ে আমরা নিজেদেরকে শুধুমাত্র চাকরিজীবী অর্থাৎ চাকর ভাবতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে শুরু করলাম। যেখানে আমাদের সওদাগরেরা সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিতো, সেখানে সৃষ্টি হলো কালাপানির ধারণা অর্থাৎ সমুদ্র যাত্রা যদি কেউ করে তো তার জাত চলে যাবে, জাতচ্যুত হবে। ফলে কালক্রমে আমরা পরিচিত হলাম দুর্ভিক্ষপীড়িত, বন্যা কবলিত, জরা-ব্যাধি জর্জরিত একটি জনপদ হিসেবে।

স্বাধীন পেশায় যাওয়া নিয়ে আপনার যে হতাশা, যে বিভ্রান্তি-ক্যারিয়ার সংক্রান্ত এ হতাশা ও স্থবিরতার মূলে রয়েছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিগত অবক্ষয়। যত আমরা পূর্বপুরুষদের সেই সাহসী চেতনাকে, সেই উদ্যোগ ও উদ্যমকে জহৃত করতে পারবো, তত আমাদের মেধাকে আবারো শতধারায় বিকশিত করতে পারবো। নিজের অনন্য মেধাকে সেবায় রূপান্তরের মাধ্যমে নিজেই গড়তে পারবো পরিতৃপ্তিময় কর্মজীবন।

**প্রশ্ন :** চাকরির পরিবর্তে স্বাধীন পেশা বলতে কী বোঝায়?

**উত্তর :** স্বাধীন পেশা হচ্ছে সেই পেশা যেখানে আপনি নিজেই উদ্যোক্তা। আপনার নিজের উদ্যমের ওপর নির্ভর করবে আপনার পরিচিতি আর সম্মান-সবকিছু। যেমন-বৃত্তিজীবীদের স্বাধীন পেশা, কনসালটেন্টদের স্বাধীন পেশা, আইন পেশায় যারা আছেন তাদের স্বাধীন পেশা, ডাক্তার-যারা নিজেরা প্র্যাকটিস করেন-তাদেরও স্বাধীন পেশা।

**প্রশ্ন :** কর্মজীবনে চাকরি, স্বাধীন বৃত্তি বা ব্যবসার মধ্যে কোনটি বেছে নেবো?

**উত্তর :** যেখানে সৎভাবে কাজ করার সুযোগ আছে এবং অন্যের উপকার করার সুযোগ আছে-এরকম যেকোনো ব্যবসা বা চাকরি আপনি করতে পারেন। আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে, কোন কাজটা আপনি ভালো পারেন, কোন কাজে বেশি আনন্দ পান, কোন কাজে নিজের দক্ষতা ও মেধাকে সেবায় রূপান্তরিত করতে পারেন। সেটা খুঁজে বের করতে হবে এবং সেটাতে এক নম্বরে পৌঁছতে হবে।

দৃষ্টিভঙ্গি হবে-যদি জুতা সেলাই ভালো পারি, আমার জুতা সেলাই দেখে যেন সবাই বলে ‘এমনভাবে সেলাই করা হয়েছে যে, এটা সেলাই না আসল বোঝাই যাচ্ছে না’। একাউনটেন্ট হলে সেরা একাউনটেন্ট, আইটি স্পেশালিস্ট হলে সেরা আইটি স্পেশালিস্ট, শিক্ষক হলে সেরা শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার হলে সেরা ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে। যদি রাস্তা পরিষ্কারের কাজ করেন, সেরা ঝাড়ুদার হতে হবে। রাস্তার কোন দাগ কীভাবে তোলা যায় তা জানতে হবে। আপনি ঝাড়ু দেয়ার পর যাতে কোনো ময়লা না থাকে।

এরপর আপনি যে কাজটা জানেন সেই কাজের যারা ভোক্তা, মানে যাদের এই কাজটা প্রয়োজন তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে হবে এবং তাদের কাছে এটা প্রমাণ করতে হবে, এই কাজে আপনার চেয়ে ভালো আর কেউ নেই। এভাবে আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ অনন্য মেধার ভিত্তিতে পেশা সৃষ্টি করতে পারি। নিজের মেধাকে বিকাশ করার সবচেয়ে চমৎকার সুযোগ থাকে স্বাধীন পেশায়।

**প্রশ্ন :** চাকরির চেয়ে স্বাধীন পেশার প্রতি আপনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। অথচ এমন অনেকে আছেন যারা শুধু সম্মানের জন্যে চাকরি করতে চান। এক্ষেত্রে কোনটি করা উচিত বলে ধরে নেবো?

**উত্তর :** সেক্ষেত্রে তো চাকরির চেয়ে স্বাধীন পেশা আরো বেশি সম্মানের। আসলে এটি ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার কুফল। ইংরেজরা যখন এ শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশে চালু করে, তাদের মূল লক্ষ্য ছিলো একটি কেরানি শ্রেণী তৈরি করা যারা শাসনে সহায়তা করবে। ইংরেজদের তুলনায় এদেরকে পয়সা কম দিতে হবে এবং চিন্তাচেতনায় এরা ইংরেজদের দাস হিসেবে কাজ করবে। তখনকার দিনে এন্ট্রান্স পাশ করে ডেপুটি কালেক্টর বা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে কেরানির চাকরি বা জজ কোর্টে পেশকারের চাকরি আশেপাশের লোকদের কাছে খুব সম্মানের ছিলো। আর গ্রাজুয়েশন নিয়ে সাব-রেজিস্ট্রার হতে পারলে সেটা ছিলো বিশাল ব্যাপার। তখন এপ্লিকেশনও লেখা হতো এভাবে যে, ‘ইওর মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সাবজেক্ট’ অর্থাৎ ‘আপনার অত্যন্ত বাধ্যগত প্রজা’।

আমাদের মূল সমস্যা হলো, আমরা কিন্তু ঐ চেতনা নিয়েই বড় হয়ে উঠেছি। আমরা এখনো চাকর হওয়াটাকেই একমাত্র সম্মানের বিষয় মনে করি। আমরা চাই-কেউ বলবে, তখন আমি তার কাজ করে দেবো এবং

যতটুকু বলবে ততটুকু করবো। আমরা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে করতে চাই না। আর এই মানসিকতার কারণে আমরা জাতিগতভাবে পিছিয়ে পড়েছি।

একজন মানুষ তার মেধা ও আগ্রহের ভিত্তিতে এবং সেবার মনোভাব নিয়ে চাকরি বা স্বাধীন পেশা—যেকোনোটি বেছে নিতে পারে, এটি দোষের কিছু নয়। কিন্তু একথা সত্যি যে, স্বাধীন পেশায় যেহেতু সবদিক নিজেই খেয়াল রাখতে হয় তাই মেধা শতধারায় বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়, বিশেষত নেতৃত্ব বা ব্যবস্থাপকীয় গুণাবলি গড়ে ওঠে, চাকরিতে যা সম্ভব না।

আবার চাকরি যদি একজন মানুষের মিশনের অংশ হয় তাহলে সে চাকরিও করতে পারে। যেমন, একজনের মিশন হতে পারে গবেষণা। তিনি একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণা করতে চান, তখন একটা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে চাকরি তার মিশন হবে। আবার একজন ডাক্তারের যদি চিকিৎসা পেশার প্রতি সম্মান ও বিশ্বস্ততা থাকে, তিনি যদি রোগীকে সেবা করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করেন তবে এটাই তার মিশন।

একজন শিক্ষক যদি মনে করেন—ছাত্রছাত্রীদেরকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করাটাই আমার লক্ষ্য, তখন এটা আর চাকরি থাকছে না। এটা তার মিশনে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। তখন তার আলাদা একটা তৃপ্তি থাকবে, উপার্জনও হবে। কিন্তু আপনি যদি শুধু উপার্জনের জন্যে কাজ করেন, তবে এটা মিশন হবে না। এটা কাজ হবে।

**প্রশ্ন :** আমার টার্গেট চাকরি করা। এ অবস্থায় কী করে সৃজনশীল কিছু একটা করতে পারি? একটা গাইডলাইন আমাদের দেবেন দয়া করে।

**উত্তর :** এ ব্যাপারে অন্য কেউ কোনো গাইডলাইন দিতে পারবে না। এই আগুন নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে হয়, এটা বাইরে থেকে করা যায় না। যখন ভেতরে আগুন থাকবে এবং শেকল ভাঙার পর কী করবেন সেটা যখন নিজের কাছে পরিষ্কার থাকবে, তখন আপনি গোলামির জিজির অনায়াসে ভেঙে ফেলতে পারবেন।

**প্রশ্ন :** আমি বুয়েট থেকে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে এখন একটি মোবাইল কোম্পানিতে চাকরি করছি। এই যোগ্যতা নিয়ে আমি কী ধরনের স্বাধীন পেশায় যেতে পারি? স্বাধীনভাবে কী কাজ করতে পারি যাতে সমাজ ও দেশ উপকৃত হবে আর আমার শিক্ষাও কাজে লাগবে?

**উত্তর :** আপনার চেয়ে অনেক কম যোগ্যতা নিয়ে বহু মানুষ স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত আছে। বরং বলা যেতে পারে নিজস্ব ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠান যারা গড়েছেন তাদের অধিকাংশই খুব কম প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা নিয়ে শুরু করেছিলেন। আমাদের দেশে স্বাধীন পেশায় লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যারা হয়তো নিজের নাম স্বাক্ষর ছাড়া আর কিছু করতে পারে না। আর আপনি তো একজন ইঞ্জিনিয়ার। আপনার যে যোগ্যতা রয়েছে তা দিয়েই স্বাধীন পেশায় যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেটা নিজেকেই খুঁজে বের করতে হবে যে, আমি কী করতে পারি, আমি আমার এই যোগ্যতাকে কীভাবে কাজে লাগাতে পারি। এটা প্রত্যেকটা মানুষের নিজেরই খুঁজে বের করার বিষয়।

## সঠিক ক্যারিয়ার

**প্রশ্ন :** মেধার বিকাশের জন্যে সঠিক ক্যারিয়ারে আছি বোঝার উপায় কী?

**উত্তর :** যে কাজটা আপনি করছেন সেটা নিয়ে যখন আপনি তৃপ্ত, আপনি যখন অনুভব করেন যে, আপনি আপনার মেধাকে কাজে লাগাতে পারছেন এবং কাজটা মানুষের জন্যে কল্যাণকর। শোষকের পক্ষে নয়, শোষিতের পক্ষে আপনি কাজ করতে পারছেন তখন বোঝা যাবে যে, আপনি আপনার মেধাকে কাজে লাগাচ্ছেন। এই কাজে যদি আপনি আর্থিক দিক থেকে তত লাভবান না-ও হন, অর্থাৎ অন্য কাজে আর্থিক দিক দিয়ে আরো লাভবান হওয়ার সুযোগ থাকার পরও যখন আপনি এই কাজের আনন্দ অনুভব করবেন তখন বোঝা যাবে আপনি আপনার মেধাকে ঠিক পথে বিকশিত করছেন।

**প্রশ্ন :** মানুষের কোন গুণকে বা কী ধরনের কাজকে মেধা হিসেবে ধরা হয়? একজন যদি ভালো ছাত্র/ ছাত্রী না হয়ে থাকে এবং দৃশ্যত তেমন কোনো বিষয়ে দক্ষ না হয়ে থাকে, সে কীভাবে নিজের মেধাকে শনাক্ত করবে?

**উত্তর :** মেধা কোথায় আছে এটা আপনাকেই খুঁজে বের করতে হবে। যেমন, আমাদের কোয়ান্টাম ল্যাবের অনারারি পরিচালক প্রফেসর ডা. ইউনুস। ছোটবেলায় তার পরিবার তাকে মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দিলো। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি মাদ্রাসায় পড়বেন না। পালিয়ে গেলেন। বেশ দূরের আরেক থানা শহরে গিয়ে দেখা হলো এক শিক্ষকের সঙ্গে। তিনি দেখেই

বুঝলেন তার অবস্থা, স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। লজিৎয়ের ব্যবস্থা করে দিলেন। শুরু হলো তার স্কুলজীবন। আইএ পরীক্ষায় মেধাতালিকায় সেকেন্ড হলেন। ভর্তি হলেন এমবিবিএস। সেখানেও অনার্স নিয়ে ফার্স্টক্লাস। দেশের বাইরেও পড়াশোনা করতে গেলেন স্কলারশিপ নিয়ে। এখন দেশের একজন কৃতী রক্তরোগ বিশেষজ্ঞ। অর্থাৎ আপনার মেধা শনাক্ত করতে হবে আপনাকেই। আপনার মা-বাবা-ভাই-বোন চাইলে হবে না।

## ক্যারিয়ার এবং কাজের তৃপ্তি

**প্রশ্ন :** কর্মজীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় কর্মসন্তুষ্টি। শুধু টাকার জন্যে কাজ করতে চাই না তা সে চাকরি বা ব্যবসা যা-ই হোক। কাজ করতে চাই মনের আনন্দে। যা করার পর মনে হবে, ‘হাঁ, কাজ করেছি’। সিদ্ধান্তহীনতাই বড় সমস্যা।

**উত্তর :** আসলে কাজ না করা পর্যন্ত বোঝা যাবে না-মনের আনন্দে করছেন, না মনের দুঃখে করছেন। আগে কাজ করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা করবেন না। সিদ্ধান্তহীনতা যত থাকবে, তত সময় নষ্ট হবে এবং একটা সময় দেখা যাবে যে, কিছুই করছেন না। অতএব সিদ্ধান্ত নিতে নিতে বয়স পার করে দেবেন না। সময় থাকতে সিদ্ধান্ত নেবেন।

**প্রশ্ন :** আমি টিভিতে সংবাদ পাঠক হিসেবে আবেদন করেছিলাম। কিন্তু আশানুরূপ পোস্টটি পাই নি। বিভিন্ন খবরে ভয়েস দিচ্ছি। এ অবস্থায় আমি কী করতে পারি? আমি হতে চাই নিউজ প্রেজেন্টার, বানিয়েছে নিউজ কাস্টার। আমার করণীয় জানাবেন।

**উত্তর :** নিজেকে ভাগ্যবান মনে করুন যে, অন্তত শুরু করার একটি জায়গা পেয়েছেন। দেখা যাবে যে, এই কাস্টিং করতে করতেই প্রেজেন্টার হয়ে যাবেন। একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট দাঁড়ানোর জায়গা পেলে বসার জায়গা করে নেবে, বসার জায়গা পেলে সে নাশতা-পানির ব্যবস্থা করে নেবে। তারপরে খাওয়ার ব্যবস্থা করবে এবং শোওয়ার জায়গা করে নেবে। এটাই একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটের স্পিরিট হওয়া উচিত।

আর আপনি এটা অনায়াসে পারবেন। শুধু কাজটাকে ভালবাসবেন।

কাজকে ছোট মনে করবেন না। যত মনোযোগ দিয়ে, যত ভালবেসে আপনি কাজ করবেন সেই কাজ আপনাকে তত সম্মান দেবে, তত খ্যাতি দেবে, তত অর্থ দেবে। যদি ঝাডুও দেন, সেটা ভালোভাবে দেবেন। সেই কাজ আপনাকে সম্মানিত করবে। আর যদি মনের ভেতরে ক্ষোভ নিয়ে, অসন্তোষ নিয়ে কাজ করেন, আপনি এগুতে পারবেন না। আপনার হতাশা দূর হবে না।

ছোট ঘটনা বলি-আমি তখন এস্ট্রলজার। আমার এক ক্লায়েন্ট আসতেন লুঙ্গি পরে একটা শার্ট গায়ে। লুঙ্গিটাও ভালো না। শার্টের ভেতরে গেঞ্জিতে ছিদ্র ছিদ্র মানে এয়ার কন্ডিশনড। আমার কাছে যিনিই আসেন তিনিই তো আমার ক্লায়েন্ট। আমি বসতে বললেও তিনি খুব সংকোচ করতেন এবং দাঁড়িয়েই থাকতেন। চেহারা সুরত এরকম যে, অন্য যেকোনো অফিসে গেলে তাকে টুলেও বসতে দেয়ার কথা না।

তিনি ভুসির ব্যবসা করতেন। একবার ইমামগঞ্জে তার গদিতে যাবার সুযোগ হলো। দেখি একটা চৌকির ওপরে পাটি বিছানো। তার ওপর ক্যাশবাক্স। তিনি বসে আছেন সেখানে। আমাকে দেখেই একেবারে লাফ দিয়ে উঠলেন। তার ধারণা ছিলো না যে, আমি কখনো যাবো। এর মধ্যে দেখি তার কাছে এক লোক এসে বললো যে, ২০ লাখ টাকা লাগবে। এই ভুসির ব্যবসায়ী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, ২০ লাখ টাকা সে কিসে নেবে-৫০ টাকার নোটে, ১০০ টাকার নোটে না ৫০০ টাকার নোটে? এটা ৩০ বছর আগের কথা।

আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম যে, এই মানুষটা নগদ ২০ লাখ টাকা ৫০ টাকার নোটে দিতে পারে, ১০০ টাকার নোটে দিতে পারে, ৫০০ টাকার নোটেও দিতে পারে। অর্থাৎ কী পরিমাণ নগদ অর্থ তার রয়েছে! সব উপার্জনই তার ভুসির ব্যবসা থেকে। কারণ সে এই ভুসি খুব ভালবাসতো। অতএব যে কাজ আপনি করবেন সে কাজকে ভালবাসতে হবে। তাহলে কাজ আপনাকে প্রতিদান দেবে।

অধিকাংশ মানুষের চাকরি জীবনে এত হতাশা কেন? কারণ সে মনে করে, যে কাজটা সে করছে এটা কোনো কাজই না। আরেকজন যেটা করছে সেটা কাজ। কাজের প্রতি তার মমতা থাকে না, ভালবাসা থাকে না। ফলে অগ্রগতিও হয় না। অতএব আপনি যা করছেন সে কাজটাকে ভালবাসবেন। আপনাকে কেউ আটকাতে পারবে না। যেমন, এই নিউজ কাস্টার হিসেবে কাজ করাটা আপনার জন্যে আনন্দের হতো যদি আপনি এই দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতেন এবং সেটাই খুলে দিতো আপনার প্রেজেন্টার হবার স্বর্ণদ্বার।

**প্রশ্ন :** আমি কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। কয়েক বছর ধরে আমার চাকরির খুব সমস্যা হচ্ছে। খুব পরিশ্রম করি, চেষ্টা করি কিন্তু ভালো চাকরি পাচ্ছি না। ছোটখাটো যা পাই তা-ও বেশিদিন টিকে থাকে না।

**উত্তর :** চাকরি টিকে থাকে না কারণ আপনি মনে করছেন ছোটখাটো চাকরি। মনে অসন্তোষ নিয়ে কাজ করছেন। অসন্তোষ নিয়ে যা করা হয় সেখানে কখনো কোনো বরকত থাকে না। চাকরিকে ছোট মনে করবেন না। যখন যে কাজ করবেন সেটাকেই খুব বড় কাজ মনে করবেন। অর্থাৎ ভেতরে অস্বস্তি নিয়ে, অপছন্দ বা ক্ষোভ নিয়ে করবেন না। যা করবেন আনন্দিত চিত্তে করবেন। আপনার চাকরি যাবে না বরং চাকরিতে ক্রমশ উন্নতি হবে। দেখবেন যে, এর চেয়ে আরো ভালো চাকরি আপনি পাচ্ছেন।

## প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ক্যারিয়ার

**প্রশ্ন :** আমার মা এবং বাবা দুজনেই ডাক্তার। তারা চান আমিও ডাক্তারি পড়ি। কিন্তু আমার পছন্দ আর্কিটেকচার। পেশা বাছাইয়ের দৃষ্টিভঙ্গি আসলে কী হওয়া উচিত?

**উত্তর :** পেশা বাছাইয়ের মূল দৃষ্টিভঙ্গি হলো মেধা এবং আগ্রহ। তা না হলে পেশায় উন্নতির জন্যে কাজের প্রতি যে ভালবাসা প্রয়োজন তা কখনোই জন্মাবে না, মেধার বিকাশও তিনি করতে পারবেন না। পেশা নির্বাচন নিয়ে আমাদের অনেক অভিভাবক বা মা-বাবার একটি ধারণা হচ্ছে, সন্তানরা পিতার পেশাকেই তার নিজের পেশা হিসেবে বেছে নেবে। যেমন, একসময় রেলওয়েতে যারা চাকরি করতেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গিই ছিলো যে, ছেলেকেও রেলওয়েতে তার ডিপার্টমেন্টে ঢুকতে হবে। একজন লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের ছেলে যদি আপার ডিভিশন ক্লার্ক এবং তারপর কোনোরকমে ছোটখাটো অফিসার হতে পারে তাতেই তারা সন্তুষ্ট। অর্থাৎ পরিচিত গন্ডির বাইরে যাওয়ার অনিশ্চয়তাকে তারা এড়াতে চাইতেন।

অথচ পরিচিত গন্ডির বাইরে না গেলে কখনো বড় হওয়া যায় না। বৃত্ত ভাঙা যায় না। যেমন এ পি জে আব্দুল কালামের বাবা ছিলেন খেয়া নৌকার মাঝি। তিনি যদি মনে করতেন যে, আমার বাবা মাঝি, আমিও নৌকা বাইবো, তাহলে কি তিনি রকেটবিজ্ঞানী হতে পারতেন? রাষ্ট্রপতি হতে

পারতেন? পারতেন না। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো ‘আগুনের ডানা’ (Wings of Fire) বইটি আপনি কেন লিখলেন? তিনি বললেন যে, নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে না, এ বইটি আমি লিখেছি শুধু এটুকু বলার জন্যে যে, খুব সাধারণ মানুষ, নিম্নবর্ণের একজন মানুষও যদি তার মেধাকে বিকশিত করতে চায়, সে তা পারে। সে সফল হতে পারে। তাই সবসময় নিজ মেধা ও অগ্রহের ভিত্তিতে পেশা নির্বাচন করা উচিত।

**প্রশ্ন :** আপনি বলেছেন প্যাশনকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রফেশন নির্ধারণ করলে ভালো এবং সফল হওয়া যায়। কিন্তু আমাদের অভিভাবকদের দ্বারা আমাদের প্রফেশন নির্ধারিত হয়। অনেক সময় নিজের পছন্দের বিষয়ে শেষ পর্যন্ত ক্যারিয়ার হয় না। আমরা কীভাবে এ থেকে মুক্তি পেতে পারি?

**উত্তর :** যখন মানবিক মহাসমাজ সৃষ্টি হবে, তখন আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এই সুযোগ পাবেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সামাজিক পরিবর্তন সেই স্তরে না যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত নিজের অন্তর্গত শক্তিকে বিকশিত করে নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে হবে। অভিভাবকদের বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে অভিভাবকদের বোঝানো কঠিন। তারা বোঝেন সিদ্ধান্ত নেয়ার পরে এবং বেশ পরে। যেমন, আমাদের অধিকাংশ অর্গানিয়ারই ফাউন্ডেশনে যোগ দেয়ার আগে মা-বাবাকে বোঝাতে বা রাজি করাতে পারেন নি। কিন্তু পরবর্তীতে যখন সেই অভিভাবকের কোনো পরিচিত বা আস্থাভাজন ব্যক্তির কাছে অর্গানিয়ারের কাজের প্রশংসা শুনেছেন তখন তিনি বুঝতে পেরেছেন। অতএব প্যাশনকে অগ্রাধিকার দিতে হলে নিজের বিশ্বাস ও অন্তর্গত শক্তিকে বিকশিত করতে হবে।

**প্রশ্ন :** আমি একজন ব্যবসায়ী, পাশাপাশি একটি আইন কলেজে পড়ছি। দুটো একসাথে করতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু পরিবারের প্রায় সব দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হয়। যার জন্যে ব্যবসাটা চালিয়ে যেতে হচ্ছে, এদিকে পড়াশোনা করতেও ইচ্ছা হয়। কী করবো?

**উত্তর :** আইন কলেজে পড়ে আপনি কী করবেন সেটা আপনাকে আগে ঠিক করতে হবে। যেহেতু আপনি ইতোমধ্যেই ব্যবসায়ে নিয়োজিত আছেন, যদি আপনি একজন ব্যবসায়ী হিসেবে ক্যারিয়ার গড়তে চান তাহলে আইন



কলেজে পড়াটা অর্থহীন। তার চেয়ে ব্যবসায় মনোযোগী হোন, এখানেই সফলতা পাবেন।

আমাদের তরুণ-তরুণীরা উচ্চশিক্ষার জন্যে ছোটেন শুধুমাত্র ডিগ্রি যোগাড়ের চেষ্টায় যার সঙ্গে ক্যারিয়ারের কোনো সম্পর্ক থাকে না। অনেক ছাত্রছাত্রী আছেন যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এমন সব বিষয় নিয়ে অনার্স পড়ার জন্যে যা বাস্তবজীবনে কোনো কাজে লাগে না। ইংরেজ শোষণেরা তাদের সহযোগী কেরানি শ্রেণী তৈরির জন্যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এমন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলো।

যেমন, দর্শন কিংবা ইসলামের ইতিহাস-পাঁচ/ ছয় বছর ধরে পড়ার কী আছে এ বিষয়গুলোতে? সবই তো ১০০/ ২০০ বা হাজার বছরের পুরনো থিওরির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। না এটা দর্শন বা ইতিহাসের আধুনিকায়ন, না বাস্তবজীবনে এর কোনো প্রয়োগ আছে। ফলে খুব ভালো রেজাল্ট করে যারা হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ ডিপার্টমেন্টেই শিক্ষকতা করার সুযোগ পাচ্ছেন, তারা ছাড়া অধিকাংশের পক্ষেই এই জ্ঞান দিয়ে জীবিকা অর্জন করা সম্ভব হয় না। ফলে তিনি হতাশায় ভোগেন। কাজেই আপনি যদি প্রথম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী না হন বা সত্যিকারের জ্ঞানপিপাসু না হন, তাহলে বরং প্রযুক্তি নিয়ে পড়ুন যা কাজে লাগবে অথবা এখনই ক্যারিয়ার গঠনে মন দিন।

**প্রশ্ন :** আমি লেখাপড়ায় বেশি আগ্রহের হতে পারি নি, এইচএসসি পর্যন্ত পড়েছি। তাই বর্তমান বাজারে চাকরি পাওয়ার মতো সার্টিফিকেট আমার নাই। তাছাড়া চাকরির ব্যাপারে আমি প্রথম থেকেই আগ্রহী ছিলাম না এবং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাই আমাকে লেখাপড়ায় উৎসাহ যোগাতে পারে নি। এখন স্রষ্টা যেহেতু পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন এবং কিছুদিন আমাকে এখানে থাকার সুযোগ দিচ্ছেন, সেহেতু এই থাকাকালীন সময়ে জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে।

**উত্তর :** আসলে জীবিকা বা সাফল্যের জন্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কিছু বাড়তি সুবিধা নিয়ে আসে নিঃসন্দেহে। ভালো ডিগ্রি থাকলে আপনি জীবনের প্রতিযোগিতায় একধাপ এগিয়ে থাকবেন। অর্থাৎ আপনি দৌড়টা শুরু করবেন সামনে থেকে। কোনো কারণে প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি না থাকলে সেটা সাফল্যের ক্ষেত্রে বাধা, কিন্তু অলঙ্ঘনীয় বাধা মোটেই নয়। একধাপ পেছন থেকে শুরু করেও আপনি দুই ধাপ এগিয়ে যেতে পারেন, কারণ পৃথিবী অনেক বড়।

বরং ডিগ্রি না থাকাটাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভালো। কারণ তখন একজন মানুষকে পুরোপুরি তার মেধা ও শ্রমের ওপর নির্ভর করতে হয়। কেউ যখন তার নিজের শ্রমের ওপরে আস্থা স্থাপন করে, কিছু না থাকার পরেও সে উঠে যায়। যেমন শিল্পপতি গুল বক্স। গুল টেক্সটাইল এবং গুল বক্স জুট মিলের মালিক ছিলেন। ডেমরায় বিশাল কারখানা। কোটি কোটি টাকার ব্যবসা। কিন্তু তিনি চেক কাটতেন টিপসই দিয়ে। আকিজ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের প্রতিষ্ঠাতা আকিজ মিয়া জীবন শুরু করেছিলেন বিড়ি শ্রমিক হিসেবে। চুং জু জুং-কোরিয়ার হুন্দাই কর্পোরেশনের মালিক-তারও কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিলো না।

অতএব, সবসময় মনে রাখবেন, কোনোকিছুই জীবনে প্রথম হওয়ার পথে অলঙ্ঘনীয় বাধা নয়, শুধু একটা চ্যালেঞ্জ মাত্র। এই বাধাটাকে যদি আপনি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে পারেন, পেছন থেকে শুরু করেও দৌড়ে আপনি সবাইকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারেন।

**প্রশ্ন :** যদি একাডেমিক ডিগ্রি কম থাকে এবং যেটুকু থাকে সেটাও ভালো না হয় এবং ঐ কারণে ছোটখাটো কোনো চাকরি করে-তাহলে ঐ ব্যক্তির ওপরে ওঠার ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কী?

**উত্তর :** কেউ যদি নিজে ওপরে উঠতে না চায়, কোনোদিন ওপরে উঠতে পারবে না। আমাদের এক গ্রাজুয়েট ইংরেজিতে অনার্স করে একটি প্রতিষ্ঠানে অনেক বেতনের চাকরি করেছেন। সে প্রতিষ্ঠানের মালিক ক্লাস টেনও পাশ করতে পারেন নি। অথচ বিবিএ, এমবিএ, সিএ-রা কাজ করছেন তার অধীনে। তাকে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। আমাদের সেই গ্রাজুয়েট তার বক্তৃতার পয়েন্টস তৈরি করে দেন। এরকম ব্যাক বেঞ্চরদের প্রতিষ্ঠানে ফ্রন্ট বেঞ্চরদের কাজ করার অনেক উদাহরণ আছে। অর্থাৎ আপনি যদি ভেতরের গুণকে বিকশিত করেন, তাহলে পেছন থেকেও এগিয়ে যেতে পারবেন। কেউ আপনাকে আটকাতে পারবে না। কিন্তু আপনার সেই আগ্রহ থাকতে হবে। ভেতরে সেই আগুন থাকতে হবে যে, আমি এ অবস্থা মানতে চাই না। আমি কেরানিগিরি করবো না, আমি ভালো কিছু করবো-তাহলেই আপনি পারবেন।

**প্রশ্ন :** আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে ইংলিশে অনার্স করছি, সামনে মাস্টার্স। কিন্তু ভালো কোম্পানি ও বড় চাকরির ক্ষেত্রে অর্থাৎ জব মার্কেটে

রাজশাহী ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইন্টারভিউয়ের আগেই বাতিল করা হয়। আমি জানি, আমি যোগ্য। কিন্তু আমরা তো প্রতিযোগিতা করারই সুযোগ পাচ্ছি না। তাছাড়া আমাদের সাবজেক্টে ফাস্ট ক্লাস পাওয়া বিরল ব্যাপার। এদিকে জব মার্কেটের জন্যে অনার্স-মাস্টার্সের যেকোনো একটিতে ফাস্ট ক্লাস পাওয়া প্রয়োজন। যদিও প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ফাস্ট ক্লাস পাওয়া সহজ। কিন্তু আমার আর্থিক সীমাবদ্ধতা আছে। এখন ভালো বেতনের চাকরি পেতে চাইলে আমার কী করা উচিত? রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স করে একটা বছর নষ্ট না করে টাকা জমিয়ে এক বছর পর কি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবো, না কী করবো?

**উত্তর :** এখানে মূল সমস্যা হলো অস্থিরতা। রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে ভালো চাকরি পাওয়া যাবে না-এমন ধারণা ঠিক নয়। প্রচুর ছাত্রছাত্রী আছেন যারা রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে ভালো বেতন বা পদমর্যাদার চাকরি করছেন।

আর ফাস্ট ক্লাস পাওয়াটা নির্ভর করে নিজের প্রস্তুতির ওপর। প্রস্তুতি যদি ভালো হয় ফাস্ট ক্লাস না পাওয়ার কোনো কারণ নেই। ‘রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ফাস্ট ক্লাস পাওয়া বিরল ঘটনা’-আপনি সেই বিরল ঘটনাটা কেন ঘটতে পারবেন না? যদি আপনি মনে করেন যে, আপনার যোগ্যতা রয়েছে, তাহলে সেভাবেই আপনাকে প্রস্তুতি নিতে হবে। যাতে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকেই আপনি ফাস্ট ক্লাস পান। আরো এক বছর পরে টাকা জমিয়ে তারপরে মাস্টার্স করার চেয়ে যেটা এখনই করা যায় সেটাই ভালো।

**প্রশ্ন :** আমি একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার। বিষয় কেমিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং। এখন আমি আরো পড়াশোনা করতে চাচ্ছি। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে নয়, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিষয়ে। আমার ধারণা-সমাজের জন্যে, দেশের জন্যে কিছু করতে হলে ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়টা যথেষ্ট নয় এবং ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিষয়টা পারফেক্ট। এই ধারণা কি সঠিক? জানতে চাই।

**উত্তর :** সমাজের উন্নয়নের জন্যে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ প্রয়োজন-এটা একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা। সমাজের উন্নয়নের জন্যে উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা ও নিয়তই যথেষ্ট। ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ নিয়ে আপনার পড়তে যাওয়াটা একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। বরং যেহেতু আপনি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, আপনার

বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার হওয়া উচিত। এতে সমাজের ও দেশের উন্নয়নের জন্যে কিছু করার সুযোগ আরো বেড়ে যাবে।

**প্রশ্ন :** আমি যে বিষয়ের ওপর লেখাপড়া করছি সেটা আমার প্রিয় বিষয় এবং মজাও পাচ্ছি। কিন্তু পেশার ক্ষেত্রে চাহিদা থাকলেও এখানে মানুষকে সেবা প্রদানের সম্ভাবনা নেই। আমার মনে হয় এ কাজটি আমি দক্ষতার সাথে করতে পারবো। কিন্তু সেবা ভাবনাও আমাকে তাড়িত করে। এক্ষেত্রে কী করতে পারি?

**উত্তর :** বিষয়টা আপনার প্রিয়, মজাও লাগছে, পেশার ক্ষেত্রে চাহিদাও আছে। তার মানে এটা একটা ভালো বিষয়। মানুষকে সেবা করা মানে শুধু একজনের হাত-পা মুছে দেয়া না। একজনকে ধরে নিয়ে রাস্তা পার করে দেয়া না। যেকোনো বিষয়ে আপনি যদি দক্ষ হতে পারেন তবে সেই বিষয়ের মধ্য দিয়ে আপনি সেবা দিতে পারেন। এটাই আপনার জন্যে উত্তম। আর বাকি কাজের জন্যে তো ফাউন্ডেশন রয়েছেই। আপনি আপনার পেশায় থাকুন আর বাকি সময়টা ফাউন্ডেশনে দিন।

**প্রশ্ন :** আমার সাবজেক্ট একাউন্টিংয়ে সেবা দেয়ার সুযোগ সম্পর্কে আমি ঠিক নিশ্চিত নই।

**উত্তর :** কেন সেবা দেয়ার সুযোগ থাকবে না? একটা প্রতিষ্ঠানের একাউন্টসকে স্বচ্ছ রাখার চেয়ে সেই প্রতিষ্ঠানের জন্যে বড় সেবা আর কিছু হয় না। সে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হোক বা অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠান হোক। একাউন্টস হচ্ছে যেকোনো প্রতিষ্ঠানের মেরুদণ্ড। এটা যদি ঠিক থাকে, সে প্রতিষ্ঠান কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। সে প্রতিষ্ঠান ওপরের দিকে উঠবেই। অতএব আপনার নিশ্চিত না হওয়ার কোনো কারণ নেই।

## সরকারি চাকরি

**প্রশ্ন :** আমাদের মনে বন্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, সরকারি চাকরির নিশ্চিত ভবিষ্যৎ আছে—চাকরি যাবে না সহজে। অন্যদিকে বেসরকারি চাকরিতে এসব ঝুঁকি বেশি। এ চিন্তাটাও প্রফেশন নির্ধারণে সমস্যা সৃষ্টি করছে।

**উত্তর :** এটা আমাদের তরুণদের একটা মৌলিক সমস্যা। নিশ্চয়তার এই ধারণা এসেছে ইংরেজদের কাছ থেকে যে, একবার সরকারি চাকরিতে ঢুকলে পেনশন পর্যন্ত থাকবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, যে চাকরিতে নিশ্চয়তা আছে, পেনশন পাওয়া যায়—সে চাকরির বেতন কখনোই বেশি হয় না। তাহলে বাড়তি বেতনের জন্যে কী করতে হবে? দুর্নীতি করতে হবে। দুর্নীতি যদি আপনি করেন তাহলে আর্থিক নিশ্চয়তা বলতে যেটা আমরা বুঝি সেটা আপনি পাবেন—হয়তো বাড়ি করতে পারবেন, গাড়ি করতে পারবেন, ব্যাংক-ব্যালেঞ্চ করতে পারবেন কিন্তু মানসিক নিশ্চয়তা থাকবে না। কেননা মানসিক নিরাপত্তা সৃষ্টি হয় সততা থেকে। আর মানসিক অস্থিরতা যদি থাকে তাহলে গাড়ি-বাড়ি কখনো নিশ্চয়তা দিতে পারে না। তাছাড়া জীবনটাই যেখানে অনিশ্চিত সেখানে চাকরিতে নিশ্চয়তা খোঁজা কি বোকামি নয়?

**প্রশ্ন :** চাকরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি সংগীত ভালবাসি। তাই কোনো চ্যানেলে চাকরি নেয়া আমার জন্যে সুবিধাজনক। কিন্তু সরকারি চাকরিতে নিরাপত্তা অনেক বেশি। এ ক্ষেত্রে আমি কোনটা গ্রহণ করতে পারবো?

**উত্তর :** জীবনেরই তো কোনো নিরাপত্তা নেই। ঘর থেকে বেরিয়ে আবার ঘরে ফিরে আসতে পারবে—এ ব্যাপারে কি কেউ নিশ্চিত? অতএব সরকারি চাকরিতে নিশ্চয়তা আছে এই ভাবনা অর্থহীন। বাংলাদেশে সরকারি চাকরি কয়টা? এর বাইরে যারা রয়েছে তাদের কি জীবন নেই? আপনি যদি মেধাকে কাজে লাগান, ইনশাল্লাহ আপনার কোনো অভাব থাকবে না।

আপনি যেহেতু সংগীত ভালবাসেন, এই ক্ষেত্রেই আপনার মেধাকে বিকশিত করুন। আসলে যে কাজটা আপনি পছন্দ করেন, যে কাজটাকে ভালবাসেন, সেটাকে জীবন মনে করুন। তাহলেই দেখবেন জীবন আপনাকে প্রতিদান দেবে। মেধা যেমন বিকশিত হবে, তেমনি কোনোদিক থেকেই আপনার কোনো অভাব থাকবে না।

**প্রশ্ন :** অনেকে মনে করেন সরকারি চাকরিতে আইডেন্টিটি আছে। আমাদের কি তাহলে সরকারি চাকরিতে যাওয়া উচিত?

**উত্তর :** আসলে পরিচয় না দেয়া পর্যন্ত অথবা তার কাছে যতক্ষণ না আমাদের যেতে হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কজন সরকারি চাকরিজীবীকে আমরা চিনি? আর

সরকারি চাকরিতে হয়তো আইডেন্টিটি আছে, কিন্তু সত্যিকারের সম্মান, শ্রদ্ধা কতখানি আছে? সাধারণভাবে একজন পুলিশ বা ট্যাক্স অফিসারের কথা শুনলে আপনার সামনে কী ভেসে ওঠে?

আসলে সত্যিকারের পরিচয় সবসময় তৈরি হয় সেবার মাধ্যমে। পরিচয় সৃষ্টি হয় দক্ষতায়, পরিশ্রমে। যেকোনো পেশায় যদি আপনি আন্তরিক হন, সে পেশা-ই আপনাকে অর্থ পরিচয় খ্যাতি সব দেবে।

ফায়ার সার্ভিসের একজন উদ্ধারকর্মী আবুল খায়ের। তার কাজ হচ্ছে অগ্নিকাণ্ড, নৌ-দুর্ঘটনা বা অন্য যেকোনো দুর্ঘটনাস্থল থেকে মানুষ বা জিনিসপত্র উদ্ধার করা। কিন্তু এ কাজ করেই তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছেন। স্রোত বা গভীরতার কারণে বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নৌবাহিনীর ডুবুরীরা যেখানে ডুব দিতে সাহস পায় নি সেখানে দমকল বাহিনীর একজন সাধারণ ডুবুরী হয়ে তিনি ডুব দিয়েছেন। রিডার্স ডাইজেস্টে তাকে নিয়ে নিবন্ধ ছাপা হয়েছে। বিবিসি-তে তার সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে। আবুল খায়ের কি তার পেশাগত পরিচিতি সৃষ্টি করেন নি? সম্মান-খ্যাতি পান নি? পেয়েছেন। কারণ তার কাজকে তিনি ভালবাসেন।

মামা পৈয়াজুর মামা কিংবা হাজীর বিরিয়ানির হাজী-তারা কি সরকারি চাকরি করেছেন? কিন্তু তাতে করে কি তাদের পরিচিতিতে কোনো অসুবিধা হয়েছে? অতএব যেকোনো পেশায় আপনি পরিচয় সৃষ্টি করতে পারেন যদি আপনি যোগ্যতা অর্জন করেন এবং মেধাকে সেবায় রূপান্তরিত করেন।

**প্রশ্ন :** বর্তমানে আমি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে চাকরি করি। সবসময় হতাশায় ভুগি কারণ আমাদের সমাজে এই কাজ সম্মানজনক নয়। সামাজিক মূল্যায়ন কতটুকু দরকার?

**উত্তর :** সামাজিক মূল্যায়নকে গুরুত্ব দিতে হলে তো সবাইকেই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার অথবা বহুজাতিক কোম্পানির এক্সিকিউটিভ হতে হবে এবং প্রচুর উপার্জন করতে হবে। কিন্তু বহুজাতিক কোম্পানি কয়টি, প্রচুর উপার্জন করেন এরকম ডাক্তারই বা কতজন আছেন? বাকিরা তাহলে কী করবেন?

আসলে সম্মান সম্পর্কে আমাদের ধারণাটাই ভুল। সম্মান নির্ধারিত হওয়া উচিত নৈতিকতার ভিত্তিতে, কিন্তু আজকাল আমরা সম্মান নির্ধারণ করি উপার্জনের ভিত্তিতে। যে কারণে কিছুদিন আগেও যেখানে বিসিএস পরীক্ষার্থীদের লক্ষ্য থাকতো ফরেন সার্ভিস বা এডমিনিস্ট্রেশন ক্যাডারে

প্রবেশ করা, সেখানে আজকাল অনেকেরই পছন্দের তালিকার শীর্ষে থাকছে কাস্টমস কিংবা ইনকাম ট্যাক্স। কারণ সেখানে উপরির সুযোগ বেশি। আগে সহজে কেউ পুলিশে যেতে চাইতো না, এখন পুলিশ সার্জেন্ট হওয়ার জন্যেও লবিং করতে হয়। কেন? কারণ ওখানেও মূল বিষয় হলো অর্থ।

সত্য হচ্ছে, জীবিকার জন্যে যেকোনো কিছু করতে পারেন, যদি সেটা সৎ হয়, আন্তরিক হয় এবং উপার্জন যা করছেন সেটা পরিশ্রমলব্ধ হয়। সৎ আন্তরিক পরিশ্রমলব্ধ উপার্জন যেখানে রয়েছে সেটাকে কখনো ছোট মনে করবেন না, কায়িক শ্রম হলেও না।

প্রতিটি কাজ সম্মানজনক। আর সম্মান সবসময় নির্ভর করে আপনি আপনার পেশাটাকে সম্মান করেন কি না তার ওপর। আপনি যদি আপনার পেশাকে সম্মান করেন, অন্যরা সম্মান করবে। আপনি যদি আপনার পেশাকে সম্মান না করেন, অন্যরা সম্মান করবে না।

**প্রশ্ন :** আপনি বার বার বলেন কাজ আর কাজ করতে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করতে। কিন্তু কাজের কোনো ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে না। যুবসমাজ হতাশাগ্রস্ত, কতদিনে কাজের সুযোগ তৈরি হবে?

**উত্তর :** মাথার ঘাম তো সবাই পায়ে ফেলে। আমরা তো মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে বলি না। আমরা বলি, পায়ের ঘাম মাথায় উঠিয়ে কাজ করতে। কারণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে কোনো পরিশ্রম লাগে না বাংলাদেশে। গরমের দিনে এমনিই মাথার ঘাম পায়ে পড়ে। আমরা বলি যে, পায়ের ঘাম মাথায় তুলতে হবে, তাহলে এটা পরিশ্রম। আর কাজের সুযোগ কেউ কাউকে তৈরি করে দেয় না। এরকম আহাম্মক কেউ নেই।

যেমন, একজন যখন একটা ফ্যাক্টরি করে তখন সে কি কাজের সুযোগ তৈরি করে, না আপনার শ্রমকে কাজে লাগিয়ে মুনাফার চিন্তা করে? আসলে কাজের সুযোগ কেউ তৈরি করে দেয় না। এটা তৈরি করে নিতে হয়।

কাজের কোনো অভাব নেই। কাজ করার মানসিকতার অভাব আছে। আমরা কাজ বলতে চাকরি বুঝি। তা-ও সরকারি চাকরি। আর ভার্সিটি থেকে বেরোলেই তো বিসিএস ক্যাডার। কারণ ওখানে কোনো কাজ নেই। একটা কাজ কতভাবে না হতে পারে, এই ফাইলটা কোন কোন কারণে ছাড়া যাবে না-অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা এটাই বলেন। কী করলে ফাইলটা ছাড়া যাবে বা কীভাবে কাজটা হতে পারে তা সাধারণত সহজে বলেন না।

এ নিয়ে মজার গল্প আছে।

পাকিস্তান আমলের কথা। আইয়ুব খানের সময় স্পিকার ছিলেন চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী। লম্বা চওড়া সুদর্শন মানুষ ছিলেন। তখনকার দিনে প্রেসিডেন্ট বিদেশে গেলে স্পিকার হতেন ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট। এখন যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, এটা কুমিল্লায় হওয়ার কথা ছিলো। পুরো প্রোগ্রাম ঠিক। এর মধ্যে আইয়ুব খান চলে গেলেন বিদেশ সফরে। স্পিকার হয়ে গেলেন ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট। উনি সচিবকে ডাকলেন যে, এটা আমি চট্টগ্রামে ট্রান্সফার করতে চাই। এটা কীভাবে করা যাবে?

সচিব বললেন, না, এটা তো এই এই কারণে করা যাবে না। উনি বললেন যে, আমি এ ব্যাপারে কী করতে পারবো? সচিব বললেন যে, এ ব্যাপারে আপনি কিছুই করতে পারবেন না। ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বললেন, আমি তোমাকে ডিসমিস করতে পারবো কি না? উনি বললেন যে, জিঁ স্যার, এটা পারবেন। আপনি যেহেতু ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট, আপনি এটা করতে পারবেন।

তখন ফজলুল কাদের চৌধুরী বললেন, তাহলে আমি কোনটা করবো? সচিব তখন বললেন, ঠিক আছে স্যার, আমি দেখছি। ফাইল রেডি হয়ে গেল। ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট স্বাক্ষর করলেন, ফাইল পাস হয়ে গেল। আইয়ুব খান এসে দেখেন যে, কুমিল্লার বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামে ট্রান্সফার হয়ে গেছে।

এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে, যাদের সবচেয়ে বেশি কাজ করার সুযোগ তারা সবচেয়ে কম কাজ করেন। আমাদের পরিবারে যারা সরকারি কর্মকর্তা আছেন তারা চেষ্টা করবেন যে, একজন মানুষের যতটা উপকার করা যায়। ‘কী কারণে এটা হবে না’ সেটা না, বরং ‘কী করলে এটা হবে’ সেটা বলবেন।

তবে আপনি বেআইনি কোনো কাজ করবেন না, আইনের মধ্যে করবেন। কিন্তু তাকে দেখিয়ে দেবেন যে, কীভাবে করলে এই কাজটা আইনসিদ্ধভাবে হতে পারে। তাহলে আল্লাহ তায়াল্লা এর উত্তম প্রতিদান আপনাকে দেবেন। কারণ আল্লাহ দেখছেন—এত অসৎ লোকের মাঝখান থেকে আপনি এতগুলো সৎকাজ, ভালো কাজ করেছেন।

কাজ কেউ কাউকে দেয় না, কাজ সৃষ্টি করতে হয়। বাংলাদেশে শুধু ১৬ কোটি মানুষ না, ৫০ কোটি মানুষ হলেও কাজের অভাব হবে না। চীনে কি কাজের কোনো অভাব হয়েছে? চীনে ১৫০ কোটি লোক, ভারতে ১২০ কোটি লোক, সেখানে তো কাজের কোনো অভাব হয় নি। আমাদের দেশের লোক গিয়েও সেখানে কাজ করে। মানুষের তো শুধু মুখ নয়, মস্তিষ্কও আছে। আর মস্তিষ্কই সবকিছুর আকর।



## শখ কি পেশা হতে পারে?

**প্রশ্ন :** আমার শখ হচ্ছে খেলা। এটাকেই পেশা হিসেবে নিতে চাই। কিন্তু খেলাধুলায় আর্থিক নিরাপত্তা নেই। কোনো গেমসে ভালো করতে পারলে টাকা ও পরিচিতি দুটোই পাওয়া যায়। আর ভালো করতে না পারলে সারাজীবন আফসোস করতে হবে। এদিকে আমার পরিবার চায় আমাকে বিদেশে পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু আমার শুধু টাকা উপার্জনের জন্যে বেঁচে থাকতে হবে ভাবলে কষ্ট হয়। কী করবো?

**উত্তর :** শুধু টাকা উপার্জন তো জীবন হতে পারে না। আর শুধু টাকা উপার্জনের জন্যে বিদেশে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। চলার মতো টাকা দেশে বসেও উপার্জন করা যেতে পারে।

খেলার প্রতি যেহেতু আকর্ষণ আছে, খেলাও আপনার জন্যে একটা পেশা হতে পারে যদি সেখানে প্রথম হওয়া যায়। মাঝে মাঝে কোনো গেমসে ভালো করা শুধু নয়, চাওয়া হবে যেন প্রত্যেকটা ম্যাচে ভালো করা যায়।

আর আজকাল তো খেলা একটা বড় ব্যবসা। এই যে আবাহনী ক্লাব—আমরা মনে করি এটা ক্লাব, এটা কিন্তু ক্লাব না। এটা একটা লিমিটেড কোম্পানি। একেকটা ক্লাবের আয় আকাশচুম্বী। খেলোয়াড়দের উপার্জন কি কম? পর্তুগিজ ফুটবল তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। বিশ্বের সবচেয়ে দামি ১০ খেলোয়াড়ের তালিকার শীর্ষে আছেন তিনি। ২০০৯ সালে রিয়েল মাদ্রিদে যখন তিনি খেলেন, তখন তার বার্ষিক আয় ছিলো ১১.৩ মিলিয়ন পাউন্ড অর্থাৎ ১১৭ কোটি টাকার ওপরে। অতএব ভালো খেলোয়াড় হতে অসুবিধা কোথায়? জীবনে এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আমি যেখানেই থাকি আমাকে এক নম্বর হতে হবে। তাহলে আপনি সম্মানিত হবেন। পার্থিব যা পাওয়া যায় তা পাবেন। আর যদি তৃতীয় সারিতে পড়ে থাকেন কেউ আপনার দিকে তাকাবে না।

তৃতীয় স্থান নিয়ে একটা ঢাকাইয়া চুটকি আছে। একবার এক ঘোড়দৌড়ে এক ঘোড়া পেছনে পড়ে গেছে। ঘোড়ার মালিককে একজন বললো, তোর এটা ঘোড়া হলো—এত পেছনে পড়ে আছে? ঘোড়ার মালিক তখন বললো, কী বলিস? এটা তো একটা বাঘের বাচ্চা, দেখিস না অন্য ঘোড়াগুলোকে কীভাবে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তো ঐরকম খেলোয়াড় হলে হবে না যে, আপনার ভয়ে অন্যরা আগে দৌড় দিয়েছে। আপনাকে প্রথম হতে হবে।

**প্রশ্ন :** ব্যক্তিগতভাবে কারো যদি কোনো প্রতিভা থাকে, যেমন-ছবি আঁকা, গান করা-তবে সে কি তার প্রতিভাকে ভিত্তি করে পেশা গড়ে তুলবে? সে কি তার প্রতিভাকে শাণিত করার জন্যে ছাত্রজীবনে সে বিষয়ের ওপর পড়াশোনা করবে? আর কীভাবেই বা তার মেধাকে সেবায় রূপান্তরিত করতে পারবে? ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এর উত্তর জানতে চাই।

**উত্তর :** খুব ভালো, অবশ্যই করবে। ধর্মীয় দিক থেকে এতে কোনো বাধা নেই যদি সেই শিল্প বা সংগীত মানুষের কল্যাণের জন্যে হয়, মানুষকে উদ্দীপ্ত করার জন্যে হয়, উজ্জীবিত করার জন্যে হয়।

**প্রশ্ন :** আমি ফিজিক্স-এর একজন ছাত্র। কিন্তু শখ হলো পেইন্টিং এবং ডিজাইনিং। আমি এই দুয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে পারছি না। রেজাল্ট ভালো হলেও ফিজিক্সকে ভালবাসতে পারছি না।

**উত্তর :** আসলে ফিজিক্সে ভর্তি হয়ে গেলেই যে ফিজিক্সকেই ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। ক্যারিয়ার হিসেবে যেকোনো কিছুকেই বেছে নিতে পারেন। যদি পেইন্টিং বা ডিজাইনিংয়ে আপনি ভালো করেন তাহলে সেটাকেও ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নিতে পারেন। মেডিকেল থেকে পাশ করেও রাজনীতি করছেন বা ব্যবসা করছেন এমন অনেকে আছেন। এখানে আপনার বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে শখটা কোন পর্যায়ের। শখটাই যদি প্রধান হয় তাহলে এক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধিতেই আপনার মনোযোগী হওয়া উচিত। অবশ্য শখ যদি শুধু অবসর কাটানোর মাধ্যম হয় তাহলে ভিন্ন কথা।

## বিদেশে চাকরি

**প্রশ্ন :** দেশে অনেকভাবে অনেক কিছু করেও আমার তেমন কিছু হয় নি। এখন পরিবার চাচ্ছে আমাকে বিদেশে পাঠিয়ে দিতে। কী করা উচিত?

**উত্তর :** বিদেশে যেতে পারেন। কিন্তু যদি প্রস্তুতি না থাকে, দক্ষতা-যোগ্যতা না থাকে তাহলে বিদেশে গিয়ে অবস্থা আরো খারাপ হতে পারে। একজন জয়েন্ট সেক্রেটারি চাকরি ছেড়ে বিদেশে গিয়ে এখন ফিলারের (গাড়িতে পেট্রোল ভরা) চাকরি করছেন। আরো ভালো সুযোগ পাওয়া যাবে-এই

আশায় তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন। এরকম হতাশায় দিন কাটানো প্রবাসীর সংখ্যা মোটেই কম নয়।

**প্রশ্ন :** আমি একজন ডাক্তার। বছরখানেক হলো আমি দেশের শীর্ষস্থানীয় একটি মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করে বেরিয়েছি। আমি এখন ডাক্তারির রেজিস্ট্রেশন পরীক্ষা দিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় চাকরি ও পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে চাই। অনেকে বলে, কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট হয়ে দেশকে সেবা না দিয়ে বাইরে চাকরি করবে? এটা কি অন্যায় গুরুজী, আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।

**উত্তর :** বিদেশে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে কোনো অসুবিধা নেই। বিশেষজ্ঞ হয়ে দেশে ফিরে আসুন। আসলে জীবিকার প্রয়োজনে যদি কেউ প্রবাসে যেতে বাধ্য হন তা একরকম। কিন্তু যারা দক্ষ, দেশের জন্যে তাদের প্রয়োজন আছে। আপনার যখন দেশে আর করার কিছু থাকবে না, তখন যদি বিদেশিদের কল্যাণের জন্যে আপনি বাইরে যান, আপনি তৃপ্তি পাবেন।

কিন্তু শুধুমাত্র অর্থ উপার্জন বা একটু আরাম-আয়েশে জীবন কাটানোর জন্যে যদি আপনি বাইরে যান, আপনি তৃপ্তি পাবেন না। একটু খবর নিলে দেখবেন, যারা বাইরে আছেন, ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত হয়তো তারা কোনোক্রমে ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটিয়ে দেন, কিন্তু ৬০-এর কোঠায় এসে তাদের মধ্যে হাহাকার সৃষ্টি হয়। এর কারণ—একদিকে জীবনের অর্থবহতার অভাব, অন্যদিকে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেনের জীবন। এর চাইতে আপনার মেধাকে দেশে ব্যয় করলে আপনার জীবন অনেক অর্থবহ হবে।

## আইন পেশা

**প্রশ্ন :** আমি অনার্স শেষ করে ব্যারিস্টারি পড়ে ব্যারিস্টার হতে চাই। আমার জন্যে সমাজবিজ্ঞান নিয়ে কোনোকিছু করা ঠিক হবে, না ব্যারিস্টারি পড়া ঠিক হবে, সেটা ঠিক করতে পারছি না।

**উত্তর :** ব্যারিস্টার হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আপনাকে জানতে হবে ব্যারিস্টার হয়ে আপনি কী করবেন? ব্যারিস্টার হয়ে আপনি যদি নির্যাতিতের পক্ষে দাঁড়ান, তাহলে আপনি যথার্থ। ন্যায়ের পক্ষে লড়েন, এর চেয়ে বড়

কাজ খুব কম আছে। কিন্তু ব্যারিস্টার হয়ে আপনি যদি খুনী বা ধর্ষকের পক্ষে ওকালতি করেন, তাহলে তা হবে কোরআনের নির্দেশের লঙ্ঘন। কেন না কোরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে ‘তোমরা অপরাধীর পক্ষে ওকালতি করো না’। যে আইনজীবী অপরাধীর পক্ষে ওকালতি করেন, অপরাধীকে শাস্তি থেকে রক্ষা করেন, তিনি কি কখনো সম্মান পাওয়ার যোগ্য! অর্থের জন্যে নিজেকে বিক্রি করে দেয়া নিঃসন্দেহে অসম্মানজনক।

কিন্তু শোনা যায়, আমাদের সমাজে আইন পেশার এখন যা অবস্থা, ম্যালপ্র্যাকটিস ছাড়া সফল আইনজীবী হওয়া অত্যন্ত কঠিন। যারা প্র্যাকটিস করেন তাদের উপার্জন কম আর যারা ম্যালপ্র্যাকটিস করেন তাদের উপার্জন বেশি।

একবার এক প্রথিতযশা ইনকাম ট্যাক্স প্র্যাকটিশনারের সাথে পরিচয় হলো। বললাম, ইনকাম ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার হিসেবে আপনার তো যথেষ্ট সুনাম শুনেছি। উনি হাসলেন। বললেন যে, না, আমি আসলে প্র্যাকটিস করি না, ম্যালপ্র্যাকটিস করি এবং ম্যালপ্র্যাকটিসে আমি দক্ষ, এজন্যে আমার নাম আপনি শুনেছেন।

আমাদের এক গ্রাজুয়েট, তিনি নিজেও আইনজীবী। তার মা তাকে উইল করে কিছু সম্পত্তি দিয়েছিলেন। দাতা তখনো জীবিত। উইলে কিছু ভুল ধরা পড়লো। তিনি এক পরিচিত সিনিয়র আইনজীবীর কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ নিতে গেলেন। আইনজীবী পরামর্শ দিলেন মামলা করার। তিনি সরল মনে রাজি হলেন এবং ঐ আইনজীবীকেই নিয়োগ করলেন মামলা পরিচালনার জন্যে। সেই আইনজীবী মামলা এমনভাবে সাজালেন, যেন রায় বিপক্ষে যায় এবং আপিল করতে হয়। তিনি আপিল করলেন। এভাবে মামলা, পাল্টা মামলায় ২০০২ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত কেটে গেল। ২০০৮-এ তিনি জানতে পারলেন, যে কাজটার জন্যে তিনি ইতোমধ্যেই ছয় বছর ব্যয় করেছেন, দলিল রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে একদিনেই তা করতে পারতেন। পরে এক সকালে রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে দলিলের সংশোধন হয়ে গেল।

আপনি যদি মনে করেন-অর্থ যা-ই আসুক, আমি নির্যাতিতের পক্ষে থাকবো, আপনি ব্যারিস্টারি পড়তে পারেন।

**প্রশ্ন :** ওকালতি পেশাতে ১০০ ভাগ গ্যারান্টি না দিলে ক্লায়েন্টরা টাকা বা কেস দিতে চায় না। তারা আইনে জেতার চেয়ে ঘুষ দিয়ে কেস জেতা বেশি পছন্দ করে। এক্ষেত্রে কী করা যায়? আমার পরিচিত এক এডভোকেট

আইনগতভাবে জেতার সম্ভাবনা থাকলে তখন ১০০% গ্যারান্টি দেন যাতে তারা পয়সা দেয়। প্রায় সময়ই উনি সাফল্য পান কিন্তু মাঝে মাঝে মিস হয়ে গেলে সমস্যা পড়েন। এটা কীভাবে মোকাবেলা করা যায়?

**উত্তর :** শুনেছি—যারা ওকালতি করেন তাদের অনেকে জানেন যে, এটাকে কীভাবে মোকাবেলা করতে হবে। জিতলেও তারা জানেন কী কারণে জিতলেন এবং এটা তিনি তার ক্লায়েন্টকে বোঝাতে পারেন খুব ভালোভাবে। আবার কোনো কেস-এ হারলে, কী কারণে হারলেন এবং কেসটা যে আবার তাকেই দিতে হবে—যাতে পরের বার জিতিয়ে দিতে পারেন—এই আশ্বাস ক্লায়েন্টকে দিতে পারেন পুরোপুরি। এটাই নাকি ওকালতি পেশার বিশেষত্ব। তবে ওকালতির ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ খুব পরিষ্কার। কোরআনে বলা হয়েছে, ‘অপরাধীর পক্ষে ওকালতি করো না’। কাজেই জেনেগুনেন কখনো কোনো অপরাধী, খুনী ও ধর্ষকের পক্ষে ওকালতি করবেন না।

## ব্যাংকে চাকরি

**প্রশ্ন :** একটি ব্যাংকে আমার চাকরি হয়েছে। সামনের মাসে জয়েনিং। আমি জানি, ব্যাংকে লেনদেন ইসলামি শরিয়তের বিধান অনুযায়ী হারাম। আমার মন খুঁতখুঁত করছে। আমার রোজগারের টাকা হালাল হবে তো? হারাম পথে আমি কোনো টাকা আয় করতে চাই না। গুরুজী দয়া করে জানাবেন।

**উত্তর :** ধারের বিনিময়ে সুদ গ্রহণ এবং হারাম ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগকে ইসলাম অবৈধ করেছে। শরিয়ার এই রীতি মেনে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনার নীতিগত ধারণাটিকেই ইসলামি ব্যাংকিং বলে। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর থেকে শুরু করে ৮০০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ইসলামের স্বর্ণযুগে যে ব্যাপকভিত্তিক ইসলামি অর্থনীতির বিকাশ ঘটে, তারই অনুপ্রেরণায় ৬০-এর দশকের মাঝামাঝি মিশরে প্রথম ইসলামি ব্যাংকিং পদ্ধতির প্রচলন হয়। পরবর্তীতে তা বিস্তৃত হয় ইরান, সৌদি আরব এবং মালয়েশিয়ায়।

ইসলামি ব্যাংকিং বলে, সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিপরীতে তাদের ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালিত হয় লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগির শর্তানুসারে। মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা ইত্যাদি নানা নামের অর্থনৈতিক লেনদেনের

নিয়ম রয়েছে তাদের। এখন প্রশ্ন হলো, পারস্পরিক নির্ভরশীল বর্তমান বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় কোনো বিশেষ ব্যাংকিং ব্যবস্থার পক্ষে কি বাদবাকি ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে লেনদেন না করে থাকা সম্ভব? আর যখন একই দেশে অন্যান্য ব্যাংকিং ব্যবস্থা রয়েছে এবং যেখানে তাদের সবাইকে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে বাধ্যতামূলক লেনদেন করতে হয় তখন সেখানে শরিয়ামভিত্তিক ব্যাংকিং কীভাবে হবে? আমাদের দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে বাধ্যতামূলক একটা জামানত রাখতে হয়, লেনদেন করতে হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কি ইসলামভিত্তিক লেনদেন করছে, না বাংলাদেশ ব্যাংকের আইন অনুযায়ী করছে? অর্থাৎ একটা দেশের সব ব্যবস্থা যখন ধর্মনিরপেক্ষ, তখন শুধু ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামি হওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, কোরআনে যে রিবা বা সুদকে হারাম করা হয়েছে, আলেমদের একটা অংশ-যাদের মধ্যে আল্লামা ইউসুফ আলীও রয়েছেন-তারা মনে করেন, বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থার সুদ তার আওতায় পড়ে না। কোরআনের এই রিবা হলো মহাজনী সুদ যা অনেকসময় আসলের চেয়েও অনেক গুণ বেশি হয়ে যেত এবং তা শোধ করতে না পারলে আমাদের চিরায়ত সাহিত্যের সেই উপেন কিংবা গফুরের মতো ভিটেবাড়ি সব খোয়াতে হতো। শেক্সপিয়ারের মার্চেন্ট অফ ভেনিসের শাইলকের মতো এই মহাজনেরা দেনাদারের ওপর খড়গহস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো।

আর সাধারণ ব্যাংক যাকে সুদ বলে, ইসলামি ব্যাংক তাকেই বলে মুদারাবা বা প্রফিট শেয়ারিং। অর্থাৎ আপনার টাকা খাটিয়ে ব্যাংক যদি প্রফিট করে তাহলে আপনি তার ভাগ পাবেন, কিন্তু লস করলে আপনি কিছু পাবেন না। কিন্তু আপনি যদি ব্যাংকের টাকা নিয়ে লস করেন তাহলে ব্যাংক আপনার এই লস শেয়ার করবে না। তাহলে এটা ব্যবসা হলো কীভাবে? অর্থাৎ সবই এক, শুধু নামগুলো আরবি। যেমন, একসময় লাইফ ইনস্যুরেন্সকে শরিয়ার পরিপন্থি গণ্য করা হতো। এখন এটাকে বলা হয় ইসলামিক ইনস্যুরেন্স বা তাকাফুল। সবই এক শুধু ব্যাংকটি বদলে গেছে যে, একজনের ঝুঁকিকে যখন অনেকে মিলে বহন করেন তখন এর লাভ পেতে অসুবিধা নেই।

ইসলাম শব্দটির সাথে আমাদের দেশের মানুষের যেহেতু একটা দুর্বলতা আছে, সেই সুবাদে ইসলামের নামে অনেকেই লাভজনক ব্যবসা করছেন। তাই এখন এইচএসবিসি এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের মতো বহুজাতিক ব্যাংক তাদের সাধারণ ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি ‘সাদিক’ ‘আমানাহ’ ইত্যাদি নামে ইসলামি ব্যাংকিংও চালু করেছে। এটা অনেকটা ইংরেজদের ইংরেজ

প্রিন্সিপাল দিয়ে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা চালু করার মতো।

আমাদের কারো কারো বাতীক আছে—ব্যাংকে টাকা রেখেছি, সুদ নেবো না। কিন্তু এই টাকাটা কারা ব্যবহার করছে? এখন সারা বিশ্বের ব্যাংকিং অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে ইহুদিরা। আপনি আপনার টাকা তাদেরকে দিচ্ছেন আরো টাকা বানাবার জন্যে। আপনি সুদ না নিলে তাদের জন্যে আরো ভালো। তাদের টাকা বাড়বে। অতএব আমরা যেন আত্মপ্রতারণার শিকার না হই। যা বাস্তব, তাকে যেন বাস্তবানুগভাবেই গ্রহণ করি। কারণ আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ। এখানে শুধু ব্যাংকিং ইসলামি হতে পারে না। একমাত্র ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যাংকিং শরিয়তসম্মত হবে। তখন আপনি ইসলামি ব্যাংকিং করতে পারবেন।

অতএব আমরা দেখেছি যে, তথাকথিত ইসলামি ব্যাংকিং আর অন্যান্য ব্যাংকিংয়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো পার্থক্য নেই। সবাইকেই বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়মের অধীনে কাজ করতে হচ্ছে। তারা একই কাজ করছেন, শুধু ভিন্ন নামে ডাকছেন। আর ব্যাংক ছাড়া এবং ব্যাংকের সুদ ছাড়া তো এখন কোনো অর্থনীতি চলছে না। আপনি যেহেতু অন্য কাউকে ঠকাচ্ছেন না এবং যা হচ্ছে সব পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে একটা সিস্টেমের মধ্যে হচ্ছে অতএব ব্যাংকিং সার্ভিসের মধ্যে আমরা হারামের কিছু দেখছি না।

**প্রশ্ন :** আমি টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র। আমার লক্ষ্য একজন ব্যাংকার হওয়া। কিন্তু ব্যাংকিং সেক্টর পুরোপুরি সুদের ভিত্তিতে চলে। আমি সুদমুক্ত জীবনযাপন করতে চাই। এক্ষেত্রে আমার করণীয় কী?

**উত্তর :** এর বিস্তারিত উত্তর আমরা আগের প্রশ্নে দিয়েছি। আসলে বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতি হচ্ছে সুদভিত্তিক। তাই আপনি যতই চান সুদমুক্ত জীবনযাপন করতে, তা সম্ভব নয়। যেমন, আমরা বাজার থেকে চাল কিনি। যে ব্যবসায়ী বিদেশ থেকে চাল আমদানি করছে, সে চাল আনছে ব্যাংকের মাধ্যমে। ব্যাংক তাকে টাকা দিচ্ছে সুদের ভিত্তিতে। বাজারে আমাদের কাছে চাল বিক্রি করে সে ওই টাকা পরিশোধ করছে।

অতএব বাস্তববাদী হতে হবে। খন্ডিতভাবে জীবনযাপন করা যায় না। দৃষ্টিটাকে আরো বিস্তৃত করতে হবে। বাস্তবতা হচ্ছে, আপনি যে পেশাতেই থাকেন না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বের সুদমুক্ত অর্থনীতি না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কারো পক্ষে সুদমুক্ত জীবনযাপন করা সম্ভব নয়।

## মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি

**প্রশ্ন :** আমাদের সমাজে বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরি করাটাকে যোগ্যতার পরিচয় মনে করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের টিচারদের কথাতেও সেটাই বোঝা যেত। আমি ব্যক্তিগতভাবে এখন এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে বা আবেদন করতে দ্বিধাশ্রিত থাকি। কিছুদিনের মধ্যেই ক্যারিয়ার শুরু করতে যাচ্ছি। এখন আমার কী করা উচিত?

**উত্তর :** বহুজাতিক কোম্পানিগুলো আসলে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ হিসেবে কাজ করছে। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো বিশ্বজুড়ে উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে সাম্রাজ্য বিস্তারের যে কাজ করেছে, বিংশ বা একবিংশ শতকে তা-ই নব্যরূপ নিয়েছে মাল্টিন্যাশনালের নামে। আর তাদের এ শোষণেরই হাতিয়ার হয়ে যাচ্ছেন নেটিভদের মধ্য থেকে যারা তাদের ওখানে কাজ করছেন তারা। এবং তারাও যে খুব ভালো আছেন তা নয়। কারণ এরকম একজন কর্মীকে বহুজাতিক কোম্পানিটি হয়তো বেতন দিচ্ছে ৪০ হাজার টাকা, কিন্তু সে তো তাকে দিয়ে চার লাখ টাকা উপার্জন করতে চাইবে। নইলে তারা এত বেতন কেন দেবে? কারণ মাল্টিন্যাশনাল তো আর সেবামূলক প্রতিষ্ঠান না। তারা তো নেট প্রফিট ছাড়া কোনোকিছু চিন্তা করে না। সেটার জন্যে যে পরিমাণ পরিশ্রম, তা করতে গিয়ে ঐ মানুষটিকে তার জীবনের অনেক মূল্যবান দিককে অবহেলা করতে হবে।

উপরন্তু কাজের কোনো তৃপ্তি এই কাজগুলোর মধ্য দিয়ে পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ শ্রেফ উপার্জনের জন্যে বা শোষণ করে টাকা কামানোর মধ্যে কোনো আনন্দ নেই, তৃপ্তি নেই যা আসে সেবা বা মিশন হিসেবে যে কাজ করা হয় তার মধ্য দিয়ে। ফলে স্ট্রেস, হতাশা, মানসিক অবসাদ, শারীরিক রোগ-ব্যাদি অবশ্যম্ভাবী। আপনি এর প্রমাণ দেখুন বড় বড় মাল্টিন্যাশনালের সিইওদের জীবনে। সাইকোলজি টুডে পত্রিকার রিপোর্ট হচ্ছে, আমেরিকায় প্রতি পাঁচজনে একজন সিইও ডিপ্রেশনে ভোগেন। কারণ কাজটা তার ভালবাসা নয়, এটা তার কাছে বিরক্তিকর একটা ব্যাপার।

বহুজাতিক কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে হৃদরোগ, বিষণ্ণতাসহ অন্যান্য রোগের যে প্রাদুর্ভাব এর অন্যতম প্রধান কারণ বিরক্তি সহকারে কাজ। বিরক্তি নিয়ে কোনো কাজ করলে তার বরকত কমে যায় এবং সেই কাজ করে সুস্থ থাকা যায় না। শরীরে টক্সিন সৃষ্টির অন্যতম কারণ বিরক্তি



সহকারে কাজ করা।

আর মাল্টিন্যাশনালে কাজ করাটা একটা বৃত্তের মতো। একবার যখন আপনি মাল্টিন্যাশনালে ঢুকবেন, তখন বেশি বেতন, অফিস স্ট্যাটাস-সবকিছু মিলে আপনি একটা লাইফস্টাইলে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। বেশি অর্থ দিয়ে থাকা খাওয়া চলা কেনা সবই হয়ে যাবে আপনার স্ট্যাটাস সিম্বল। ফলে এর চেয়ে নিচের অবস্থানে নামা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না। গাড়িতে চড়ে অভ্যস্ত হলে তখন চাইলেও আপনি রিকশায় চড়তে পারবেন না। দামি ফ্যাশন হাউস থেকে ব্র্যান্ড পোশাক কিনতে কিনতে ভিড়ের মার্কেট থেকে দরদস্তুর করে কেনাটা আপনার কাছে বিরক্তিকর মনে হবে। কাজেই তখন এই লাইফ স্ট্যাটাস বজায় রাখার জন্যে উচ্চবেতনের মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ছেড়ে যাওয়ার কথা আর আপনি ভাবতে পারবেন না।

আসলে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি দুর্দশার এক ভিন্ন ধরনের বৃত্ত। আপাত লোভনীয় বেতন খরচ আর ক্রেডিট কার্ডের বৃত্তে আপনাকে জড়িয়ে ফেলবে। ক্রমাগত টিকে থাকার প্রতিযোগিতায় এদের অধিকাংশই স্ট্রেস, ডিপ্রেসন বা হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তাই উদ্যমী ও পরিশ্রমী হলে স্বাধীন পেশা বা ব্যবসা করাই উত্তম।

**প্রশ্ন :** মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরিরত একজন কোয়ান্টাম থ্রাজুয়েটের কী ভূমিকা থাকা প্রয়োজন? তার কি সে চাকরি থেকে অব্যাহতি নেয়া উচিত?

**উত্তর :** আসলে সবকিছুই সময়মতো করতে হয়। আমরা একটি চেতনার কথা বলেছি। আজকে মাল্টিন্যাশনালের চাকরি ছেড়ে দিলে আপনার চলবে কীভাবে? এজন্যে আপনার মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। আবেগ খুব বেশিক্ষণ না-ও থাকতে পারে।

কিন্তু মনে রাখবেন যে, আপনি গৌরবজনক কিছু করছেন না। যখনই সুযোগ পাবেন, নিজে কিছু করার চেষ্টা করবেন। ধীরে ধীরে চেতনাকে শাণিত করুন। নিজের জন্যে, দেশের জন্যে কিছু করতে পারেন কি না চিন্তা করুন। দেখবেন, এমন সময় আসবে যখন এর চেয়ে ভালো কিছু করতে পারছেন।

**প্রশ্ন :** আমি এমবিএ-র স্টুডেন্ট। মেজর সাবজেক্ট মার্কেটিং। অন্যান্য এমবিএ-দের মতো আমিও চাইতাম বহুজাতিক কোম্পানিতে কাজ করতে। কিন্তু আপনি বলেছেন সেটা ভালো আইডিয়া না। আমার কী করা উচিত?

**উত্তর :** এটা নির্ভর করবে আপনার লক্ষ্য কী তার ওপর। আপনার লক্ষ্য যদি মানুষের সেবা করা হয় তাহলে সেবামূলী যেকোনো কাজ করতে পারেন। যদি ব্যবসায়িক ব্যাপারে আপনার আগ্রহ বেশি থাকে তাহলে নিজস্ব ব্যবসা শুরু করতে পারেন। ব্যবসাও সেবার মাধ্যম হতে পারে। আর যদি অর্থের ব্যাপারে আপনার কোনো আগ্রহ না থাকে, বিশুদ্ধ সেবা দেয়া লক্ষ্য হয়, তাহলে ফাউন্ডেশনে আসতে পারেন। কারণ আপনি যেহেতু বহুজাতিক কোম্পানিতে কাজ করতে চাচ্ছেন না, কোনো দেশীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও আপনি কাজ করতে পারবেন না, কারণ সেখানেও অবস্থা একই।

**প্রশ্ন :** প্রাইভেট অর্গানাইজেশনে কাজ করি। সকাল নয়টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত খাটতে হয়। তারপর টপ বসদের বকুনি। মানসিক চাপ থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?

**উত্তর :** আসলে প্রাইভেট অর্গানাইজেশনে কাজ করতে হলে এ পরিমাণ খাটতেই হবে এবং টপ বসদের বকুনিও খেতেই হবে। এই চাপ থেকে মুক্তির জন্যে নিয়মিত মেডিটেশন করণ এবং বকুনিকে প্রশংসা বলে মনে করণ, অর্থাৎ বকুনিকে সহজভাবে নিন।

আসলে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোতে আপাত বেশি বেতনের আড়ালে আছে এই হাড়ভাঙা খাটুনি। সেখানে বেতন হয়তো দুইজনের সমান দেয়া হচ্ছে। কিন্তু কাজ করানো হয় চারজনের সমান। সকাল নয়টা থেকে রাত নয়টা। সে মনে করছে সে অনেক কাজ করছে কিন্তু সে কাজের ফল ভোগ করছে তার মালিক।

আর এখনকার তরুণ-তরুণীরা যেভাবে বিবিএ-এমবিএ পড়ার দিকে ঝুঁকছে তাতে যা হবে তা হলো-বিবিএ-এমবিএ করার পর অধিকাংশই ভালো কোনো চাকরি পাবে না। কারণ এত বেশি বিবিএ-এমবিএ হয়ে যাবে যে, দেখা যাবে ছোট কোনো পোস্টেও এমবিএ-রা এগ্লাই করছে-বেশিরভাগ সময়ই যারা নির্বাচিত হতে পারবে না। কারণ, এ সমস্ত ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা ভাবেন, এত ছোট পোস্টে এরকম বড় ডিগ্রিধারী একজনকে নিলেও সে হয়তো বেশিদিন থাকবে না। ভালো অফার পেলে প্রথম সুযোগেই এ চাকরিটা সে ছেড়ে দেবে। অথচ তিনি যদি বড় কিছু করতে উদ্বুদ্ধ হতেন তাহলে তিনি স্বাধীন পেশাকে বেছে নিতে পারতেন এবং নিজের প্রতিষ্ঠানে আরো অনেককে চাকরি দিতে পারতেন।

## ব্যবসা

**প্রশ্ন :** আমি ব্যবসা করতে চাই। কী ধরনের ব্যবসা করা উচিত?

**উত্তর :** যে ব্যবসার মধ্য দিয়ে আপনি একজন মানুষকে সেবা দিতে পারবেন, প্রতারণা নয়। একটা ভালো পণ্য একজনের হাতে তুলে দেয়াটাও একটা সেবা, একটা ইবাদত। একটা ভালো খাবার একজনের হাতে তুলে দেয়াটাও একটা সেবা। কিন্তু সফট ড্রিংকস, এনার্জি ড্রিংকস, মদ বা ড্রাগস তুলে দেয়াটা সেবা নয়। অতএব যেখানে আপনি সেবা করতে পারবেন সততার সাথে সেটাই আপনার ব্যবসা হতে পারে। প্রতিটি ব্যবসাতেই সেবা করার সুযোগ আছে, যদি আপনার সে মানসিকতা থাকে।

**প্রশ্ন :** আমি বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরি করি। আমার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা চাকরির পর ব্যবসা করবো।

**উত্তর :** অধিকাংশ চাকরিজীবী এই ভুলটা করেন। এ কারণে তাদের পেনশনের টাকা তারা ভোগ করতে পারেন না। কারণ যখন পেনশনের টাকা বা গ্রাচুয়িটির টাকা পান—এই ১০, ১৫ বা ২০ লাখ টাকা তারা কোনো আংকেল, ভাতিজা বা ছেলের বন্ধুর সাথে ব্যবসায় খাটান এবং এই টাকাটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। যত রিটার্ডার্ড অফিসার বিনিয়োগ করেছেন, এর ৯৯ ভাগই তাদের বিনিয়োগ ফেরত পান নি।

কিছু পুঁজি নিয়ে যেকোনো একটা কিছু শুরু করে দিলেই সেটা ব্যবসা হয় না। ব্যবসায় সফলতা পেতে হলে ব্যবসা বুঝতে হয়, অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। প্রতিটি ব্যবসার যে নিজস্ব সাফল্যের গোপন রহস্য আছে, সেটা জানতে হয়। ধরুন, আপনি একটি সফটওয়্যার ফার্ম খুললেন। আপনি যদি এ সম্পর্কে না জানেন, ইঞ্জিনিয়ার হয়তো তিন মিনিটের কাজকে বলবে—এটা অনেক কঠিন কাজ, জটিল কাজ, তিন মাস লাগবে। আপনি যেহেতু জানেন না এটা তিন মাস লাগবে না তিন মিনিট লাগবে, আপনার তাকে বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় থাকবে না। আপনার ব্যবসায় লস হবে।

সারাজীবন চাকরির পর ব্যবসা করাটা আপনার পক্ষে সহজ নয়। এই টাকা ব্যবসায় না খাটিয়ে ব্যাংকে রেখে দিলেই তো আপনার মাসের খরচের টাকা উঠে আসে। আর অবসরে না গিয়ে পুরো সময়টাই আপনি আত্মিক

উন্নয়ন ও সৃষ্টির সেবায় ফাউন্ডেশনে কোয়ান্টিয়ার হিসেবে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। এতে আপনি একদিকে যেমন সুস্থ থাকবেন, অন্যদিকে আপনার পারলৌকিক মুক্তির পথও প্রশস্ত হবে।

**প্রশ্ন :** চার বছর বিদেশে ছিলাম। এখন বাংলাদেশে চলে এসেছি। কষ্টার্জিত অর্থ কোথায় বিনিয়োগ করবো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। ভয় হয় যদি লস হয়। এ ব্যাপারে আপনি কোনো উপদেশ দিলে উপকৃত হবো।

**উত্তর :** কষ্টার্জিত অর্থ বিনিয়োগ না করে এই অর্থের সাথে কীভাবে শ্রম বিনিয়োগ করতে পারেন সে চিন্তা করুন। শুধু টাকা বিনিয়োগ করলে হয় না। এর সাথে শ্রম ও বুদ্ধি বিনিয়োগ করতে হবে।

আর ব্যবসা করার আগে ব্যবসা বুঝতে হবে। প্রত্যেকটা ব্যবসার রহস্য আছে। সেই রহস্যটি বুঝতে হবে। ব্যবসায় নামার আগে, বিনিয়োগ করার আগে তাই ব্যবসাটা বোঝার চেষ্টা করুন। অথবা সেই ব্যবসাই শুরু করুন যা আপনি বোঝেন, সেটা যত ছোটই হোক না কেন। তাহলে আপনি টাকাকে পুঁজিতে রূপান্তরিত করতে পারবেন।

**প্রশ্ন :** আমি যে চাকরিটা করছি তাতে বেতন ভালো কিন্তু কোনো ভবিষ্যৎ নেই। আমি এটা বদলে এমন কিছু করতে চাই যা ক্যারিয়ারকে অনেক দূর নেবে। ভাবছি স্বাধীন ব্যবসা করবো। কিন্তু পরিবারের সহযোগিতা পাওয়া যাবে কি না জানি না। এদিকে চাকরিতে মোটেও মনোযোগ দিতে পারছি না।

**উত্তর :** পরিবারের সহযোগিতার অপেক্ষায় যদি থাকেন তাহলে ব্যবসায় সফল হবার সম্ভাবনা কম। ব্যবসা করার জন্যে শূন্য থেকে শুরু করতে হবে। পৃথিবীতে যত বিভবান দেখবেন, তারা সবাই শুরু করেছেন শূন্য থেকে।

বিল গেটস কত টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলেন? অথচ আমরা জানি, সাম্প্রতিক কয়েক বছর ধরে তিনি ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধনকুবের। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধনকুবের ওয়ারেন বাফেট। পত্রিকার হকারি থেকে ২৫ ডলার জমিয়ে ১৪ বছর বয়সে তিনি একটা যন্ত্র কেনেন। এই হলো ব্যবসার শুরু। আজ তিনি দুই লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকার মালিক।

মুন্সি সিরামিকের হারুনুর রশীদ খান মুন্সি, ৭৫ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। আকিজ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা আকিজ মিয়া বিড়ি বানাতেন। পরে

অন্য ব্যবসা ছাড়াই শুধু বিড়ি ফ্যাক্টরি থেকেই বছরে ছয় কোটি টাকা ট্যাক্স দিতেন আজ থেকে ১৫ বছর আগে। তারা তো কারো কাছে হাত পাতেন নি।

অর্থাৎ আপনাকে শুরু করতে হবে যা আছে তা দিয়ে। আপনি যদি মনে করেন পরিবার আমাকে সহায়তা করছে না, ঠিক আছে, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আমি গার্মেন্টস বিক্রি করবো। তাহলে আপনি বায়িং হাউস করতে পারবেন। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি করতে পারবেন, সবকিছু করতে পারবেন।

**প্রশ্ন :** আমি অনার্স শেষ করে সম্প্রতি মাস্টার্সও পাশ করেছি। পেশাগত জীবনে আমার ইচ্ছা উদ্যোক্তা হওয়া। কিন্তু বার বার বিভিন্ন ভীতি মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। কোনো সাহসী পদক্ষেপ নিতে পারছি না। অনেকে বলছে—আগে চাকরি করে পরে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নিও। কিন্তু এটি আমার আবেগ ও ভীতির মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। কীভাবে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে আমি উদ্যোক্তা হতে পারি? এক্ষেত্রে বাস্তব পদক্ষেপ কেমন হতে পারে? উল্লেখ্য, আমি কোনো কাজ একটু করার পর পূর্ণ গতি থাকে না। এটা কীভাবে দূর করা সম্ভব?

**উত্তর :** আগে ঠিক করতে হবে আপনি কী করবেন এবং ব্যবসা আপনি বোঝেন কি না। ব্যবসা যদি ফুটপাত থেকে শুরু করতে পারেন, আপনি খুব ভালো উদ্যোক্তা হতে পারবেন। কারণ সংকোচ জড়তা সিদ্ধান্তহীনতা থাকলে কেউ ব্যবসা করতে পারে না, কেউ উদ্যোক্তা হতে পারে না। সিদ্ধান্ত নেয়ার নাম হচ্ছে উদ্যোগ। সবসময় মনে রাখবেন, পৃথিবী সাহসী মানুষের জন্যে এবং যে ব্যবসা করতে চান সেটা শূন্য থেকে শুরু করতে হবে।

আমরা অধিকাংশই ভুল করি কোথায়? আমরা টাকাপয়সা যোগাড় করে ব্যবসা শুরু করি। আমরা সবসময় মনে করি যে, এই করবো, ওই করবো, রিভলভিং চেয়ার থাকবে সেখানে বসবো। তিনটা টেলিফোন থাকবে, পাঁচ জন সেক্রেটারি থাকবে। যার ফলে ব্যবসা হয় না, টাকাপয়সা নষ্ট হয়।

ব্যবসার জন্যে শুরুতেই টাকার কোনো প্রয়োজন নেই। রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ুন। আপনি ব্যবসা করতে পারবেন। রাস্তা থেকে আপনি প্রাসাদে উঠবেন।

আমাদের দেশে উদ্যোক্তা কী রকম? একজন তার বন্ধুকে বলছে যে, চল, আমরা তিন বন্ধু মিলে ফ্যাক্টরি বানাবো। প্রস্তাবটা খুব মজার। বন্ধুর জায়গাটা ব্যাংকের কাছে বন্ধক দিয়ে লোন নেবে। সেই লোন থেকে প্রথমে তিন বন্ধু তিনটা লেক্সাস গাড়ি কিনবে। এই হচ্ছে ব্যবসার শুরু! এদের না কোনোদিন

ফ্যান্টারি হবে, না সে ঋণ কোনোদিন শোধ হবে। আসলে যে ব্যবসা শূন্য থেকে শুরু হয় তা-ই এগিয়ে যায় পূর্ণতায়।

সাহস এবং বিশ্বাস ছাড়া উদ্যোগ নেয়া যায় না। মরলে এর সাথে মরবো, বাঁচলে এর সাথে বাঁচবো-এই চিন্তা আপনাকে অমর করবে। যে জিনিসের জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত থাকবেন সেই জিনিস আপনাকে অমর করবে।

**প্রশ্ন :** আমি বিগত আট বছর যাবত ব্যবসার সাথে জড়িত। ব্যবসাগত লেনদেনে আমি নিজে সবসময় পরিশোধ করি সঠিক সময়ে। কিন্তু আমার পাওনা খুব কমই আমি সময়মতো পাই। যার জন্যে আমাকে প্রায়ই সমস্যা পড়তে হয়। এ ব্যাপারে আমার করণীয় কী?

**উত্তর :** ব্যাপারটা খুব সহজ। আমি আগে কোনো কাজ করালে মজুরি যা হবে সব দিয়ে দিতাম। দেখতাম, কাজটা পাঁচ দিনেও হয় না। পরে বুঝলাম, সে যেহেতু মজুরি পেয়েই গেছে অতএব কাজটা তার কাছে গুরুত্বহীন হয়ে গেছে। একজন পরামর্শ দিলেন যে, এ সমস্ত ক্ষেত্রে কাজ হওয়ার আগে দেবেন ১০%, হওয়ার পরে দেবেন ৯০%। দেখবেন, আপনার কাজটা সময়মতো হয়ে যাবে। দেখলাম যে, তা-ই হচ্ছে।

আপনাকেও এরকম কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ জিনিসপত্র দিলেও একটু পঁয়চ রেখে দিতে হবে যাতে সে টাকাটা দিতে বাধ্য হয়। আবার আটকে রাখছেন এটাও বোঝানো যাবে না।

**প্রশ্ন :** স্বাধীন পেশা বা ব্যবসা করার পূর্বে চাকরি করা প্রয়োজন, এতে ব্যবসা শেখা যায়-এ সম্পর্কে জানতে চাই।

**উত্তর :** এটা ঠিক। তবে সেক্ষেত্রে আপনি যে ব্যবসায় যেতে চান সে ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট জায়গায় আপনাকে চাকরি করতে হবে। আপনি যদি ফটোগ্রাফির ব্যবসায় যেতে চান, তাহলে ফটোগ্রাফির দোকানে চাকরি নিতে হবে। কাজটা আপনাকে শিখতে হবে, কাজের রহস্যগুলো বুঝতে হবে, বুঝে তারপর ব্যবসা করতে হবে। অর্থাৎ যেকোনো ব্যবসায় নামার আগে সে ব্যবসা বুঝতে হবে এবং যে চাকরিতে গেলে এই ব্যবসা সবচেয়ে সুন্দরভাবে বোঝা যাবে, বেতন যা-ই হোক তাতেই যেতে হবে।

আর ব্যবসায় সফল হওয়ার কৌশল খুব সহজ। সনাতন ধর্ম অনুসারে

ব্যবসার দেবতা গণেশ। গণেশের দেহটা মানুষের, আর মাথাটা হাতির। অর্থাৎ দেহটা মানুষের আর মাথাটা পশুর। অতএব ব্যবসা করতে হলে দেহটুকুই মানুষের থাকবে—যদি খুব বড়, অনেক বড় ব্যবসা করতে চান। সাধারণভাবে আপনার মধ্যে পশুর যে Survival Instinct—এটা তীব্র থাকতে হবে যে, ব্যবসা ছাড়া আপনি আর কিছু বোঝেন না। আপনি ব্যবসাতে তখন খুব ভালো করবেন।

ব্যবসায়ে সফল হতে হলে যে সূত্রে আপনাকে এগুতে হবে তা হলো—  
পুঁজি + উদ্যম + শ্রম + ব্যবস্থাপনা + বিপণন।

**প্রশ্ন :** বন্ধুদের দেখাদেখি শুরু করেছিলাম ফ্যাশন ওয়্যারের বিজনেস। কিন্তু লাভ তো দূরের কথা দামি মার্কেটে সাজানো-গোছানো দোকানের খরচ ওঠাতেই ধার-দেনার অবস্থা। এখন কী করবো?

**উত্তর :** আপনি এখানেই ভুল করেছেন। ব্যবসা করতে গিয়ে হুজুগে মেতে ওঠার প্রবণতাটা আমাদের অনেকেরই আছে। সবাই যেখানে যাচ্ছে সে ব্যবসার পেছনেই আমরা ছুটি। কিন্তু এটা বুঝতে হবে যে, প্রতিটি পাত্রের যেমন একটা ধারণক্ষমতা আছে, তেমনি প্রতিটি খাত বা ব্যবসার চূড়ান্ত মাত্রা বা ধারণক্ষমতা আছে যার পরে আর ঐ ব্যবসায়ে বিস্তৃতির কোনো সুযোগ থাকে না। যারা প্রথমে যায়, তারাই মূলত লাভবান হয়। পরে যারা আসে তাদের আখেরে তেমন কিছুই জোটে না।

বাংলাদেশে যখন আশির দশকে প্রথম গার্মেন্টস ব্যবসা শুরু হলো, আমি যেহেতু এস্ট্রলজি চর্চা করতাম, অনেককেই বললাম—গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি করুন। তারা বললেন যে, ‘কী! দর্জির দোকান দেবো আর বাড়ির মেড-সার্ভেন্টদের চাকরি দেবো’? তারা গার্মেন্টস ব্যবসায় গেলেন না। আর যারা গেলেন সেই প্রথম উদ্যোক্তারাই কোটি কোটি টাকার মালিক হলেন।

যখন প্রথম কেউ একটা জিনিস শুরু করে, সবসময় মাখন সে-ই পেয়ে যায়। যেরকম—মোবাইলের প্রথম মাখন খেলো সিটিসেল, ১০ বছর। তারপরে মাখন যেটুকু ছিলো—গ্রামীণ। এখন হাড্ডি নিয়ে কামড়াকামড়ি হচ্ছে, তারপরেও আরো নতুন নতুন কোম্পানি আসছে। গ্রামীণ যা লাভ করে গেছে! একটু চিন্তা করে দেখুন যে, প্রতি মিনিটে কলরেট একসময় ছিলো— একটা জোনের মধ্যে চার টাকা, ইন্টারজোন হলে ১২ টাকা। তারপর তারা বললো, ওয়ান কান্ট্রি ওয়ান মোবাইল ওয়ান রেট—সাত টাকা। এখন ওয়ান কান্ট্রি

ওয়ান মোবাইল ওয়ান রেট এক টাকার কম। তারপরও তো তারা লাভ করছে। তাহলে যখন সাত টাকা ছিলো, কী পরিমাণ লাভ করেছে? এটা কেন? যেহেতু তারা আগে এসেছে। অর্থাৎ ব্যবসার জন্যে প্রয়োজন নতুন আইডিয়া খুঁজে বের করা।

২০ বছর আগের কথা। এক যুবক ভুয়া আদমব্যাপারীর পাল্লায় পড়েছিলো। বিদেশে গেল, ওখানে গলাধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে আমার সাথে দেখা করতে এলো। তাকে বললাম, আপনি কী করতে পারবেন? কী আছে আপনার? যা আছে তা নিয়েই শুরু করুন।

সে বললো, গ্রামে আমার এখনো একটা বাড়ি আছে, একটা পুকুর আছে। পুকুরের পাশে আমার বিঘাখানেক জমি আছে।

বললাম, চিন্তা করুন-এ থেকে কী করা যায়। খুব বুদ্ধিমান ছিলো সে। বললো, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। আমি কাউকে জানাতে পারছি না। যাকে বলি সে-ই বলে পাগল।

আমি বললাম, খুব ভালো। আমি তো এরকম পাগলদের খোঁজই করি সবসময়। সে বললো, আমার এই পুকুরটাকে দুই ভাগ করবো। একভাগে মাগুর মাছ চাষ করবো, আরেকভাগে ব্যাঙ চাষ করবো। এর সাথে কেঁচোর চাষ করবো। ব্যাঙের তো পা ছাড়া অন্য অংশ কাজে লাগে না। এগুলো মাটিতে পুঁতে দেবো দুই পুকুরের মাঝখানে, যেখানে কেঁচো থাকে। কেঁচো এগুলো পছন্দ করে, কেঁচো এগুলো খাবে। আবার, ব্যাঙ কেঁচো খুব পছন্দ করে। ব্যাঙ কেঁচো খায়। ব্যাঙকে কেঁচো খাবে আবার কেঁচোকে ব্যাঙ খাবে। একটা খাদ্যচক্র। ব্যাঙাচি হচ্ছে মাগুর মাছের সবচেয়ে প্রিয় খাবার। প্রচুর ব্যাঙাচি হবে, ওদেরকে মাগুর মাছ খাবে।

তার যে টাকা নষ্ট করেছিলো সেই টাকা দুই বছরে উসূল হয়ে গেল। ব্যাঙাচি খেলে মাছ খুব দ্রুত বাড়ে। মাগুর মাছ খুব দ্রুত বাড়তে লাগলো। মাগুর মাছ বিক্রি করছে, ব্যাঙের পা বিক্রি করছে। ব্যাঙের অবশিষ্টাংশ মাটিতে পুঁতে দিচ্ছে। সেটা খেয়ে কেঁচো বড় হচ্ছে। কেঁচো খেয়ে ব্যাঙ বড় হচ্ছে। ব্যাঙাচি খেয়ে মাগুর মাছ বড় হচ্ছে।

চার/পাঁচ বছর পরে আবার সে এলো, চমৎকার চেহারা। বললো, এখন আমার কোনো অভাব নেই। এখন আমি চিন্তা করছি নির্বাচনে দাঁড়াবো।

আমি বললাম, নির্বাচন করে কী হবে? সে বললো, এখন তো আল্লাহর রহমতে টাকাপয়সার অভাব নাই। আমি বললাম, টাকাপয়সা বাড়াতে থাকেন। মানুষের কিছু উপকার করেন। সে বললো, উপকার করার জন্যেই



তো নির্বাচন। আমি বললাম, নির্বাচন করে উপকার করতে পারবেন না। নির্বাচন করতে গেলেই আপনার উপকারের পরিমাণ কমে যাবে। কারণ যারা আপনাকে নির্বাচিত করবে তখন তাদের ফুট-ফরম্যাশেশ, তাদের মনোরঞ্জন করতে করতে আপনার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে।

চিন্তার নতুনত্ব তাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, সে এখন প্রচুর টাকার মালিক। নির্বাচন করতে গেলেই তো অনেক টাকা লাগে। নষ্ট করার মতো এত টাকা তার হয়ে গেছে।

ব্যবসা যখন করবেন, আপনাকে এই বুদ্ধি, এই নতুনত্ব, এই মেধাটাকে প্রয়োগ করতে হবে। চিন্তা করতে হবে—নতুন কোন ক্ষেত্রে তা করা যায়। ছোট হোক, কিন্তু নতুন ক্ষেত্র। কারণ সেখানে আপনিই প্রথম—দাঁড়িয়ে যেতে পারবেন প্রতিযোগিতা ছাড়া।

**প্রশ্ন :** আমার এক পরিচিতজন আছে, তার ভাগ্য খুব ভালো। খরিদাররা তার দোকান ছাড়া কেনে না। আমার কেন যেন এ ব্যাপারে ভাগ্য খুব খারাপ।

**উত্তর :** এটা ভাগ্য নয়। এটা তার নিয়ত, তার দৃষ্টিভঙ্গি। আসলে একজন ব্যর্থ এবং সফল ব্যবসায়ীর মধ্যে পার্থক্য হলো—ব্যর্থ ব্যবসায়ী চিন্তা করে ‘কত দ্রুত লাভ করা যাবে’। আর সফল ব্যবসায়ী লাভ কম করে। সে তার ক্রেতার ওপর গুরুত্ব দেয়, যাতে এ লোকটি সবসময় এই দোকান থেকে কেনে। সফল ব্যবসায়ী অল্প লাভ করে বেশি জিনিস বিক্রি করে আর ব্যর্থ ব্যবসায়ী অল্প জিনিস বিক্রি করে বেশি লাভ করতে চায়।

অল্প জিনিস বিক্রি করে আপনি যদি বেশি লাভ করতে চান তবে আপনার ব্যবসা টিকবে না। একবার ঠকবে, দুইবার ঠকবে, তৃতীয়বার ক্রেতা আর আপনার কাছে আসবে না। এ প্রসঙ্গে একজন সফল ব্যবসায়ী একবার বলছিলেন, সাধারণ ব্যবসায়ীরা বিক্রি করে লাভ করতে চায়। বিক্রি করে আসলে লাভ করা যায় না। লাভ করতে হয় কেনার সময়।

সম্ভ্রষ্ট হলে আপনার ক্রেতারাই নতুন ক্রেতা নিয়ে আসবে। আর ক্রেতার সম্ভ্রষ্টি নির্ভর করছে আপনার ওপর। এক তো হচ্ছে আপনার পণ্যের মান হতে হবে এমন যাতে ক্রেতা মনে করতে পারেন ভালো পণ্য কিনতে হলে আপনার দোকানই একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। আপনার কাছেই তাকে আসতে হবে। এই যে মামা পেঁয়াজু—প্রথম সে গুরু করেছিলো একটা টং দিয়ে। কিন্তু এখন শুধু পেঁয়াজু বিক্রি করে তার ঢাকা শহরে চারটা বাড়ি।

কেন পেরেছে? ক্রেতার সম্ভ্রুতি। যে কিনছে, সে নিজেকে প্রতারিত মনে করছে না। যেমন, এখনকার কিছু চাইনিজ জিনিসপত্র একবার কিনলে আর দ্বিতীয়বার কেনার ইচ্ছে হয় না। এর মধ্যে একজন এসে বললো, আট গিগাবাইটের পেনড্রাইভ একবার ঢোকাতে আর দ্বিতীয়বার চলে না। চীনারা যে মার্কেট দখল করছিলো—এই দুই নম্বর কোম্পানিগুলো চীনাদের মার্কেটের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, আপনার দোকানে যদি আরো কর্মচারী থাকে, ক্রেতার প্রতি তাদের আচরণ কেমন হচ্ছে সেদিকেও আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। যেমন, আপনার কর্মচারীরা কি ক্রেতাকে যথাযথ সম্মান দেয়? মনোযোগ দিয়ে তার কথা শোনে? আন্তরিকভাবে জিনিস দেখায়? কোনো কারণে ক্রেতা পণ্য কিনতে না চাইলে তাকে কি কট্ট মন্তব্য করে? দোকানে ক্রেতা এলে আপনি এবং আপনার কর্মচারীরা কি খুশি হন? শুকরিয়া আদায় করেন?

অতএব দোকানের বিক্রি বাড়ার জন্যে এই বাস্তব পদক্ষেপগুলো নিন। সবসময় ইতিবাচক থাকুন। সাধ্যমতো দান করুন। দেখবেন, ভাগ্য আপনার অনুকূলে চলে আসবে।

**প্রশ্ন :** আমরা দুজনে একটা প্রতিষ্ঠান চালাই কিন্তু আমার পার্টনার মাঝে মাঝেই বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে। মাঝে মাঝে তাকে চতুর মনে হয়। আমি বেরিয়ে যেতে চাইলে সে হাত-পা ধরা শুরু করে। এরকম বেশ কয়েকবার হয়েছে। অনেকে আমাকে আলাদা প্রতিষ্ঠান করতে বলে এবং আমি জানি তা আমি পারবো। আপনি বলে দিন—আমি কী করতে পারি?

**উত্তর :** ‘পার্টনার মাঝে মাঝেই বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে। মাঝে মাঝে তাকে চতুর মনে হয়।’ তার মানে পার্টনারের প্রতি আপনার আস্থা নেই। এটা না হলে তো আপনি পার্টনারশিপ বিজনেস করতে পারবেন না। কারণ পার্টনারশিপটাই হচ্ছে আস্থা বা বিশ্বাসের ব্যাপার।

এ ব্যাপারে ‘বে-ইস্টার্ন’ গ্রুপের জাকি-মোশাররফ জুটি এক চমৎকার উদাহরণ। ৫০ বছর আগে প্রথম যখন শুনলাম জাকি মোশাররফ, আমি ভাবলাম ‘জাকি মোশাররফ’ মানে একজন। পরে যখন তাদের অফিসে গেলাম, দেখলাম—দুজন মানুষ। একজন জাকিউদ্দিন আহমেদ, আরেকজন মোশাররফ হোসেন। এত বিশ্বস্ত পার্টনারশিপ খুবই বিরল। একইসাথে ব্যবসা করছেন, যেখানে যান একসাথে যান। বাড়ি করেছেন, সেটাও পাশাপাশি এবং

একই ডিজাইন। দাওয়াত করলেও দুজনকেই করতে হয়। কারণ একজনকে ছাড়া আরেকজন যান না। ১২ তম ব্যাচে দুজন একসাথে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করেছেন। অর্থাৎ এটা হলো পার্টনারশিপ যে, আপনারা একে অপরকে সবকিছুতে সবসময়ই পাশে পাবেন। বিশ্বাস করতে পারবেন।

পার্টনারশিপ গড়ার আগেই আপনাকে চিন্তা করতে হবে—যাকে আমি পার্টনার করছি তার সাথে আমি চলতে পারবো কি না। কারণ, যাকে বিশ্বাস করতে পারবেন না তার সাথে আপনার ব্যবসা বেশিদিন চলবে না। আজ হলেও ভাঙবে, কাল হলেও ভাঙবে।

যৌথ ব্যবসার ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা হচ্ছে—আমরা এখনো সামন্তবাদী বা তালুকদারি দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করছি, সজ্জের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলতে পারছি না। আমরা মনে করি—আমি আমার মতন বুঝি, আমি চলবো আমার মতো। আর এর ফলেই আমরা বড় কিছু করতে পারি না।

অথচ দেখুন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে। ১৬০০ সালে কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হলো, তার দেড়শ বছর পর ১৭৫৭ সালে তারা এই উপমহাদেশ দখল করলো এবং ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উপমহাদেশের ক্ষমতা হারালো।

অর্থাৎ একটা কোম্পানি ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ১০০ বছর একটা উপমহাদেশ দখল করে থাকলো। কত প্রজন্ম এই কোম্পানি চলেছে আমরা খুব সহজে বুঝতে পারি। যারাই এই সজ্জ-সংস্কৃতি অনুসরণ করেছে তারাই পৃথিবীর নিয়ন্ত্রক হয়েছে।

**প্রশ্ন :** ভেবেছিলাম ব্যবসা শুরু করবো। কিন্তু আমার চেহারা দেখলে সবাই কেমন করে যেন বুঝে ফেলে—আমাকে ঠকানো যায়। কী করবো বুঝে উঠতে পারছি না।

**উত্তর :** যদি ব্যবসা করার যোগ্যতা থাকে আর আপনাকে দেখে যদি মনে হয় যে, আপনাকে ঠকানো যায় তাহলে তো খুব ভালো। আপনি জেনেগুনেন খুব সরলতার ভান করতে থাকুন। অন্যরা ভাববে যে, তারা আপনাকে ঠকাচ্ছে। আসলে ঠকছে সে নিজে। এটা তো একটা বড় গুণ যে, কাউকে দেখে মনে হয় তাকে ঠকানো যায় কিন্তু আসলে সে তা নয় এবং সে অন্যদের এ অভিসন্ধিটা বুঝতেও পারে। আর এরকম ক্ষেত্রে তাকে কেউই ঠকাতে পারে না। উল্টো যে ঠকাতে চায় সে-ই ঠকে যায়।

**প্রশ্ন :** আমি একজন ব্যবসায়ী, দুইটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটাতে সর্বদা একটু সমস্যা লেগে থাকে। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানটি আকারে বড় অর্থাৎ বিনিয়োগ বেশি। আমি কী করতে পারি? দয়া করে জানালে উপকৃত হবো।

**উত্তর :** বড় প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে আরো মনোযোগী হতে হবে। মনোযোগী হলেই সমস্যা সমাধানের পথ বেরিয়ে আসবে। অর্থাৎ যেখানেই সমস্যা সেখানেই আরো বেশি মনোযোগ দিতে হবে।

**প্রশ্ন :** আগামী মাসে আমি বিজনেস শুরু করতে যাচ্ছি। মনে জোর পাচ্ছি না। ভয় হচ্ছে যদি লোকসান হয়? ভয়ে আমি ঘুমাতে পারি না। কী করবো?

**উত্তর :** আসলে নিজের মনের ভেতরে আগে সাহস আনতে হবে। বিশ্বাস আনতে হবে। ভয় পাওয়া মানেই হচ্ছে নিজের ওপরে বিশ্বাসের অভাব রয়েছে। বিশ্বাস যখন আসবে তখন ভয়টা এমনিতেই কেটে যাবে। সাহস করতে না পারলে কেউ কখনো বড় কাজ করতে পারে না। আসলে যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে কোনোটাই ঝুঁকি নয় যদি বিশ্বাস এবং সাহস থাকে। কারণ আপনি এমন কিছু করতে যাচ্ছেন না যেটা এর আগে কেউ করে নি। এর আগে যেহেতু কেউ না কেউ পেরেছে অতএব আপনিও পারবেন। কাজেই লোকসানের ঝুঁকি নয়, আপনার অন্তর্গত ভয়ই হচ্ছে আপনার বাধা।

আর ব্যবসায়ে যদি আপনি এই নিয়ত নিয়ে নামতে পারেন যে, আপনি আপনার ক্লায়েন্টদের সেবা দেবেন, আপনার কর্মীদের একটা ভালো কর্মসংস্থানের সুযোগ দেবেন তাহলে আপনাকে কখনো লোকসানের ভয়ে ভীত হতে হবে না। একটা উদাহরণ দেই।

বিশ্ববিখ্যাত প্যানাসনিক কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা কনসুকি মাতসুশিতা জন্মেছিলেন ১৮৯৪ সালে পশ্চিম জাপানের এক প্রত্যন্ত গ্রামে। জুয়াড়ি বাবার অপরিণামদর্শিতার ফলে সবকিছু খুইয়ে পরিবারটি যখন পথে বসতে যাচ্ছিলো তখন আট ভাই-বোনের মধ্যে সবার ছোট নয় বছর বয়সী মাতসুশিতা বাইসাইকেলের দোকানে ফুটফরমার্শের কাজ করে ধরেন পরিবারের হাল। কিছুদিনের মধ্যেই সেটি ছেড়ে যোগ দেন ওসাকা লাইট কোম্পানিতে। দক্ষতা ও বিশ্বস্ততার কারণে একের পর এক পদোন্নতি পেয়ে ইন্সপেক্টরের পদে উন্নীত হলেও স্বপ্ন ছিলো তার আরো বড়। ভাবনা ছিলো মানুষকে কীভাবে আরো সেবা দেয়া যায়। উদ্ভাবন করলেন নতুন এক ধরনের লাইট-সকেট,

প্রচলিতগুলোর চেয়ে যা অনেক ভালো।

কিন্তু মালিক এর উৎপাদনে রাজি হলেন না। অগত্যা—‘বল বল আপন বল’। চাকরি ছেড়ে দিলেন। স্ত্রী এবং তিনজন মাত্র সহকারী নিয়ে মাতসুশিতা শুরু করলেন তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। অর্থ নেই, ব্যবসা করার অভিজ্ঞতা নেই এবং প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া বা ইলেকট্রিক বাল্ব উৎপাদনে কোনোরকম অভিজ্ঞতা নেই—এমন সহকারীদের নিয়ে একটানা কয়েক মাস কাজের পর তারা সফল হলেন। উৎপাদন তো হলো। কিন্তু বিক্রি করতে গিয়ে দেখা দিলো বিপত্তি। পাইকারি বিক্রেতাররা তার পণ্য নিতে চাইলো না পরিমাণে কম বলে। লেগে থাকলেন মাতসুশিতা। গুণগত মান বাড়িয়ে দিলেন। দাম কমালেন ৫০%। পত্রিকায় পণ্যের বিজ্ঞাপন দেয়ার অভিনব উপায় তিনিই প্রথম চালু করেন। হু হু করে বাড়তে লাগলো তার বিক্রি।

১৯২২ সাল নাগাদ মাতসুশিতার প্রতিষ্ঠান প্রতিমাসেই নতুন নতুন পণ্য নিয়ে হাজির হতে লাগলো। ব্যবসাক্ষেত্রে মাতসুশিতা দিলেন এক যুগান্তকারী ধারণা। প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে বাজারে প্রচলিত পণ্যের চেয়ে অন্তত ৩০% ভালো পণ্য দিতে হবে আর দাম কমাতে হবে অন্তত ৩০%। আফটার সেল সার্ভিস দেয়ার ধারণাটি মাতসুশিতাই চালু করেন।

কর্মীদের তিনি নিজ পরিবারের সদস্য বলে ভাবতেন। মহামন্দার সময় কোম্পানিগুলো যখন কর্মী ছাঁটাই করে মন্দা মোকাবেলার চেষ্টা করছিলো মাতসুশিতা তখন উৎপাদন কর্মীদের বিক্রয়কাজে নিয়োজিত করে চেষ্টা করেছেন ছাঁটাই না করে কীভাবে চলা যায়। সে সময় কর্মীদের আধবেলা কাজ করালেও বেতন দিতেন পুরোবেলার। এই ভালবাসার প্রতিদানও তিনি পেয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রবাহিনীর অভিযোগের মুখে কোম্পানি প্রধানের পদ ছেড়ে দিতে হলেও তার কর্মীরাই তাকে আবার ফিরিয়ে আনে কোম্পানিতে। তিনি বলতেন, একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান শুধু তার শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থই রক্ষা করবে না, রক্ষা করবে সমাজের স্বার্থও।

আপনি যদি মনে করে থাকেন—এত দান-দক্ষিণা করে মাতসুশিতার কী লাভ হলো, তাহলে ভুল করবেন। ১৯৮৯ সালে ৯৪ বছর বয়সে মৃত্যুর সময় তার ব্যক্তিগত সম্পদেরই পরিমাণ ছিলো তিন বিলিয়ন ডলার। ২০ হাজার কর্মীসমেত তার প্রতিষ্ঠান ছিলো বিশ্বের সবচেয়ে লাভজনক ইলেকট্রনিক কোম্পানি। আমেরিকার কোনো ভিসিআর বিক্রির দোকানে গিয়ে যদি আপনি ব্র্যান্ড ভিসিআর খোঁজেন তাহলে দেখবেন সবগুলোই মাতসুশিতার।

আপনিও এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজে নেমে পড়ুন। কখনো লস করবেন না।

**প্রশ্ন :** আমি ইটের ব্যবসা করতে চাইছি। কিন্তু আমি মহিলা। আমার পক্ষে এ ব্যবসা কতটুকু শোভন হবে?

**উত্তর :** এটা কোয়ান্টাম থ্রাজুয়েটসুলভ কোনো কথা হলো না। কারণ আমি বহু মহিলাকে ইট ভাঙতে দেখেছি। আর আপনি তো ইটের ব্যবসা করবেন। মহিলারা যদি ইট হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গুঁড়া গুঁড়া করতে পারে আর আপনি ইটের ব্যবসা করতে পারবেন না এটা একটা কথা? তবে বাস্তবে ইটভাটা চালাতে হলে অনেক ঝুঁকি পোহাতে হয়। এর চেয়ে আরো অনেক ধরনের ব্যবসা আছে, যা করা আপনার জন্যে সহজ হবে।

## শেয়ার ব্যবসা

**প্রশ্ন :** শেয়ার ব্যবসা করা কি হারাম? আমার বড় ভাই শেয়ার ব্যবসা করেন। কিছু লোক বলে, এটি নাকি লটারির মতো। আবার কেউ বলে, শেয়ার ব্যবসা করা আর সুদ খাওয়া সমান। দয়া করে বলবেন, আসলে এটা কী?

**উত্তর :** আসলে শেয়ারের দুটি ক্ষেত্র আছে। একটি হচ্ছে প্রাইমারি শেয়ার। প্রাইমারি শেয়ার সাধারণত কম ঝুঁকির। যেমন, আপনি কোনো কোম্পানির একটি শেয়ার কিনলেন। কোম্পানি লাভ করলে আপনি লাভ পাবেন, লাভ না করলে আপনি লাভ পাবেন না। এটি অর্থ বিনিয়োগের একটি মাধ্যম। তাই প্রাইমারি শেয়ারের বিষয়টি অন্যরকম। আর সাধারণভাবে শেয়ার ব্যবসা বলতে বোঝায় শেয়ার মার্কেট যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এটি লটারি না, এটি স্ট্রেফ জুয়া। যেকোনো মুহূর্তে জুয়ার মতো আপনার টাকা 'নাই' হয়ে যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সারা পৃথিবীতে শেয়ার মার্কেট হচ্ছে মাফিয়া চক্রের নিয়ন্ত্রণে। এটি শোষকদের শোষণের একটি ফাঁদ। মানুষকে কর্মবিমুখ করে তোলার ফাঁদ। আমাদের দেশে শেয়ার মার্কেটে প্রতিদিন প্রায় হাজার কোটি টাকার লেনদেন হচ্ছে। অর্থনীতিতে এর অবদানটা কী? হাজার কোটি টাকার তো কোনো শিল্প গড়ে উঠছে না।

একসময় মতিঝিলের রাস্তায় দাঁড়িয়ে এ শেয়ার বেচাকেনা করা হতো। এখন লোকজন এসি রুমে বসে কম্পিউটারেই শেয়ার কেনাবেচা করছে। একশ্রেণীর শ্রমবিমুখ লোক সারাদিন মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকছে, চাকরি খাচ্ছে আর গল্পগুজব করছে। সারাদিনে তাদের আর কোনো কাজ

নেই। ২০১০ সাল নাগাদ প্রায় ৩৪ লক্ষ লোক নাকি এই শেয়ার মার্কেটের সাথে জড়িত হয়েছে, যারা উৎপাদনমুখী কোনো কাজ করছে না।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগকৃত এ টাকার উৎস হচ্ছে বিদেশ থেকে আত্মীয়স্বজনদের পাঠানো অর্থ। শরীরের রক্ত ঘাম করে যারা দেশে টাকা পাঠাচ্ছেন, তাদের স্বজনরা এ টাকাগুলো আগে জায়গাজমি কিনতে বিনিয়োগ করতো, যা এখন শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগ করছে। হঠাৎ একদিন তারা দেখছে যে, পুরো টাকাটা শেষ হয়ে গেছে। অতএব, শেয়ার ব্যবসা হারাম না হালাল—এ বিষয়ে মওলানা সাহেব যারা আছেন, তারা ফতোয়া দেবেন। বাস্তবতা হলো, এর চেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ আর নেই। শেয়ার বাজারকে এক কথায় জুয়া বাজারই বলা যায়।

আপনার কষ্টার্জিত সম্পদ নষ্ট করার সবচেয়ে সহজ উপায় এটি। আপনার টাকা চলে যাবে ঐ মাফিয়া চক্রের হাতে। কারণ তাদের টেকনিকটা খুব সহজ। তারা একটি শেয়ারের দাম বাড়াতে থাকে, যার আসলে কোনো মূল্যই নেই। সেটা নিজেরা কিনতে থাকে। এভাবে সেই শেয়ারের দাম বাড়তে থাকে। সাধারণ মানুষ তখন ঐ শেয়ারের প্রতি আগ্রহী হয়। এরপর যারা পরিকল্পনা করে দাম বাড়িয়েছিলো তারা সেই শেয়ারটা বিক্রি করতে থাকে আর মানুষ কিনতে থাকে। যখন তাদের কাছে থাকা শেয়ারগুলো সব মানুষের হাতে চলে যায় তখন হঠাৎ করে এর দাম পড়ে যায়। ফলে যারা বেশি দাম দিয়ে কিনেছিলো তাদের টাকাগুলো তখন কাগজে পরিণত হয়ে যায়।

তাই সবসময় মনে রাখতে হবে যে, টাকা ও শ্রম—এ দুটো যখন একত্রিত হয় তখন তা হয় পুঁজি, তখন তা ফসল দেয়। আর শ্রম ছাড়া যে টাকা সেটা কখনো পুঁজিতে রূপান্তরিত হয় না। তাই তাদের টাকা নষ্ট হবেই। কারণ এ টাকার পেছনে কোনো শ্রম নেই। অতএব শেয়ার বাজার থেকে নিজে দূরে থাকবেন। বিরত রাখার চেষ্টা করবেন আপনার পরিচিতদেরও।

১৯৯৪ সাল থেকে আমরা সাধারণ মানুষকে সচেতন করে যে কথাগুলো বলে আসছি, সম্প্রতি শেয়ার মার্কেটে এই ঘটনাগুলোরই বাস্তবচিত্র প্রতিফলিত হচ্ছে। অর্থনীতির ভাষায় শেয়ারবাজার এখন মহামন্দার কবলে পড়েছে। বছরের প্রথম থেকে টানা পাঁচ মাস ধরে এ অবস্থা চলছে। পুঁজি হারিয়ে সম্পূর্ণ নিঃশ্ব হয়েছেন লাখ লাখ বিনিয়োগকারী। পুঁজি হারিয়ে অনেকেই করেছেন আত্মহত্যা। রাজপথে ভাঙচুর, লাঠিপেটা, পুলিশের ধরপাকড়ও কম হয় নি। কিন্তু বিনিয়োগকারীরা পুঁজি বিনিয়োগের নামে যদি এ জুয়ায় না জড়াতে তাহলে এ করুণ পরিণতিতে পড়তে হতো না।

**প্রশ্ন :** আমি এবং আমার স্বামী-দুজনই চাকরিজীবী। আমাদের সীমিত আয় থেকে ব্যয় এবং দান করি। কিন্তু উদ্বৃত্ত সঞ্চয় আমার স্বামী শেয়ার বাজারে রাখেন। আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ বাড়চ্ছেন। আমার খুবই অপ্রিয় একটি জিনিস-ক্রেডিট কার্ডের বহুল ব্যবহার করছেন। যুক্তি-তর্কে পেয়ে ওঠা কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ স্বল্প পুঁজিতে কোনো ব্যবসা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি ব্যাংকে টাকা ফেলে রাখতে চাচ্ছেন না। আমাদের প্রাইভেট চাকরির নিশ্চয়তা নেই-এসব বলে তিনি শেয়ার বাজারে অবস্থান দৃঢ় করতে চান। এ ব্যাপারে আমার করণীয় কী? কোয়ান্টিয়ার হিসেবে ব্যস্ত থাকায় অন্য ব্যবসাও করতে পারছি না। নিজের সঞ্চয় রাখার উপায় কী?

**উত্তর :** আপনি এবং আপনার স্বামী-দুজনই চাকরিজীবী। চাকরি করার পরেও আপনাকে যদি অন্য ব্যবসাও করতে হয় তাহলে আপনি সংসারের দিকে মনোযোগ দেবেন কখন?

দ্বিতীয়ত, অনেকেই বলেন যে, প্রাইভেট চাকরির নিশ্চয়তা নেই। আসলে বাস্তবতা হলো, বাহ্যিক বা বস্তুগত কিছু কখনো মানুষকে নিশ্চয়তা দিতে পারে না। নিশ্চয়তার অনুভূতি আসে ভেতর থেকে। আগামীকাল আপনি বেঁচে থাকবেন তারও তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। জীবনেরই যেখানে নিশ্চয়তা নেই সেখানে সম্পদ কখনো নিশ্চয়তা দিতে পারে না। নিশ্চয়তার মালিক হচ্ছেন স্রষ্টা। তিনি যাকে খুশি নিশ্চয়তা দিতে পারেন, যাকে খুশি প্রাচুর্য দিতে পারেন। এটা তাঁর ইচ্ছা।

তৃতীয় বিষয় হচ্ছে-শেয়ার বাজার। শেয়ার বাজার সম্পর্কে এখন আর নতুন করে বলার কিছু নেই। আমরা গত ১৮ বছর ধরে শেয়ার বাজার সম্পর্কে বলে আসছি। বলেছিলাম যে, একদিন দেখবেন, আপনার টাকা কাগজ হয়ে গেছে। যদি টাকা কাগজ হয়ে যায়, তাহলে আপনার এ নিশ্চয়তা কোথায় থাকবে? এটি আপনাকে বরং আরো অনিশ্চয়তার মধ্যে নিয়ে যাবে।

চতুর্থ বিষয় হচ্ছে যে, আপনার স্বামীকে বোঝাতে পারছেন না। আপনি বোঝানোর চেষ্টা করছেন, আপনার যা করণীয় তা করেছেন। তাকে সতর্ক করে দিয়েছেন, এরপর আপনার আর কিছু করার নেই। তাকে বাস্তবে কিছু বলা অর্থহীন। এখন যা কিছু করার মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে গিয়ে করবেন। কমান্ড সেন্টারে এনে আপনার স্বামীকে বোঝান যে, এ কাজগুলো ক্ষতিকর, এগুলো করা থেকে বিরত থাকো। এভাবে এই কাজের পরিণতি সম্পর্কে তাকে নিয়মিত বোঝাতে থাকুন।



## কর্মসন্ধান

**প্রশ্ন :** আমি একটি এনজিও-তে জয়েন করতে যাচ্ছি। কিন্তু আমার ইচ্ছা ব্যাংকে জয়েন করা এবং একজন সফল ব্যাংকার হওয়া। তাহলে আমি কি মনছবি থেকে দূরে অথবা সঠিক পথে নেই? আমার কি ব্যাংকে চাকরি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত? এখন জীবিকার জন্যে যেকোনো পথে ঢুকে যাওয়া জরুরি। এই সিদ্ধান্তহীনতা কীভাবে কাটাতে?

**উত্তর :** আপনি যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন যে চাকরি করবেন, তাহলে আপনার ফার্স্ট স্ট্র্যাটেজি হওয়া উচিত যেকোনো চাকরিতে ঢুকে যাওয়া। অনেকসময় আমরা পছন্দসই চাকরির জন্যে অপেক্ষা করি। মনে করি, একটি নির্দিষ্ট মানের বা বেতনের চাকরি না হলে করবো না। আরো ভালো কিছু অপেক্ষায় সুযোগ হাতছাড়া করি। পরে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এর চেয়ে ভালো সুযোগ এলো না, বরং যে সুযোগটা ছিলো সেটাও হাতছাড়া হয়ে গেল।

এর চেয়ে বরং প্রথম সুযোগেই চাকরিতে ঢুকে পড়ুন, বিশেষত যদি সেটা অফিসারদের এন্ট্রি লেভেলের হয়। কেরানি লেভেলে ঢুকলে ওপরের দিকে ওঠা খুব কঠিন এবং এই চাকরিটাকে আপনার ওপরে ওঠার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করুন। কারণ চাকরি বাজারে একজন বেকার মানুষের চেয়ে কাজ করছে এমন মানুষের গুরুত্ব সবসময়ই বেশি। তাই প্রথম যে সুযোগটা আসবে ওটাকে গ্রহণ করুন এবং প্রথম সুযোগেই পরিবর্তন করুন।

অতএব, এনজিও-তে যোগদান হলো সাময়িক পদক্ষেপ। এনজিও-তে যোগদান করাটা মনছবির পথে কোনো অন্তরায় নয়। ব্যাংকের চাকরির জন্যে যোগাযোগ রাখবেন, চেষ্টা করবেন। যখন ব্যাংকে চাকরি হবে, চলে যাবেন।

**প্রশ্ন :** আমি মাস্টার্স শেষ করে একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে চাকরি করছি। কিন্তু এখানে থাকতে ভালো লাগছে না। আবার ছেড়ে দিতে পারছি না ভালো সুযোগ পাচ্ছি না বলে। সমস্যা হলো অভিজ্ঞতা ও রেফারেন্সের অভাব। যেখানেই যাই, কমপক্ষে তিন/ চার বছরের অভিজ্ঞতা চায়। কী করবো?

**উত্তর :** অভিজ্ঞতার অভাবে নয়, আপনি ইমপ্রেস করতে পারছেন না বলে চাকরি পাচ্ছেন না। চাকরিদাতাকে এই ইমপ্রেশনটা দিতে পারা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, আপনি তার প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম। একজন মানুষ

যদি মনে করে যে, আপনার দ্বারা তার প্রয়োজন পূরণ হবে, তাহলেই সে আপনাকে চাকরি দেবে।

এই ইমপ্রেশন আপনি তখনই সৃষ্টি করতে পারবেন যখন আপনার যোগ্যতা ও প্রস্তুতি নিয়ে আপনার কোনো সংশয় থাকবে না। যখন আপনি বিশ্বাস করবেন—যে কাজটা আপনি চাচ্ছেন আপনি তার উপযুক্ত। নিজের মধ্যে বিশ্বাসের এই অনুরণনকে প্রবল করতে পারলে আপনি ইন্টারভিউ দিতে গেলেই নির্বাচকরা ভাববেন, এই তো! এতক্ষণে এসেছে একজন।

অতএব চাকরি পাওয়ার জন্যে চাকরিদাতার যে ধরনের লোক প্রয়োজন আপনি নিজেকে সেই আঙ্গিকে গড়ে তুলুন। ভেতরে বিশ্বাস সৃষ্টি করুন, মেডিটেশন করুন। নিজেকে উপস্থাপন করুন বিনয় এবং আত্মপ্রত্যয়ের সাথে। দেখবেন, কাক্ষিত চাকরি পেয়ে যাচ্ছেন।

**প্রশ্ন :** আমি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করেছি। এখন আমি চাকরির চেষ্টা করছি। নিজেকে সবসময় মানসিকভাবে সুস্থ রাখার জন্যে কর্মব্যস্ত থাকার চেষ্টা করছি যাতে নেতিবাচকতা, খারাপ চিন্তাভাবনা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারি। কিন্তু আমি নিজেকে যতই কর্মব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছি, পারছি না। এক্ষেত্রে আমার কী করণীয়?

**উত্তর :** একজন মানুষ যদি নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চায় তাহলে কাজের কোনো অভাব হয় না। যেকোনো কাজ শুরু করুন। কোনো কাজ না পেলে ঝাড়ু দেয়া শুরু করুন। কারো বাড়ির সামনে ঝাড়ু দিন কয়েকদিন ধরে। তার কৌতূহল হবে যে, এ লোকটার কী কোনো কাজ নেই যে, ঝাড়ু দিচ্ছে! আরেকজন এসে হয়তো বলবে, এত যোগ্যতা নিয়ে ঝাড়ু দিচ্ছে, একে একটা ভালো কাজ দেয়া যেতে পারে। কারণ কাজকে আপনি ভালবাসতে শুরু করেছেন। আপনার চাকরি হয়ে যাবে।

আসলে প্রত্যেকের ‘কাজের লোক’ দরকার। আমাদের চাকরিপ্রার্থীর অভাব নেই কিন্তু আন্তরিক ও পরিশ্রমী মানুষের খুব অভাব। তাই নেতিবাচকতামুক্ত হয়ে নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তুলুন। পরিশ্রমী হোন। যোগ্যতা অর্জন করুন। চাকরি আপনাকে খুঁজে বের করবে।

**প্রশ্ন :** ইন্টারভিউ দিতে গেলে সবকিছু ভুলে যাই। হাত-পা কাঁপে। যা পারি ঠিকমতো তা-ও বলতে পারি না। কী করবো কিছুই বুঝতে পারছি না।

**উত্তর :** যতদিন পর্যন্ত এ ভয় দূর না হচ্ছে, প্রত্যেকদিন সকালবেলা ঘরে ১০০ বার উঠ-বোস করতে হবে। বাঘ-ভাল্লুক নাকি যে, খেয়ে ফেলবে? হয় চাকরি দেবে, না হয় দেবে না, এর চেয়ে খারাপ আর কী হবে? একটি ইন্টারভিউয়ের কথা বলি-একজন তরুণ চাকরির জন্যে একটা ভাঁজ করা খোলা চিরকুট নিয়ে গেছে চাকরিদাতার কাছে। যিনি চিঠি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, এই চিঠি নিয়ে যাও। অমুকের সাথে দেখা কর, চাকরি হয়ে যাবে।

সে কথামতো চিঠি দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানের মালিক চিঠিটার ভাঁজ খুললেন। চিঠিতে চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়ং ম্যান, এই চিঠিতে কী লেখা আছে তা কি তুমি জানো? তরুণ বললো, স্যার! এটা আপনাকে লেখা চিঠি, আমার জানার বিষয় না। উনি চিঠিটা এগিয়ে দিলেন, পড়, কী লেখা আছে। জোরে পড়, আমি শুনি। তরুণ চিঠি পড়া শুরু করলো। চিঠিতে লেখা আছে, ছেলেটা বখাটে, তবে ধার আছে। কাজ করাতে পারলে কাজ করতে পারবে।

এই চিঠি পড়েও তো সেই তরুণের হাত-পা কাঁপে নি। উনি বললেন, এর পরেও তুমি চাকরির প্রত্যাশা কর? তরুণ বিনয়ের সাথে বললো, স্যার! লেখাই তো আছে যে, আপনি যদি কাজ করাতে পারেন, আমি কাজ করতে পারবো। ভদ্রলোক আরেকবার তাকালেন, বললেন, ঠিক আছে, তুমি জয়েন কর। অর্থাৎ জীবনে সাহস দরকার। মনে করতে হবে-হয় চাকরি দেবে, না হয় দেবে না। অতএব ভয় পাওয়ার কী আছে?

**প্রশ্ন :** ইন্টারভিউতে, জব-এর পরীক্ষার সময় অনেক জানা প্রশ্ন ভুলে যাই অথবা সময়ের অভাবে লিখতে পারি না।

**উত্তর :** তার মানে আপনার প্রস্তুতির অভাব। অন্যরা তো লিখছে, আপনি পারছেন না কেন? আপনার প্রস্তুতি নেই। চাকরি বাজারে নিজেকে উপস্থাপন করার যে পূর্ব-যোগ্যতা প্রয়োজন, সে যোগ্যতা আপনার নেই। আগে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। আর প্রস্তুতি নেয়ার পরও ইন্টারভিউয়ে খারাপ করার একটাই কারণ থাকতে পারে, সেটি হচ্ছে-নার্ভাসনেস। নিয়মিত মেডিটেশন এই নার্ভাসনেসকে দূর করে দেয়। আপনাকে প্রস্তুতি নিতে হবে এবং নিয়মিত মেডিটেশন করতে হবে যাতে আপনি নার্ভাস ফিল না করেন।

**প্রশ্ন :** ৫৫/ ৬০ বছর বয়সের প্রার্থীও যদি চাকরি করার যোগ্যতা রাখেন, তাহলে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যে কেউ কি চাকরির চেষ্টা করলে সফল হবে?

**উত্তর :** কেন হবে না? চাকরির বাজারে তরুণদের দাপট বেশি। কিন্তু অভিজ্ঞ কর্মীকেও তো নিয়োগকর্তারা খুঁজছেন। অতএব তিনি যদি নিজেকে উপস্থাপন করতে পারেন, অবশ্যই সুযোগ পাবেন।

আসলে অবসর গ্রহণের যে ধারণা সমাজে প্রচলিত আছে সেটি পুরোপুরি ভ্রান্ত। ৬০ বছর হলেই অবসর গ্রহণে বাধ্য করা একজন অভিজ্ঞ লোকের মৃত্যু পরোয়ানা জারি করার শামিল। গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষের জীবনে দুটো সময়ে মৃত্যুর আশঙ্কা সবচাইতে বেশি—১. জন্মের প্রথম বছরে, ২. যে বছর তিনি অবসর গ্রহণ করেন সে বছর। এ সময়েই একজন মানুষ তার জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে দেশ এবং জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করতে পারেন যদি তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম থাকেন।

বাস্তবেও আমরা দেখি—সারা পৃথিবীতে রাষ্ট্র ও সমাজের গুরুদায়িত্ব পালনকারীদের অধিকাংশের বয়সই ৬০-এর ওপরে। মেধার সাথে অভিজ্ঞতার অপূর্ব মিশ্রণ ঘটে এই বয়সেই। টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ, এম এফ হুসেনসহ বহুগণ্য ব্যক্তিদের সৃজনশীলতার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে এই বয়সেই। অতএব ৫৫ বা ৬০ বছর কখনোই মানদণ্ড হওয়া উচিত নয়। যখন কেউ বার্ধক্যের কারণে পুরোপুরি অযোগ্য হয়ে পড়ছেন, তখন তিনি অবসর গ্রহণ করবেন। আবার একজন মানুষ ৪০/৫০ বছর বয়সেও শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম হয়ে যেতে পারেন।

**প্রশ্ন :** সঠিক প্রফেশন নির্ধারণ করা অর্থাৎ কোন পেশাতে যাবো—সেটা ঠিক করতে পারছি না। যদিও বা কোনো প্রফেশন মনে মনে ঠিক করি—কিন্তু সেটা শুরু করার স্কোপ পাই না। স্কোপ না পাওয়ার অর্থ হলো সেসব প্রতিষ্ঠানে নানা কারণে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি না।

**উত্তর :** পেশাতে সুযোগ কেউ দেয় না, সুযোগ করে নিতে হয়। সুযোগ করে নেয়ার জন্যে নিজের যোগাযোগটাকে সেভাবে বাড়াতে হবে। কারণ সুযোগ আসলে সিঁড়ি ড্রপ করে হয় না। যে যোগ্যতা আপনার রয়েছে সেই কাজ যাদের যাদের দরকার তাদের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করার কৌশলটা জানতে হবে এবং এটা একটা আর্ট।

অনেক সময় দক্ষতার সাথে সুযোগ সৃষ্টির জন্যে কিছু কাজ বিনামূল্যে করে দিতে হয়। একটা ছোট্ট ঘটনা বলি—তখন নিজে ড্রাইভ করতাম। একদিন রাস্তায় হঠাৎ চাকা গেল পাংচার হয়ে। স্বাভাবিকভাবে আমার এই

সাদা পোশাক নিয়ে গাড়ির চাকা খোলা বেশ কঠিন কাজ। কিন্তু আমাকে তো চাকা খুলে চাকা লাগাতে হবে। জ্যাক দিয়ে খুব ঘোরানোর চেষ্টা করছি কিন্তু ঘুরছে না।

দূরে একটি লোক দাঁড়িয়ে ছিলো। সে এগিয়ে এলো। বললো যে, স্যার, আমি আপনাকে একটু সাহায্য করি। প্রথমে ভাবলাম, কী মতলব, কেন সাহায্য করবে? তারপর ভাবলাম, মতলব যা-ই থাকুক, এ মুহূর্তে তার সাহায্যটা আমার দরকার। বড়জোর কিছু বকশিশ চাইবে।

সে চাকা খুলে খুব দ্রুত আবার লাগিয়ে দিলো। আমি তার প্রশংসা করলাম এবং তাকে খুশি হয়ে স্বাভাবিকভাবে কিছু টাকা দিতে চাইলাম। সে বললো-না না স্যার, দেখলাম আপনার কষ্ট হচ্ছে, এজন্যে। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কী করেন? বললো যে, আমি ড্রাইভার, ড্রাইভিং করি।

আমার যদি ড্রাইভারের প্রয়োজন হতো, আমি কিন্তু সাথে সাথেই তাকে অফার করতাম, চাকরি দেয়ার ব্যাপারে কোনো খোঁজখবরও নেয়ার প্রয়োজন মনে করতাম না। কারণ সে ইতোমধ্যেই আমাকে ইমপ্রেস করে ফেলেছে।

এর চেয়ে ভালো ইন্টারভিউ আর কী হতে পারে? সে বুঝতে পেরেছে যে, আমার ড্রাইভার প্রয়োজন হতে পারে। এবং সে নিজের দক্ষতাকে সফলভাবে উপস্থাপন করেছে। আসলে নিজেকে আরেকজনের সামনে উপস্থাপন করতে জানতে হবে। এ ব্যাপারে লাজুক হওয়াটা অপ্রয়োজনীয়। তাহলে দেখা যাবে যে, সুযোগের কোনো অভাব হচ্ছে না।

**প্রশ্ন :** আমি ইন্টারনেটের মাধ্যমে সিভি জমা দেই। বেশিরভাগ সময়ই আমি ইন্টারভিউ-এর জন্যে কল পাই না। এর কারণ হতে পারে আমার যোগ্যতার অভাব বা প্রচেষ্টার অভাব। কিন্তু বন্ধুদের মধ্য থেকেই যখন দেখি তারা রেফারেন্স ব্যবহার করে ইন্টারভিউতে কল পাচ্ছে অথবা সবার মুখে শুনি রেফারেন্স ছাড়া কল পাওয়া যাবে না তখন খুব হতাশ লাগে। যখন অনুভব করি ‘জ্যাক’ ধরলেই সহজে চাকরি পাওয়া যায় তখন সিস্টেমের ওপর অশ্রদ্ধা জাগে। এই অবস্থায় কীভাবে মনের মতো চাকরি পাওয়া যেতে পারে?

**উত্তর :** আসলে সারা পৃথিবীতেই অধিকাংশ চাকরি, বিশেষত উচ্চপদের চাকরিগুলো হয় রেফারেন্সের সূত্রে। আপনি যদি আপনার বাসায় একজন গৃহকর্মীও নিয়োগ করেন, আপনি কি তার রেফারেন্স খুঁজবেন না? একে কেউ চেনে কি না, এ কোথাও থেকে পালিয়ে এসেছে কি না, এর ব্যাকগ্রাউন্ড কী?

আসলে তদবির বলেন, জ্যাক ধরা বলেন, রেফারেন্স বলেন, এটাই এখন সিস্টেম এবং চাকরির ক্ষেত্রে সোশাল নেটওয়ার্কিং বা পরিচিতি সৃষ্টি একটা গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা। বাস্তব যোগ্যতার পাশাপাশি এই যোগ্যতাও আপনাকে অর্জন করতে হবে। এটা কিন্তু মোটেই কঠিন কাজ নয়। আমরা আমাদের ভেতরের লজ্জা সংকোচ জড়তার কারণে সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায় চারপাশের মানুষের সাথে মিশতে পারি না। এই জড়তাকে কাটিয়ে সহজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে চারপাশের মানুষের সাথে মিশলেই দেখবেন অনেক মানুষই ‘জ্যাক’ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে। অতএব নতুন নতুন মানুষদের সাথে মেশা, মিশে নিজের পরিচয় বাড়ানোটাকে অভ্যাসে পরিণত করুন।

**প্রশ্ন :** দীর্ঘদিন পড়ালেখার পর চাকরির জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছি। সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কাক্ষিত চাকরি অর্জিত হলো না। নতুন করে প্রস্তুতি নিতেও ভালো লাগে না। উল্লেখ্য, এ যাবত পাঁচটি ব্যাংকে ভাইভা দিয়েছি। নিজের মধ্যে নতুন করে প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পারছি না। চাকরি পাওয়াটা আমার জন্যে খুবই দরকার। এখন কীভাবে এগুবো?

**উত্তর :** আসলে সমস্যাটা আপনার মধ্যে। কোন চাকরি কীভাবে হয় এবং ব্যাংকে চাকরি পেতে হলে কী কী যোগ্যতা লাগে তা তো আপনাকে জানতে হবে। সর্বাত্মক প্রচেষ্টা আপনি চালান নি। পাঁচটি ব্যাংকে ভাইভা দিয়েই মনে করছেন সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আসলে তা নয়। ভাইভা দিয়ে এলেই চাকরি হয়ে যায় না। তা প্রাইভেট ব্যাংক হোক আর সরকারি ব্যাংক হোক।

আসলে ভাইভা দেয়াটা তো গুরুত্বপূর্ণ না, আপনি ভাইভা-তে ইমপ্রেশ করতে পারছেন কি না, এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। যেরকম ভিসাতে সমস্যা হয় কেন? অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাগজপত্র এক নম্বর হলেও ভিসাপ্রার্থীর চেহারা দেখলে মনে করে দুই নম্বর লোক। ভেতরে আগুন নেই, ভেতরে আত্মবিশ্বাস নেই। আমরা যাই চোরের মতো। ফলে ভিসা দেয় না।

আপনার ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছে। ভাইভা বোর্ডকে আপনি ইমপ্রেশ করতে পারেন নি। আপনাকে দেখে তাদের মনে হয় নি যে, ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্যে আপনার মতো তরুণের প্রয়োজন আছে। যেমন, আমাদের এক গ্রাজুয়েট একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে ভাইভা দিতে গেছে। তখনো তার পরীক্ষার রেজাল্ট হয় নি। তাই এটা ছিলো তার জীবনের প্রথম ভাইভা। ইন্টারভিউ বোর্ডের যিনি প্রধান, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই প্রতিষ্ঠানে যে তুমি আসতে

চাও, তোমার লক্ষ্য কী? ওনার চেয়ারটা দেখিয়ে সে খুব নিঃসংকোচে বললো, স্যার, এই চেয়ারটা। জব হয়ে গেল তার। কিন্তু সে জয়েন করলো না। বললো, স্যার, এখন পর্যন্ত আমার সার্টিফিকেট আসে নি। তারা বললো, কোনো অসুবিধা নাই। তুমি বল যে, পাস করেছো এবং জয়েন কর। কিন্তু সে বললো, না, আপনারা যদি অপেক্ষা করেন, আমার সার্টিফিকেট এলে আমি জয়েন করতে পারি। অর্থাৎ এই ইমপ্রেশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

যেমন, ভিসার জন্যে যাচ্ছেন যখন, একটা ড্যামকেয়ার ভাব নিয়ে যাবেন-হয় দেবে, না হয় দেবে না। দিলে ভালো, না দিলে আরো ভালো। যাওয়ার ঝামেলা থেকে বেঁচে গেলাম। এর চেয়ে খারাপ কিছু তো আর হবে না। কাজেই ভয় পাওয়ার কী আছে? অর্থাৎ এই দৃষ্টিভঙ্গিটা রাখবেন যে, হলে ভালো, না হলে আরো ভালো। তাহলেই যিনি দেনেওয়াল, তিনি দেবেন।

অতএব ইমপ্রেস করার প্রস্তুতি নিয়ে যাবেন। নিজের ভেতরে বিশ্বাস নিয়ে যাবেন। আপনাকে দেখে যেন মনে হয় তেলে মাথা। তেল থাকুক অথবা না থাকুক। কারণ তেল দেয়া হয় তেলে মাথায়।

অর্থাৎ আপনি কিসে চড়েন এটা গুরুত্বপূর্ণ না, আপনাকে দেখে যেন মনে হয় আপনি যেকোনো কিছুতে চড়তে পারেন। আবার না চড়লেও কিছু আসে যায় না। যদি পয়সার অভাবে রিকশায়ও যান তখন যেন মনে হয় যে, ফ্যাশন করে রিকশায় এসেছেন। তাহলে লোকজন আপনার পকেটে টাকা দেবে। জীবনে কয়টা ভাইভার মথোমুখি হলেন এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কোনটাতে আপনি ইমপ্রেস করতে পেরেছেন। আর এর জন্যে মেডিটেশন করতে হবে। নিজের ভেতরে বিশ্বাসটাকে বাড়াতে হবে। ভেতরের শক্তিকে জাগাতে হবে।

**প্রশ্ন :** যোগাযোগ বা কমিউনিকেট করতে পারি না। পেশাগত ক্ষেত্রে অন্যের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারি না। কী করণীয়?

**উত্তর :** পেশাগত ক্ষেত্র তো বটেই, যেকোনো ক্ষেত্রেই সফল হতে হলে এই যোগাযোগ ও পরিচিতি সৃষ্টির গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা অনেক সময় এত বেশি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠি যে, অন্যের সাথে যোগাযোগ, অন্যের সহযোগিতা চাওয়াকে মনে করি আত্মমর্যাদাবোধের লঙ্ঘন। আসলে তা নয়। একজন বিখ্যাত সিইও তার আত্মজীবনীতে বলেছেন-জনসংযোগ বা পরিচিতি কীভাবে তাকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছে। একটি স্টিল কারখানায় শ্রমিকের চাকরি করতেন তার বাবা। কোম্পানির সিইও-র সাথে

কাজের সূত্রে তার সরাসরি কোনো যোগাযোগ ছিলো না স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু তিনি নিজের পরিচয় দিলেন এবং সুযোগ পেলেই তার সাথে দেখা করে পরামর্শ নিতেন। এতে সেই সিইও-র একজন স্নেহভাজনে তিনি রূপান্তরিত হলেন। এই যোগাযোগকে কাজে লাগিয়েই তিনি তার ছেলের জন্যে স্কলারশিপে পড়ার সুযোগ করে নিলেন এবং বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই জনসংযোগ সচেতন ছেলে নিজেই এখন একজন সিইও।

নিজেকে যদি উপস্থাপন করতে না পারেন, তাহলে অনেক মেধা ও সম্ভাবনা নিয়েও আপনি বেশি দূর এগুতে পারবেন না। প্রয়োজন নিজের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করা, আত্মবিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করা। প্রয়োজনীয় গুণ ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে, নিরলসভাবে লেগে থাকতে হবে এবং সবসময় শেখার জন্যে উন্মুখ থাকতে হবে আর মেডিটেশন করতে হবে। বিশেষ করে শিথিলায়ন এবং হও উন্নত শির-এ দুটো মেডিটেশন নিয়মিত করুন। দেখবেন-কিছুদিনের মধ্যেই আপনি এক অন্তর্গত শক্তিতে উজ্জীবিত হচ্ছেন। তখন যেকোনো পরিবেশে যে কারো সামনেই নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারছেন।

**প্রশ্ন :** বিভিন্ন জায়গায় চাকরির জন্যে পরীক্ষা দিয়ে চান না পেয়ে আমি এখন অনেকটাই হতাশ। বেকারত্ব থেকে আমি কীভাবে মুক্তি পেতে পারি?

**উত্তর :** আসলে আপনি চাকরি চাচ্ছেন, কাজ চাচ্ছেন না। তার মানে আপনি যোগ্যতা সৃষ্টি করেন নি। যোগ্যতা সৃষ্টি করলে চাকরি না হওয়ার কোনো কারণ নেই। যদি কাজ করতে চান, কাজ কেন হবে না? আপনি যদি পরিশ্রম করতে চান পরিশ্রমের সুযোগ চান, কেন পাবেন না? নিজের ওপরে আস্থা রাখতে হবে, নিজেকে বিশ্বাস করতে হবে এবং নিজেকে যোগ্য করে তুলতে হবে। চাকরি আপনার কাছে আসবে। আমাদের অনেক গ্রাজুয়েট একটা ইন্টারভিউতেই চাকরি পেয়ে গেছেন। নিয়মিত মেডিটেশন করবেন। নিজের ভেতরে বিশ্বাস সৃষ্টি করবেন এবং পরিশ্রম করার জন্যে তৈরি থাকবেন। অবশ্যই আপনি বেকারত্ব থেকে মুক্তি পাবেন।

আর যদি ১২ ঘণ্টা/ ১৪ ঘণ্টা পরিশ্রম করতে চান যে, আমি কাজ চাই, চাকরি না, তাহলে ফাউন্ডেশন আছে। আমরা সাধারণত সরকারি চাকরি চাই। কারণ আমরা মনে করি ওখানে তেমন কাজ করতে হয় না। আর দুই হলো, দিনে এক সময় গেলেই হলো। বসকে তেল মারতে পারলেই হলো। তিন



হচ্ছে, বেতনের পাশাপাশি কিছু উপরি পাওয়া যাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

আমরা তো ফাউন্ডেশনে কাজ করার মানুষ পাচ্ছি না। আমাদের অনেক কাজ আমরা করতে পারছি না কাজের মানুষের অভাবে। কারণ পরিশ্রমপ্রিয় মানুষের এখনো খুব অভাব।

## সফল ক্যারিয়ারের সূত্র ॥ কাজকে ভালবাসা

**প্রশ্ন :** আমি এলএলবি কমপ্লিট করেছি এবং এক বছর কোর্টে কাজও করেছি। কিন্তু এই পেশার প্রতি আমার কোনো ভালবাসা জন্মায় নি। যার ফলে আমার এডভোকেটশিপ সনদ পরীক্ষাও আশানুরূপ হয় নি। গত ছয় মাস যাবৎ আমি আর কোর্টে যাচ্ছি না। বর্তমানে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে মোটামুটি বেতনের একটা চাকরির কথা ফাইনাল হয়ে আছে। আমি দোটানায় ভুগছি। দয়া করে আমাকে সঠিক পরামর্শ দেবেন। উল্লেখ্য যে, সম্মানজনক একটি কাজে যোগ দেয়া আমার জন্যে একান্ত জরুরি।

**উত্তর :** পেশায় উন্নতি করতে হলে হয় কাজকে ভালবাসতে হবে, না হয় কাজে আসক্ত হতে হবে। যাকে ইংরেজিতে বলে ‘ওয়াকোহলিক’। অর্থাৎ কাজ সে পছন্দ করছে না, কিন্তু কাজ না করলে তার ভালো লাগে না। যত সিইও-এরা কাজকে যতটা না ভালবাসে, তার চেয়ে কাজের ব্যাপারে নেশাগ্রস্ত। আর কাজকে ভালবাসা হলো কাজটাকে পছন্দ করা এবং দায়িত্বের প্রতি অনুগত এবং কর্তব্যপরায়ণ হয়ে কাজ করা।

আপনার অফিসে যাওয়ার হয়তো সময় আছে, কিন্তু অফিস থেকে ফেরার সময় ঠিক করবে আপনার প্রতিষ্ঠান, আপনার বস। যদি আপনি করেন, তাহলে হবে না। আপনার বস বেরোবার আগে যদি আপনি বেরিয়ে যান তবে প্রাইভেট অফিসে আপনার উন্নতি হবে না কখনো। বস ভাববেন, এর হয়তো বাসার প্রতি টান বেশি। হয়তো আপনার অন্য যোগ্যতা থাকলে তিনি চাকরি খাবেন না। তা না হলে চাকরিও খেয়ে ফেলবেন। অর্থাৎ বস যাতে অনুভব করেন যে, এই অফিসকে আপনি তার মতোই পছন্দ করেন। বাস্তবেও কর্মজীবনে সফল প্রতিটি ব্যক্তির অফিসে যাওয়ার সময় আছে কিন্তু বেরোবার নির্দিষ্ট সময় নাই। যত বড় বস তত বেশি সময় তারা অফিস করেন।

যেমন, আমেরিকার সাবেক মিডিয়া মোঘল টেড টার্নারের কথা ধরুন।

খুব সামান্য থেকে শুরু করে তিনি সিএনএন-এর মতো প্রতিষ্ঠান করেছেন এবং এই প্রতিষ্ঠান গড়তে গিয়ে তিনি ১২ বছর নিজের বাসায় যান নি। দিন-রাত অফিসেই কাটিয়েছেন। তার সাথে দেখা করতে হলে স্ত্রী অফিসে এসে দেখা করে যেতেন। তিনি সেভাবে পড়াশোনা করতে পারেন নি কিন্তু তাকে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক পিএইচডি প্রদান করেছে। ৭৫/৭৬টা ডিগ্রি গ্রহণের পর বাকিগুলো উনি সময়ের অভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। এমনকি পারিবারিক জীবনে তার স্ত্রী-ও তাকে ছেড়ে চলে গেছেন। এমনই ওয়ার্কোহলিক ছিলেন তিনি। পেশা তাকে বৈষয়িক প্রতিদান দিয়েছে। অতএব পেশায় ভালো করতে হলে হয় নেশাগ্রস্তের মতো কাজ করতে হবে। নয়তো কাজটাই হতে হবে আপনার প্রথম ভালবাসা।

**প্রশ্ন :** আমি একজন রিসিপশনিষ্ট। মাঝে মাঝেই ক্যারিয়ার নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভুগি যে, আমি ছোট কাজ করি।

**উত্তর :** আসলে কোনো পেশাই ছোট নয়। যেমন, রিসিপশনিষ্ট পেশাকে আমরা অনেকেই হয়তো খুব অবহেলার দৃষ্টিতে দেখি। আসলে রিসিপশনিষ্ট হওয়া উচিত সবচেয়ে দক্ষ মানুষটার, কারণ তার ওপর নির্ভর করছে প্রতিষ্ঠানের ইমেজ। অথচ যার শিক্ষাগত যোগ্যতা কম, যে আর কিছু করতে পারে না তাকে আমরা রিসিপশনে বসিয়ে দেই। এটা হচ্ছে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি।

যেমন, হাসপাতালের একজন রিসিপশনিষ্ট। তিনি যদি তার কাজটাকে ভালবাসেন এবং আন্তরিকতার সাথে নেন, তাহলে তিনি অনেক বড় সেবার সুযোগ নিতে পারেন। যখনই কোনো রোগী এলো-রোগীকে, তার এটেনডেন্টকে প্রয়োজনীয় তথ্য দেয়া ইত্যাদি কাজ একজন রিসিপশনিষ্ট যেভাবে করতে পারেন আর কেউ সেভাবে পারেন না। আর যদি আন্তরিকভাবে কাজটাকে না নেন, তাহলে কাজের মান ঐরকমই হবে।

আর একটা জিনিস মনে রাখবেন, ক্যারিয়ার নিয়ে আপনার হতাশা তখনই কাটবে যখন আপনি ছোট থেকে শুরু করার মানসিকতা রাখবেন। আপনি অপেক্ষা করতে পারবেন এবং নীরবে কাজ করে যেতে পারবেন।

**প্রশ্ন :** আমি আমার প্রতিষ্ঠানে রিসিপশনে বসি এবং আমার দায়িত্বটিকে খুব ভালবাসি। দায়িত্ব পালন এবং কাজের প্রতি ভালবাসা এবং আসক্তির মধ্যে সীমা নির্ধারণ করবো কীভাবে?

**উত্তর :** কাজ করলে ভালো লাগে—এটি হচ্ছে ভালবাসা, আর কাজ না করলে ভালো লাগে না—এটি হচ্ছে আসক্তি। একজন মাদকাসক্ত যেমন মাদক সেবন না করে থাকতে পারে না, কর্মাসক্ত ব্যক্তিও তেমনি কাজ না করে থাকতে পারেন না। অন্যভাবে বলতে গেলে যেকোনো দায়িত্ব যখন মমতার সাথে পালন করা হয় তখন এটা হচ্ছে ভালবাসা। আর যখন অভ্যাসবশত, স্বয়ংচালিত যন্ত্রের মতো কাজটা করে যাওয়া হয় তখন এটা হচ্ছে আসক্তি।

আপনি যদি রিসিপশনিষ্ট-এর কাজকে ভালবাসেন তাহলে আপনার প্রতিষ্ঠানে যারা আসছেন তাদের প্রতি মমতা অনুভব করবেন, যার যা তথ্য ও দিক-নির্দেশনা প্রয়োজন আনন্দের সাথে তা জানাবেন। হয়তো কেউ ফর্ম পূরণ করতে পারছেন না, তাকে সাহায্য করবেন। কিন্তু আপনি যদি কাজকে ভালো না বাসেন তাহলে বকাবকি করবেন, ‘কি, এখনো ফর্ম পূরণ হলো না’? অর্থাৎ আপনার কাজের গুণগত মান থেকেও বোঝা যাবে আপনি কাজকে ভালবাসছেন, না কাজের প্রতি আসক্ত। আসক্ত হলে হয়তো প্রচুর সময় দিতে পারেন, কিন্তু কাজের সৃজনশীলতা থাকবে না, আনন্দ বা তৃপ্তি থাকবে না।

**প্রশ্ন :** অনেক সময় দেখা যায় যে, যাদের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক তাদের ওপর কর্মক্ষেত্রে অত্যধিক কাজের চাপ আসে। সেক্ষেত্রে কি দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো পরিবর্তন করা যায়? সেক্ষেত্রে কীরূপ হওয়া উচিত—শুধু বিশ্বাসই কি একমাত্র অবলম্বন নাকি বিশ্বাসের সাথে কোয়ান্টাম পদ্ধতির নিয়মিত অনুশীলন অত্যাৱশ্যক? বুঝিয়ে বলুন।

**উত্তর :** বহু লোক আছে যারা কাজ করার কোনো সুযোগই পায় না। কাজের চাপ তাদের ওপরেই আসে যারা কাজ পারে, যাদের ওপরে মানুষের আস্থা আছে। মানুষের এই আস্থাই তাদের কর্মক্ষেত্রে ওপরের দিকে নিয়ে যায়। যত দায়িত্ব বাড়ে, তত তিনি ওপরের দিকে যেতে থাকেন। অতএব কাজের চাপকে আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করুন। এজন্যে গুৱরিয়া আদায় করুন এবং শ্রমানন্দে কাজ করুন।

**প্রশ্ন :** পেশাগত জীবনে তেমন কোনো সমস্যা নেই। কারণ আমি যে বিষয়ের ওপর পড়াশোনা করেছি সে সাবজেক্ট রিলেটেড জব করছি। কাজের পরিবেশ ভালো। মেয়েদের সিকিউরিটি ও সম্মান আছে। নির্ধারিত সময়ে বেতন পাওয়া যায়। তবে একটা অতৃপ্তি—আমি যে বিষয়ে কাজ করছি সে বিষয়ে

অফিসের বস থেকে শুরু করে কারো কোনো ধারণা নেই। আমি ভালো করছি না মন্দ করছি, সেটাও তারা জানেন না। দিনের পর দিন যদি কাজে ফাঁকি দেই তবু কেউ টেরও পাবে না, এই ব্যাপারটা খারাপ লাগে।

**উত্তর :** ‘দিনের পর দিন যদি কাজে ফাঁকি দেই তবু কেউ টেরও পাবে না, এই ব্যাপারটা খারাপ লাগে’। এই যে খারাপ লাগে, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটাই একজন মানুষকে অনেক ওপরে তুলে দিতে পারে। আমি কাজে ফাঁকি দিচ্ছি কি না এটা আমার বস না বুঝতে পারে কিন্তু আমার ভেতরের যে অন্তরতম ‘আমি’ সে তো বুঝতে পারছে এবং এর কাছেই আমি আসলে দায়ী। যে মানুষ কাজে ফাঁকি দেয় না, কাজ তাকে কোনোদিন ফাঁকি দেয় না। আর যে মানুষ কাজে ফাঁকি দেয়, কাজ তাকে সবসময় ফাঁকি দেয়। কারণ প্রকৃতি হচ্ছে নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং প্রকৃতি হচ্ছে সর্বোত্তম প্রতিদানকারী। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, যে মানুষ পেশায় কখনো ফাঁকি দেয় নি, পেশায় সে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হয়েছে আর যে ফাঁকি দিয়েছে, একটা সময় নিজের ফাঁকে নিজেই পড়ে গেছে।

আমি বহু প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেছি। কাজ পছন্দ হোক বা না হোক, আমার দিক থেকে কখনো কোনো ফাঁকি ছিলো না। অনেক সময় যাদের জন্যে কাজ করেছি তারা আমাকে প্রতিদান দেয় নি, কিন্তু প্রকৃতি আমাকে প্রতিদান দিয়েছে সবসময়।

আমার খুব ভালো লাগছে এই সচেতনতা। যেখানে কাজ করেন, আপনি বসকে পছন্দ না করতে পারেন, আপনি কাজকেও পছন্দ না করতে পারেন, কিন্তু যতক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন—আপনার যতটুকু করার আপনি করে দেবেন। আপনি কোনোদিন ফাঁকে পড়বেন না। অতএব, এই অতৃপ্তি দূর করার পথ হচ্ছে নিজের বিবেকের কাছে সবসময় পরিস্কার থাকা। আল্লাহকেও বলতে পারবেন যে, আল্লাহ! আমার সুযোগ ছিলো, কিন্তু আমি ফাঁকি দেই নি। অতএব জীবনের কোনো ফাঁকে তুমি আমাকে ফেলবে না।

**প্রশ্ন :** অফিসে আমার পদবি অনুযায়ী যে কাজ সেগুলো আমার ভালো লাগে না। আমি আমার কাজ না করে বস যে কাজ করেন তা করি। অফিসের বড় বড় কাজ করতেই আমার বেশি ভালো লাগে। এ কারণে আমার যথেষ্ট সুনামও রয়েছে। কিন্তু পদবি নিয়ে যখন ভাবি তখন অনেক প্রশংসাও আর ভালো লাগে না। এ থেকে মুক্তির উপায় কী?

**উত্তর :** আসলে যিনি দায়িত্ব নিতে পারেন, বড় বড় কাজে উদ্যোগী হতে পারেন তার উত্তরণকে কেউ দমিয়ে রাখতে পারে না। বড় বড় কাজ করতে গিয়ে একসময় ঊর্ধ্বতনদের নজরে পড়ে যাবেন। তখন দেখা যাবে, বাস্তবেও আপনি বড় পদবি লাভ করছেন। তাই এখন থেকে বসের জায়গায় নিজেকে বসিয়ে মনছবি দেখতে থাকুন। সে চেয়ারে বসার জন্যে যত রকম যোগ্যতা-দক্ষতা প্রয়োজন-আন্তরিকভাবে তা অর্জন করুন। মনে মনে আপনার বর্তমান পদবি বদলে দিন। কিন্তু বাস্তবে তা কাউকে বলবেন না। আর বস যতদিন চেয়ারে আছেন ততদিন অধীনস্থ হিসেবে আন্তরিকভাবে তার আনুগত্য করুন। বাস্তবে বড় পদবি লাভ করা তখন হবে সময়ের ব্যাপার মাত্র।

## পদ-আনুগত্য ॥ ‘বস ইজ অলওয়েজ রাইট’

**প্রশ্ন :** আমি যে অফিসে চাকরি করি, সেখানে সব কাজ ঠিকভাবে করেও অন্যদের মতো সমমর্যাদা পাচ্ছি না। অফিসে কিছু মেয়ে সহকর্মী বসদের সাথে খাতির করে বেশি সুবিধা ভোগ করছে। এতে আমার ভীষণ রাগ হয়।

**উত্তর :** রাগ করে তো লাভ নেই। আপনাকে বরং একটু কুশলী হতে হবে। আসলে আপনি যে অনেক কাজ করছেন সেটা আপনি আপনার বসকে বোঝাতে পারছেন না। চাকরির ক্ষেত্রে অনেকে এ জায়গায়ই ভুল করেন।

চাকরিতে উন্নতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে-নিজেকে বসের কাছে অত্যন্ত অনুগত এবং বিশ্বস্ত কর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। চাকরি জীবনের সবচেয়ে বাস্তব সত্য হচ্ছে ‘বস ইজ অলওয়েজ রাইট’। তিনি যা বলেন, যেভাবে বলেন, সেভাবেই অনুসরণ করার ব্যাপারে প্রশ্নাতীত আনুগত্য দেখানো। অর্থাৎ নিজের ভালো লাগা-না লাগা বা মতামতকে আমলে না নিয়ে বসের মতামত বা নির্দেশকেই অনুসরণ করার জন্যে তৈরি থাকতে হবে। কাজেই আপনি যদি এই বসের অধীনে এই চাকরি করতে চান এবং উন্নতি করতে চান তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আপনাকে তা-ই করতে হবে যা আপনার বস পছন্দ করেন।

যেমন, আপনার বস একটা ব্ল্যাকবোর্ডকে হোয়াইট বোর্ড বলতে বললেন। আপনি যদি চাকরিতে উন্নতি করতে চান, তাহলে সেটাকে আপনার হোয়াইট বোর্ডই বলতে হবে-যদিও আপনি জানেন যে, ওটা আসলে ব্ল্যাকবোর্ড। কারণ দায়িত্ব তো বসের, আপনার নয়। তিনি যা বলবেন তা আপনি পালন

করবেন। তিনি যদি এ ব্যাপারে আপনার ওপরে আস্থা রাখতে না পারেন, কোনো অবস্থাতেই আপনাকে সামনের দিকে অগ্রসর হতে দেবেন না।

এক অফিসে একজন বস এতই বদরাগী ছিলেন যে, তার সাথে বেশিদিন কেউ কাজ করতে চাইতো না। এভাবে লোক বদল হতে হতে একবার তার অধীনে এমন একজন এলো যাকে তিনি খুব পছন্দ করে ফেললেন। কারণ, কর্মী ছেলেটি তার সব কথাতেই বলতো, জি স্যার, এর চেয়ে ভালো কিছু তো আর হতে পারে না। এভাবে যখন সে বসের আস্থাভাজন হয়ে গেল তখন বস তার পরামর্শ চাইতে লাগলেন। সে তখন তার সিদ্ধান্ত ও মতামত দিতো এবং দেখা যেত তার সিদ্ধান্তই গৃহীত হতো।

আনুগত্যটা হবে দাসের মতো। তাহলে আপনি চাকরিতে খুব ভালো করবেন। চাকরির দুটো ধরন আছে। ১. কেরানি, ২. ব্যবস্থাপক। এছাড়াও চাকরি দূরকম-১. সাধারণ, ২. টেকনিকেল বা কারিগরি। যেমন একজন মেকানিক। তার বিশেষ টেকনিকেল জ্ঞান আছে, কিন্তু সে চাকরি করছে। এখানে দরকার বুদ্ধি + বিশেষ জ্ঞান + দাসের মতো আনুগত্য। যেমন ম্যানেজার-তার বিশেষ জ্ঞান আছে; কিন্তু তিনি চাকরিও করছেন।

আমরা অনেক সময় মনে করি যে, আমার ক্যারিয়ারে উন্নতি হচ্ছে না কেন। আমি তো আরেকজনের চেয়ে খুব ভালো কাজ করি, তারপরও আমার প্রমোশন হচ্ছে না কেন, আমার ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে না কেন? আমার চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন, তার প্রমোশন হয়ে গেল, আর আমি ফাস্ট ক্লাস পেয়ে আগের অবস্থায়ই পড়ে রইলাম কেন? এর মূল কারণ-পেশাগত দায়িত্বশীলতা-বসের আপনার ওপর আস্থা। যত মেধাবীই হোন, যত দায়িত্বশীল হোন, আপনি পেশাতে এগুতে পারবেন না যদি না বস আপনার ব্যাপারে আস্থাশীল হন। একটি ছোট ঘটনা তার বিরক্তি উৎপাদনের জন্যে যথেষ্ট। অতএব, আপনাকে তো তিনি রেসপনসিবিলিটি দেবেন না। কারণ তিনি নিশ্চিত হতে চান যে, তিনি যাকে দায়িত্ব দেবেন সে ঐ দায়িত্ব পালন করতে পারবে। অতএব তিনি নির্ভর করতে পারেন না-এমন কাউকে কখনো দায়িত্ব দেবেন না, সে যত যোগ্য হোক বা নিজেকে যত দক্ষই মনে করুক।

**প্রশ্ন :** চাকরির ক্ষেত্রে দেখছি আমার চেয়ে অনেক কম জানা সহকর্মীও বসের আনুকূল্য পাচ্ছেন। তাদের একটি ভালো গুণ হলো তারা অনেক কথা বলতে পারেন এবং তোষামোদ করতে জানেন। এখন আমার প্রশ্ন হলো, কথা বলাটাই কি মুখ্য যোগ্যতা হওয়া উচিত?

**উত্তর :** আসলে যুক্তিসঙ্গত প্রশংসা আর চাটুকারিতা বা তোষামোদি এক বিষয় নয়। তার যোগ্যতা ও গুণাবলি নিয়েই তার সামনে বাস্তবসম্মত প্রশংসা করণ। ধরন, নতুন পোশাকে বসকে সুন্দর দেখাচ্ছে। অবস্থা বুঝে তাকে অভিনন্দিত করণ। এতে দোষের কিছু নেই। আর তেল দেয়ারও আর্ট আছে। তেল যে দিচ্ছেন এটা যেন বস বুঝতে না পারেন। কারণ কিছু তেল আছে যে, বেশি হয়ে যায়, এটা বসও বোঝেন, হয়তো মুখে কিছু বলেন না। কারণ তেল পেতে সবারই ভালো লাগে। কিন্তু বোঝেন যে, এত তেল দিচ্ছে যখন, নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে।

তোষামোদি নিয়ে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানের একটি বিখ্যাত ঘটনা আছে। মোনায়েম খান ছিলেন পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খানের বশংবদ একজন গভর্নর। একবার আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে এলেন। প্রেসিডেন্টের মনোরঞ্জনর আয়োজনের মধ্যে মোনায়েম খান কুমির শিকারের একটি পর্বও রাখলেন। কারণ তিনি জানতেন আইয়ুব খান কুমির শিকার করতে পছন্দ করেন। লঞ্চ করে আইয়ুব খানকে নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে কুমির শিকার করা হবে সেখানে।

এদিকে শিকারের জায়গায় কুমির যদি পাওয়া না যায় তখন হয়তো প্রেসিডেন্টের বিরাগভাজন হতে হবে ইত্যাদি ভেবে মোনায়েম খান লোকজন দিয়ে আগেই একটি কুমির মেরে নির্ধারিত জায়গায় ফেলে রাখলেন। যথাসময়ে প্রেসিডেন্টকে নিয়ে লঞ্চ যাত্রা করলো। কাছাকাছি যেতেই মোনায়েম খান ভীষণ উত্তেজিত হওয়ার ভান করে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, সদরে রিয়াসত, ক্রোকোডাইল! ক্রোকোডাইল! অর্থাৎ কুমির। প্রেসিডেন্ট তো তাড়াতাড়ি বন্দুক উঁচু করে নিশানা করলেন। গুলি ছুঁড়তে যাবেন এমন সময় ভালো করে তাকাতেই দেখলেন কুমিরটা চিং হয়ে পানিতে ভেসে আছে। তার মানে বেশ কিছুক্ষণ আগেই এটাকে মারা হয়েছে। তিনি আর গুলি না ছুঁড়ে মোনায়েম খানের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি আর কী মারবো? তুমি তো ওটাকে আগেই মেরে রেখেছো। এরপর আইয়ুব খান আর কখনো কুমির শিকারে যান নি।

অর্থাৎ এই ধরনের তোষামোদি না করলেও চাকরিতে আপনার উন্নতির জন্যে বসের আস্থা অপরিহার্য। যদি কখনো কোনো ভুল করে ফেলেন তাহলে সরাসরি বসের কাছে স্বীকার করবেন। কোনো ব্যাখ্যা দিতে যাবেন না বা দেরি করবেন না। কারণ একটা মিথ্যা বললে সেই মিথ্যাকে ঢাকার জন্যে ১০টা মিথ্যা বলতে হবে এবং আপনি নিজের পঁয়চে নিজেই পড়ে যাবেন।

আর অন্য কারো কাছ থেকে যদি তিনি এটা আগে শুনে ফেলেন তাহলে দুটো সম্ভাবনা। এক, তার কাছে আপনার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হতে পারে। দুই, অন্য কেউ হয়তো বাড়িয়ে বলতে পারে। আর আপনি নিজেই যদি স্বীকার করেন, তাহলে বস হয়তো প্রথমে রাগ করলেও ভেতরে ভেতরে আপনাকে শ্রদ্ধা করবেন। আর প্রাকৃতিক নিয়মই হচ্ছে—আপনি যা পেতে চান তা আগে আপনাকে দিতে হবে। বসের প্রতি যদি আপনি আন্তরিক অনুগত না হন আপনার অধীনস্থরাও আপনার প্রতি আন্তরিক এবং অনুগত হবে না।

**প্রশ্ন :** মিথ্যা বলা আমি খুবই অপছন্দ করি এবং নিজের খুব প্রয়োজনেও আমি মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকি। কিন্তু ইদানীং বসের কারণে আমাকে মিথ্যা বলতে হচ্ছে। যেমন, আমার বস বলেছেন যে, যদি তাকে কেউ খোঁজ করে তাহলে উনি যদি অফিসে না-ও আসেন তাহলেও বলতে হবে উনি এসেছেন অথবা এই মুহূর্তে বাইরে গেলেন। বিষয়টি আমার জন্যে খুব পীড়াদায়ক। এখন আমার কী করণীয়?

**উত্তর :** যদি দেখেন যে, বস এমন কোনো অনৈতিক কাজের প্রস্তাব দিচ্ছেন বা নির্দেশ দিচ্ছেন যেটা আপনার পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়। তখন দ্বিধা করবেন না, প্রথম সুযোগেই চাকরি ছেড়ে দিন। তা না করে যত সময় ক্ষেপণ করবেন তত সম্পর্কের অবনতি ঘটবে এবং আপনি হতাশ হতে থাকবেন। কারণ বস যদি অনৈতিক কাজের নির্দেশ দেন—সেটা ঘুষ হোক অথবা চারিত্রিক কোনো বিষয় হোক, বুঝতে হবে এটা তার স্বভাব, এখান থেকে আপনি তাকে বের করতে পারবেন না। মাঝখান থেকে বসের সাথে আপনার একাত্মতা নষ্ট হয়ে গেলে ঐ প্রতিষ্ঠানে আপনার আর উন্নতি হবে না। তাই প্রথম সুযোগেই সাহস করে চলে যাবেন। আল্লাহর দুনিয়া অনেক বড়। নতুনভাবে ভাগ্যের অন্বেষণ করবেন।

**প্রশ্ন :** আমি বাবার সঙ্গে ব্যবসা করি। আমার মূল সমস্যা হলো—ব্যবসায় আমি যত ভালো করি তার ক্রেডিট বাবার, আর বাবার সব ব্যর্থতার দায় আমার। অথচ আমার কোনো কথাই তিনি শোনেন না। বরং তিনি তার বন্ধুরা পী কিছু শত্রুর পরামর্শে সবকিছু করেন। আমার ব্যবসায়িক জ্ঞানকে বিকশিত করতে না দিয়ে সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখাই যেন তার প্রধান কাজ। এ জটিলতা থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?



**উত্তর :** সমস্যার কারণ-আপনার বয়স যতই বাড়ুক, আপনার বাবার কাছে আপনি হয়তো সেই ছোট্ট খোকা বা খুকি-অধিকাংশ মা-বাবার কাছেই তার সন্তান যেমনটা থাকে।

দ্বিতীয়ত, জেনারেশন গ্যাপ বা প্রজন্ম-ব্যবধান সংকট। সন্তান নিজেকে মনে করছে লেটেস্ট, আধুনিক। ফলে আগের প্রজন্ম বলে বাবার যেকোনো সিদ্ধান্তকেই গুরুত্বহীন মনে করছে। ভাবছে, বাবা হাল আমলের ব্যবসার কিছুই বোঝেন না।

আপনার বাবা যদি ব্যবসার কিছুই না বুঝতেন তাহলে তার প্রতিষ্ঠানে আপনি সংযুক্ত হতে পারতেন না। বরং অনেক আগেই তাকে ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হতো। সব বাবাই চান তার ছেলে ভালো করুক, নিজেকে বিকশিত করুক। কিন্তু সামান্যসামান্য হয়তো তিনি প্রশংসা করছেন না ছেলে প্রশ্রয় পেয়ে যাবে ভেবে। অর্থাৎ আপনাদের মধ্যে সমস্যা মূলত যোগাযোগের। আপনার বাবাকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসার জন্যে কোনো আত্মীয় বা বন্ধু-যার কথা তিনি শুনবেন-পরোক্ষভাবে তাকে কাজে লাগাতে পারেন।

মনে রাখবেন, ঘরে আপনারা পিতা-পুত্র হলেও ব্যবসায় কিন্তু আপনারা পরস্পরের পার্টনার। সিনিয়র পার্টনার হিসেবে বাবা আপনার বস। তার সামনে কথা কম বলবেন। আগ বাড়িয়ে পরামর্শ দেবেন না। নিজেকে জুনিয়র পার্টনার হিসেবেই মনে করবেন। আর ব্যক্তিগতভাবেও বাবাকে সম্মান করুন, ভালবাসুন। বাবা যখন তার প্রতি আপনার আগ্রহকে বুঝতে পারবেন, দেখা যাবে তিনিও তখন আপনার প্রতি আগ্রহী হচ্ছেন। আপনার পছন্দকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। প্রয়োজনে কমান্ড সেন্টারে এনে তাকে বোঝাতে থাকুন। বাস্তবেও বিনিয়ের সাথে আপনার মতামত তুলে ধরুন। একসময় দেখবেন আর কোনো সমস্যা থাকছে না।

**প্রশ্ন :** বিগত ৯-১০ বছর থেকে আমার কোম্পানির কর্ণধার প্রতিটি সিদ্ধান্ত ভুল নেয়ার পরও তার শোধরানোর কোনো লক্ষণ নেই, এখনো উনি মনে করেন উনিই ঠিকমতো সব বোঝেন। কোম্পানির সবাই সবদিক থেকে ভুক্তভোগী এমনকি উনি নিজেও। আমাকেও ছাড়ছেন না। তাকে কী করে বোঝানো যায়? দয়া করে জানাবেন।

**উত্তর :** আমাদের অসুবিধা হলো, বসকে অনেক কথা আমরা বলতে পারি না। মনে মনে রাখি। নিজের চেয়ারে বসে মনে মনে সে কথাগুলো আওড়াই।

‘ব্যটা! কত বড় বড় কথা বলে! এটা ভুল করেছে, ওটা ভুল করেছে, জানে ঘোড়ার ডিম। এ ব্যাটার এত খারাপ গুণ, তার মতো লোক বস হলো কীভাবে?’ এই যে মনে মনে আপনি আওড়াচ্ছেন মনের অবচেতন স্তরে কিন্তু তার সাথে আপনার দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। তখন বসের সাথে আপনার আর সুসম্পর্ক হবে না। ফলে যখন প্রমোশনের ব্যাপার হবে, সুযোগ-সুবিধার ব্যাপার হবে আপনি যেমন বসকে দেখতে পারেন না, বসও আপনাকে সহ্য করতে পারবেন না। অধিকাংশের চাকরি নিয়ে অসন্তোষ এখান থেকেই।

আর সবসময় ভাববেন তিনি বেশি জানেন বা আপনার চেয়ে তার গুণ বেশি বলেই তিনি আপনার বস, আপনার চেয়ে ওপরের চেয়ারে আসীন। বস যদি আপনার পরামর্শ না চান, তাহলে তাকে কিছু বলতে যাওয়াটাই হচ্ছে অর্থহীন। সবসময় মনে রাখতে হবে, বস আপনার চেয়ে যোগ্য বলেই তিনি আপনার বস। আর যদি তা মনে করতে না পারেন তাহলে আপনার এ প্রতিষ্ঠানে থাকা লাভজনক কিছু হবে না। তাই অবচেতন স্তর থেকে এই স্ফোভ বের করে দিতে হবে। বস করেছেন এটা তার ব্যাপার, এখানে আপনার তো কিছু করার নেই।

অর্থাৎ আপনার বোঝার সীমারেখাটা টেনে নেবেন আপনি নিজেই। আর আসলে অন্যের সাথে মিলেমিশে কাজ করতে পারাটাই হলো সফলতা। কারণ যারা খুব মেধাবী তারা আসলে বড় কাজ করতে পারে না তাদের মেধার অহংকারের কারণে। কিন্তু সবার সাথে মিলেমিশে কাজ না করলে আপনি কখনো বড় কাজ করতে পারবেন না। আর প্রয়োজনে আপনার বসকে কমান্ড সেন্টারে নিয়ে আসুন। নিয়মিত বোঝান। এটি ফলপ্রসূ হতে পারে।

## কলিগদের সাথে সম্পর্ক/ পেশাদারিত্ব

**প্রশ্ন :** অফিসের অনেক বড় বড় কাজ আমাকে দেন এমডি। তখন ভয় হয় পারবো কি না। আবার সফলভাবে সম্পন্ন করার পর অন্যান্য সহকর্মীরা হিংসাবোধ করে। এ অবস্থায় করণীয় কী?

**উত্তর :** সবসময় মনে রাখবেন, এমডি যদি পারেন, আরেকজন অফিসার যদি পারেন তো আপনি কেন পারবেন না। আর সহকর্মীরা তো হিংসা করবেই। কোন গাছে মানুষ ঢিল মারে—যে গাছে ফল থাকে। যে গাছে ফল থাকে না, সে গাছে কেউ ঢিল মারে না। যখন কেউ ঈর্ষা করবে, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া

আদায় করবেন যে, আপনি কিছু করছেন।

আর অন্যদের ঈর্ষার মুখে সবসময় প্রো-একটিভ থাকবেন। আপনি যে ভালো কাজ করে ফেলেছেন এবং এটা যে আপনার ভেতরে তৃপ্তি দিচ্ছে—এটা স্বীকারই করবেন না। অন্যদেরকে বলবেন যে, এটা আর কী কাজ, এটা তো তোমরাও পারবে। মনে করেছে ছোট কাজ, তাই এটা তোমাদেরকে দেয় নি, আমাকে দিয়ে ফেলেছে। তোমরা এর চেয়ে ভালো পারতে।

অর্থাৎ পেশার ক্ষেত্রে কুশলী হবেন এবং সংঘাত এড়িয়ে চলবেন। কনফুসিয়াসের সেই উক্তিটি সবসময় মনে রাখবেন, বুদ্ধিমান মানুষ বিরোধে জড়িয়ে প্রথম যে ভুলটা করে তা হলো বুদ্ধিকে বিতর্ক এড়ানোর কাজে ব্যয় না করা। অর্থাৎ বুদ্ধি ব্যয় করতে হবে বিতর্ক এড়ানোর জন্যে। সবসময় কর্মস্থলে সংঘাতটাকে এড়িয়ে যাবেন। বড় বড় কাজ করবেন, কিন্তু থাকবেন লো প্রোফাইলে। অন্যরা যে এর থেকে বড় কিছু করতে পারতো, এই উপলব্ধিটা তাদের দেবেন। অর্থাৎ অবস্থা বুঝে ঝগড়া ও ঈর্ষাকে যেভাবে এড়ানো যায় সেভাবে এড়াবেন।

**প্রশ্ন :** অফিসে আমি সাধারণত বিনয়ী ও সদাচারী। অন্য ডিপার্টমেন্টের কর্মীরা যখন আমার সুনাম করে—আমার সহকর্মীরা ঈর্ষান্বিত হয়, বদনাম করতে শুরু করে। আমার করণীয় কী?

**উত্তর :** ঈর্ষাকারী এবং গীবতকারী, এদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার শান্তি বিনষ্ট করা, যাতে আপনি ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে না পারেন, মেধাকে বিকশিত করতে না পারেন। সহকর্মীরা কথা বলবে, ঈর্ষান্বিত হবে, গীবত করবে, খোঁচা দেবে। কিন্তু এগুলোকে কখনোই ব্যক্তিগতভাবে নেবেন না, সাংগঠনিকভাবে দেখবেন। ক্ষোভ বা অভিযোগ করবেন না, প্রো-একটিভভাবে সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হবেন।

যখনই মনে হচ্ছে অফিসে এই লোক আপনার বিরুদ্ধে বসের কাছে বলেছে তার সাথে সবসময় সুন্দর সম্পর্ক রাখবেন। আপনি কোনো প্রতিবাদ তো করবেনই না, বরং বেশি বেশি তার প্রশংসা করবেন—তার সামনে এবং অন্যদের সামনে। আস্তে আস্তে দেখবেন তার বিরোধিতা কমে যাচ্ছে। আর যদি সম্পর্কচ্ছেদ করেন তাহলে সে সরাসরি আপনার বিরোধিতা করবে।

আর কর্মস্থলে সবসময় আলোচনার পথ উন্মুক্ত রাখবেন। আপনার বিরুদ্ধে যে কথা বলে তাকে উৎসাহ দেবেন বেশি। সে আপনার সবচেয়ে ভালো বন্ধু।

কারণ আপনার ভুলগুলো তার চোখে যত সুন্দরভাবে ধরা পড়বে, আপনাকে যারা হাওয়া দিচ্ছে তাদের চোখে সেভাবে ধরা পড়বে না। সাধারণভাবে আমরা সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করি প্রতিযোগীকে, প্রতিপক্ষকে। কিন্তু একটি বিষয় মনে রাখবেন, আপনার ভুল সবচেয়ে ভালো ধরিয়ে দিতে পারবে আপনার প্রতিপক্ষ, যারা আপনাকে হাওয়া দিচ্ছে তারা নয়।

**প্রশ্ন :** অফিসে একটা পোস্ট খালি হওয়ায় সম্প্রতি আমাকে সেখানে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমার একজন সহকর্মীর সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা ছিলো। ফলে এখন সে আমার সাথে অসহযোগিতামূলক আচরণ করছে। কিছু চাইলে এমন আচরণ করে যে, অপমানিত বোধ করি। সহ্য করতে করতে একসময় রেগে যাই। চুপ করে থাকলে মনে করে দুর্বল। কী করা যায়?

**উত্তর :** আপনাকে নিজের যোগ্যতা দক্ষতাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে তার কাছে কিছু চাইতে না হয়। আর তাকে সবসময় এপ্রিশিয়েট করবেন। সে অসহযোগিতা করলেও আপনি তাকে সহযোগিতা করবেন। যত তাকে সহযোগিতা করবেন তত তিনি তার ঐ দুঃখটাকে ভুলে যাবেন। তিনি একটি জিনিস চেয়েছিলেন, কিন্তু পান নি। আপনি পেয়ে গেছেন। এটা নিয়ে তার মধ্যে দুঃখবোধ থাকতে পারে। এটাই স্বাভাবিক। হতে পারে, তিনি যদি ঐ পোস্টে যেতেন আপনিও তার সাথে একই আচরণ করতেন। অতএব তার আচরণকে মনে মনে এপ্রিশিয়েট করুন। তার সাথে ভালো আচরণ করতে থাকুন। একদিন অবশ্যই তার আচরণে পরিবর্তন আসবে।

**প্রশ্ন :** আমি কিছু শ্রমিক কর্মকর্তা নিয়ন্ত্রণ করি। শ্রমিক অসন্তোষের কারণে আমাকে সবসময় টেনশনে থাকতে হয়। এ ব্যাপারে আমার করণীয় কী?

**উত্তর :** আপনি শ্রমিক এবং কর্মচারীদের অধীনস্থ না ভেবে যদি সহকর্মী ভাবেন, তাদের দুঃখগুলো যদি নিজের দুঃখ হিসেবে দেখেন—আপনার টেনশন করার কিছু নেই। আপনার সীমাবদ্ধতা আছে, কারণ আপনি মালিকের পক্ষের মানুষ। আপনি মন থেকে তাদের ভালবাসুন, তাদের কল্যাণ করুন যতটুকু আপনার পক্ষে সম্ভব। আপনার জন্যে তারা সমস্যা হবে না। বরং তারা আপনাকে ভালবাসবে। তারা হয়তো আপনার জন্যে কিছু করতে পারবে না। কিন্তু আপনার জন্যে দোয়া করতে পারবে, চোখের পানি ফেলতে পারবে।

## ক্রম-উৎকর্ষ ॥ দক্ষতা ॥ যোগ্যতা

**প্রশ্ন :** কাজের ক্ষেত্রে কোন দৃষ্টিভঙ্গিটি গুরুত্বপূর্ণ যা একজন মানুষকে চূড়ান্তভাবে দক্ষ এবং যোগ্য করবে?

**উত্তর :** কাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, আরো ভালো করার জন্যে সবসময় সাধ্যমতো চেষ্টা করা। যদি সাময়িক সাফল্যে তৃপ্তি চলে আসে, মনে হয় আর কিছু শেখার নেই, আর কিছু করার নেই—তাহলে সেটাই হলো দক্ষতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। কারণ আমি সবকিছু পারি—এ অহংকারই একজন মানুষের পতনের জন্যে যথেষ্ট। এজন্যে সবসময় শোকরগোজার থাকতে হবে, বিনয়ী হতে হবে। দক্ষতা নিয়ে অহংকার করবেন না। কারণ ভালো কাজের অহংকারও পতনের কারণ হতে পারে।

তাই কাজ যত বাড়বে, শুকরিয়াও যেন তত বাড়তে থাকে। কাজ যে করতে পারছি সেজন্যে শুকরিয়া, যতটুকু করতে পারছি সেজন্যে শুকরিয়া। কারণ ভালো কাজে ব্যস্ত থাকার চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কিছু নেই। মানুষের স্বভাবই হচ্ছে, হয় সে ভালো কাজে ব্যস্ত থাকবে, নয়তো মন্দ কাজে সময় নষ্ট করবে। ভালো কাজ হলো তার অ্যাসেট যার সুফল সে ভোগ করতে পারবে। আর মন্দ কাজ হলো বোঝা, যার পরিণামে তাকে দুঃখ ও ভোগান্তির মুখে পড়তে হবে। কাজেই যোগ্যতা ও দক্ষতা বিকাশের মূল কৌশল হলো অভিমান অভিযোগ ক্ষোভকে দূরে সরিয়ে রেখে সবসময় কাজে ব্যস্ত থাকা।

সেই সাথে নিজের যোগ্যতা-দক্ষতা বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনা বা নেতৃত্বের গুণাবলি উন্নয়নের জন্যে প্রতিদিন আত্মপর্যালোচনা করা যে, আমার যোগ্যতা-দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে, ব্যবস্থাপকীয় ও নেতৃত্বের গুণাবলি উন্নয়নের জন্যে আমি আজকে কী করলাম? অর্থাৎ প্রতিনিয়ত নিজের সাথে প্রতিযোগিতা করা। সবসময় মনে রাখবেন, চাকরির বাজারে আপনার চেহারা সুরত বা আপনার অন্য পরিচয় অর্থহীন যদি দক্ষতা না থাকে। তাই নানাদিকে দক্ষতা ক্রমাগত বাড়তে হবে।

**প্রশ্ন :** আমি একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি। কিন্তু পেশাগত ক্ষেত্রে বিদেশি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিধারীদের চাহিদাই বেশি। তাই মাঝে মাঝে দ্বিধায় ভুগি যে, দেশে পড়া বাদ দিয়ে কি বিদেশেই চলে যাবো?

**উত্তর :** আসলে টেকনিকেল কাজের ক্ষেত্রে ডিগ্রির চেয়েও বাস্তব দক্ষতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেমন আপনার বাসার ফ্যানটা নষ্ট হয়ে গেছে। ঠিক করার দায়িত্ব দিলেন একজন বড় ডিগ্রিধারী ইলেকট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ারকে। কিন্তু তাত্ত্বিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ এই ইঞ্জিনিয়ার অনেক চেষ্টা করেও ফ্যানটি ঠিক করতে পারলো না। কারণ এর জন্যে প্রয়োজনীয় বাস্তব জ্ঞান তার নেই। তাহলে? তার ডিগ্রি অর্থহীন হয়ে গেল কারণ প্রায়োগিক সাফল্যই তিনি দেখাতে পারলেন না।

ইনফরমেশন টেকনোলজিসহ সব ধরনের টেকনোলজিকেল ক্ষেত্রে এ কথাটিই প্রযোজ্য। কাজেই আপনি যদি দক্ষতা অর্জন করতে পারেন তাহলে বিদেশি বিশেষজ্ঞ বাদ দিয়ে আপনাকেই ডাকা হবে কাজটা করে দেয়ার জন্যে। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও প্রযুক্তিক্ষেত্রে ডিগ্রিধারীদের চেয়ে দক্ষরাই ভালো করছেন। আর এখন যেহেতু বেসরকারিকরণের জোয়ার চলছে এসময়ে এই দক্ষতাগুলোর স্বীকৃতি পাওয়াটা আরো সহজ।

**প্রশ্ন :** আপনার মতে কোন জ্ঞান বা বিশেষ দক্ষতা আমাদের সব শ্রেণী-পেশার মানুষের জন্যে অত্যাवश्यकীয়?

**উত্তর :** নেতৃত্ব বা ব্যবস্থাপনার যোগ্যতা অর্থাৎ অন্যদের নিয়ে কাজ করার যোগ্যতা। ব্যবস্থাপনার যোগ্যতা বিকশিত হলে বড় বড় প্রতিষ্ঠান আপনি চালাতে পারবেন। যত মেধাবী হোন, যদি সবার সাথে মিলে কাজ করতে না পারেন তাহলে কখনো বড় কাজ করতে পারবেন না। যে অন্যের সহযোগিতা অর্জন করতে পারে না সে কখনো বড় কাজ করতে পারে না। আপনাকে অন্যেরা সহযোগিতার জন্যে উদ্ধুদ্ধ হলেই আপনি বড় কাজ করতে পারবেন।

আর এজন্যে একজন নেতাকে বা ব্যবস্থাপককে তার কর্মীদের চেয়ে বেশি শ্রম এবং সময় দেয়ার মতো আগ্রহ, শক্তি ও বিশ্বাস থাকতে হবে। প্রতিষ্ঠানের একজন নেতা বা ম্যানেজারকেও সেরকম হতে হবে। যে পরিশ্রমের কাজ আরেকজন করতে পারবে না তিনি যেন সেই কাজটা করতে পারেন। কর্মী যখন অনুভব করেন, আমি যদি কাজ না করে দাঁড়িয়ে থাকি তবে ম্যানেজার এসে সেই কাজ করে যাবেন তখন আপনি সফল ম্যানেজার হতে পারবেন। তাদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য দুটোই পাবেন।

আসলে আমাদের মধ্যে এই ব্যবস্থাপনার দক্ষতার অভাবই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। যে কারণে আমাদের দেশে মাঝারি স্তরের এক্সিকিউটিভ এখনো বিদেশ থেকে আসে। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির ম্যানেজার বিদেশ থেকে আসে। এর

চেয়ে লজ্জার ব্যাপার তো আর কিছু হতে পারে না। অতএব এই ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বিকশিত করতে হবে।

**প্রশ্ন :** ক্রমাগত ভুলের ক্ষেত্রে অধীনস্থদের প্রতি একজন নেতার দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত এবং এর সমাধান কী হওয়া উচিত?

**উত্তর :** প্রথমত তার উচিত হবে ভুল হওয়ার কারণগুলোকে খুঁজে বের করা। ভুল প্রধানত দুটি কারণে হতে পারে। প্রথমত, সেই অধীনস্থের যদি সেই কাজের প্রতি আগ্রহ না থাকে। দ্বিতীয়ত, সেই কাজের জন্যে যে মানসিক প্রস্তুতি এবং যোগ্যতা দরকার তা যদি তার না থাকে। যদি আগ্রহ না থাকে তাহলে তাকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করা যেতে পারে এবং যদি যোগ্যতার অভাব থাকে তাকে যোগ্যতা-দক্ষতা সৃষ্টি করার জন্যে প্রয়োজনীয় সময় দেয়া যেতে পারে। এতেও যদি ভুলের পরিমাণ না কমে তবে তাকে বাদ দেয়া যেতে পারে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তার সাথে দুর্ব্যবহার করা যাবে না।

**প্রশ্ন :** কর্মস্থলে অসৎ সহকর্মীদের সাথে মানিয়ে চলতে পারি না। তাদের সাথে সাথে ঘুষের টাকা না নিলে সমস্যা করে এবং অধীনস্থদের কাজে ফাঁকি দেয়ার সুযোগ না দিলে তারাও বিরোধিতা করে। সৎ থেকে তাদের সাথে কীভাবে মানিয়ে চলতে পারবো?

**উত্তর :** এটা খুব কঠিন প্রশ্ন। এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য খুব স্পষ্ট। আসলে এখন সিস্টেমই দাঁড়িয়েছে এটা। আর একা কেউ কখনো সিস্টেমের বিরুদ্ধে যেতে পারে না। আপনার বাধা দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। আপনাকে যেকোনোভাবেই হোক এর সাথে এক ধরনের সমঝোতায় আসতে হবে, তা না হলে আপনি চাকরি করতে পারবেন না। অর্থাৎ চাকরি পরিবর্তন ছাড়া আপনার সৎ থাকার কোনো সুযোগ নেই।

## পেশাজীবী ॥ বৃত্তিজীবী

**প্রশ্ন :** পেশাজীবী বা বৃত্তিজীবীদের সফলতার দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত?

**উত্তর :** পেশাজীবী অর্থাৎ ডাক্তার, শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার, ল-ইয়ার, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট বা কনসালটেন্ট হিসেবে যখন একজন স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত

থাকেন তখন সেখানে সাফল্য অর্জনের জন্যে চারটি বিষয় প্রয়োজন।

প্রথমত, উদ্যম-নতুন কিছু, বড় কিছু করার।

দ্বিতীয়ত, পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা।

তৃতীয়ত, পেশার প্রতি ভালবাসা, আন্তরিকতা, দায়িত্ব পালনে বিশ্বস্ততা।

চতুর্থত, জনসংযোগ বা পরিচিতি।

এই চারটি বিষয় যদি একজন পেশাজীবী আয়ত্ত করেন, তিনি শুধু বৈষয়িকভাবে সফল হবেন তা নয়, একজন সৃজনশীল কীর্তিমান পেশাজীবী হিসেবেও স্মরণীয় হবেন।

কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে, আমাদের অধিকাংশ পেশাজীবী বিপুল অর্থের পেছনে ছুটে গিয়ে সাফল্যের এ শর্তগুলো অবহেলা করেন। ফলে একসময় পেশাজীবীদের যে মর্যাদার চোখে দেখা হতো এখন তা অনেকটাই দুর্লভ।

যেমন, ৭০-এর দশক পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক ছিলেন যাদের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হয়। কিন্তু এরপর থেকে পট বদল হতে লাগলো। জ্ঞানচর্চায় ব্রতী ছাত্র অন্তঃপ্রাণ শিক্ষকের জায়গায় এসে দাঁড়ালো অর্থোপার্জনের নেশায় পাগল দিনমান প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটে ব্যস্ত শিক্ষক নামের কিছু আত্মকেন্দ্রিক মানুষ। নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহার করতেও তারা দ্বিধাবোধ করে না। যদিও এখনো অনেক শিক্ষক আছেন যারা সত্যিকার অর্থেই শ্রদ্ধেয়-তাদের গভীর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব এবং আদর্শের জন্যে।

কিন্তু এখনকার সাধারণ প্রবণতা হলো, রাজনীতির লেজুড়বৃত্তিতে ব্যস্ত শিক্ষক সুযোগ পেলেই ক্লাস বর্জন, ধর্মঘট, রাস্তায় আন্দোলন ইত্যাদির ঘোষণা দেন। এতে ছাত্রছাত্রীরা জ্ঞানার্জনে পিছিয়ে পড়ুক কিংবা সেশন জটে আটকে পড়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ুক-তাতে তাদের কিছু আসে যায় না।

মজার ব্যাপার হলো, নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস না নিয়ে মহা উৎসাহে ধর্মঘট পালন করলেও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিক সময়েই তিনি হাজিরা দেন। যেখানে মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে তার ছাত্ররা পড়ছে-সেখানে তিনি এ জাতীয় আন্দোলনের কথা দূরতম কল্পনাতেও আনতে পারেন না।

আসলে একজন পেশাজীবী শিক্ষক হতে পারেন বা ডাক্তার হতে পারেন। কিন্তু নীতিগতভাবে তিনি কখনো বলতে পারেন না যে, আমি পড়াবো না বা আমি রোগী দেখবো না-যতক্ষণ তিনি একজন শিক্ষক বা ডাক্তার হিসেবে নিয়োজিত আছেন। যেকোনো সময় সেবা দেয়ার জন্যে তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে।



ধরুন, একজন দর্জি, পোশাক তৈরি করেন। এটাও একটা স্বাধীন পেশা। তাকে প্রত্যেকের মাপমতোই পোশাক তৈরি করতে হবে। মি. এক্স-এর মাপে মি. ওয়াই-এর পোশাক বানাতে কি হবে? অথবা যে সময়ের মধ্যে পোশাক তৈরি করে দেয়ার কথা, তার অন্তত একদিন আগে পোশাকটি তৈরি করে রাখতে হবে, যাতে ক্লায়েন্ট আসার সাথে সাথে তাকে দিয়ে দিতে পারেন। আর দুইদিন আগে করে রাখতে পারলে আরো ভালো।

আর একজন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারের এটা কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয়, আজকে তার এই অবস্থান তৈরির জন্যে কত নিরন্ন মানুষের ট্যাক্সের টাকায় তিনি প্রায় বিনা পয়সায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন। শুধু তা-ই নয়, তার বেতনের অর্থায়নও হয় এই ট্যাক্সের টাকায়। নিজের বিবেকের কাছেই তার জিজ্ঞেস করা উচিত—এই ঋণ বা দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তির কতটা চেষ্টা তিনি করেছেন। ক্লাস বর্জন বা ক্লাস ফাঁকি দেয়ার ফলে তার ঋণের বোঝা কি দিনে দিনে আরো বাড়ছে না?

হ্যাঁ, যদি এমন হয় যে, পারিপার্শ্বিক কারণে তিনি ঐ পেশায় কোনোভাবেই মানিয়ে নিতে পারছেন না, তখন হয়তো ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে যতক্ষণ একটি জায়গায় সেবাদানের চুক্তিতে তিনি আবদ্ধ ততক্ষণ ঐ দায়িত্বই তাকে পালন করতে হবে চূড়ান্ত নিষ্ঠার সাথে। যখন যা খুশি করার কোনো অধিকার তার তখন থাকে না বা নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিতে যাওয়ার দ্বৈত নীতি অনুসরণ করার সুযোগও আর থাকে না। তা করলে তিনি তার শপথেরই লঙ্ঘন করলেন। আসলে পেশাজীবন শুরু করার আগে প্রত্যেক পেশাজীবীকেই পেশার কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য মেনে চলার অঙ্গীকার করতে হয়। সেটা ঘোষিত হতে পারে বা হতে পারে অঘোষিত।

যেমন, আমরা জানি—একজন চিকিৎসক যখন তার পেশাজীবন শুরু করেন, তাকে ‘হিপোক্রেটিক ওথ’ নামে একটি শপথ নিতে হয়, যেখানে তিনি নিজের সীমাবদ্ধতাকে স্মরণে রেখে বিনয়ের সাথে একজন রোগীকে সুস্থ করে তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় সবকিছু করার প্রতিজ্ঞা করেন। ওষুধ বা সার্জারির চেয়েও রোগীর জন্যে তার একটু মমতা, একটু সহানুভূতি অনেক সময় বেশি কাজ করতে পারে এটা মনে রাখার অঙ্গীকার তিনি করেন। এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলো, অসুস্থ হলে একজন মানুষ শুধু যে শারীরিকভাবেই আক্রান্ত হয় না, তার পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক জীবনও যে প্রভাবিত হয়, চিকিৎসার সময় এ বিষয়গুলোতে দৃষ্টি দেয়ার অঙ্গীকার তিনি করেন।

যেকোনো পেশাজীবী যখন তার পেশাগত অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থ হবেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তিনি শ্রদ্ধা হারাবেন। কারণ শুধু পদ-পদবি বা কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানে থাকলেই শ্রদ্ধা পাওয়া যায় না। শ্রদ্ধা পাওয়ার জন্যে ব্যক্তিকেই কাজ করতে হবে সততা, নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতা নিয়ে।

আর বৃত্তির ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বস্ততা বলতে বোঝায়—ধরুন, আপনি পরামর্শ দিচ্ছেন একজনকে। পরামর্শদাতা হিসেবে আপনাকে বিশ্বস্ত হতে হবে। যদি আপনি বিশ্বস্ত না হন, যারা পরামর্শ নিতে আসছেন তারা যদি মনে করেন যে, সে যা বলছে তা আপনি কাউকে বলে দিতে পারেন। তাহলে পরামর্শদাতা হিসেবে আপনি ব্যর্থ হবেন। কেউ আপনার কাছে পরামর্শের জন্যে আসবে না। তাই আপনাকে আপনার পেশার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে।

## চাকরি বদল

**প্রশ্ন :** জীবনের প্রথম চাকরিতে কত বছর থাকা উচিত? চাকরি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত?

**উত্তর :** চাকরি যদি শ্রেফ জীবিকা অর্জনের জন্যে হয় তাহলে বেশি সুবিধা পেলে প্রথম সুযোগেই চাকরি পরিবর্তন করা উচিত। কারণ আপনি জীবিকার জন্যে শ্রম বিক্রি করছেন। যেখানে আপনার শ্রমের ভালো মূল্য পাবেন সেখানেই চাকরি করবেন। যত চাকরি বদলাতে পারবেন তত ওপরের দিকে উঠবেন। আর যিনি বদলাতে পারবেন না, চাকরিতে উন্নতির দিক থেকে তিনি সবসময়ই পিছিয়ে থাকবেন। কারণ গৈরী যোগী ভিখ পায় না। যেমন, আপনি যে প্রতিষ্ঠানে ঢুকেছেন তারা হয়তো ভাবতে পারে, আপনি এই লেভেলে ঢুকেছেন, আপনি তো এই লেভেলেরই। সেক্ষেত্রে যদি মনে করেন এই প্রতিষ্ঠানে আপনার মূল্যায়ন হচ্ছে না, আপনি এর চেয়ে আরো ভালো কাজ করার উপযুক্ত—পদোন্নতির চেষ্টা না করে তখনই চাকরি বদল করুন। তখন হয়তো দেখা যাবে, এই প্রতিষ্ঠানেই আবার আপনি এসেছেন। কিন্তু আরেক ধাপ এগিয়ে। তবে চাকরি যদি মিশনের অংশ হয় তাহলে ভিন্ন কথা।

আর প্রথম চাকরিতে সাধারণত স্বপ্ন ভঙ্গের কষ্টটা একটু বেশি থাকে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য শিক্ষাক্ষেত্র থেকে মাত্র বেরিয়ে প্রথম কর্মস্থলটা অনেকের কাছে বেশ কঠিন এবং কষ্টকর মনে হয়। কেউ কেউ মনে করে মুক্ত

জীবন থেকে জেলখানায় প্রবেশ করেছে। পদে পদে জবাবদিহিতা, নিয়মকানুন। এক্ষেত্রে শিক্ষাজীবনের সাথে কর্মজীবনের তুলনা যত কম করেন তত ভালো। কর্মজীবনের বাস্তবতা এটাই। অতএব বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি লালন করবেন, আপনি সহজে মানিয়ে নিতে পারবেন।

**প্রশ্ন :** আমি একটি চাকরি করতাম। চাকরিটি আমার ভালো লাগছিলো না। কোয়ান্টাম কোর্স করার পর খুব সাহস নিয়ে চাকরিটি ছেড়ে দেই। এখন একটি ভালো চাকরি পেতে চাই। কিন্তু মাঝে মাঝে হতাশা ও দুশ্চিন্তায় ভুগি। গত তিন মাস ধরে আমি বেকার। কীভাবে হতাশা-দুশ্চিন্তা ভুলে গিয়ে চাক্রা মনোভাব নিয়ে একটি ভালো চাকরির জন্যে চেষ্টা করবো? দিনের বেশিরভাগ সময় কীভাবে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করবো?

**উত্তর :** আসলে আপনার মূল সমস্যাটা হচ্ছে অস্থিরতা। এ অস্থিরতা দূর করার জন্যে নিয়মিত মেডিটেশন করতে হবে। যেহেতু আপনার এখন কোনো ব্যস্ততা নেই, দিনে দুইবেলা মেডিটেশন করুন, মনছবি দেখুন এবং কোয়ান্টামমে কোয়ান্টায়ন করুন। আত্মজাগরণের সিডি শুনুন। কারণ ভেতরের শক্তিকে জাগ্রত করার জন্যে মেডিটেশন জরুরি। আর অন্তর্গত শক্তি যখন জাগ্রত হতে থাকবে তখন চাকরি নিজেই আপনার দিকে আকৃষ্ট হবে।

**প্রশ্ন :** আমি একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে শিক্ষকতা করছি। মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন আমার কাছ থেকে অনেক বেশি প্রত্যাশা করেন। আমার পারিবারিক ও আর্থিক অবস্থাও খুব বেশি ভালো না। আমি এমন পেশায় নিয়োজিত হতে চাই যাতে আমার সার্বিক অবস্থার পরিবর্তন করতে পারি। এ ব্যাপারে সঠিক দিক-নির্দেশনা চাই।

**উত্তর :** আপনি একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। তার মানে হয়তো অন্য কোথাও সুযোগ না পেয়ে আপনি ওখানে গেছেন। এখন আপনার কর্তব্য হবে অস্থিরতায় না ভুগে যে পেশায় আছেন সেখানেই সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জন করা। নিজেকে প্রতিষ্ঠানের জন্যে অপরিহার্য একজন শিক্ষকে পরিণত করা। সেরা শিক্ষক বলতে যা বোঝায় তাতে রূপান্তরিত হওয়া। তাহলেই দেখবেন আপনার আর্থিক অবস্থা ভালো হচ্ছে। কারণ আর্থিক অবস্থা নির্ভর করে আপনি কতটা দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছেন, নিজের মেধাকে কতটুকু

সেবায় রূপান্তরিত করতে পেরেছেন তার ওপর।

অন্যদিকে অস্থিরতা অগ্রগতিকে আরো রুদ্ধ করে দেয়। আর মা-বাবার প্রত্যাশা সবসময়ই থাকবে। কোটি টাকা পাওয়ার পরও মা-বাবার প্রত্যাশা, পরিবারের বৈষয়িক প্রত্যাশা কোনোদিন শেষ হবে না। কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে আপনার বাস্তবতা কী এবং কোথা থেকে আপনি শুরু করবেন।

**প্রশ্ন :** আমার বয়স ৩৫। আমি একজন প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা। বর্তমান কর্মস্থলে আমার অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগের সুযোগ কম। তবে কোনো মাল্টিন্যাশনালে হয়তো আমার অর্জিত জ্ঞানের অধিকতর প্রয়োগ সম্ভব। কিন্তু সেখানে তো জীবিকাই জীবন হয়ে দাঁড়ায়। এখন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছি। সরকারি চাকরির অপ্রতুল আয়ও এখানে বিবেচ্য বিষয়।

**উত্তর :** আসলে এটা খুব সত্যি যে, সরকারি চাকরিতে যে বেতন হওয়া উচিত সেটা হয় না। বেতনের স্কেল এমন হওয়া উচিত, যাতে একজন বিসিএস অফিসার বা একজন সরকারি কর্মচারী তার আর্থসামাজিক অবস্থানে থেকে ভদ্রস্থ জীবনযাপন করতে পারেন। কিন্তু আমাদের বেতন কাঠামোটাই অত্যন্ত অযৌক্তিক। ঔপনিবেশিক শোষকদের তৈরি করা এই বেতন কাঠামো আসলে আমাদের দুর্নীতির দিকে ঠেলে দেয়।

একজন পুলিশ কনস্টেবলকে কত টাকা বেতন দেয়া হয়? ৪৫ বছর আগে দেয়া হতো ৬০ টাকা, এখন ছয়/সাত হাজার টাকা। অথচ একজন পানওয়ালা কত উপার্জন করে মাসে? দিনে চারশ টাকা হলে মাসে ১২ হাজার টাকা। একজন বিসিএস অফিসার, যিনি সদ্য যোগদান করেছেন—বেতন পান ১৫/১৮ হাজার টাকা যা একজন পানওয়ালার উপার্জনের চেয়ে বেশি, কিন্তু চটপটিওয়ালার উপার্জনের চেয়ে কম। তাহলে ঐ বিসিএস অফিসার কী করবেন? অতএব স্বীকার করতে হবে যে, এটা একটা সমস্যা। তবে সরকারি চাকরিতে মানুষের উপকারের যে সুযোগ আছে বহুজাতিক কোম্পানিতে তা নেই। আর এমএনসি-তে যারা কাজ করে, স্ট্যাটাস মেইনটেইন, অসুখবিসুখ ইত্যাদির পেছনে তাদের যে পরিমাণ খরচ হয় তাতে তার সম্বল যে খুব একটা থাকে তা-ও কিন্তু নয়।

**প্রশ্ন :** অনেকদিন থেকে বর্তমান চাকরিটি করতে আর ভালো লাগছে না। কেবলই মনে হচ্ছে, এই চাকরি আমার জন্যে না। আমি জন্মেছি আরো বড়

কিছু, আরো ভালো চাকরি করার জন্যে। আর সেই জন্যে নিজেকে যোগ্য হতে হবে। তাই আমি হায়ার স্টাডি করতে লন্ডন যেতে চাচ্ছি। এর জন্যে আমার বর্তমান চাকরি ছাড়তে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না সেটা ঠিক হবে কি না। গুরুজী আমাকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিন।

**উত্তর :** আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লন্ডনে যাবেন পড়াশোনা করার জন্যে। কিন্তু এর জন্যে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, সেটা যদি আপনার কাছে থাকতোই তাহলে তো আপনার চাকরি করারই প্রয়োজন হতো না। আসলে এটা একটা ভুল ধারণা যে, দেশের বাইরে চাকরি করে পড়াশোনা করা যায়। বরং বাস্তবতা হচ্ছে, ওখানে চাকরির সুযোগ খুব সীমিত। তারাই এখন জর্জরিত বেকারত্ব, কর্মী ছাঁটাই ইত্যাদি নানা সমস্যায়। ১০ বছর পরে হয়তো তারাই আমাদের দেশে আসবে চাকরি করে পড়াশোনা করার জন্যে। অতএব আহাম্মকের স্বর্গে থাকবেন না।

আর বড় চাকরির জন্যে হায়ার স্টাডির প্রয়োজন নেই। হায়ার স্টাডি করে কেউ কখনো চাকরি করতে পারে না। চাকরি করতে হয় নিজ যোগ্যতা দিয়ে, দায়িত্বশীলতা দিয়ে। আর পদোন্নতি কখনো ডিগ্রি দেখে হয় না। সরকারি চাকরিতে পদোন্নতি নির্ভর করবে আপনার যোগাযোগের দক্ষতার ওপর। প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে এটা নির্ভর করবে আপনার দক্ষতা, দায়িত্ব নিতে পারার যোগ্যতা আর ব্যবস্থাপনার কুশলতার ওপর। ডিগ্রি বা উচ্চশিক্ষার ওপর নয়।

মনে রাখবেন, যত বড় চাকরিই হোক, চাকরি মানে-চাকর। চাকরি মানে-‘বস ইজ অলওয়েজ রাইট’। তখন আপনি বসের আগে অফিসে ঢুকবেন, বসের পরে বেরোবেন, বসের নজরের মধ্যে থাকবেন, তাহলে আপনার উন্নতি হবে।

চাকরি করতে আপনার ভালো লাগছে না মানে আপনি আসলে কাজটাকে ভালবাসতে পারছেন না। আমাদের সমস্যা হলো, কাজ হয়তো আমরা করি, কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও করি। বিরক্তি সহকারে করি। ফলে বিষণ্ণ থাকি, অনেকসময় যার শারীরিক প্রভাবও পড়ে। মাল্টিন্যাশনালে বা অন্যান্য চাকরিতে যত সিইও আছে, দুই বছরের মাথায় তারা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছেন। ঘাড়ে ব্যথা, পিঠে ব্যথা, মাইগ্রেন, উচ্চ রক্তচাপ, অনিদ্রা, হজমে সমস্যা ইত্যাদিতে ভুগছেন। কারণ-বিরক্তির সাথে কাজ করা। অধিকাংশই কাজটাকে ভালবাসেন না।

যেমন, মহিলাদের এত অসুখবিসুখ, এত অস্থিরতার অন্যতম কারণ

হলো-প্রতিদিন ঘরের যে কাজগুলো তারা করেন, অধিকাংশই তা করেন খুব বিরক্তির সাথে। করতে হবে তাই করেন। অথচ আনন্দ নিয়ে কাজ করলে তারা অনেক সুস্থ থাকতেন। আবার আমাদের সময় মা-চাচী-খালাদের অসুখ-বিসুখ খুব একটা দেখি নি। কারণ তাদের কাছে ঘরের কাজটাই ছিলো আনন্দের। ছেলে বিরক্ত করছে, মেয়ে বিরক্ত করছে-এটাই তার আনন্দ। এটাই তার জগৎ। এর বাইরে তার কোনো জগৎ ছিলো না। কিন্তু সাধারণভাবে এখনকার শহুরে মহিলাদের একটা বড় অংশের জগৎ হচ্ছে শপিং টিভি ফেসবুক ই-মেইল এসএমএস মোবাইল। যার ফলে ঘরের কাজের মধ্যে তিনি আর কোনো আনন্দ খুঁজে পান না।

অতএব কাজটাকে ভালবাসবেন। যদি চাকরি করেন এবং কাজকে ভালবাসেন তাহলে আপনি প্রতিদান পাবেনই। বস আপনাকে প্রতিদান না দিলেও আপনার কাজ আপনাকে প্রতিদান দেবে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম।

## পেশা ও নৈতিকতা

**প্রশ্ন :** আপনি বলেছেন আয় বাড়িয়ে ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে হবে। আয় বাড়াতে হলে অন্যায় পথে পা বাড়াতে হয়। এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। এই পথ থেকে কীভাবে পরিব্রাজণ পেতে পারি?

**উত্তর :** আসলে আয় বাড়াতে হলে অন্যায় করতে হয় না। আয় বাড়াতে হলে আপনাকে সেবা দিতে হবে। আপনি সেবার পরিমাণ যত বাড়াতে পারবেন আপনার আয় তত বাড়তে থাকবে। আর দ্রব্যমূল্য কমানো আসলে একটা ভ্রান্ত ধারণা। পৃথিবীতে দ্রব্যমূল্য কোনোদিন কমে নি। ১৯৭০ সালে চালের কেজি ছিলো ১২ আনা। ২৭ টাকা থেকে ৩০ টাকা ছিলো মণপ্রতি চালের দাম। এখন যদি কেউ বলে চাল ৩০ টাকা মণ করে দেবে, তাহলে সেটা হবে অলীক চিন্তা। কারণ প্রত্যেকটা জিনিসের মূল্য বেড়েছে। এর সাথে তারাই তাল মেলাতে পারবেন যারা তাদের ক্রয়ক্ষমতাকে বাড়াতে পারবেন। আয় বাড়ানো ছাড়া এই মূল্যবৃদ্ধি মোকাবেলা করার বিকল্প কোনো পথ নেই। কারণ ঘড়ির কাঁটাকে পেছন দিকে নিতে পারবেন না।

যারা দাম কমাতে চান তারা শায়েস্তা খাঁর শাসনামল নিয়ে গর্ব করেন। শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। কিন্তু টাকায় আট মণ চাল কেনার সামর্থ্য কতজনের ছিলো? সেই সময়ে কৃষকেরা খাবারের

অভাবে তাদের মেয়েদেরকে বাজারে এনে বিক্রি করতো। ইবনে বতুতার বিবরণ থেকেই পাওয়া যায়, তখন টাকায় দুজন দাসী পাওয়া যেত। অর্থাৎ একজন নারীর দাম ছিলো আট আনা। তাহলে টাকায় আট মণ চালেও কোনো লাভ নেই যদি আট মণ চাল একটাকা দিয়ে কেনার মতো টাকা না থাকে। অতএব আপনাকে ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে হবে এবং এটা সম্ভব যদি আপনি আপনার সেবার পরিমাণ বাড়িয়ে দেন।

আসলে কেউ যখন সৎপথে উপার্জন করে তখন তার সে উপার্জনে বরকত থাকে। থাকে প্রশান্তি। আমাদের এক সহপাঠী ছিলো। তার বাবা খুব ছোট সরকারি চাকরি করতেন। তখন সরকারি চাকরিতে সাতটা থেকে দুইটা পর্যন্ত অফিস ছিলো। এটা ষাটের দশকের কথা। তিনি দুপুরে বাসায় এসে খাওয়া দাওয়া করে আবার বেরিয়ে যেতেন। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে গেঞ্জি লুঙ্গি গামছা বিক্রি করতেন। প্রত্যেকদিন চাকরি শেষে এটা ছিলো তার কাজ। তার তিন মেয়ে এখন প্রফেসর। ছেলেও প্রতিষ্ঠিত। তার পাশাপাশি আরেকজন পদস্থ অফিসার। তার ছেলেদের দেখতাম খুব জাঁকজমকের সাথে চলতে। যদিও তার চাকরিতে যে বেতন হওয়ার কথা তাতে এতটা জৌলুস থাকার কথা নয়। তার ছেলে-মেয়ে কেউ মানুষ হয় নি। কারণটা পরে বুঝেছি, তা হলো তার ঘুষের পয়সা।

অন্যায় পথে পা বাড়াবেন না। প্রকৃতি অত্যন্ত নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণকারী। অন্যায়ের প্রতিফল আপনি পাবেনই। আজ কাল বা পরশু-যেকোনো দিন। পাপের ঘট পূর্ণ হলে আপনার রক্ষা নেই। সম্রাসীদের জীবন দেখুন, কত করুণ! অনেক টাকাপয়সা নাড়াচাড়া করে তারা। কিন্তু জীবনে কি শান্তি আছে তাদের! না মরণে শান্তি পেয়েছে! কুলি থেকে আন্ডারওয়াল্ডের বস হয়ে ওঠা ডাকাত শহীদ ক্রস ফায়ারে মারা যাওয়ার পর লাশ দুদিন মর্গে পড়ে ছিলো। আপন ভাইও গ্রামের বাড়িতে লাশ নিয়ে যায় নি কবর দেয়ার জন্যে। কেন? লোকে বলবে-এই বাড়িতে ডাকাত শহীদের কবর রয়েছে। আবার আকিজ মিয়ার জীবন দেখুন। জীবন শুরু করেন বিড়ি শ্রমিক হিসেবে। মৃত্যুর সময় রেখে গেছেন আকিজ গ্রুপের মতো বিশাল সাম্রাজ্য। তাই সঠিক পন্থায় পরিশ্রম করুন। সাফল্য আসবেই।

**প্রশ্ন :** বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক কিংবা বিসিএস-এর মতো সম্মানজনক চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রায়শই অনিয়ম ঘটে। বঞ্চিত এসব প্রার্থীর কষ্ট কান্না কখনো কখনো প্রবোধ মানতে চায় না। যে শিক্ষকের কারণে কিংবা

পিএসসি-র মেম্বারের কারণে বঞ্চিত হলাম, তাদেরকে যদি ক্ষমার প্রশ্ন আসে তাহলে কি তা আমার জন্যে খুব সহজ হবে? এইসব শিক্ষক কিংবা মেম্বারও ফাউন্ডেশন কোর্স কিংবা রিয়েলাইজেশন কোর্স করে খুবই সজ্জন ব্যক্তিতে পরিণত হবে। আমার পক্ষে কি তাদের সাথে আত্মার বন্ধন গড়ে তোলা সম্ভব হবে? অবৈধভাবে নিয়োগ পাওয়া ব্যক্তির যখন ফাউন্ডেশন কোর্সে ৪র্থ দিন গভীর মানসিক শান্তি লাভের অনুভূতি ব্যক্ত করে ফাউন্ডেশনের সকল কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আগ্রহ ব্যক্ত করছেন-আমি কীভাবে তার সাথে একাত্ম হবো?

**উত্তর :** প্রতিটি প্রতিকূলতা, প্রতিটি সমস্যা নতুন সুযোগ, নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসে। জীবন সবসময় সহজ পথে চলে না। জীবন কিন্তু রেল লাইন না। জীবন হচ্ছে ঝর্না, জীবন হচ্ছে নদী। জীবন রাজপথ না, জীবন হচ্ছে আঁকাবাঁকা পথ। যারা রাজপথে চলে তাদের জীবনে অনেক সময় কোনো অর্জনই থাকে না। কারণ যে অর্জনের ভিত্তি দুর্বল সেটা কখনো স্থায়ী হয় না। যে অর্জনের ভিত্তি অন্যায় সেই অন্যায় কখনো প্রশান্তি দিতে পারে না।

আর আপনার চাকরি যত সম্মানজনক হোক সবসময় মনে রাখবেন যে, চাকরি মানে হচ্ছে আপনি তার চাকর। যদি সেটা মিশন না হয়। আর এই চাকরি যদি আপনি না-ও করতে চান আপনার বড় হওয়ার পথে কোনো অসুবিধা নেই। বাংলাদেশে সফল মানুষদের কজন চাকরি করেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা কত? ১০ হাজার, ১৫ হাজার বা ২০ হাজার হবে। বিসিএস অফিসার কতজন? খুব বেশি হলে ৫০ হাজার। সব মিলিয়ে ধরলাম এক লাখ। এই এক লাখ মানুষই কি সফল মানুষ? এর বাইরে কি সফল মানুষ নেই? এর বাইরে কি খ্যাতিমান মানুষ নেই? এর বাইরে কি বিত্তবান মানুষ নেই? এর বাইরে কি শক্তিমান মানুষ নেই? বরং এর বাইরেও সফল খ্যাতিমান বিত্তবান শক্তিমান মানুষ আছে। তাদেরকে মানুষ চেনে বেশি। তাদের পরিচিতি বেশি, অর্থ বেশি, খ্যাতি বেশি, সম্মান বেশি।

পশ্চিম বাংলার মূখ্যমন্ত্রী ছিলেন জ্যোতি বসু। জ্যোতি বসু তো আইসিএস পরীক্ষা অর্থাৎ ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন। তার সাথে যারা পাস করেছে তাদের কয়জনের নাম আপনি বলতে পারবেন? কিন্তু জ্যোতি বসুর নাম শোনে নি বা জানেন না এরকম মানুষ খুব কম আছেন। অতএব চাকরি না হওয়ায় আপনি ব্যর্থ হন নি। আরেকজনের হয়ে গেছে, হোক না। আপনি আরো অনেক কিছু হতে পারেন। আপনার সম্ভাবনা



অনেক। যারা প্রচলিত পথে যেতে পারে না, অপ্রচলিত পথে গিয়ে তারা অনেক অনেক বেশি সফল হয়েছেন।

আমাদের অর্গানায়ারদের মধ্যে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হন নি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে চলে এসেছেন। তাদের জীবন কি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের চেয়ে কম সম্মানজনক? জীবন কিন্তু অনেক বড় যদি জীবনকে সেভাবে দেখতে পারেন, যদি এই ক্ষোভটা পুষে না রাখেন তাহলে দেখবেন, জীবনে আপনার অনেক কিছু করার আছে। আসলে মানুষকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করে তার এই ক্ষোভ—এটা পেলাম না কেন? এই যে পেলাম না কেন—এই নেতিবাচক অনুরণন আপনার ভেতরে হচ্ছে। এটা অন্য বড় প্রাপ্তির পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়।

আপনি শোকর আলহামদুলিল্লাহ বলুন যে, আমার মামা নেই, চাচা নেই, শোকর আলহামদুলিল্লাহ! আমার টাকা নেই, টাকা দেয়ার সুযোগ নেই। আবার টাকা দিলেও যে সুযোগ হতো তা-ও কিন্তু নয়। যদি জায়গামতো দিতে না পারেন তখন টাকাও যাবে, ছালাও যাবে। আর সবসময় মনে রাখবেন—চোরের দশ দিন, গৃহস্থের একদিন। পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে—বিজি প্রেসের কম্পোজিটর রংপুরে ১২ তলা বাড়ি করেছে। ঢাকায় ১০ তলা বাড়ি করেছে প্রশ্নপত্র নকল করে। তার সাথে আবার পিএসসির মেম্বারও নাকি যুক্ত আছে। ঐ মেম্বার সাহেবের সম্মানের এখন কী হবে? অন্যায় যখন করবেন, অন্যায়ের শাস্তি আপনাকে পেতে হবে। আজ কাল অথবা পরশু।

আর, ক্ষমা হলো মহত্ব। আপনি যখন আপনার শত্রুকে, যার দ্বারা আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাকে ক্ষমা করতে পারবেন, তখনই আপনি মহৎ হবেন। এই ক্ষমার শিক্ষাটাই হচ্ছে ধ্যানের শিক্ষা। ওহুদের সংঘর্ষে খালিদ বিন ওয়ালিদের জন্যেই মুসলমানরা পরাজিত হয়েছিলো। রসুলুল্লাহ (স)-এর দন্ত মোবারক শহীদ হওয়া থেকে শুরু করে এত সাহাবীর যে শাহাদাৎ হলো, এর পেছনে মূল কারণ কিন্তু খালিদ বিন ওয়ালিদের রণ কৌশল। সেই খালিদ বিন ওয়ালিদ যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন তখন রসুলুল্লাহ (স) কি তাকে ক্ষমা করেন নি? ক্ষমা করেছেন।

আসলে যেকোনো মানুষ যেকোনো অবস্থায় যেকোনো ভুল করে যদি অনুতপ্ত হয়, অনুশোচনা করে এবং সেই কাজ থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেয়, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। কারণ অনুশোচনাকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন। আপনি যত তাড়াতাড়ি ক্ষমা করতে পারবেন তত ভালো থাকবেন। যারা অবৈধভাবে নিয়োগ পেয়েছে, তারাও যদি বৈধ হয়ে যায়, তারাও যদি

ভালো কাজ করে, ভালো কাজকে আমরা সবাই সমর্থন করবো।

আর ব্যক্তিগত জীবনে কোনোকিছু না পাওয়ার কারণে কোনো ক্ষোভ রাখবেন না। কারণ এই ক্ষোভটা আপনার ক্ষতির কারণ হবে। ক্ষোভ থেকে যত দূরে থাকবেন তত আপনার সম্ভাবনাকে বিকশিত করতে পারবেন।

সেজন্যে আমরা বলবো যে, যত দ্রুত সম্ভব ক্ষমা করে দিন এবং নিজের জীবনের পথটাকে বেছে নিন যে, এটা হয় নি, এখন আমার বিকল্প কী? এখন আমার কী কী সম্ভাবনা রয়েছে? দ্রুত সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্যে আপনি উদ্যোগী হোন, আপনি সফল হবেন। আমি তো সবসময় মনে করি যে, কোয়ান্টাম সদস্যের কোনো কিছু না হওয়া মানে বুঝতে হবে যে, এটার মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। স্রষ্টা চান যে, আপনার দ্বারা আরো বড় কিছু হোক, যেটাকে আপনি সম্মানজনক মনে করছেন এর চেয়ে বড় কিছু আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে, যদি আপনি আপনার ক্ষোভটাকে বের করে দিতে পারেন। শর্ত হচ্ছে একটাই, ক্ষোভ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তাহলে আপনি আপনার সম্ভাবনাকে খুব চমৎকারভাবে কাজে লাগাতে পারবেন।

**প্রশ্ন :** আমি একজন ডেন্টাল টেকনোলজিস্ট। সরকারি চাকরি করছি। সরকারি হাসপাতালে আমি যে কাজটি করি বা সরকার আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে সে কাজটি বাইরে আমাকে করতে বৈধতা দিচ্ছে না। আমি প্রাইভেট প্র্যাকটিসের কথা বলছি। এক্ষেত্রে আমি কী করতে পারি?

**উত্তর :** এখানে একটা হচ্ছে নৈতিকতার প্রশ্ন, আরেকটা হচ্ছে আইনের প্রশ্ন। আপনার স্বীর সাথে যে আচরণটা বৈধ, আরেকজনের স্বীর সাথে সেই আচরণ যদি আপনি করতে যান সেটা তো বৈধ হবে না। এটা হচ্ছে আইনের প্রশ্ন। সরকারি চাকরি যদি করেন তাহলে সরকার যে কাজের জন্যে পয়সা দিচ্ছে, যে কাজের বৈধতা দিয়েছে, সে কাজই করতে হবে, সেই কাজই করা উচিত। আমরা মনে করি নীতিগতভাবে সরকারি কর্মচারীদের কোনোরকম প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা উচিত না। সরকারি কর্মচারীদের বেতন এমন পরিমাণ হওয়া উচিত যাতে তাদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বা অন্য কোনোকিছু করার প্রয়োজন না হয়। একজন ডাক্তার, যিনি বিসিএস ক্যাডারে যোগ দিয়েছেন—তার নিজের ভরণ-পোষণের জন্যে, ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার জন্যে যাতে বাইরে আর কিছু করতে না হয় এরকম বেতন-স্কেল হওয়া উচিত।

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, আমাদের সিস্টেমটাই এমন যা আমাদের অনেক

কিছু করতে বাধ্য করে। একজন পুলিশ কনস্টেবলের বেতন কত? একজন রিকশাওয়ালা দিনে উপার্জন করে কত? একজন রিকশাওয়ালার উপার্জন একজন পুলিশ কনস্টেবলের উপার্জনের চেয়ে অন্তত দুইগুণ বেশি। অথচ তাকে ক্ষমতা দিয়েছেন অনেক। পুলিশ কনস্টেবলকে রিকশাওয়ালার বেতনও দেন না, তাহলে সে করবেটা কী?

অতএব যদি নিয়মের ব্যাপার বলেন, নিয়ম খুব পরিষ্কার। আর যদি বাধ্যবাধকতার কথা বলেন যে, আমি যা বেতন পাচ্ছি তা দিয়ে আমার চলছে না। আপনাকে তো চলতে হবে। সেখানে যদি মানুষের কল্যাণ করেন তাহলে দোষের কিছু দেখি না। তবে আইন বাঁচিয়ে করবেন। আইন যদি বৈধতা না দেয় তাহলে তো আবার আইনের ফাঁকে পড়ে যাবেন।

**প্রশ্ন :** আমি ৪,৩৫০ টাকা মাসিক বেতনে চাকরি করলেও তিন বছর চাকরি জীবনে সাত লক্ষ টাকার বাড়ি, ১০টি ডিপিএস, অনেক সঞ্চয়পত্র এবং অনেক টাকা ব্যাংকে জমা হয়। অন্যায় করে আমার আত্মীয়-পরিজনের ২৯ জনকে চাকরি দেই, যারা পাঁচ বছর অফিস না করেই বেতন নিয়েছে। যেহেতু তারা সবাই ছাত্র ছিলো—ক্লাস করার মাঝে অফিস না করার ব্যবস্থা করেছিলাম। বিয়ের আগের দিন প্রতিজ্ঞা করি এমন অন্যায় আর করবো না। পরে ওই চাকরি ছেড়ে দেই। দুই লাখ ২০ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নেই। এখন প্রশ্ন হলো, আমার হারাম উপার্জনকে কীভাবে হালাল করবো? এক আলেম বলেছেন তওবা করলেও নাকি আমি মাফ পাবো না, যেহেতু আমার সব জমা টাকা অন্যের। বর্তমান চাকরির টাকাও নাকি হারাম, যেহেতু ঘুষ দিয়ে চাকরি হয়েছে। এই দুর্নীতির টাকা দিয়ে নাকি হজ করলেও কবুল হবে না। অবশ্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে এমনটি দরকারও ছিলো। হারাম উপার্জনকারীর তওবার ধরন কী? বিস্তারিত জানালে আমিসহ আমার মতো অনেকেই উপকৃত হবে।

**উত্তর :** বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি, তা-ও দুই লাখ ২০ হাজার টাকা ঘুষে! আমাদের সমাজে এখন সিস্টেমটাই এরকম। কেউ বাধ্য হয়ে ঘুষ খায়। কেউ ঘুষকে ঘুষ মনে না করেই ঘুষ খায়। সে মনে করে যে, এটা তার পাওনা। কারো মনে অনুশোচনা হয়। অধিকাংশের মনে অনুশোচনা হয় না। সবসময় মনে রাখবেন, অতীতকে আপনি কখনো ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। কিন্তু ভবিষ্যৎ আপনার হাতের মধ্যে।

কৃতকর্মের জন্যে আপনি তওবা করুন। তওবা কবুল করার মালিক আল্লাহ। এবং আল্লাহ কার তওবা কবুল করবেন, কার তওবা কবুল করবেন না—এ ব্যাপারে ফতোয়া দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। তবে অনুশোচনাটা অন্তর থেকে হতে হবে। সেইসাথে বেশি বেশি দান করুন এবং সিদ্ধান্ত নিন যে, মানুষের কল্যাণে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করবেন। কখনো কারো অমঙ্গল করবেন না এবং যতটা পারবেন কল্যাণ করবেন। তারপরে কবুল করার মালিক আল্লাহ। আপনার অনুশোচনা, আপনার সংকর্ম আল্লাহ যেকোনো সময় কবুল করতে পারেন।

## ফাউন্ডেশন যখন পেশা

**প্রশ্ন :** আমি অনার্স তৃতীয় বর্ষের একজন ছাত্র। আমার ইচ্ছা ভবিষ্যতে কোনো সেবামূলক সংস্থায় চাকরি করবো। বর্তমানে একটি সংস্থার সাথে জড়িত। আমি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সাথে জড়িত হতে চাই এবং এটাকে ভবিষ্যৎ লক্ষ্য হিসেবে নিতে চাই। আমার অবশ্য এ পর্যন্ত ব্লাড ক্যাম্প ছাড়া আর কিছু করার সৌভাগ্য হয় নি। আমি কি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে লক্ষ্য হিসেবে নিতে পারবো? পারলে কীভাবে এগুবো?

**উত্তর :** যেকোনো তরুণ-তরুণীর জন্যে ফাউন্ডেশনকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করার চেয়ে ভালো লক্ষ্য আর কিছু হতে পারে না। এতে তিনি একাধারে নিজেকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ পাচ্ছেন, অন্যদিকে আলোকিত মানুষ গড়ার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারছেন। নিজের সময় ও মেধার সর্বোত্তম ব্যবহারের এত চমৎকার সুযোগ অন্য কোথাও আছে কিনা আমি জানি না। পেশা যখন মিশন হয়, তখন স্ট্রেস ও যুগ-যন্ত্রণা উধাও হয়ে যায়।

**প্রশ্ন :** কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে চাকরি করতে হলে আমাকে কী প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে?

**উত্তর :** ফাউন্ডেশনের দরজা সবার জন্যে উন্মুক্ত। যেকোনো তরুণ বা তরুণী এটাকে মিশন হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। ফাউন্ডেশনকে যদি আপনি মিশন হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন, ফাউন্ডেশন যদি আপনার ভালবাসা হয়, তাহলে

সম্মান-সম্মানী সবকিছুই আপনি পাবেন। কারণ এখনকার যুগে একজন তরুণ বা তরুণীর জন্যে এর চেয়ে সম্মান অন্য কোনো পেশায় পাওয়া খুব কঠিন। ফাউন্ডেশনের একজন অর্গানিয়ার যে সম্মান পান অন্য যেকোনো পেশার অনেক বড় কর্তাও হয়তো তা পান না। এখানে যে কাজের পরিবেশ অন্য কোথাও এরকম কাজের পরিবেশ পাওয়া খুব দুরূহ ব্যাপার।

আর যদি মনে করেন যে, এটা সরকারি চাকরির মতো চাকরি, তাহলে আপনার মানিয়ে নেয়াটা কষ্টকর হতে পারে। কারণ একজন অর্গানিয়ারের কমিটমেন্ট হচ্ছে যেকোনো সময় যেকোনো স্থানে যেকোনো কাজ। কাজপ্রেমিক ছাড়া, কাজটাকে মিশন হিসেবে নেয়া ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এটা সম্ভব নয়। আর এ দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে ফাউন্ডেশনে এসেও দেখা যাবে যে, এডজাস্ট করতে না পেরে নিজেই চলে যাচ্ছেন। তবে আমরা আনন্দিত যে, ফাউন্ডেশনে যারা আছেন তাদের অধিকাংশই অত্যন্ত মেধাবী এবং তারা পরিতৃপ্ত-সম্মানের দিক থেকে, সম্মানীর দিক থেকেও। সম্মানী যা-ই হোক তার বরকত অনেক বেশি। আর একটা সময় আসবে যখন ফাউন্ডেশনে যোগ দেয়াটাই হবে ক্যারিয়ারের প্রথম পছন্দ।

**প্রশ্ন :** আপনি বলেছিলেন, আপনারা কাজের লোক পান না। আপনাদের কাজটা কী? কোথায় গিয়ে করতে হবে? বেতন আছে কি নেই? কাজের যোগ্যতাই বা কী? সব জানানোর জন্যে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা কাজ করতে চাই।

**উত্তর :** খুব ভালো। আপনি যে কাজের উপযুক্ত ফাউন্ডেশন আপনাকে সে কাজ দিতে পারে। আপনি যদি বাডু দেয়ার উপযুক্ত হন, বাডু দেয়ার সুযোগ রয়েছে, আর আপনি যদি কাউন্সিলর হওয়ার যোগ্য হন, আপনার কাউন্সিলর হওয়ার সুযোগ রয়েছে। যে কাজের জন্যে আপনি উপযুক্ত, সে কাজ ফাউন্ডেশন আপনাকে দিতে পারে। আর ফাউন্ডেশনে কাজের যদি কোনো সম্মানী না থাকে, যদি কাজ করে কিছু পাওয়া না যায় তাহলে আমরা বেঁচে আছি কীভাবে?

ফাউন্ডেশনে কাজের কোনো শেষ নেই। যখন আমরা ফাউন্ডেশন গড়ি তখন আমাদের দায়িত্বশীলরা ভাবতেন, কী কাজ করবো। আজ তারা এত ব্যস্ত যে, অন্য কোনো চিন্তা করার সময় তাদের নেই। আর ১০ বছর পরে কী অবস্থা হবে সেটা চিন্তা করুন। এখন তো একই দিনে তিন/চারটা প্রোগ্রাম

হয়, তখন একই দিনে ৩০/৪০টা প্রোগ্রাম হবে। একটা সময় দেখা যাবে, লক্ষ লোক আমাদের কাজ করছেন। মানুষকে আলোকিত করার জন্যে দলে দলে মিশন নিয়ে বিদেশে যাচ্ছেন। অতএব যারা কাজ করতে চান, সত্যিকারের মেহনত করতে চান-সময় আছে, সময় দিতে চান, ফাউন্ডেশন তাদের জন্যে সবসময় উন্মুক্ত।

**প্রশ্ন :** একজন আইটি এক্সপার্ট হিসেবে কাজের প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও একাধিকবার প্রতারণিত হয়েছি। ফাউন্ডেশনকে ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে হলে কী ধরনের যোগ্যতা ও প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন? আমার দক্ষতা-অভিজ্ঞতাকে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে জনকল্যাণে লাগাতে চাই। কী করতে হবে?

**উত্তর :** ফাউন্ডেশনের সাথে যোগাযোগ করবেন। কারণ ফাউন্ডেশন সবসময় প্রতিশ্রুতিশীল প্রতিভাবান তরুণ-তরুণীদেরকে খোঁজ করে। যিনি সেবা করতে পারবেন, যিনি আন্তরিকভাবে মানুষকে সেবা দিতে চান, তার জন্যে ফাউন্ডেশনের দরজা উন্মুক্ত। কারণ আমরা অনেক কাজ করতে পারছি না শুধু আন্তরিক লোকবলের অভাবে।

তবে ফাউন্ডেশনের কাজ অবশ্যই ডেডিকেটেড কাজ। কাজ যিনি ভালবাসতে পারবেন, ফাউন্ডেশন তার জন্যে। যিনি কল্যাণ চিন্তা করেন, ফাউন্ডেশন তার জন্যে।

ভবিষ্যৎ কী? আমাদের অর্গানাইজারদের মধ্যে কেউ কেউ টাকা ইউনিভার্সিটিতে যোগদান না করে এখানে এসেছেন। বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির চাকরি ছেড়ে এখানে এসেছেন। ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশন ছেড়ে এসেছেন। মেডিকেল প্রফেশন থেকে এসেছেন। তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আর ইউ হ্যাপি অর নট? সবকিছুর মূল্যায়ন অর্থের মানদণ্ডে হয় না। তৃপ্তি দিয়ে হয়।

৩০ হাজার টাকা বেতন পেয়ে যদি ৪০ হাজার টাকা খরচ হয়, তাহলে ১০ হাজার টাকা ঘাটতি। আর ১৫ হাজার টাকা বেতন পেয়ে যদি দুই হাজার টাকা সঞ্চয় হয় তাহলে দুই হাজার টাকা উদ্ধৃত। এটা হচ্ছে বরকত। ফাউন্ডেশনে যারা কাজ করেন তাদের জীবনে এই বরকত এবং রহমতটা অনেক অনেক বেশি। অতএব যেকোনো তরুণ-তরুণীর জন্যে ফাউন্ডেশন উন্মুক্ত। তবে এর জন্যে নিজেকে যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

যারা ছাত্র, ক্লাসে প্রথম হোন। প্রথম সারিতে থাকুন। নিজেকে গড়ে

তুলুন। যত কোয়ান্টিয়ার রয়েছে তাদেরকে আমরা সবসময় বলি, পরীক্ষা বাদ দিয়ে, ক্লাস বাদ দিয়ে ফাউন্ডেশন নয়। ফাউন্ডেশন হচ্ছে পরীক্ষা এবং ক্লাসসহ—সেখানে প্রথম হতে হবে। মানুষকে সেবা করার জন্যে সত্যিকারের আন্তরিক মনোভাব থাকতে হবে, মানুষের জন্যে ভালবাসা থাকতে হবে।

যখনই কোনো পেশা ভালবাসায় রূপান্তরিত হয় তখন সেখানে একজন মানুষ তার মেধার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটাতে পারে। সেটা যেকোনো পেশা হোক। আপনি যদি আপনার পেশাকে ভালবাসেন, আপনি যদি আপনার শিক্ষকতাকে ভালবাসেন, আপনি যদি আপনার মেডিকেল প্রফেশনকে ভালবাসেন, আপনি যদি সেবা দিতে চান—আন্তরিকভাবে সেবা দিন। আপনার মেধা চূড়ান্তভাবে বিকশিত হবে। আপনি সেখানে ভালো করবেন। কারণ আমাদের দেশে দক্ষ লোকের অভাব প্রকট। আমরা চাই যে, শুধু ফাউন্ডেশন না, আমাদের তরুণ-তরুণীরা সমাজের সমস্ত জায়গায় যাবে এবং তারা দক্ষতার সাথে কাজ করবে, প্রত্যেকটা কাজে নেতৃত্ব দেবে। আপনি অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার—আপনার যোগ্যতা এমনভাবে সৃষ্টি করতে হবে যে, ১০ জন ইঞ্জিনিয়ারের নাম যদি নিতে হয়, আপনি যাতে সেই ১০ জনের একজন হতে পারেন। আমরা এমন তরুণ-তরুণীই চাই। এই দক্ষতা চাই, এই যোগ্যতা চাই। আপনি যোগ্যতা ডেভেলপ করুন। দুনিয়ার কোথাও আপনার কাজের কোনো অভাব হবে না।

**প্রশ্ন :** ফাউন্ডেশনে একাত্ম হতে হলে কি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে জয়েন করতে হবে? যারা কোয়ান্টামে জয়েন করবে তারা কি আর্থিকভাবে সচ্ছল হবে? ফাউন্ডেশনের বেতনের টাকায় তারা কি হজ যাকাত বা নিয়মিত দানের সামর্থ্য লাভ করবে?

**উত্তর :** অনেক সময় রিজিকদাতা বলতে আমরা আমাদের চাকরি, চাকরি প্রতিষ্ঠান বা অনেক সময় ব্যক্তিকে মনে করি বা ব্যবসাকে মনে করি। ব্যবসা বা চাকরি বা প্রতিষ্ঠান—এটা রিজিকের একটা সূত্র। এটা কিন্তু রিজিকদাতা নয়। রিজিকদাতা হচ্ছেন আল্লাহ। ফাউন্ডেশনে যারা অর্গানিয়ার হিসেবে আছেন প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করুন—কারো কোনো ঋণ আছে কি না। জিজ্ঞেস করুন তাদের অভাব আছে কি না।

তাদের সহপাঠী—যারা ৪০/৫০ হাজার, ৬০/৭০ হাজার টাকা বেতন পাচ্ছেন—মাসে অত বেতন পেয়েও তারা ঋণগ্রস্ত, অসুস্থ। তারা ঈর্ষা করেন

ফাউন্ডেশনের এই অর্গানিয়ারদের, তাদের এই বন্ধুদের যে, তোরা এত ভালো আছিস কীভাবে? এত ভালো থাকিস কীভাবে? আমি তো এত টাকা পেয়েও এই খারাপ অবস্থা। এই অসুখ-বিসুখ, এইটা সেইটা।

একজন মানুষ ৬০ হাজার টাকা উপার্জন করে তার যদি মাসে ৮০ হাজার টাকা খরচ হয় তাহলে সে প্লাসে থাকছে না মাইনাসে থাকছে? আর একজন যদি ১০ হাজার টাকা উপার্জন করে তার নয় হাজার টাকা খরচ হয় বা ১৫ হাজার টাকা উপার্জন করে যদি ১২ হাজার টাকা খরচ হয় তাহলে সে প্লাসে থাকছে নাকি মাইনাসে থাকছে? তো প্লাসে থাকাটা উপার্জন না মাইনাসে থাকা উপার্জন? আর আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি যে, যাকাত আদায় বা অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে দান করার সামর্থ্য আমাদের অর্গানিয়ারদের আছে। হজ যাদের ওপর ফরজ হয়েছে, তাদের অনেকেই ইতোমধ্যে হজ করেছেন।

## সেলিব্রেটি ক্যারিয়ার

**প্রশ্ন :** এখনকার তরুণ-তরুণীদের একটা বড় অংশই শোবিজ জগতের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। মডেলিং বা আরজে/ ডিজে অথবা রিয়েলিটি শো-তে অংশ নেয়ার নামে এরা যে জীবনের দিকে ঝুঁকছে তা কতটা অর্থপূর্ণ?

**উত্তর :** আসলে এখনকার তরুণ-তরুণীদের এই যে ক্রেজ-এটা অধিকাংশের জন্যেই ক্ষতিকর হচ্ছে। কারণ যেসব তরুণ-তরুণী এসব মডেলিং বা আরজে/ ডিজে-র নামে শোবিজ জগতে ব্যস্ত হচ্ছে, তাদের অধিকাংশই এক পর্যায়ে নিজেদেরকে পণ্য ছাড়া আর কোনোকিছু ভাবতে পারে না। কারণ এটা ভাবতে না পারলে তারা টিকে থাকতে পারবে না।

যেমন, এমনও নায়িকা বা মডেল আছেন যার মা তাকে খেতে দিতে চান না। ঘরের ফ্রিজে তালা দিয়ে রাখেন যাতে মেয়ে তাকে না জানিয়ে এমন কিছু খেয়ে ফেলতে না পারে যাতে তার ওজন বেড়ে যাবে। কারণ ওজন বাড়লে তার সৌন্দর্য কমবে, পরিচালকরা তাকে কম পছন্দ করবে। দর্শক চাহিদা কমবে। অতএব খিদেয় কষ্ট পেলেও তাকে না খেয়েই থাকতে হবে অস্থিচর্মসার থাকার জন্যে। এই মায়ের কাছে তার মেয়ে একটি পণ্য ছাড়া আর কিছু নয়, সে তার কাছে পয়সা উপার্জনের একটি মাধ্যম মাত্র।

পয়সার জন্যে তারা কী না করছে? এই যে তারকারা বিজ্ঞাপনের মডেল হচ্ছেন-সবচেয়ে বড় মেগাস্টার-হরেক রকম পণ্যের জন্যে যেভাবে মডেল



হন, তাতেই বোঝা যায়, পয়সার জন্যে তারকারা যেকোনো কিছুই পক্ষেই বলতে পারে।

আবার এর আরেকটা দিকও আছে। আমরা ভাবি, শোবিজ জগতে গেলেই বোধ হয় কাঁড়ি কাঁড়ি উপার্জন করা যাবে। আসলে কিন্তু তা নয়। একেকজন স্টার-বলিউড বা হলিউডের যে নায়ক-নায়িকাদের দেখে আমরা মোহিত হই, আমরা তাদের রূপালি জীবনের চাকচিক্যটাই শুধু দেখি, কষ্ট বা অধ্যবসায়ের বিষয়গুলো দেখি না। আর এর ফলে যা হয়েছে, আমাদের এখনকার উঠতি তারকাদের একটা বড় অংশ কিছুদিন পরেই ঝরে যাচ্ছে।

এই যে আমাদের দেশে ‘তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ’ বা ‘সুপারস্টার’ নামে যে রিয়েলিটি শো-গুলো হচ্ছে এগুলোর মধ্য দিয়ে প্রতিবছর যে তারকারা বেরিয়ে আসছে তাদের কী অবস্থা? বিজয়ী হওয়ার পর অমুক বিজ্ঞাপন, তমুক চলচ্চিত্র, এই এম্বাসেডর, সেই বিদেশ সফর, প্রাইজ মানি, গাড়ি, ফ্ল্যাট ইত্যাদি ডামাডোলে তারা এতই আপ্ত হয়ে যাচ্ছে যে, এরপর আর নিজেদেরকে গড়ে তোলার প্রয়োজন তারা বোধ করছে না। ফলে হারিয়ে যাচ্ছে। আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে এই রিয়েলিটি শো-র মধ্য দিয়ে কজন তারকা বিকশিত হয়েছে?

আসলে এরা একবার মিডিয়ার হাওয়া পেলেই মনে করে-হয়ে গেছি! এখন যেভাবে পারো কামাও। মেধাকে শাণিত করার জন্যে সাধনা করার সময় ও সুযোগ-কোনোটাই এরা পায় না। ফলে রঙিন ফানুসের মতো কিছুক্ষণ পর মিলিয়ে যায়। বাস্তবতা হচ্ছে, এখনকার শোবিজরা সের্গেই আইজেনস্টাইন, আলফ্রেড হিচকক, সত্যজিৎ রায়, মোস্তফা আক্বাদ, জহির রায়হান, মেহদী হাসান, লতা মুঙ্গেশকরের মতো কালজয়ী প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারছেন না। আসলে পাওয়ার জন্যে ছুটে কখনো কালজয়ী হওয়া যায় না। কালজয়ী হতে হলে দেয়ার জন্যে ছুটতে হয়, সাধনায় লীন হতে হয়।

## ক্যারিয়ার ॥ সঠিক ধারণা

**প্রশ্ন :** দিনরাত পরিশ্রম বা কাজটাই জীবন মনে করতে না পারলে সাধারণত পর্যাপ্ত আয় করা যায় না। আবার পর্যাপ্ত আয় না থাকলে পেশায় উন্নতি করার মতো মানসিক প্রশান্তি থাকে না। জীবিকা ও কর্মজীবনের মধ্যে পার্থক্য কী? এর মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকলে তা থেকে মুক্তির উপায় কী?

**উত্তর :** আমাদের পেশা সংক্রান্ত ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি একসময় নিয়ন্ত্রিত হতো ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা। এখন আমাদের ক্যারিয়ার সংক্রান্ত সমস্ত ভাবনা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে স্বাধীনতার পর থেকে যে শ্রেণী কালোবাজারি ও লুটপাট করে প্রচুর সম্পদের মালিক হয়েছে তাদের দ্বারা। এই দুর্বৃত্তদের একটি বড় অংশ ব্যবসা ও রাজনীতির সাথে জড়িত এবং এদের লুটপাটের সহযোগী অনেক বেসামরিক-সামরিক আমলা। এই পয়সাওয়ালাদের দুই নম্বরী জীবনযাপন দেখে এবং সেই সাথে '৯০-এর দশক থেকে মিডিয়া ও পণ্যদাসত্বের প্রভাবে ক্যারিয়ার হয়ে উঠেছে শুধু অর্থ উপার্জনের মাধ্যম।

তাদের কাছে ক্যারিয়ার হচ্ছে অনেক উপার্জন করতে পারা আর বহুভাবে জৈবিক ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকতে পারা। অর্থাৎ শুধু বৈষয়িক চাহিদা পূরণ নয়, পূরণের পর যত উদ্ভূত রাখা যায় সে হচ্ছে তত সফল। যেমন, আমার একটা বাড়ি দরকার। একটার বেশি দুটো বাড়িতে তো আমি থাকতে পারবো না। কিন্তু আমার ১৫টা ম্যানশন আছে, ৩০টা ভিলা আছে। কী করবো ৩০টা ভিলা দিয়ে? কিন্তু আছে, এটাই আমার সাফল্য।

এখন আমাদের অধিকাংশেরই ক্যারিয়ার সংক্রান্ত একমাত্র লক্ষ্য-একটি তথাকথিত সম্মানজনক পেশায় যত কম সময়ে যত বেশি সম্ভব অর্থ উপার্জন করা। আমরা ডাক্তার হয়ে বড় হাসপাতালে পাঁচ লাখ টাকা বেতনের চাকরি করার স্বপ্ন দেখি, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কমিশন পেতে চাই অথবা এমবিএ করে গুরুত্বই লাখ টাকা বেতনের চাকরি চাই। সেটা যখন পারি না তখন হতাশ হয়ে পড়ি।

একসময় শিক্ষকদের মধ্যে যথেষ্ট তৃপ্তি ছিলো। কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষকদের মধ্যে তৃপ্তি নয় বরং হতাশাই দেখা যায়। বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা আরো বেশি। কিন্তু একসময় শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নয়, প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যেও তৃপ্তি ছিলো। তিনি শিক্ষক-এই আনন্দই তাকে পরিতৃপ্ত রাখতো। কিন্তু এখন কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া শিক্ষকদের কারো মধ্যেই তৃপ্তি নেই। কারণ তাদের কাছে শিক্ষকতা কোনো মিশন নয়, এটা একটা চাকরি। তারা মনে করছেন যে, অন্য চাকরিতে বেশি উপার্জন করার সুযোগ আছে। তারা বেশি উপার্জন করতে পারছেন না, তাই তারা হতাশ হয়ে পড়ছেন।

আবার যারা প্রচুর উপার্জন করছেন তারাও শান্তিতে নেই। কারণ এখন পেশাগত সাফল্যের যে সংজ্ঞা সে অনুযায়ী সফল হতে গেলে জীবনের অন্য সবদিককে অগ্রাহ্য করে টেড টার্নারের মতো অফিসে পড়ে থাকতে হবে।

ব্যবসা করতে হলে মানুষের দেহে পশুর মাথা বসাতে হবে, অর্থাৎ নিজের মানবিকতাকে বিসর্জন দিতে হবে। মানসিক প্রশান্তি স্বাস্থ্য পরিবার-সবকিছুই হারাতে হবে। যে কারণে সাইকোলজি টুডে-তে প্রকাশিত একটি জরিপে দেখা গেছে, প্রতি পাঁচজনে একজন সিইও বিষণ্ণতায় ভোগেন। বহু সিইও আত্মহত্যাও করেছেন।

তাই জীবিকা কখনো ক্যারিয়ার বা কর্মজীবন হতে পারে না। কর্মজীবন আরো অনেক ব্যাপক। কর্মজীবন হলো-আমার মৃত্যুসংবাদ আমি কীভাবে দেখতে চাই, অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করে পরিতৃপ্তির সাথে মারা যাওয়া।

এর জন্যে প্রয়োজন এমন পেশা নির্বাচন করা-যে পেশার গন্তব্য আছে, অর্থাৎ যে কর্ম পার্থিব কল্যাণ এবং পারলৌকিক কল্যাণ দিতে পারে। আমি যা-ই করি, সেটা দিয়ে আমি যতটুকু সম্ভব মানুষের কল্যাণ করবো এবং আমার মেধাকে আমি সর্বোত্তম পর্যায়ে ব্যবহার করবো। এবং সেই সেবার প্রতিদান আমি পাবোই।

একজন ডাক্তার যদি শুধু দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে ফেলেন যে, আমি এই রোগীর সেবা করবো, সে তো এমনিতেই ফিস দেবে। যেমন আমাদের দেশের একজন প্রখ্যাত ডাক্তার তার চেম্বারে সাইনবোর্ড লাগিয়ে রেখেছেন যে, আর্থিক অসুবিধা থাকলে নিঃসংকোচে বলুন। অর্থাৎ টাকার অভাবে একজন চিকিৎসা করাতে এসে আমার কাছে চিকিৎসা পাবে না-এটা যদি হয়, তাহলে আমি আমার ডাক্তারি পেশার অবমাননা করলাম।

দ্বিতীয়ত, জীবনে যতগুলো দিক আছে সবগুলো দিকের মধ্যে ব্যালেন্স করে চলা। আমি বিয়ে করলাম না, আলাদা ব্যাপার; কিন্তু বিয়ে করে আমেরিকাতে থাকলাম, শুধু উপার্জন করলাম, আমার পরিবার-পরিজন এখানে থাকলো, আমার ছেলেকে আমি মানুষ করতে পারলাম না। সেটা ব্যালেন্স করা হলো না।

অর্থাৎ আমার কর্মজীবনকে এমনভাবে সাজাতে হবে, যেটা আমার মেধাকে বিকশিত করবে, পারিবারিক কল্যাণ করবে, সামাজিক কল্যাণ করবে এবং যে কাজের প্রতিদান আমি দুনিয়াতে পাবো এবং আখেরাতেও পাবো। এটিই হচ্ছে সফল ক্যারিয়ার এবং এটিই হচ্ছে সফল কর্মজীবন।

**প্রশ্ন :** আমরা সাধারণত পড়াশোনা শেষ করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে মেধার স্বীকৃতি মনে করি। প্রকৃতপক্ষে জীবনে মেধার বিকাশ ও মেধার

স্বীকৃতি বলতে আমাদের কী বোঝা উচিত? আমি যদি প্রচুর টাকা উপার্জন করতে চাই কিন্তু আমার উদ্দেশ্য যদি হয় তা কল্যাণকর কাজে খরচ করা ও সমাজে নিজের শক্ত ভিত্তি রাখা ও নিজে স্ট্যান্ডার্ড লাইফ লিভ করা তাহলে অসুবিধা আছে কি না। টাকা অর্জনের মূল উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত?

**উত্তর :** আমরা আসলে এই ডিল্যুশনে সবসময় ভুগি যে, অনেক টাকাপয়সা উপার্জন করবো, তারপর সৎকর্ম করবো। এই উদ্দেশ্য নিয়ে অধিকাংশ তরুণ তার জীবন শুরু করে। কিন্তু টাকাপয়সা উপার্জন করতে গিয়ে সে টাকাপয়সার নেশায় পড়ে যায়। তখন কোনো পরিমাণ টাকাই তার কাছে যথেষ্ট মনে হয় না। সে মনে করে আরো উপার্জন করবো, আরো বড় কাজ করবো। এবং টাকা উপার্জন করতে করতে এমন সময় আসে যখন ভালো কাজ বা সেবামূলক কাজ আর করা হয় না।

অতএব দুটো কাজই পাশাপাশি করতে হবে। যদি সেবামূলক কিছু করতে চাই তাহলে চিন্তাটা শুরু করতে হবে কাজ দিয়ে, টাকা দিয়ে নয়। আমার কী আছে, আমি কী সেবা দিতে পারি। আর যদি টাকাপয়সা উপার্জন করে ভোগ-বিলাসে জীবন কাটাতে চাই সেটা ভিন্ন কথা। আপনি যেভাবে পারেন টাকা উপার্জন করুন। কিন্তু অনেক উপার্জন করলেই যদি সেবা করা যেত তাহলে বাংলাদেশের সমস্ত ধনকুবেরই সেবক হয়ে যেত। কারণ তরুণ বয়সে তাদেরও হয়তো এরকম স্বপ্ন ছিলো। অতএব আপনাকে পরিষ্কার হতে হবে যে, আপনি টাকা চান, না সেবা করতে চান।

আসলে জীবনে মেধার বিকাশ হচ্ছে—আমি যে কাজটা করতে ভালবাসি, যে কাজটা অন্যের জন্যে কল্যাণকর সে কাজে আমি আমার দক্ষতা সৃষ্টি করতে পারছি কি না। যেমন আমি কবিতা পড়তে ভালবাসি কিন্তু আমি কবিতা লিখতে পারি না, এক্ষেত্রে কবি হিসেবে আমার মেধার বিকাশ হলো না। কিন্তু আবার যদি আমি কবিতার সমালোচনা ভালো লিখতে পারি, তাহলে সমালোচক হিসেবে আমার মেধার বিকাশ হলো।

আর সাধারণত হীনম্মন্য লোকরাই স্বীকৃতি খুঁজে বেড়ায়। কারণ স্বীকৃতি খোঁজা অর্থহীন। আমি স্বীকৃতি খুঁজছি—এর অর্থ হলো, আমি যে ভালো কাজ করছি এ ব্যাপারে আমার আস্থার অভাব আছে।

**প্রশ্ন :** আমি যে জব করছি সেটা আমার জন্যে অত্যন্ত হালকা কাজ হয়ে গেছে। আরেকটু ভারী কাজ দরকার। বেতন অত্যন্ত আকর্ষণীয় হওয়ায়

ছাড়তেও ইচ্ছে করছে না। কারণ সমবেতন এবং ভালো কোম্পানির আরেকটি জব পাওয়া সময়ের ব্যাপার। আমি জব স্যাটিসফেকশন পাচ্ছি না। কাজগুলো বোরিং লাগে। আমার কী করা উচিত?

**উত্তর :** এটা তো খুব চমৎকার। আপনি হালকা কাজে ভারী বেতন পাচ্ছেন, আপনি হালকা কাজই করুন। আর যে সময়টুকু বেঁচে যাচ্ছে সে সময়টুকুকে কাজে লাগান। আসলে কর্মজীবন বা ক্যারিয়ার মানে তো শুধু পেশা না। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের অবদানের সমষ্টি আমাদের কর্মজীবন। যেমন, ছায়ানটের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত ওয়াহিদুল হক পেশায় ছিলেন একজন সাংবাদিক। কিন্তু তার পেশার বাইরের কাজ অর্থাৎ ছায়ানটের প্রতিষ্ঠাই তাকে স্মরণীয় করেছে। আপনিও বাকি সময়টুকুতে মানুষের জন্যে কাজ করুন। আর এ কাজে ফাউন্ডেশন তো আছেই। দেখবেন আপনি তৃপ্তি পাচ্ছেন।

**প্রশ্ন :** আমি একজন চাকরিজীবী। পেশা-বাসা-ফাউন্ডেশন-এর সাথে কীভাবে সমন্বয় করবো?

**উত্তর :** এটা সম্ভব। চাকরির একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে। কখনো কখনো এটা নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে চলে যায়। কিন্তু এটা যদি অতিরিক্ত বাইরে চলে যায় এবং এটা যদি আপনার মিশনের সাথে সংযুক্ত না হয় তখন এটা আপনার মধ্যেই একটা হতাশা সৃষ্টি করবে।

তাই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় হওয়া উচিত—আমরা যে পেশাতেই যাই, সে পেশাতে দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি যাতে আমি আমার মিশনের জন্যে, জীবনের জন্যে, সন্তানের জন্যে, ফাউন্ডেশনের জন্যে সময় দিতে পারি। বাসাকে ব্যালেন্স করতে পারি। তা না হলে হয়তো টেড টার্নারের মতো হয়ে যেতে হবে, জীবনে অর্থ থাকবে কিন্তু প্রশান্তি থাকবে না। কারণ বস্তু কখনো স্থায়ী তৃপ্তি দিতে পারে না।

বস্তুগত সাফল্যের পাশাপাশি আমরা সবসময় খেয়াল রাখবো—এটা আমার আত্মাকে কলুষিত করছে কি না। আমার আত্মা অবহেলিত কি না। যদি আমার আত্মা অবহেলিত হয়, সেটাতে আসলে শান্তি পাবো না। অতএব, সবসময় ব্যালেন্স করতে হবে।

# সাফল্যের চোরাবালি



## অপচয় ॥

### অপচয় কী? কেন?

**প্রশ্ন :** বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্র দেশ বলে পরিচিত হলেও এক শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রা এতই বিলাসবহুল যে, এ বক্তব্য বিশ্বাস করা শক্ত। আমার এক আত্মীয় আছে। পাঁচতারা হোটеле বন্ধুদের নিয়ে নিয়মিত বুফে ডিনারে মাথাপিছু তার যে ব্যয় হয় তা দিয়ে অনায়াসে একটি ১০ সদস্যের পরিবারের সারা মাসের খাওয়া খরচ মিটে যাবে। এ বিলাসিতা কতটা গ্রহণযোগ্য?

**উত্তর :** দুর্দশার একটি প্রধান কারণই হচ্ছে এ অপব্যয় বা অপচয় প্রবণতা। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বুঝি না যে, যেটাকে আমরা ব্যয় মনে করছি, তা আসলে অপব্যয়। ব্যক্তিগতভাবে যেমন এটি সত্যি, জাতিগতভাবেও তা সত্যি। যেমন বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নামে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হলেও বিদ্যুৎ ব্যবস্থার তেমন কোনো উন্নতি হয় নি। কারণ এ টাকাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যয় করা হয়েছে অপরিকল্পিতভাবে, অপ্রয়োজনীয় খাতে। যেমন কোথাও হয়তো বৈদ্যুতিক খুঁটি স্থাপন করা হয়েছে কিন্তু সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোনো ব্যবস্থা করা হয় নি। আবার কোথাও হয়তো ব্যয়বহুল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে কিন্তু যথাযথ ট্রান্সমিশন লাইন তৈরি হয় নি।

শিক্ষাখাতেও একই অবস্থা। অনুদান বা সরকারি সাহায্যে বিশাল এবং ব্যয়বহুল সব স্কুল বা কলেজ বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে পড়ানোর কোনো শিক্ষক নেই। ফলে তালাবদ্ধ হয়ে পড়ে আছে বা বাসাবাড়ি হিসেবে দখল হয়ে আছে এসব ব্যয়বহুল ভবনগুলো।

আমাদের দেশে অপচয় প্রবণতা সম্ভবত অবিশ্বাস্যরকম বেশি। যে কারণে এদেশে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান অবিশ্বাস্যরকমভাবে বাড়ছে। আমাদের দেশের একজন খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলিকুজ্জমান কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে এসে বলছিলেন, সরকারি হিসেবে ১৯৯১-৯২-এ ধনীর আয় ছিলো দরিদ্রের আয়ের ১৮ গুণ বেশি, ৯৫-৯৬-এ এটা হয় ২৭ গুণ বেশি, ২০০০ সালে হয় ৪৬ গুণ বেশি এবং ২০০৫ সালে ৮৪ গুণ বেশি। অর্থাৎ মাত্র ১৫ বছরে ১৮ গুণ থেকে ৮৪ গুণে রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ যার কম আছে তার আয় আরো কমছে, যার বেশি আছে, তার আয় আরো বাড়ছে। এটাই হলো অপচয়ের পরিণতি।



আসলে যে জাতি অপচয়ে এবং বিলাস-ব্যসনে লিপ্ত হয়েছে, তারাই একসময় হতদরিদ্র এবং অসহায় অবস্থায় নিপতিত হয়েছে। ইতিহাসে এর ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে।

মুঘল বাদশাহদের বিলাসিতার কথা সর্বজনবিদিত। সে সময়কারই একজন নবাবের বাবুর্চি নিয়োগ করা হবে। নতুন বাবুর্চি হিসেবে যাকে নিয়োগ দেয়া হলো সে এসে প্রথম যে কাজটি করলো তা হলো, রান্নাঘর থেকে ১০ মণ ঘি নর্দমায় ফেলে দিলো।

সবাই তো ভীষণ অবাক, ক্ষুব্ধ। নালিশ গেল নবাবের কাছে। নবাব শুনে ক্রুদ্ধ হলেন না, তার শাস্তির ব্যবস্থা করলেন না। তিনি শুধু বললেন, ঠিক আছে, আরো ১০ মণ ঘি তাকে পাঠিয়ে দাও।

বাবুর্চি তখন বললো, হাঁ, এ নবাবের চাকরি আমি করবো। কারণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা জ্বাল দিয়ে ঘন করে ঘি-এর নির্যাস দিয়ে যে আমি রান্না করবো তা সরবরাহ করার সামর্থ্য এ নবাবের আছে। আর এটা পরীক্ষা করার জন্যেই আমি নর্দমায় ঘি ফেলে দিয়েছি। এতে যদি তিনি ক্রুদ্ধ হতেন, তাহলে বুঝতাম আমি আমার পছন্দমতো বিলাস-ব্যসনে রান্না করতে পারবো না। সেক্ষেত্রে তার বাবুর্চির চাকরি করাও আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। অর্থাৎ এ নবাবদের বাবুর্চিও কতটা বিলাসী ছিলো।

এই রাজা-বাদশাহদের পরিণতিও কিন্তু খুব করুণ। ৭০-এর দশকে ভারতের দিল্লি এবং কলকাতায় শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের দুজন অধস্তন পুরুষকে পাওয়া গেল। একজন ধোপার কাজ করে, আরেকজন টানা রিকশা চালায়।

অথচ যে জাতি বা যে দেশগুলো এখন বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে এই একটি ক্ষেত্রে তারা সবসময় সচেতন-হিসেব সচেতনতা এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় থেকে বিরত থাকা। আর যারা সেটি পারে নি সেসব বিশাল বিশাল জনপদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে তাদেরকে পরিচালিত করছে এসব ক্ষুদ্র জনসমষ্টির দেশ বা জাতিগুলো।

তাই ব্যক্তিগতভাবে বা জাতিগতভাবে যতক্ষণ না এ অপচয়গুলোকে শনাক্ত করে তা থেকে মুক্ত হওয়া যাবে, ততক্ষণ ব্যক্তি এবং জাতির জীবনে সমৃদ্ধি আসবে না, প্রশান্তি আসবে না।

**প্রশ্ন :** অপচয়ের প্রবণতাটি তো আসলে বড়লোকদের ব্যাপার। আমাদের মতো ছা-পোষা মানুষেরা কীভাবে অপচয় করবে?

**উত্তর :** আসলে অপচয়ের ব্যাপারটি এত ব্যাপক এবং সূক্ষ্ম যে, শুধু উচ্চবিত্ত নয়, নিম্নমধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তদের মধ্যেও এ প্রবণতা রয়েছে। একজন গার্মেন্টস মালিকের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, তার কর্মীদের আয়ের একটা বড় অংশই প্রতিমাসে চলে যায় তার প্রতিষ্ঠানের নিচের তলায় যে ছবি তোলার স্টুডিওটি রয়েছে সে দোকানে নিজেদের ছবি তুলে।

চা-শ্রমিকদের জীবনও একইরকম। সপ্তাহ শেষে যে মজুরি এ শ্রমিকরা পায়, সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফেরার পথে তা নিয়ে সে প্রথমে ঢোকে রাস্তার পাশে মদের দোকানে। মদ এবং জুয়ার পেছনে সব পয়সা খরচ করে শেষ রাতে শূন্য হাতে সে বাড়ি ফেরে। বাধ্য হয়ে পরদিন তাকে চাল-ডাল কিনতে হয় ধার করে। যে কারণে চা-শ্রমিকরা কখনো ঋণমুক্ত থাকতে পারে না, সবসময়ই তাকে চলতে হয় ধারকর্জ করে। তারা কখনো শ্রমিক-জীবন ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না। বংশ-পরম্পরায় তারা সবাই চা-শ্রমিক। কারণ শ্রমিক, সাপ্তাহিক উপার্জন, মদের দোকান এবং পরদিন আবার শ্রমিক-এই চক্রেই ঘুরপাক খাচ্ছে তারা।

আমাদের এখনকার সমাজেও এই একই বাস্তবতা। মনে হয় যে, ধনীরাই বোধ হয় শুধু অপচয় করে। ধনীরা দৃশ্যত অপচয় করলেও অনেক ক্ষেত্রেই আসলে তা তাদের বিনিয়োগ। কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত মানুষ মিডিয়ার চটকদার বিজ্ঞাপনে প্রলুব্ধ হয়ে অপ্রয়োজনীয় যে ব্যয় করে ফেলে, তার পুরোটাই তার অপচয়।

ইদানীং এ অপচয়ের জ্বলন্ত উদাহরণ হলো, মোবাইল ফোনের দৌরাত্ম্য। ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাই ছুটছে এ মোবাইলের পেছনে। কিন্তু প্রভাবটা গরিবের ওপর যেমন, ধনীর ওপরে তো তা নয়।

আমাদের দেশে এখন মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় সাত কোটি। ১৫ কোটি মানুষের দেশে সাত কোটি অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক মানুষের কাছে মোবাইল আছে। মোবাইলের হয়তো কিছু কার্যকারিতা আছে। সহজ যোগাযোগ, ব্যবসা, তথ্যের আদান-প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা হয়েছে। কিন্তু সবক্ষেত্রে কি তা-ই?

বিশেষত, তরুণ সমাজের একটা বড় অংশ যেভাবে এখন মোবাইল-আসক্ত হয়ে পড়েছে তা কি তাদের জন্যে কল্যাণকর হচ্ছে? অহেতুক আড্ডা, এসএমএস, অপ্রয়োজনীয় সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া এবং সময় অপচয় করে পড়াশোনা নষ্ট-এসবের একটা বড় কারণই হচ্ছে এই মোবাইল।

কেন তার মোবাইল লাগবে? কারণ সে তার ক্লাসের বন্ধুদের দেখেছে

তাদের হাতে হাতে খুব দামি মোবাইল সেট। টিভিতে বিজ্ঞাপনে দেখছে মোবাইল থাকলে এটা হয়, সেটা হয় ইত্যাদি। ফলে অনেক সময় সামর্থ্য না থাকলেও মা-বাবাকে বাধ্য করে মোবাইল কিনে দিতে, কখনো বা বাসা থেকে টাকা চুরি করে মোবাইল কেনে।

এমনও হয়েছে—মা অন্যের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালায়, তাকেও তার স্কুলপড়ুয়া ছেলের চাপে বাধ্য হয়ে ধার করে মোবাইল কিনে দিতে হয়েছে এবং এর মাধ্যমে গরিবের কষ্টার্জিত অর্থ কিন্তু চলে যাচ্ছে ধনীর পকেটেই। ফলে গরিব আরো গরিব হচ্ছে এবং ধনী হচ্ছে আরো ধনী।

অর্থাৎ নিজের অজান্তেই অপচয়-অপব্যয়ে জড়িয়ে কোটি কোটি টাকা আমরা তুলে দিচ্ছি বহুজাতিক কোম্পানির বিদেশি মালিকগোষ্ঠীর কাছে এবং এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে আমাদের অজ্ঞতা বা অবিদ্যা। পাঁচ টাকা দিয়ে চীনাবাদাম না খেয়ে আমরা ১৫ টাকা দিয়ে চিপস খাই। বাসায় পাঁচ টাকার আলু দিয়ে যে ফ্রেঞ্চফ্রাই তৈরি করা যায়, তা ৮০ টাকা/ ১০০ টাকা দিয়ে কিনে খাই ফাস্টফুড শপে। কারণ আমরা ভাবি, এতেই বোধহয় পুষ্টি বেশি, ফুটানি বা আভিজাত্য বেশি।

**প্রশ্ন :** কেউ মারা গেলে মৃতের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে ৪০ দিন পর খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়। এটি কি অপচয়? বিকল্প কী করা যেতে পারে?

**উত্তর :** এই যে মৃতের উদ্দেশ্যে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন-ধরুন, এক হাজার লোক মিলে খাওয়া-দাওয়া করলো। কেউ খুশি হলো, কেউ অখুশি হলো, রান্না ভালো, না মন্দ—এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হলো, কে কী পেলো, না পেলো তা নিয়ে মন-কষাকষি হলো—এসবের ফলে মৃতের আত্মার শান্তি হয় কি না ভেবে দেখুন। বরং এসব হই-হুল্লোড়, ঝগড়া-ফ্যাসাদ তার অশান্তিকেই হয়তো বাড়িয়ে দেয়।

আসলে মৃতের প্রতি উৎসর্গীকৃত সৎকর্ম ও দোয়াই তার আত্মাকে শান্তি দিতে পারে। একজন বলছিলেন, তার মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গ্রামে মেজবানি অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়ার প্রচলন ছিলো প্রতিবছর। এবার তিনি গ্রামবাসীকে বললেন, তারা রাজি হলে এ বছর মেজবানিতে যা খরচ হতো তা দিয়ে তিনি একটি টিউবওয়েল বসাতে চান। গ্রামবাসীরা সম্মুখে হাঁ বললো। বসানো হলো একটি ডিপ টিউবওয়েল, যা থেকে গ্রামবাসী বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহের সুযোগ পেলো।

এটাই সদকায়ে জারিয়া, অর্থাৎ ঐ টিউবওয়েল থেকে যতদিন যত মানুষ পানি পাবে, ততদিন এর সওয়াব ঐ মৃতের নামে লেখা হতে থাকবে। এটিই মৃতের আত্মার প্রকৃত শান্তি বিধানের পথ।

**প্রশ্ন :** প্রয়োজন আর অপচয়-এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করবো কীভাবে?

**উত্তর :** প্রয়োজন আর অপচয়-এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করা খুব সহজ। আপনার পোশাকের কথাই ধরুন-পোশাক সবসময় আপনার পরিবেশের উপযোগী হওয়া উচিত। সর্বহারাদের সমাবেশে আপনি বজ্রুতা করতে যাচ্ছেন। সেখানে ছেঁড়া জামাকাপড় পরে আপনি হয়তো যেতে পারেন। কিন্তু কোনো পাঁচতারা হোটেলে আপনি ওসব পরে ঢুকতেই পারবেন না।

আবার আপনার জুতো প্রয়োজন। কিন্তু যদি মনে করেন, এ জুতোয় ডায়মন্ড বসানো থাকতে হবে, শার্টের বোতাম সোনার তৈরি হতে হবে, তাহলে এটা বাহুল্য-অপচয়। আপনার ১০/২০ সেট জামা থাকতে পারে। যখন নতুন কিনবেন, পুরনোগুলো যা আপনি আর পরবেন না, অভাবীদের দিয়ে দিন। কিন্তু যদি ২০০ সেট জমিয়ে রাখতে চান, সেটা হবে অপচয়।

আসলে প্রয়োজন আর অপচয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারলে কী হয়, সম্প্রতি জাতিসংঘের একটি রিপোর্টে তার এক করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে ‘টেকসই উন্নয়ন’ বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলনে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বে প্রতিবছর ১৩০ কোটি টন খাদ্য বিনষ্ট হয়। এটা বিশ্বে মোট উৎপাদিত খাদ্যের এক-তৃতীয়াংশ। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি নষ্ট হয় ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশগুলোতে। প্রতিবছর সেখানে ২২ কোটি ২০ লাখ টন খাবার ভালো ও তাজা অবস্থায় ফেলে দেয়া হয় যা গোটা সাব-সাহারা অঞ্চলে একবছরে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যের প্রায় সমান-২৩ কোটি টন।

‘এভয়ডিং ফিউচার ফ্যামিনস’ বা ভবিষ্যৎ দুর্ভিক্ষ এড়ানোর উপায় শীর্ষক এ প্রতিবেদনটির ওপর একটি খবর প্রকাশিত হয় ২৬ জুন, ২০১২-দি টাইমস অফ ইন্ডিয়ায়। এতে বলা হয়, ‘বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ যখন না খেয়ে থাকছে, উন্নত বিশ্বের মানুষ তখন বছরে মাথাপিছু ৯৫ থেকে ১১৫ কেজি খাবার নষ্ট করছে। সামষ্টিক পর্যায়ে এ হিসাবটা আরো বেশি-২৮০ থেকে ৩০০ কেজি। শুধু শিল্লোনুত দেশগুলোই বছরে নষ্ট করে ৬৭০ মিলিয়ন টন খাবার যার মধ্যে রয়েছে সবজি থেকে গুরু করে ফলমূল পর্যন্ত।

পরিবহনের সময় পথে অথবা ভোক্তার নিজের হাতেই ফেলে দেয়া এসব খাবার কখনো ঐ ক্ষুধার্ত মানুষগুলোর কাছ পর্যন্ত যায় না।

জরিপে দেখা যায়, মধ্য ও উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে খাওয়ার উপযোগী থাকা সত্ত্বেও খাবার ফেলে দেয়ার প্রবণতা উল্লেখযোগ্য। আমেরিকায় কেনা খাবারের ২৫ শতাংশই ফেলে দেয়া হয়। অন্যদিকে মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়া এবং মার্কেটিং অফারের ফাঁদে পড়ে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কেনার কারণে ব্রিটিশরা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ খাবার ফেলে দেয়। শিল্লোনুত দেশগুলোতে ৪০ শতাংশের বেশি খাদ্যই নষ্ট হয় খুচরা বিক্রি ও ভোক্তা পর্যায়ে।

নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে কি অপচয় হয় না? হয় এবং তা শিল্লোনুত দেশের চেয়ে খুব একটা কমও নয়—বছরে ৬৩০ মিলিয়ন টন। তবে সেটা মূলত খাদ্য সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাবে। যেমন, যথাযথভাবে গুদামজাত না করার কারণে বা সঠিক প্রক্রিয়াকরণের অভাবে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ফসল তোলার পর প্রক্রিয়াকরণের অভাবে ৪০ শতাংশ খাদ্য নষ্ট হয়ে যায়। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি নষ্ট হয় চাল। এছাড়াও সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের সময় নয় থেকে ১৫ ভাগ বিনষ্ট হয়। আর মাছ কেনার পর ভোক্তাদের বাড়িতে নষ্ট হয় ছয় থেকে আট ভাগ। এ ধরনের খাদ্য বিপর্যয় রোধে কেন্দ্রীয় খাদ্য সংরক্ষণাগার, সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থা এবং বাজার সুবিধা গড়ে তোলার সুপারিশ করা হয়েছে।

অর্থাৎ খাদ্যের কোনো অভাব নেই। অপচয় সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা গেলে, প্রয়োজনের অতিরিক্তের ব্যাপারে ব্যক্তিক এবং সামষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা গেলে, খাদ্যাভাব বা দুর্ভিক্ষ বলে পৃথিবীতে কোনোকিছু থাকবে না।

**প্রশ্ন :** মেয়েদের পোশাকের ক্ষেত্রে দামের কোনো সীমা কি নির্ণয় করা উচিত? সেটা কত হতে পারে? আমার যদি কোনো পোশাক খুব পছন্দ হয় এবং আমি বুঝি, আমি সেটা বহুদিন ধরে বহুবার খুব এপ্রিশিয়েট করে ব্যবহার করবো, তাহলে কি একটু দাম দিয়ে হলে আমি সে পোশাক কিনতে পারি? রেস্টুরেন্ট বা পোশাকের খরচ একটা নির্দিষ্ট সীমার বেশি হলে মোট খরচের একটা নির্ধারিত অংশ আমরা মাটির ব্যাংকে দেই। এটা কি ভালো করছি, নাকি নিজের অপচয়কে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করছি?

**উত্তর :** পোশাক আসলে সবসময় স্থান-কাল এবং ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানানসই হওয়া উচিত অর্থাৎ সামাজিক এবং পেশাগত অবস্থানের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হতে

হবে। যখন যেখানে অবস্থান করছেন বা যাচ্ছেন তার সঙ্গে মানানসই হওয়া উচিত। যেমন, বিয়েবাড়ির সাজ আর মৃতের বাড়িতে যাওয়ার সাজ-পোশাক সঙ্গত কারণেই আলাদা হবে। আবার কাঁচাবাজারে যাওয়ার পোশাক আর টেলিভিশন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের পোশাক অবশ্যই এক হবে না।

এই স্থান-কাল বিবেচনায় রুচিসম্মত পোশাক সে দামেই কেনা উচিত যা যুক্তিসঙ্গত এবং গ্রহণযোগ্য, যা অযৌক্তিকভাবে চড়া দামের নয় এবং লোক দেখানো বা ফুটানি করার জন্যেও নয়।

**প্রশ্ন :** আমার স্ত্রী গয়না পরতে ভালবাসে, যদিও সে হিজাব পরে। কিন্তু জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী বা ঈদের সময় তাকে সোনার চেইন আংটি চুড়ি ইত্যাদি দিলে সে খুব খুশি হয়। এগুলো কি অপচয়?

**উত্তর :** স্ত্রীকে গয়না কিনে দিতে বাধা নেই। যত পারেন কিনে দিন, যাতে পরে তিনি সেটার যাকাত আদায় করতে পারেন।

**প্রশ্ন :** দোকানদারদের সাথে দরদাম করতে ইচ্ছা হয় না। পাঁচ-দশ টাকা বেশি দামে কিনে ফেলি। এটা কি অপচয়?

**উত্তর :** দোকানদারদের বেশি দিয়ে লাভ কী? বরং দরদাম করলে যদি পাঁচ-দশ টাকা বাঁচানো যায়, তাহলে কেন দরদাম করবেন না? আসলে দরদাম করে কিনতে পারাও একটা আর্ট এবং দক্ষতার পরিচয়। আর ঠাকার মধ্যে কোনো কৃতিত্ব নেই।

**প্রশ্ন :** ভোগবাদিতা শুধুই কি নেতিবাচক? ইতিবাচক দিক কি নেই? যেমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অর্থনৈতিক মন্দায় ভুগে। যার একমাত্র কারণ সে সময় আমেরিকার বিশাল ভোক্তাবাজার। বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীও কি একইভাবে ভোক্তাবাজার তৈরির মাধ্যমে দেশকে সমৃদ্ধ করতে পারে না? আমার যুক্তি কি সঠিক?

**উত্তর :** আপনার যুক্তিতে বড় রকমের ফাঁক রয়েছে। কারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারত বা এশিয়ার দেশগুলোও কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। এর কারণ তাদের

দেশের ক্রেতাধিক্য নয়। বরং এর কারণ হলো এদেশগুলোতে সরাসরি যুদ্ধ হয় নি অর্থাৎ এ দেশগুলো যুদ্ধক্ষেত্র ছিলো না। কিন্তু যে দেশগুলো যুদ্ধক্ষেত্র ছিলো—যেমন, ইউরোপের দেশগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

একইভাবে আমেরিকাও ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি, কারণ আমেরিকায় যুদ্ধ হয় নি। বরং তাদের দেশের সৈন্যরা অন্যান্য দেশে গিয়ে যুদ্ধ করেছে। যেখানে ধ্বংসযজ্ঞের কারণে যুদ্ধের পর পুরো জার্মানিতে একটি ইটও আস্ত ছিলো না, ফ্যাক্টরি বিল্ডিং তো দূরের কথা—সেখানে আমেরিকার কোনো শিল্পকারখানা ধ্বংস হয় নি। সোভিয়েত ইউনিয়নেও তা-ই। কাজেই যে দেশগুলোতে অর্থনীতিই নেই, কোনো শিল্পকারখানা নেই, উৎপাদন, বাণিজ্যের কোনো সুযোগ নেই, সেখানে মন্দা ছাড়া আর কী থাকবে? অতএব আপনার এ ধারণাটা ভুল যে, ভোক্তাবাজার ছিলো বলে তারা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নয়।

আর তাছাড়া ভোক্তার জন্যে পণ্য কতটা কল্যাণকর তা-ও দেখতে হবে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোই এখনকার বিশ্ববাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাদের তৎপরতার ফলে অনেক প্রয়োজনীয় উপকরণ খুব সুলভে বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে, তেমনি এ সুযোগে অনেক ক্ষতিকর পণ্যও ঢুকে পড়েছে বিভিন্ন দরিদ্র দেশে এবং ভোক্তাদেরকে প্রলুব্ধ করেছে।

দরিদ্র ভোক্তারা তাদের সীমিত ক্রয়ক্ষমতা দিয়েই কিনছে লোভনীয় এসব পণ্য আর ভোগের নেশায় মত্ত হচ্ছে। যেমন, সিগারেট বা কোমল পানীয়—আপাত তৃপ্তিকর হলেও এগুলোর রয়েছে গুরুতর শারীরিক, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষতি। আর মুনাফার ভাগীদার হচ্ছে এই বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। কিন্তু আমরা মনে করছি, নিত্যনতুন ভোগ্যপণ্যে দেশ সয়লাব হবে আর এতেই বুঝি সমৃদ্ধ হবে দেশের অর্থনীতি!

**প্রশ্ন :** গুরুজী, আপনি পণ্যের কথা বললেন। আমি নতুন নতুন জামা কিনতে ও পরতে বেশ ভালবাসি। এটা কি খুব বাড়াবাড়ি? মার্কেটে গেলে নতুন কিছু কিনতে ইচ্ছে করে। মার্কেটে না গিয়ে পারি না। এমতাবস্থায় আমার স্বামী আমার ওপর খুব বিরক্ত। আমি কী করতে পারি? জামার নেশা, ব্যাগ-স্যান্ডেলের নেশা কমে না, কী করবো?

**উত্তর :** আপনি মনের বাড়িতে একটা শপিং সেন্টার বানিয়ে নিন। প্রত্যেকদিন ওখানে গিয়ে আগে জামাকাপড় কিনে সেটা পরবেন। পরার পর সেটা আবার লামায় পাঠিয়ে দেবেন—আমার তো পরা হয়েছে, এবার বধিগতরা এটা ব্যবহার

করুক। কিছুদিন যখন নিয়মিত জামাকাপড় কিনে লামায় পাঠাতে থাকবেন— দেখবেন, কেনার প্রতি আকর্ষণও তখন কমে এসেছে। এভাবে প্রতিদিন প্রচুর কেনাকাটা করুন। করতে করতে দেখবেন আপনার বিরক্তি চলে আসবে, কেনাকাটার প্রতি আগ্রহ কমে যাবে।

আর যেকোনো কাজে যখন বাধা দেয়া হয় তখন উৎসাহটা বেশি হয়। বাধা না দিয়ে আপনার স্বামীর বলা উচিত, কত জামা কিনবে তুমি আজকে! এ মাসে আমি খাওয়া-দাওয়া করবো না, বাজার করবো না, অন্যকিছু কিনবো না। যা টাকা আছে তা দিয়ে শুধু তোমার জামাকাপড় কিনে দেবো। ইচ্ছামতো কেনো। একটা না, পাঁচটা সেট কেনো। একই সেট বিভিন্ন রঙের কেনো। মানে, সব টাকা দিয়ে সারামাসে শুধুই স্ত্রীর কেনাকাটা। এতে হয়তো কাজ হতে পারে।

আমরা বলি, মহিলাদের ২০ সেটের বেশি জামাকাপড় না থাকা ভালো। অনেকে অহেতুক পোশাক জমিয়ে রাখেন। এমন পোশাকও হয়তো আছে যা দ্বিতীয়বার কখনো পরবেন না, কিন্তু আছে। এগুলো বিতরণ করে দিন। দেখবেন যে, আসক্তি থাকবে না। আসলে কেনার ব্যাপারে সংযমী হতে হবে। কোনোকিছু যদি আপনি অতিরিক্ত করেন তা ভালো না। কারণ, স্রষ্টা বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না, সীমালঙ্ঘনকারী, অমিতব্যয়ীকে পছন্দ করেন না।

**প্রশ্ন :** টাকা থাকলেই কি খরচ করা যায়?

**উত্তর :** টাকা থাকলেই খরচ করা যায় না। অপচয় করা যায়, কিন্তু খরচ করা যায় না। একবার এক লোক লটারিতে এক মিলিয়ন পাউন্ড পেয়েছে। লটারির উদ্যোক্তারা খোঁজ নিয়ে জানলো, বিজয়ী একজন দরিদ্র ব্যক্তি। তারা মনে করলো, এরকম একজন হতদরিদ্রকে যদি হঠাৎ করে এক মিলিয়ন পাউন্ড লটারি জেতার খবর দেয়া হয়, সে হার্টফেল করতে পারে। কাজেই তারা দেশের একজন খুব বড় সাইকোলজিস্টকে নিয়োগ করলো, যার কাজ হলো তাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা যাতে এক মিলিয়ন পাউন্ড জেতার খবর শুনে সে চমকে না যায়।

সাইকোলজিস্ট একদিন-দুইদিন তার সাথে যোগাযোগ করলো। তাকে বোঝাতে লাগলো, আচ্ছা, তুমি যদি এখন ১০০০ পাউন্ড পেয়ে যাও তুমি কী করবে? দরিদ্র লোকটি বললো—এই করবে, সেই করবে। এরপর জিজ্ঞেস করলো যে, এক লক্ষ পাউন্ড পর্যন্ত পেলে সে কী করবে? এই-এই করবে।



তারপর তৃতীয়দিন তাকে বলা হলো, এই লটারিতে তো তুমি অংশ নিয়েছিলে। ধর, তুমি যদি জ্যাকপটটা জিতে যাও অর্থাৎ এক মিলিয়ন পাউন্ড যদি তুমি পেয়ে যাও তাহলে কী করবে? সে বললো যে, এক মিলিয়ন পাউন্ড যদি পেয়ে যাই, তুমি যেহেতু আমাকে এই সুখবরটা দিলে, হাফ মিলিয়ন তোমাকে দিয়ে দেবো। যে-ই বললো যে, হাফ মিলিয়ন তোমাকে দিয়ে দেবো, শুনে সাইকোলজিস্ট নিজেই হার্টফেল করলো। সে গিয়েছিলো বোঝাতে যে, এক মিলিয়ন পাউন্ড পেয়ে যাতে লোকটির হার্টফেল না করে। কিন্তু হাফ মিলিয়ন পাউন্ড পাবে শুনে তার নিজেরই হার্টফেল করলো।

টাকা খরচ করার জন্যেও কিন্তু যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়। যদি দক্ষতা না থাকে, পরিকল্পনা না থাকে, কাজ না থাকে তাহলে টাকা খরচ করা যায় না, টাকা অপচয় করা যায়।

**প্রশ্ন :** অপচয় ও অপব্যয়ের কারণ কী?

**উত্তর :** কারণ হচ্ছে আমরা সাধারণভাবে হিসেব করি না। দুই হচ্ছে সামাজিক অনুষ্ঠান। আমাদের হিসেব মৃত্যুর আগেও নেই, পরেও নেই। মৃত্যুর আগে তো আছেই, মৃত্যুর পরও যাতে অপচয় করা যায় সে ব্যবস্থা করে যাই। নিজে তো করতে পারি না, পরবর্তী পুরুষরা সে অপচয়গুলো করে নানারকম অনুষ্ঠানের নামে।

আসলে এই ঠুনকো ঠাটবাট দেখানোর জন্যে, ফুটানির নামে তথাকথিত সামাজিক সম্মান রক্ষার জন্যে যে অপচয় করছি, তা বুঝতেও পারি না।

আমরা আমাদের খরচের তালিকা দেখলে দেখবো, ৮০ ভাগই অপচয়, ৮০ ভাগই অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা বা ব্যয় এবং এ অপচয়ের সাথে আমরা কম-বেশি সবাই জড়িত। এটা আমরা কেন করছি? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা আমরা করছি মিডিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয়ে।

আমাদের একটা ভুল ধারণা হচ্ছে, ধনীরাই বুঝি অপচয় করে। আসলে ধনীরা দৃশ্যত যা করে তা হলো তাদের বিনিয়োগ-মাছ ধরার টোপের মতো। আর সাধারণ মানুষ যা বিনিয়োগ করতে পারতো, সেটা অপচয় করে ফেলে।

অপচয়ের আরেকটা বড় খাত হলো সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান-বিয়ে, জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী ইত্যাদি। বিয়ে তো আবার একটা অনুষ্ঠানে হয় না। একটা বিয়ের জন্যে সাত/ আটটা অনুষ্ঠান। এসব অনুষ্ঠান আবার ঘরেও করা যায় না। এক বিয়ের সামাজিক অনুষ্ঠান করতে গিয়ে মেয়েপক্ষের অবস্থা হয়

শোচনীয়। মেয়ের মা-বাবা হওয়া মানে যেন আসামী হওয়া। মেয়েপক্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা যে কী শোচনীয় হয়ে যায় তা মেয়েপক্ষ কখনোই প্রকাশ করতে পারে না। এরপর রয়েছে যৌতুক। যৌতুক এবং বিয়েতে ফুটানি করতে গিয়ে যে হাজার হাজার পরিবার বিপর্যস্ত হয়, দুর্দশায় জড়িয়ে পড়ে তার উদাহরণ দেয়ার প্রয়োজন মনে হয় নেই। আপনাদের হয়তো এরকম অনেক ঘটনাই জানা আছে।

এরপরে রয়েছে সুনুতে খতনা। খতনা করাতে হলে আত্মীয় ও প্রতিবেশীকে খাওয়াতে হবে বলে খতনা হয় নি-এরকম অসংখ্য ছেলে রয়েছে। ছেলের বয়স ২০/ ২৫ বছর হয়ে গেছে; দাওয়াত খাওয়ানোর টাকা যোগাড় হয় নি বলে খতনা হয় নি। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ২০১২ সালের জুলাই পর্যন্ত সারাদেশে ৭০ হাজারেরও বেশি খতনার ব্যবস্থা করেছে। এমনকি ৪৫, ৬০ বা সত্তরোর্থ বয়সের পুরুষও এসেছেন খতনার জন্যে। সামাজিকতার ব্যয় বহন করতে না পারাই ছিলো খতনা না হওয়ার কারণ।

**প্রশ্ন :** আপনি বলেছেন মৃত্যুর পরও আমরা অপচয় করি। মৃত্যুর পরও অপচয় কীভাবে হতে পারে?

**উত্তর :** মৃত্যুর পরও কীভাবে অপচয় হয়-মোঘলদের দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। এক মহিলার কবরের জন্যে ২২,০০০ শ্রমিক ২০ বছর পরিশ্রম করেছে এবং লক্ষ কোটি টাকা খরচ হয়েছে, যেখানে কোনো জীবিত মানুষ কোনোদিন থাকে নি। এমনকি সম্রাট-যিনি নির্মাণ করেছেন, তিনিও জীবিত অবস্থায় ওখানে যেতে পারেন নি। মরার পরে তাকে ওখানে ঢোকানো হয়েছে। আর এ অপচয়, অপরিণামদর্শিতার পরিণতি হলো ২০০ বছরের গোলামি। আমাদের পূর্বপুরুষদের পাপের শাস্তি আমাদেরকে পেতে হলো ২০০ বছর ধরে এবং এখনো আমরা সেই শাস্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারি নি। এখন আরবদের কী অবস্থা, সৌদিদের কী অবস্থা। তারা যে পরিমাণ খাবার অপচয় করে তা দিয়ে ১০ কোটি মানুষ অনায়াসে তাদের পুষ্টির প্রয়োজন পূরণ করতে পারতো।

অথচ আরবদের পাশের ছোট দেশ ইসরায়েল, তাদের কিন্তু অপচয় নেই, সিস্টেমলস নেই। যে কারণে একটি ছোট দেশ-৩০ লক্ষ লোক, তার পাশে বিশাল বিশাল দেশ এবং কোটি কোটি মানুষ-তাদেরকে ঠান্ডা করে রেখেছে ডান্ডা পিটিয়ে, কারো কথা বলার কোনো শক্তি নেই এবং শুধু তা-ই নয়, সারা

পৃথিবীব্যাপী ইহুদিদের সংখ্যা হচ্ছে দেড় কোটি। এই দেড় কোটি মানুষ পৃথিবীর তাবৎ ব্যাংকিং, ইনস্যুরেন্স, হেভি ইন্ডাস্ট্রি, মিডিয়া, ইন্টারনেট, ওয়েব থেকে গুরু করে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি-সবকিছু তারা চালাচ্ছে সুপারিকল্পিত বিনিয়োগের মাধ্যমে এবং তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে।

আসলে এই অপচয়, অপব্যয়, সিস্টেমলস করে কেউ কোনো শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে পারে না। কোনোদিন পারে নি, কোনোদিন পারবেও না।

**প্রশ্ন :** ব্যয়ের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত?

**উত্তর :** আপনাকে হিসেবি হতে হবে। ব্যয় করবেন-ব্যয় করা কর্তব্য এবং প্রয়োজন, কিন্তু অপচয় করবেন না। আয় করবেন, ব্যয় করবেন, সঞ্চয় করবেন এবং সঞ্চয়টাকে বিনিয়োগ করবেন। কারণ বিনিয়োগ তখনই করতে পারবেন, যখন আপনি সঞ্চয় করবেন। বিনিয়োগ দুটো দিকে হতে পারে-দুনিয়ার কল্যাণ চাইলে দুনিয়ার জন্যে ব্যয় করবেন এবং আখেরাতের কল্যাণ চাইলে আখেরাতের জন্যে ব্যয় করবেন। আবার এমনভাবে ব্যয় করতে পারেন, যেটা আপনার জন্যে দুনিয়া এবং আখেরাত-দুই জায়গার কল্যাণই নিয়ে আসবে। আর আমাদের খাদ্যাভ্যাস বদলাতে হবে। সস্তায় প্রাকৃতিক ও পুষ্টিকর খাবার কিনতে হবে। বিজ্ঞাপনে প্রলুব্ধ হয়ে ব্র্যান্ড খাবার কিনবেন না।

**প্রশ্ন :** পোশাকের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত?

**উত্তর :** প্রয়োজনীয় টেকসই পোশাক কিনুন। কতটা পোশাক আপনি ব্যবহার করছেন, সে ব্যাপারে খেয়াল রাখুন। হয়তো আপনার কেনাকাটার খুব শখ। প্রায়ই কেনেন। কিন্তু কেনার পর খেয়াল করবেন-যে শাড়িগুলো হয়তো আর কখনোই পরবেন না, সেগুলো কোনো গরিব আত্মীয়কে-যার ভালো শাড়ি নেই, কিংবা কোনো সহকর্মী বা অধীনস্থ যে শাড়ি কিনতে পারছে না-তাকে দিয়ে দিন। অর্থাৎ এগুলোকে জমিয়ে রাখবেন না।

অবশ্য বিয়ের শাড়ির সাথে যেহেতু সেন্টিমেন্ট জড়িত তাই এ ব্যাপারে কিছু বলছি না, এটা রেখে দিন। অনেকে আবার ছেলের বৌয়ের জন্যে রেখে দেন। অবশ্য হাল ফ্যাশনে অভ্যস্ত আপনার হবু পুত্রবধূ তার শাড়ির পুরনো আমলের শাড়ি পরে বিয়ের সাজে সাজতে চাইবে কি না সেটা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু অন্য শাড়িগুলো জমিয়ে রাখবেন না।

আর পুরুষদের মধ্যেও যাদের কেনার অভ্যাস আছে তারা দেয়া শুরু করবেন। যেটা পরবেন না, সেটা দিয়ে দেবেন। আর দেয়ার জায়গা না পেলে ফাউন্ডেশনে দিয়ে যাবেন। সেগুলোকে যাতে যথাযথ জায়গায় দেয়া যায় আমরা সেভাবে ব্যবস্থা করবো। অর্থাৎ স্টাইল বা ফুটানি নয়, পোশাক কিনবেন উপযোগিতা বিবেচনা করে।

**প্রশ্ন :** যে গরিব ধনী হতে চায়, সে-ই টাকা হলে অপচয় করে কেন?

**উত্তর :** চাওয়াটা দুধরনের। একটা হচ্ছে সচেতন চাওয়া, আরেকটা অবচেতন চাওয়া। অবচেতন মনে আমরা যা চাই এটা কিন্তু সচেতন মন সমর্থন করে না। সচেতন মন মনে করে, এই চাওয়াটা ঠিক। কিন্তু অবচেতন মন ঐ চাওয়াটার ব্যাপারে ভেতরে একটা যন্ত্রণা, ক্ষত সৃষ্টি করে যা আশাকে হতাশার দিকে নিয়ে যায়। এটা গেল একটা দিক।

আবার আমরা টাকা চাই, অর্থ চাই, সম্পদ চাই। কিন্তু পাওয়ার পর অধিকাংশই আমরা সেটাকে সংহত করতে পারি না। যেমন, অনেক কন্ট্রাস্টর যারা কোনো না কোনোভাবে হঠাৎ করে অনেক টাকাপয়সার মালিক হয়ে যান, তাদের শেষ জীবন অত্যন্ত দুঃখে কাটে।

এরকম একজনের সাথে পারিবারিকভাবে আমার পরিচয় ছিলো। তার আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ ছিলো। একেবারেই কর্পদকশূন্য অবস্থা। তাকে কিছু পরামর্শ দিলাম। সে বিজনেস শুরু করলো। কিছুদিনের মধ্যেই বেশ ভালো করতে লাগলো। প্রচুর টাকা উপার্জন করছিলো। কিন্তু তার সাথে পাল্লা দিয়ে শুরু করলো অপচয়। ইচ্ছেমতো দুহাতে খরচ করতে লাগলো। পরিবারের কেউ কেউ সাবধান করতে চাইলেন। কিন্তু কারো কোনো কথাই সে শুনলো না। আমিও বোঝানোর চেষ্টা করলাম। বললাম, অপচয় এমন এক জিনিস, কেউ যখন এটা করতে থাকে তখন তার আয়-রোজগার যতই বাড়ুক তাতে কোনো লাভ হয় না।

কিন্তু সে বললো, আমি তো খরচ কমাতে পারবো না। এভাবেই খরচ করতে হবে। আপনি বরং দুচারটা পাথরের কথা বলে দিন যা পরলে আমার আয়-রোজগার আরো বেড়ে যাবে। অপচয় করতে করতে একসময়ে এমন হলো যে, ব্যবসা তো গেলই, দেশে চলার মতো অবস্থাও তার আর থাকলো না। এখন বিদেশে গিয়ে ড্রাইভিং করছে। অনেক বছর হয়ে গেল। গ্রিনকার্ড নেই বলে দেশেও আসতে পারে না।

## বিয়েতে অপচয়

**প্রশ্ন :** আমাদের দেশে বিয়ে উপলক্ষে যে একাধিক অনুষ্ঠান হয় সেটা কি অপচয় নয়?

**উত্তর :** অবশ্যই অপচয় এবং এর পরিণতিও খুব করুণ। একটি ঘটনা-বোনের বিয়ের সময় ভাইদের মধ্যে একজনকে দায়িত্ব দেয়া হলো, বোনের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানটির অর্থ সে যোগাবে। প্রথমে বাজেট ধরা হলো ১৫ হাজার টাকা। আয়োজন করতে গিয়ে দেখা গেল, কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া, অনুষ্ঠানের স্টেজ, আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র-সব মিলিয়ে খরচ ৩৫ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এমনকি ছেলের গায়ে হলুদের জন্যে কনে পক্ষকে যে খরচ দিতে বলা হয়েছিলো, সেটার ভারও তার ওপর বর্তালো।

খরচ বাড়তে বাড়তে দাঁড়ালো ৮৪ হাজার টাকা এবং এ খরচ যোগানোর জন্যে স্বল্প আয়ের ঐ ভাইটিকে কয়েক জায়গা থেকে ঋণ করতে হলো যার বোঝা এখনো সে বয়ে বেড়াচ্ছে। আরো পরিহাসের ব্যাপার হলো, এতকিছু করেও সে তার বোনকে বা পরিবারকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। তাদের কাছে মনে হয়েছে, আয়োজনে কৃচ্ছতা করা হয়েছে। আর সবচেয়ে করুণ ব্যাপার হলো, এ ঘটনার পর তার ভাই-বোনের ধারণা হয়েছে যে, তার প্রচুর অর্থ আছে। কিন্তু সে খরচ করে না, সে কৃপণ।

আমাদের দেশে বিয়ের সামাজিকতা এখন এত অনুষ্ঠানসর্বশ্ব হয়ে গেছে যে, শুধুমাত্র একটি বিয়েকে কেন্দ্র করে পান-চিনি, আকুদ, দুটো গায়ে হলুদ, বিয়ে, বৌ-ভাত, বিয়াই-ভাত, কুটুম্ব-ভাত ইত্যাদি শিরোনামের কমপক্ষে আটটি অনুষ্ঠানের আয়োজন যেন বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে। এমনকি যার সামর্থ্য নেই তাকেও ধার-কর্জ করে হলেও যোগাতে হয় এসব অনুষ্ঠানের অর্থ। আর তারপর আয়োজনের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে দোষারোপ আর সমালোচনা তো আছেই। শুধু বিয়ে নয়-জন্মদিন, আকিকা, সুন্নতে খতনা ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে যে অতিরিক্ত আয়োজনের ঘনঘটা হয়, তা শ্রেফ অপচয় ছাড়া আর কিছু নয় এবং এসব নিঃসন্দেহে বর্জনীয়।

**প্রশ্ন :** বিয়ের অনুষ্ঠানের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত?

**উত্তর :** বিয়ে, বৌ-ভাত, বিবাহবার্ষিকী-বিয়ে সংক্রান্ত অনুষ্ঠান সীমিত করুন। এর মধ্যে আমাকে একজন একটি বিয়ের কার্ড দিলো-গায়ে হলুদের আবার

আলাদা কার্ড। সেখানে লেখা ‘পুরুষরা হলুদ পাঞ্জাবি পরিয়া আসিবেন, মহিলারা কমলা রঙের শাড়ি।’ অর্থাৎ প্রোগ্রামে যেতে হবে, সেটার জন্যে শাড়ি কিনতে হবে—এ তো স্রেফ অপচয়। এগুলোকে বর্জন করুন।

বলবেন যে, তাহলে কি গায়ে হলুদ হবে না? হবে। হলুদের অনুষ্ঠান হবে ঘরোয়াভাবে। কমিউনিটি হলে নয়। অর্থাৎ খরচগুলোকে যাতে আপনি কমিয়ে আনতে পারেন সে চেষ্টা করবেন এবং বিয়ের প্রোগ্রাম একটাই হওয়া উচিত। একটা রিসিপশন। আপনি দেখুন—ইউরোপিয়ানদের কি টাকা কম আছে? কিন্তু তারা বিয়েতে কী করে? একটা অনুষ্ঠান করে, যাতে দুই পক্ষের আত্মীয়স্বজন আসে, দেখাসাক্ষাৎ হয়, পরিচয় হয়।

আর বিয়ের একটি বড় অপচয় হয় খাবারে। আজকাল বিয়ের মেনুতে কাবাব বিরিয়ানি রোস্ট রেজালা চিংড়ি সালাদ বোরহানি ও সফট ড্রিংকস—একসাথে এ সবগুলোই করা হয়। যার ৫০ শতাংশই আসলে প্লেটে নিয়ে ফেলে দেয়া হয়। অথচ বিরিয়ানি করলে এর সাথে রোস্ট, রেজালা একেবারে অপ্রয়োজনীয়। আর বোরহানি করলে সালাদ বা অন্য পানীয় অপ্রয়োজনীয়।

অপচয় থেকে আমাদের বাঁচতে হবে। আসলে কনজুমারিজম সবকিছুকে পণ্যে পরিণত করেছে, সবকিছুই এখন পণ্য। আমাদের একটাই পরিচয় তারা রাখতে চায় সেটা হচ্ছে—আমরা ক্রেতা, তারা বিক্রেতা। কিন্তু আমরা খুব স্পষ্ট করে বলেছি যে, অপচয়কারী-অপব্যয়কারী হচ্ছে শয়তানের ভাই, আর শয়তান অভিশপ্ত। সব ধরনের খরচকে যাতে আপনি কমিয়ে আনতে পারেন সেই চেষ্টা করবেন। বিয়েতে খরচের ব্যাপারে তাই দৃষ্টিভঙ্গি হলো—নিমন্ত্রণকারী হলে আপনি চেষ্টা করবেন দুপক্ষ মিলে একটা বিয়ের অনুষ্ঠান করতে আর নিমন্ত্রিত হলে কোনো গিফট না নিয়ে নিঃসংকোচে যাবেন, তৃপ্তি সহকারে খাবেন, প্রাণভরে দোয়া করবেন, হাসতে হাসতে ফিরে আসবেন।

**প্রশ্ন :** আমার আত্মীয় পরিমন্ডলে সম্প্রতি যে বিয়েগুলো হয়েছে তা খুব ধুমধাম, হইচই—এর মধ্য দিয়ে হয়েছে। বিষয়টি এমন যে, একটি বিয়ের জন্যে একাধিক ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান এবং খরচের প্রতিযোগিতা করাটা যেন বাধ্যতামূলক। কিন্তু আমাদের এত আর্থিক সামর্থ্য নেই। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত?

**উত্তর :** আপনাদের হীনম্মন্যতায় ভোগার কিছু নেই, বরং হীনম্মন্যতায় ভুগবে তারাই যারা এ ধরনের অপচয়ে লিপ্ত। কারণ বিয়ে জীবনের একটি সহজ,

স্বাভাবিক ঘটনা। বিয়ের জন্যে অপচয়ে মত্ত হওয়া অবিদ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। বরং এই খরচ, ধুমধাড়া, অপচয় শুধু অকল্যাণই বয়ে আনে। যে বিয়েতে ধুমধাড়া-অপচয় যত বেশি, সে বিয়েতে সুখের পরিমাণ তত কম।

আসলে বিশ্ব পুঁজিবাদী চক্র নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থেই ভোজন, বিনোদন এবং জৈবিক চাহিদা পূরণকে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রচার করতে মিডিয়াকে ব্যবহার করছে। এজন্যেই মিডিয়াতে বিয়েকে কাল্পনিক এক বিশাল ব্যাপার হিসেবে চিত্রিত করা হয়।

যেমন, ‘রাজা বানকে আনা রে, মুঝে লেকে যানা রে, ছম ছমাছম ছম’—বিয়ের প্রসঙ্গে হিন্দি সিনেমার এ গানটিতে যে উচ্ছ্বাস ও মোহময় কল্পনা ফুটে উঠেছে, বাস্তব জীবনেও তা-ই হবে—এমন অলীক কল্পনা করতে গিয়েই বিয়ে সংক্রান্ত অবিদ্যা বা ভ্রান্ত ধারণায় আক্রান্ত হই আমরা। বিয়ের জন্যে খরচের প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠা তার মধ্যে প্রথম। একটি মাত্র বিয়ের জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে একাধিক অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি পোশাক ও অলংকার কেনাকাটা করতে গিয়ে হয় টাকার শ্রাদ্ধ। ঋণ করে হলেও বিয়ের এই ফুটানি করতে গিয়ে অনেক পরিবার দুর্দশায় নিপতিত হয়।

ইদানীং বিয়ের খরচে নতুন সংযোজন হলো হীরা। ‘হীরা চিরকালের’ ‘হীরা মনের দরজা খোলে’—এ জাতীয় বিজ্ঞাপন দিয়ে বহুজাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হয়তো এটা বোঝাতে চায় যে, হীরা ছাড়া বিয়ে পরিপূর্ণ হয় না এবং হীরা বিয়ের বন্ধনকে চিরস্থায়ী করে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য সমাজে ৫০-এর দশক থেকে বিয়েতে অপরিহার্য অনুযুগ হলো হীরা, সেখানে অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় বিয়ে বিচ্ছেদের হার এসময় সবচেয়ে বেশি।

এস্ট্রলজি গবেষণার একটি ফলাফল হচ্ছে, শতকরা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রে বিয়েতে হীরকের প্রভাব অশুভ। আর এর ব্যাখ্যা হলো, প্রতিটি পাথরের একটি দ্রব্যগুণ আছে যা একজন মানুষের মানসিকতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তেমনি হীরকের মনোদৈহিক প্রভাব হলো তা অহমকে বৃদ্ধি করে। যা পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সমঝোতার মনোভাব, যা একটি সুখী বিয়ের জন্যে অপরিহার্য—তার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। বিয়েতে হীরা দেয়া আর খাল কেটে কুমির আনা একই কথা।

আসলে বিয়ে একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনা যার মাধ্যমে দুজন নর-নারীর জৈবিক চাহিদা পূরণের ব্যাপারটিই সর্বজন গ্রহণযোগ্যতা পায়। একে মহিমাম্বিত করতে গিয়ে খরচের প্রতিযোগিতায় মত্ত হওয়া আহাম্মকিরই লক্ষণ।

**প্রশ্ন :** আমার বিয়ে উপলক্ষে অনেক খরচ হচ্ছে। এর কোনোটাই আমার পছন্দ হচ্ছে না। যতই বলি এর প্রয়োজন নেই, আমার কথা কেউ শোনে না। বলে, আমি যেন এটা ভুলে যাই। কিন্তু পরিবারের ওপর অতিরিক্ত একটি আর্থিক চাপ আমাকে মনঃকষ্ট দিচ্ছে। আমি এক্ষেত্রে কী করতে পারি?

**উত্তর :** প্রশ্নকর্তা একজন পুরুষ হয়ে থাকলে একথাটা একেবারেই অসমীচীন যে, আমার কথা কেউ শোনে না। আপনি একজন পুরুষ এবং বিয়ে করছেন আপনি। আপনার বিয়েতে কত খরচ হবে সেটা যদি আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন তাহলে তো হবে না।

তবে মেয়ে হলে হয়তো অনেক সময় কিছু করার না-ও থাকতে পারে। কারণ পরিবারের প্রধান বা অভিভাবকরা যদি অবিদ্যা থেকে মুক্ত না হন, একা মেয়েটির পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে যাওয়াটা কঠিন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের সমাজে বিয়েতে মেয়েদের ভূমিকাটা একটা পুতুল বৈ আর কিছু নয়—তাকে তা-ই করতে হবে যা অভিভাবকরা বলবে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, যে বিয়ে অপচয়ের মধ্য দিয়ে গেছে সে বিয়ে কখনোই দাম্পত্য শান্তি আনে না। অস্থিরতা, অশান্তি আর দাম্পত্য কলহই হয় সেখানে নিত্যসঙ্গি।

**প্রশ্ন :** নিজ খরচে বিয়ে করা কি আবশ্যিক? বিয়েতে অযৌক্তিক খরচ করা অবিদ্যা। ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে কীভাবে সম্পন্ন করা উচিত? কতটুকু বা কী পরিমাণ খরচ করা যেতে পারে? কাম্য দেনমোহর কতটুকু হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং যৌক্তিকতা কতটুকু?

**উত্তর :** অন্যের খরচে আপনি কীভাবে বিয়ে করবেন? বিয়ে তো নিজ খরচেই করতে হবে। তাই উপার্জন না থাকলে একজন পুরুষকে বিয়ের জন্যে ধৈর্য ধরতে হবে। অর্থাৎ বিয়ে করার সঙ্গতি অর্জন করাটা গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা হযরত আলী (রা)-এর সাথে মা ফাতিমার বিয়ের কথা মনে করতে পারি। ফাতিমার সাথে হযরত আলী (রা)-এর বিয়ে যখন ঠিক হলো তখন তিনি খুবই দরিদ্র ছিলেন। অগত্যা বিয়ের খরচ যোগানোর জন্যে তিনি তার বর্ম—যেটি তিনি যুদ্ধে ব্যবহার করতেন—বিক্রি করে দেন ওসমান ইবনে আফফান এর কাছে।

পরে অবশ্য ওসমান (রা) উপহার হিসেবে এটি আবার ফিরিয়ে দেন। আলী প্রথমে নিতে না চাইলেও ওসমানের অনুরোধে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে এ



বর্ম ব্যবহারের নিয়তে তা নেন। তাদের বিয়ের মোহরানা ছিলো ৪০০ রৌপ্য মুদ্রা-আলী (রা) তা আদায় করেন। বিয়ে হয়ে যায় হযরত ফাতিমার সাথে। আসলে বিয়েতে খরচের বাহুল্য যত বর্জন করা যায় তত ভালো-তা আর্থিক পারিবারিক সামাজিক সব দিক থেকেই। আর দেনমোহর হওয়া উচিত যুক্তিসঙ্গত আর্থিক ও সামাজিক অবস্থান অনুসারে।

বিয়ের আনুষ্ঠানিকতায় খরচের ক্ষেত্রে এক জঘন্য প্রতিযোগিতা চলে। সম্প্রতি শুনলাম ভারতে যেখানে ৩০ কোটি মানুষই দরিদ্র, সেখানে নাকি এক বিয়েতে ৫০০ কোটি রুপী খরচ হয়েছে!

অনেক বছর আগের কথা। এক ব্যবসায়ী তার মেয়েকে বিয়ে দেবেন। যাকে পাচ্ছেন তাকেই দাওয়াত দিচ্ছেন। আবাহনী মাঠ জুড়ে প্যাভেল করা হলো। হাজার হাজার মানুষের জন্যে ব্যাচে ব্যাচে খাবারের ব্যবস্থা। পুরো মাঠ জুড়ে বিছানো টেবিলগুলোর প্রত্যেকটিতে অর্কিড ছিলো। সে সময় আমাদের দেশে অর্কিড খুব কম পাওয়া যেত। থাইল্যান্ড থেকে অর্কিড আনা হয়েছিলো টেবিল সাজানোর জন্যে! কী পরিমাণ অপচয় বুঝতেই পারেন!

বিয়ের ক্ষেত্রে এ খরচ করাকে আমরা সামাজিক মর্যাদা (!) মনে করি। সামর্থ্য না থাকলে ঋণ করে হলেও খরচ করি! বহু পরিবার দেউলিয়া হয়ে গেছে শুধুমাত্র বিয়ের ফুটানি করতে গিয়ে।

## প্রসঙ্গ সামাজিক উপহার

**প্রশ্ন :** জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী বা ফাদারস ডে, মাদারস ডে-তে প্রিয়জন বা মা-বাবাকে কি উপহার দেয়া যাবে? এতে কি কোনো নিষেধ আছে?

**উত্তর :** প্রথমত, প্রিয়জনকে উপহার দেয়ার জন্যে কোনো দিবস কেন লাগবে? প্রিয়জনকে তো যেকোনো সময়ই উপহার দেয়া যায়। বাবা কি শুধু ফাদারস ডে-র জন্যে বা মা কি শুধু মাদারস ডে-র জন্যে? নিশ্চয়ই নয়। অতএব প্রিয়জনকে বা মা-বাবাকে যেকোনো সময়ই গিফট দিতে পারেন। বিশেষত এমন কিছু যা খুব ব্যয়বহুল নয়, কিন্তু প্রয়োজনীয়। কারণ উপহারের ক্ষেত্রে এটিও একটি অবিদ্যা যে, একগাদা অর্থ খরচ করে তথাকথিত দিবসের স্মরণে বহুজাতিক কোম্পানির অভিজাত গিফট শপ থেকে কার্ড বা এমন গিফট কেনা যার কোনো ব্যবহারিক মূল্যই নেই।

যেমন, আপনি জানেন আপনার প্রিয়জন বা পরিচিতজনের মধ্যে কারো কোনো বিশেষ একটি জিনিস প্রয়োজন। কিন্তু সে সেটা কিনতে পারছে না সুযোগ বা সামর্থ্যের অভাবে। এক্ষেত্রে তাকে সে জিনিসটি যদি গিফট করেন তাহলে এটি হবে উপহার প্রদানের চমৎকার একটি উদাহরণ।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক উপহার অর্থাৎ বিয়ে, জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী, আকিকা, সুনুতে খতনা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হলে উপহার নিয়ে যাওয়ার যে প্রথা আমাদের সমাজে প্রচলিত, আমরা মনে করি এটা একপ্রকার সামাজিক ব্যাধি। ‘উপযুক্ত গিফট বা উপহার’ সংগ্রহের বিড়ম্বনা ও কষ্ট অনেক সময় এতটাই যে, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আনন্দও তাতে অনেকটা মাটি হয়ে যায়। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ উপহারগুলো দেয়া হয় অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে বা না দিলে কী ভাববে—এ লজ্জায়। এমনকি ধার করে হলেও উপহার কেনার অর্থ যোগাড় করতে বাধ্য হতে হয় অনেককে। কারণ, উপহার দিতে না পারলে মুখ থাকবে না। তাই নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষের কাছে এখন নিমন্ত্রণ মানে এক মূর্তিমান আতঙ্ক। এ নিয়ে আমাদের গ্রাজুয়েটদের কিছু বাস্তব ঘটনা তুলে ধরা হলো—

### ঘটনা-১ (হায়রে স্ট্যাটাস!)

শ্যালিকার বিয়েতে উপহার বাবদ আমার ভাগে পড়লো ডাইনিং টেবিল। কিনতে হবে ব্র্যান্ড কোম্পানি থেকে এবং দাম মাত্র(!) ১৭ হাজার টাকা। এছাড়া অন্য কিছু দিলে নাকি শ্যালিকার কোটিপতি বরের স্ট্যাটাস থাকবে না। তার বরের মাসিক বেতন লক্ষাধিক টাকা আর আমার বেতন ছয় হাজার টাকা! ব্যবধানটা যেন আকাশ আর পাতালের চেয়েও বেশি। কিন্তু স্ট্যাটাসটা তখন এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, এসব নিয়ে ভাবার কোনো প্রয়োজন মনে করলো না কেউ। অগত্যা ধারকর্জ করে যোগাড় করলাম টাকা, কিনে আনলাম স্ট্যাটাস(?) রক্ষাকারী বহুল আলোচিত সেই ডাইনিং টেবিল। টেবিলটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম—হায়রে স্ট্যাটাস! এর জন্যে আগামী এক বছর পাই পাই করে পয়সা বাঁচিয়ে আমাকে শোধ করতে হবে দেনার দায়।

### ঘটনা-২ (উপহার না অত্যাচার!)

আত্মীয়স্বজনের বিয়ের নিমন্ত্রণ পাওয়া মানেই আমাদের কাছে একটা আতঙ্ক। কারণ আমার মায়ের একটা ধারণা হলো, তিনি যেহেতু বংশের মধ্যে সবার বড়, তাই আত্মীয়স্বজনের বিয়েতে সবসময় স্বর্ণ উপহার দিতে হবে। মায়ের

এই সংস্কারের মূল্য দিতে গিয়ে গত ছয় বছরে আমাদের দেনার পরিমাণ হয়েছে ৫০ হাজার টাকারও বেশি। কারণ আমাদের মাসিক আয় ২০ হাজার টাকা। আর গত কয়েক বছরে সোনার দাম যেভাবে বেড়েছে তাতে একেকটা বিয়ে উপলক্ষে চার/ পাঁচ হাজার টাকার কমে গিফট দেয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ফলে একমাত্র উপায়—ধার করা। আর তা করতে গিয়েই আমাদের এ অবস্থা। সামাজিকতা রক্ষার খাতিরে উপহারের নামে সীমিত আয়ের মানুষদের যে অত্যাচারের শিকার হতে হয় তা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যদের বোঝা সম্ভব নয়।

### ঘটনা-৩ (ভাইয়া তো কিছু না দিয়েই খেয়ে গেছে)

তখন আমার নতুন বিয়ে হয়েছে। স্বামীর সাথে একদিন গেলাম তার চাচার বাসায়। গিয়ে শুনলাম, কিছুদিন পরই নাকি ঐ চাচার দুই ছেলে-মেয়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠান হবে। আমার স্বামী যেন অনেকটা জোর করেই দাওয়াত নিলেন। কারণ তাদের হাবভাবে আমার মনে হয়েছে, তারা বোধহয় আমাদের দাওয়াত করতে চাচ্ছিলেন না। যা-ই হোক, অনুষ্ঠানে গেলাম কোনো উপহার না নিয়েই। কারণ তখন আমার স্বামীর তেমন কোনো উপার্জন ছিলো না। আর তাছাড়া তিনি ভেবেছেন, যেহেতু আপনজন তাই উপহার না দিলেও চলবে। কিন্তু পরে একদিন তাদের বাসায় গিয়ে দেখি চাচার মুখ ভার। ওনার চার বছর বয়সী ছেলেটি বলেই ফেললো, ‘ভাইয়া তো আমার জন্মদিনে কিছু না দিয়েই খেয়ে গেছে।’ ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল।

সেই মানসিক পীড়ন বয়ে বেড়িয়েছি অনেকদিন। কিন্তু কিছুদিন আগে আমাদের বিবাহবার্ষিকীতে তাদের দাওয়াত করলাম। কোনো উপলক্ষের কথা বললাম না, যাতে তারা কোনো উপহার না আনেন। দুটো কারণে এটা আমাকে ভীষণ তৃপ্তি দিয়েছে। প্রথমত, আমার দীর্ঘদিনের মানসিক অস্বস্তি থেকে মুক্তি পেয়েছি। দ্বিতীয়ত, উপহারের আশা না করে অতিথিকে আপ্যায়ন করার মধ্যে যে নিখাদ আনন্দ আছে সেটাকে অনুভব করেছি।

### ঘটনা-৪ (উপহার এবং বিধবার কষ্ট)

আমার স্বামী ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি ডিরেক্টর। তিনি বেঁচে থাকতে একরকম ছিলো। কিন্তু তিনি মারা যাওয়ার পর আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিকভাবেই আর আগের মতো রইলো না। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কষ্টেসৃষ্টে চলছিলো সংসার। কিন্তু লোকজন ভাবতো, আমাদের বোধহয়

অনেক টাকাপয়সা। এ সময়গুলোতে কোনো নিমন্ত্রণ পাওয়াটা ছিলো বড় বিড়ম্বনার ব্যাপার। কারণ সবাই কত দামি দামি উপহার দেবে! কিন্তু আমার তো সে সামর্থ্য নেই। এমন সময়ে এক বিয়েতে দাওয়াত পেলাম। সাত-পাঁচ ভেবে নিয়ে গেলাম একখানা ধর্মীয় গ্রন্থ। ভাবলাম, এ থেকে তার দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ হবে—যদিও মনটা খুব ছোট হয়ে ছিলো। পরে শুনেছি, এ উপহার নাকি তাদের পছন্দ হয় নি। এ নিয়ে অনেক সমালোচনা করেছে তারা। একজন বিধবার অসহায় অবস্থাকেও ছাড় দেয় না—এমনি নিষ্ঠুর এ সামাজিক উপহার প্রথা।

### ঘটনা-৫ (উপহারের নামে চাঁদা)

আমি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে একটি জেলায় কর্মরত আছি। আমাদের সিনিয়র এক অফিসার বিয়ে করলেন। বিয়ের পর নববধূকে নিয়ে কর্মস্থলে ফিরে এক নৈশভোজের আয়োজন করলেন সার্কিট হাউজে। কালেক্টরেটের সমস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী তাতে আমন্ত্রিত হলেন। আমরা যথাসময়ে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া, গল্পগুজব করে ফিরে এলাম।

কয়েকদিন পর আরেক সিনিয়র অফিসার আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, ঐ অনুষ্ঠানে যারা গিয়েছিলো তাদের কাছ থেকে চাঁদা নেয়া হচ্ছে। সর্বকনিষ্ঠ ব্যাচের অফিসার হিসেবে আমার জন্যে নির্ধারিত চাঁদার পরিমাণ ৫০০ টাকা। বিনা বাক্যব্যয়ে টাকা বের করে দিলাম। তখন মনে পড়লো, সেদিন রাতে নববধূর গলায় ডিসি স্যারের স্ত্রী একটি সোনার হার পরিয়ে দিয়েছিলেন। ওটার দাম নাকি ১৮ হাজার টাকা। অফিসারদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে সে খরচের কিছুটা তোলা হচ্ছে। বাকিটা আসবে ডিসি অফিসারের এলআর ফান্ড থেকে।

তখন আমার বেতন-স্কেল ছিলো ৬,৮০০ টাকা। আমার মতো বেতন-স্কেলভুক্ত অফিসারদেরকেও সিনিয়র অফিসাররা বাধ্য করেন গিফটের অজুহাতে নিয়মিতভাবে চাঁদা দিতে। কয়েকদিন আগেও ডিসি স্যারের নাতিকে উপহার কিনে দেয়ার জন্যে আমাকে ২৫০ টাকা চাঁদা দিতে হয়েছে। আমাদের সার্ভিসের এটা একটা ট্র্যাডিশন হয়ে গেছে। অমুক অফিসারের প্রমোশন, তমুক অফিসারের ট্রান্সফার—অতএব গিফট কিনতে হবে, সংবর্ধনা দিতে হবে ইত্যাদি অজুহাতে টাকা দিতে হয়।

অর্থাৎ উপহার—যা হওয়া উচিত আন্তরিক, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও নিঃস্বার্থ তা এখন দেয়া হয় বাধ্য হয়ে, লোকলজ্জার ভয়ে এবং অনেক ক্ষেত্রেই

দেনা-পাওনার শর্তে। উপহার দিতে গিয়ে অবচেতনভাবেই আমরা ভাবতে থাকি, এর আগে তার কাছ থেকে কী উপহার পেয়েছিলাম অথবা প্রত্যাশা করি-আমার অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হলে সে-ও যাতে সমমানের উপহারই দেয়। আর গিফট যদি সে প্রত্যাশা পূরণ না করে তাহলে মন কষাকষি, সমালোচনা এমনকি প্রকাশ্য বিবাদ-বিসংবাদও ঘটে থাকে। অর্থাৎ পুরো ব্যাপারটিই একটি লোক দেখানো অসুস্থ প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয় এবং তা দাতা-গ্রহীতা-দুপক্ষের জন্যেই এক দারুণ মানসিক চাপ, ভোগান্তি আর অশান্তির উৎস-যা এই উদাহরণগুলোতে উঠে এসেছে।

অথচ কোরআনের সূরা বাকারার ২৬১ থেকে ২৬৪ এবং সূরা আদ-দাহর-এর সাত থেকে নয় আয়াতের মর্মার্থ থেকে দেখা যায়, প্রতিদানের আশায় দান বা উপহার অথবা যে দান বা উপহার পরিণামে কষ্টের কারণ হয় তা স্রষ্টার কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় এবং তা পরিণামে একজন মানুষের সকল সৎকর্মকে নষ্ট করে দেয়। এর চেয়ে মিষ্টি কথা, শুভকামনা বা দোয়া উত্তম। এতে স্রষ্টা সন্তুষ্ট হন। অর্থাৎ আমাদের শাস্ত্র ধর্মীয় শিক্ষাও বর্তমান সমাজের উপহার প্রথার বিরুদ্ধেই কথা বলে। আসলে যখন কেউ বাধ্য হয়ে বা ধারকর্জ করে বিরজি বা অশ্রদ্ধার সাথে গিফট কিনছে ও দিচ্ছে তাতে কি গ্রহীতার কোনো কল্যাণ থাকতে পারে? নিশ্চয়ই না।

এই সামাজিক অনাচার দূর করতে কোয়ান্টামে আমরা যা করি তা হলো-সামাজিক অনুষ্ঠানে কোনো উপহার দেই না, নেইও না। নিমন্ত্রণ করার সময় অতিথিদের আগে থেকেই উপহার আনতে নিষেধ করে দিই। আর আমরা নিমন্ত্রিত হলে উপহার ছাড়াই নিঃসংকোচে অনুষ্ঠানে অংশ নেই এবং নিমন্ত্রণকারীর জন্যে সম্মিলিত প্রার্থনায় তার সুস্থ, সফল ও প্রশান্ত জীবন কামনা করি। এতে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ এখন হয়ে উঠছে অনাবিল আনন্দের। নিমন্ত্রণকারীর সাথে আন্তরিকতাও বাড়ছে আগের চেয়ে অনেক বেশি।

দেখে অনেক সময় অন্যান্য অতিথিরাও কৌতূহলী হয়ে বিষয়টি জানতে চান। আমরা বলি-আমরা কোয়ান্টাম পরিবারের। সামাজিক উপহার দেয়া ও নেয়া বর্জন করছি। আমরা মনে করি, এ উপহার অতিথির ওপর একটা চাপ সৃষ্টি করে যা অনুষ্ঠানের আনন্দকে ক্ষুণ্ণ করে। তারা তখন সমর্থন করে বলেন, এত সুন্দর উদ্যোগ! আমরাও কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য হতে চাই!

**প্রশ্ন :** অনেক সময় সম্পর্ক উন্নয়নের জন্যে গিফট দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে কী করণীয়? ব্যবসায়িক প্রয়োজনে কি উপহার দেয়া যাবে?

**উত্তর :** সম্পর্ক উন্নয়নের জন্যে যদি গিফট দিতে হয়, তাহলে বুঝতে হবে—সে সম্পর্ক কোনোদিনই উন্নত হবে না। কারণ সম্পর্ক হচ্ছে একটি আত্মিক ব্যাপার, মানসিকভাবে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ব্যাপার। বস্তুর আদান-প্রদান সেটাকে বাড়াতে পারে না। যেমন, সম্পর্ক উন্নয়ন হবে মনে করে আপনি একজনকে দামি একটা গিফট দিলেন। কিন্তু সেটা পেয়ে সে হয়তো ভাবতে শুরু করলো, এত দামি একটা গিফট আমাকে কেন দিলো! নিশ্চয়ই কোনো বদ মতলব আছে। এরপর থেকে সে হয়তো আপনার ব্যাপারে সন্দেহপ্রবণ হয়ে যোগাযোগ আরো কমিয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ সম্পর্ক উন্নয়নের বদলে সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটতে পারে। কাজেই গিফট কখনো সম্পর্ক সৃষ্টি বা বৃদ্ধির উপায় নয়। আর ব্যবসায়িক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্যে যা দেয়া হয় সেটা গিফট নয়। সেটা এক ধরনের ঘুষ বা বিনিয়োগ।

**প্রশ্ন :** আমার এক ক্রেতার মেয়ের বিয়ে। যার কাছে প্রতিমাসে বিক্রি করে আমি বেশ লাভ করি। সে অবশ্যই আশা করে যে, আমি বিয়েতে যাবো এবং ভালো কিছু দেবো। কী করণীয়?

**উত্তর :** আসলে এটা তো উপহার নয়, এটা বিনিয়োগ যা আপনি দেখছেন ব্যবসায়িক বিবেচনায়। তবে এ বিনিয়োগটি আপনি অন্য সময় করুন, বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশ নিই উপহার ছাড়াই। খাওয়া-দাওয়া সেরে, অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত সবাইকে নিয়ে বর-কনের সুখী দাম্পত্য জীবন কামনা করে প্রার্থনা করুন। আপনার প্রতি সবার শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। আপনার আন্তরিকতার প্রকাশে কনের মা-বাবা এবং আত্মীয়স্বজন নিঃসন্দেহে মুগ্ধ হবেন, সন্তুষ্ট হবেন।

**প্রশ্ন :** কর্মক্ষেত্রে আমাদের একটি বিড়ম্বনা হলো—প্রায়ই এটা ওটা উপলক্ষ করে অফিসের সবাইকে উপহার দেয়া বা খাওয়ানোর রীতি। এসব ক্ষেত্রে ইচ্ছে না থাকলেও বাধ্য হয়ে চক্ষুলজ্জার খাতিরে কিছু বলা যায় না। অনেক সময় বেতনের অর্ধেকটাই চলে যায় এ খরচের পেছনে। এটাকে কীভাবে এড়ানো সম্ভব?

**উত্তর :** আসলে এই যে আপনি খাওয়াতে চাচ্ছেন না, কিন্তু চক্ষুলজ্জার খাতিরে বাধ্য হয়ে রাজি হচ্ছেন—এ লজ্জা-সংকোচ-জড়তার বৃত্ত ভেঙে

ফেলতে হবে। কারণ আপনার সামর্থ্য নেই, ইচ্ছাও নেই। কিন্তু কে কী ভাবে—এ ভয়ে যদি আপনি খরচ করেন, তাহলে তো তা উপহারের নিঃশর্ত এবং আন্তরিক হওয়ার শাস্ত্র ধর্মীয় বিধানেরই পরিপন্থী। এ উপহারে কোনো কল্যাণ নেই। বরং এক্ষেত্রে যদি বিরিয়ানি না খাইয়ে আনন্দচিত্তে শুধু একটু ফল খাওয়ান যা আপনার সাধ্যের মধ্যে—তাহলে সেটাই শ্রেয়। আসলে জীবনে কখনো কখনো বলিষ্ঠ হতে হয়, বিশেষত সেসব ক্ষেত্রে যেগুলো আপনার কষ্ট এবং মনঃপীড়ার কারণ।

**প্রশ্ন :** আমরা কি কোয়ান্টামের বই কণিকা স্মারক সিডি ডিভিডি ইত্যাদি উপহার হিসেবে দিতে পারি?

**উত্তর :** অবশ্যই পারি। কারণ আমরা মনে করি, এতে তার জীবন আলোকিত হবে। আসলে আমরা উপহারের বিরুদ্ধে নই, আমরা সামাজিক গিফট নামক ব্যাধির বিরুদ্ধে। কারণ, এটা মানুষকে দুর্দশার বৃত্তে বন্দি করে ফেলে।

**প্রশ্ন :** কিছুদিন আগে আমাদের মেয়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠান ছিলো। এতে সবার কাছ থেকে জন্মদিনের গিফট পাবে এটিই ছিলো তার প্রত্যাশা। কিন্তু যখন জানলো, ফাউন্ডেশনের অনেকের মতো এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতদের কাছ থেকে আমরা কোনো গিফট নেবো না, তখনই সে রেগে গেল। আমাদেরকে কোয়ান্টাম ছেড়ে দিতে বললো। বললো, গিফটও নেবো, কেকও কাটবো। তবে গিফটগুলো পরে গরিবদের দিয়ে দেবো। এক্ষেত্রে কী করণীয়?

**উত্তর :** আসলে বাচ্চা যে ছোট তা বোঝাই যাচ্ছে। তাকে বোঝালে সে বোঝে, তা-ও বোঝা যাচ্ছে। আমাদের পারিপার্শ্বিকতা এমন যে, রাতারাতি পাল্টাতে পারবেন না। এর জন্যে সময় লাগবে, উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আপনার মেয়েকে বোঝান যে, তার জন্মদিনে গিফট আনতে না বললে সবাই আনন্দিতচিত্তে তার জন্মদিনে আসবে এবং তার জন্যে দোয়া করবে। তাকে বলুন, মা-বাবা হিসেবে আপনারাই তাকে গিফট দেবেন। অন্যদের কাছ থেকে গিফট প্রত্যাশা করাটা নিচু মানসিকতারই পরিচয়।

**প্রশ্ন :** গিফটের বিড়ম্বনায় আমাদের প্রায়শই পড়তে হয়। যেখানে গিফট গ্রহণ করার জন্যে খাতাকলম নিয়ে বসার টেবিল থাকে সেখানে বিনা গিফটে যাওয়া বেশ লজ্জার ব্যাপার নয় কি?

**উত্তর :** প্রশ্নটা একজন পুরুষের। প্রশ্নকর্তার সঙ্গে তো প্রশ্নটাকে মেলাতে পারছি না। কারণ, বলা হয় লজ্জা নারীর ভূষণ। লজ্জা পুরুষের ভূষণ এটা তো আমি কোথাও দেখি নি। নাকি এখন এটা উল্টে যাচ্ছে? সে যা-ই হোক, সব বিয়ের অনুষ্ঠানেই গিফট গ্রহণ করার জন্যে খাতাকলম নিয়ে বসার লোক থাকে। এতে যদি মনে করেন যে, বিনা গিফটে যাওয়া বেশ লজ্জার ব্যাপার তাহলে আপনি কখনোই সামাজিক এই অনাচার থেকে বেরোতে পারবেন না।

আসলে বিয়ে, জন্মদিন বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে উপহার দেয়ার এই রীতিটি এখন আর শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের কোনো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত পদ্ধতি নয়, বরং পরিণত হয়েছে কে কাকে কত দামি উপহার দিতে পারে এবং তার ভিত্তিতে মূল্যায়নের এক অসুস্থ প্রতিযোগিতায়।

এমনও হয়েছে-সামর্থ্য নেই, তাই ধার করে দামি উপহার দিতে বাধ্য হতে হয়েছে শুধু সামাজিকতা রক্ষার জন্যে। অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনের আগেই হিসেব করা হয়-কত খরচ হবে এবং গিফট হিসেবে কত উঠে আসবে। সে অনুসারে মালদার লোক দেখেই দাওয়াত দেয়া হয়, যাতে খরচের কমপক্ষে দ্বিগুণ উঠে আসে।

তাই যে সামাজিক অনুষ্ঠানের পেছনে আন্তরিকতা নেই, সে ধরনের অনুষ্ঠান যত কম হয় সমাজের জন্যে ততই মঙ্গল। আমরা এ অবিদ্যাকেই নির্মূল করতে চাই। তাই লজ্জা-সংকোচ সবকিছুকে ঝেড়ে ফেলে সামাজিক এই অনাচারকে প্রতিহত করতে হবে।

টেবিল আছে খুব ভালো। টেবিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করবেন, আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? যদি তাকায়, বলবেন আমরা গিফটলেস পার্টি-কোয়ান্টাম। আমরা গিফট দেইও না, নেইও না। আর দাওয়াত দিতে যে-ই আসবে, তাকে প্রথমেই বলবেন যে, আমি তো যাবো, আমার যেতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু আমরা তো কোনো গিফট নিই না। স্বাভাবিকভাবেই সে সাথে সাথে বলবে, না না, গিফট নেয়ার দরকার নেই। আর আপনিও বলবেন, আমাদের এখানে এলেও আমরা কোনো গিফট রাখি না। দেখবেন, সে-ও নিশ্চিত বোধ করবে যে, আপনার এখানে এলেও তাকে আর গিফট আনতে হবে না।

**প্রশ্ন :** লোকলজ্জার ভয়ে লোক দেখানো গিফট-এর চাকচিক্য তো বর্জন করলাম-এটা না হয় আমাদের অশান্তি, অস্থিরতার কারণ। কোনো উপলক্ষ ছাড়াই নিজ থেকে মানুষকে ছোটখাটো গিফট দেয়া-যা খুব দামিও নয়,



এরকম গিফটও কি বর্জন করতে হবে? অনেক সময় নিজের মা, ছোট ভাই-বোনকে গিফট দিলে তারা যে খুশি হয় তা দেখতে ভালো লাগে। প্রিয়জনকে আন্তরিকভাবে যে গিফট দেয়া হয় সেটাও কি বর্জনীয়?

**উত্তর :** আমরা আগেই এর উত্তর দিয়েছি। আপনজনদের যে জিনিসগুলো প্রয়োজন এবং যেটা সে পছন্দ করে, যেমন, আপনার বোন বরই খেতে পছন্দ করে, আপনি বাজার থেকে আসার সময় এক কেজি বরই নিয়ে এলেন। এ উপহারের মধ্যে দোষের কিছু নেই। বরং প্রিয়জনদের জন্যে মাঝে মাঝেই তা করা উচিত। কিন্তু আপনি বাজার থেকে এমন কিছু নিয়ে এলেন যার না আছে পুষ্টিমূল্য, না এটা রাখা যাবে, না এটাকে অন্যভাবে ব্যবহার করা যাবে। শুধু শুধু কিছু পয়সা খরচ করে এলেন। এই প্রবণতাকে আমরা বন্ধ করতে চাই।

এই যে হলমার্ক, আর্চিস, গিফট গ্যালারি ইত্যাদি বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এমন একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করছে যে, কার্ড দিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে হবে। উপলক্ষের যেমন শেষ নেই, নেই বৈচিত্রেরও শেষ। আর দামের বৈচিত্রের কথা তো বলাই বাহুল্য। শ' টাকা থেকে শুরু করে হাজার টাকা।

একবার একজন আমাকে একটা শুভেচ্ছা কার্ড পাঠালো। দেখে মনে হলো বেশ দামি। কারণ ব্র্যান্ড দেখা যাচ্ছে। সে তখন বাইরেই বসা ছিলো। তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম যে, মা, এর কত দাম পড়েছে? সে বললো যে, গিফটের কোনো দাম হয় না। আমি বললাম, তা জানি, গিফটের কোনো দাম নেই। তবু এটা তো কেনা হয়েছে। কিনতে কত খরচ হয়েছে? সাতশ টাকা। তাকে বললাম যে, মা, আপনি এটা কী করলেন? যদি শুধু একটা ছোট্ট সাদা কাগজে লিখে আমাকে শুভেচ্ছা জানাতেন, তাহলেও তো আমি অনেক খুশি হতাম। এখন এই কার্ডটা আমি কী করবো? একটু পরে ডাস্টবিনে ফেলে দেবো।

সে শকড হয়ে উঠলো। বললাম যে, এটা ডাস্টবিনে ফেলা ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই। এগুলো আমি রাখবো কোথায়? রাখার তো জায়গাও নেই। তার চেয়ে যদি এই টাকাটা আপনি আমার নামে মাটির ব্যাংকে দিয়ে দিতেন, সাতশ টাকা দিয়ে একটি শিশুর পনেরো দিনের খাবার হতো—যেটা এখন ডাস্টবিনে চলে যাবে।

আসলে আমরা এই জাতীয় যত উপহার দেই এটার ঠিকানা হচ্ছে শেষ পর্যন্ত ডাস্টবিন। গিফট কার্ড একটা বাজে অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

**প্রশ্ন :** মা-বাবার বিবাহবার্ষিকীতে সন্তান যদি নিজের জমানো অর্থ থেকে কিছু কিনে উপহার দেয়, সেটাও কি বর্জনীয়?

**উত্তর :** মা-বাবাকে তো সবসময়ই উপহার দেয়া যায়। এর জন্যে কোনো বার্ষিকীর প্রয়োজন নেই। সন্তানের টাকা যদি তার নিজস্ব হয় সে টাকা মা-বাবারই। তবে মা-বাবাকে সে জিনিসই দিতে হবে যেটা তাদের প্রয়োজন। আমরা আসলে অপচয়ের বিরুদ্ধে। মিডিয়া বা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর প্রচারণার ফলে গিফট সম্পর্কে সাধারণ যে ধারণা প্রচলিত হয়েছে—গিফট মানেই দামি একটা কিছু কিনতে হবে—এমন কিছু, যার কোনো ব্যবহার নেই, কিন্তু খরচ হবে একগাদা। পাওয়ার পর ঘরে রেখে দেয়া এবং একটা সময় ফেলে দেয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই।

মা-বাবার বিবাহবার্ষিকীতে ১০০০ টাকা দিয়ে কার্ড দিলেন। অথচ এই ১০০০ টাকা যদি আপনি মা-বাবাকে ফল খাবার জন্যে দিতেন—বাবা, এই ফল নিয়ে এলাম। সব তো একবারে আনা যাবে না, বাকি টাকাটা দিয়ে পরে ফল খেও। এই টাকাটা তোমার হাতে থাকুক। এটাতে মা-বাবা খুশি হবেন বেশি। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মা-বাবা টাকা হাতে পেলেই খুশি হন বেশি। কারণ সেটা তারা ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারেন।

**প্রশ্ন :** সম্ভবদ্বাভাবে প্রয়োজনীয় উপহার কি দেয়া যাবে না? কারো নতুন সংসার সবাই মিলে সাজিয়ে দেয়ার মধ্যে কী দোষ?

**উত্তর :** করতে পারেন। যেমন, বন্ধু বিয়ে করেছে, নতুন সংসার। অনেক কিছু প্রয়োজন। আপনারা পাঁচ-ছয় বন্ধু মিলে সংসারের জন্যে যদি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কিনে দেন, তাহলে তো এটা উপহারও হলো, উপকারও হলো।

**প্রশ্ন :** আমার স্ত্রী অল্প গিফটে তুষ্ট হয় না। জন্মদিন, ঈদ, বিবাহবার্ষিকীর আগেই সে বেশি দামের শাড়ি দেখে আসে, বায়না ধরে এবং না দিলে গোস্বা করে। কী করণীয়?

**উত্তর :** আপনার স্ত্রী তো আপনার কাছেই বায়না ধরবে। নাকি আপনি চান আপনার স্ত্রী অন্যের কাছে বায়না ধরুক? স্ত্রীর যা কিছু বায়না তা তো স্বামীর কাছেই এবং আপনার যদি সামর্থ্য থাকে আপনি অবশ্যই শাড়ি কিনে দেবেন।

আর সামর্থ্য না থাকলে বুঝিয়ে বলবেন। বুঝিয়ে বললে বুঝবেন না, এমন স্ত্রীর সংখ্যা পৃথিবীতে খুব কম। আর একটু গোস্বা করলে গোস্বা ভাঙাবেন।

**প্রশ্ন :** আমরা কি তাহলে এখন থেকে বিবাহ অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্রে লিখে দেবো—‘দয়া করে কোনো উপহার আনবেন না, শুধু দোয়াপ্রার্থী’?

**উত্তর :** এই লেখাটাও রেওয়াজ হয়ে গেলে আসলে লেখাতেও কোনো কাজ হবে না। একে অন্তর থেকে বিশ্বাস করতে হবে যে, এই কাজটা অন্যায়। সমাজ থেকে আমরা দূর করতে চাই যে, সামাজিক অনুষ্ঠানে আমরা উপহার গ্রহণ করবো না এবং উপহার দেবো না। একবার, দুইবার, তিনবার। এরপর দেখবেন যে, এই ধারণাটাকে আপনি প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন।

**প্রশ্ন :** কেউ যদি আমাকে দেয়ার জন্যে উপহার কিনে ফেলে এবং আমাকে দেয় তখন আমি কি উপহার গ্রহণ করবো?

**উত্তর :** কেউ যদি খুশি হয়ে উপহার দেয়, তো সেটা গ্রহণ করার মধ্যে কোনো দোষ নেই। আমরা যেটা দূর করতে চাই তা হলো বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে উপহার দেয়া-নেয়ার যে রোগ সেটাকে।

**প্রশ্ন :** আমাদের মা-বাবারা তো সামাজিক উপহার দিতে চাইবেন। তারা তো এ ব্যাপারে সচেতন নন। সেক্ষেত্রে আমাদের কী করণীয়?

**উত্তর :** আসলে মা-বাবার কাছে এই মেসেজটা পৌঁছে দিতে হবে যে, আমাদের এই কাজটা ধর্মীয় দিক থেকে পরিত্যাজ্য। আমাদের ধর্মবিশ্বাস অনুসারে এটা করা ঠিক নয়। এটা একটা ব্যাধি, এটা একটা অনাচার। তাদের বোঝাতে সময় লাগতে পারে। কিন্তু বোঝালে তারা অবশ্যই বুঝবেন।

**প্রশ্ন :** গুরুজী, গিফট না নেয়া যত সহজ, গিফট না দেয়া কি তত সহজ? আমার তো মনে হয় না। দাওয়াতকারী কি এতে করে আমাদের হয়ে চোখে দেখবে না? পরবর্তীতে হয়তো আমাদেরকে দাওয়াত করার আগ্রহও থাকবে না। করণীয় কী? সারা সমাজ গিফট-এর জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে, এ অবস্থায় আমরা কজন গিফট বর্জন করবো কীভাবে?

**উত্তর :** গিফট না নেয়া যেমন সহজ, না দেয়াও তেমনি সহজ। নির্ভর করছে আপনি কতটা দৃঢ়তার সাথে এটাকে গ্রহণ করছেন। কারণ, সমাজ না বুঝে অনেক কিছুতেই ভেসে যায়। কিন্তু আমরা যারা জানি, আমরা কেন ভেসে যাবো? যারা বুঝতে পারছি, কাজটা সামাজিক ও ধর্মীয় দিক থেকে পরিত্যাজ্য, নিন্দনীয় এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিকর, তারা কেন সাহস নিয়ে দাঁড়াবো না? সাহস নিয়ে দাঁড়ান-আপনি জয়ী হবেন। সত্য যত দুর্বল হোক, অসত্য অন্যায় যত প্রবল হোক-সত্যই সবসময় জয়ী হয়েছে।

আমরা যারা কোয়ান্টামে এসেছি নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের সমাজের সবচেয়ে সাহসী মানুষ। আমরা প্রচলিত স্রোতের বিপক্ষে বলেই আমরা একত্রিত হয়েছি। প্রচলিত স্রোত যা বলছে কোনোটার মধ্যেই আমরা নেই এবং আমাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ১৯৯৩ সালে আমরা যখন প্রথম শুরু করেছিলাম, তখন আমাদের সবাই পাগল বলেছিলো। আমরা তখন বলেছিলাম যে, মেডিটেশন হচ্ছে বিজ্ঞান, আমাদের চারপাশের যে চাপ, আধুনিক যুগযন্ত্রণার চাপ-এ থেকে মেডিটেশনই মুক্তি দিতে পারে। তার ১০ বছর পর ২০০৩ সালে টাইম ম্যাগাজিন প্রচ্ছদ নিবন্ধ করলো-সায়েন্স অফ মেডিটেশন। আজকে কাউকে বলে দিতে হয় না যে, মেডিটেশন কী।

আমরা একসময় সফট ড্রিংকস খেতাম। যেদিন বৈজ্ঞানিক তথ্য জানলাম যে, না, এটা ঠিক নয়, সেদিন থেকে নিজে খাওয়া বন্ধ করে দিলাম এবং আপনাদের বললাম, আপনারাও খাবেন না। ২০ বছর আগে শিক্ষিত মানুষ এ ব্যাপারে অসচেতন ছিলেন। এখন সচেতন শিক্ষিত মানুষকে বলে দিতে হয় না যে, কোমল পানীয় স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর।

আমরা বলেছিলাম, জাক্স ফুড খাবেন না, বাচ্চাদের খাওয়াবেন না। কারো বিপক্ষে নয়, আমরা সত্য কথা বলেছিলাম। আজকে সবাই জাক্স ফুডের বিরুদ্ধে বলছে। আমরা যখন স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচি নিয়ে কাজ শুরু করলাম-সবাই বলেছে, এটা পারবেন না, এটা খুব কঠিন কাজ। আমরা বলেছি, এটা মানুষের উপকারের জন্যে, নেক নিয়তে-কোনো প্রচারের জন্যে নয়। আমরা অবশ্যই পারবো। গত ১২ বছরে আমরা সোয়া চার লক্ষ ব্যাগ রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহ করেছি। বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় এবং সঙ্ঘবদ্ধ ডোনারপুল এখন আমাদের। কারণ আমাদের নিয়ত ছিলো মানুষের উপকার করা।

মানুষ যখন বিশ্বাস করতে শুরু করে, বিশ্বাসই তখন তাকে চালিত করে। এই সামাজিক গিফট একটা বাজে ব্যাধি। আমরা গত দুই যুগ ধরে দেখছি,

সামাজিক অনুষ্ঠানের সেই নির্মল আনন্দ আর নেই। কেন? গিফট কিনতে হবে। এটা একটা সামাজিক অনাচার। এটা কেউই পছন্দ করে না। যে গিফট নিয়ে যায় সে-ও পছন্দ করে না। শুধুমাত্র লোকলজ্জার ভয়ে নিয়ে যায়। আমরা যদি সাহস করে দাঁড়াই, যারা কোয়ান্টামের বাইরে আছে তারা শোনার সাথে সাথে বলবে যে, আমরাও তাহলে কোয়ান্টাম হয়ে যাই। তাহলে আর গিফট লাগবে না। কারণ এটা তাদের জন্যে এত প্রয়োজনীয় যে, প্রতিটা মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে যদি গিফট ছাড়া সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতে পারে। কাজেই আমরা যে পদক্ষেপ নিচ্ছি তা মানুষের কল্যাণে। দেখা যাবে, শীঘ্রই সামাজিক গিফটের বিপক্ষে জোয়ার শুরু হবে।

সামাজিক অনুষ্ঠানে নিঃসংকোচে যাবেন। বলবেন, আমি কোয়ান্টাম, আমি এই ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়েছি, আমি সুস্থ। দ্বিধাহীনভাবে যাবেন, তৃপ্তি সহকারে খাবেন, প্রাণভরে দোয়া করে খুশি মনে ফিরে আসবেন। দেখবেন, সবাই আপনাকে অনুসরণ করছে।

আরো কোয়ান্টাম প্রাজুয়েট অনুষ্ঠানে থাকলে তাদের নিয়ে জোরে জোরে দোয়া করুন। সবাই খেয়াল করবে যে, এরা কারা। আমরা সামাজিক গিফট দেয়া-নেয়াকে বাজে কাজ মনে করি। পরিবেশ-পরিস্থিতি বুঝে সাহসের সঙ্গে যান। অগ্রণী সে, যে পথ দেখায়, আর সমালোচক কেবল সমালোচনা করে। কিছুদিন পর সমালোচকও বলবে, আসলে আমিও এটাই ভাবছিলাম, এটাই ঠিক কিন্তু সাহস পাই নি।

**প্রশ্ন :** সামাজিকতার খাতিরে মধ্যবিভ, নিম্নবিভরা বিয়ের অনুষ্ঠানে ধারকর্জ করে। যদি এদের বিয়েতে উপহার হিসেবে টাকা খামে ভরে দেয়া হয় নাম-ঠিকানা ছাড়া-এতে মা-বাবার এবং বর-কনের উপকার হয়। যেহেতু নতুন সংসারে অনেক কিছুর প্রয়োজন। বিয়ের অনুষ্ঠানে টাকা দেয়া কেমন হয়? আপনার মতামত চাই।

**উত্তর :** আসলে এই জিনিসটাকে পরিহার করার মতো মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে। বিয়ের অনুষ্ঠান। ধার করে কেন ফুটানি করতে হবে? এই ব্যাধিটা থেকে আমাদের সাহস করে বেরিয়ে আসতে হবে। আর নতুন সংসারকে সুন্দর করার জন্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী অন্য যেকোনো সময় আন্তরিক উপহার হিসেবে দেয়া যায়। এটি একটি সুন্দর সহযোগিতা। তবে বিয়ের অনুষ্ঠানে কোনো উপহার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সামাজিক ব্যাধি।

**প্রশ্ন :** আমরা এখন কীভাবে জন্মদিন, মৃত্যুদিন, বিবাহবার্ষিকী পালন করবো তার একটা দিক-নির্দেশনা দিন।

**উত্তর :** যদি শারীরিকভাবে সমর্থ হন তাহলে রক্তদান করে আপনি আপনার জন্মদিন পালন করবেন। আর মা-বাবার মৃত্যুদিন পালন করার সবচেয়ে ভালো পথ হলো—তাদের জন্যে দোয়া করা এবং যদি আর্থিক সামর্থ্য থাকে তাহলে প্রত্যেক মৃত্যুদিনে তাদের নামে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একটি করে টিউবওয়েল স্থাপন করা। এটা তার জন্যে সদকায়ে-জারিয়া হিসেবে কাজ করবে। একটা রেওয়াজ আছে যে, মৃতের জন্যে দাওয়াত খাওয়ানো। সচ্ছল হলে পুরো গ্রামের মানুষকে খাওয়ান অনেকে। এটা অর্থহীন। একজনকে খাওয়ার জন্যে টাকা দিলে সে তো খেয়ে খরচ করে ফেললো। তার চেয়ে ২০/ ২৫ হাজার টাকা খরচ করে একটা টিউবওয়েল স্থাপন করুন। এ থেকে শত শত মানুষ উপকৃত হবে। যে কারণে আমাদের বুজুর্গরা যেখানেই যেতেন, আগে দিঘি খনন করতেন।

আর বিবাহবার্ষিকীতে স্ত্রীকে আপনার সামর্থ্য অনুসারে উপহার দিন এবং তাকে নিয়ে সময় কাটান। ফালতু খরচ যত কম করেন তত ভালো। আত্মীয়-বন্ধুদের দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতে পারেন। কিন্তু আসল কাজ হচ্ছে স্ত্রী বা স্বামীর প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেয়া।

**প্রশ্ন :** উপহার দেয়ার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত?

**উত্তর :** আমরা আসলে যে প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিতে গিফট দেই তা আমাদের শাস্ত্রত ধর্মীয় চেতনার আলোকেই বর্জন করা উচিত। আমাদের শাস্ত্রত ধর্মীয় শিক্ষা এই ধরনের গিফট এর বিপক্ষে, প্রতিকূলে। প্রতিদানের আশায় যে দান বা উপহার দেয়া হয় তা পরিণামে কষ্টের কারণ হয়।

আমরা যারাই বিয়ে বা জন্মদিনে গিফট দেই, আমরা প্রত্যেকে প্রত্যাশা করি যে, আমার ছেলের বা মেয়ের বিয়েতে এরকম আসবে। যাকে গিফট দেয়া হয় তিনি আবার লিস্ট করে রাখেন যে, অমুক এই দিয়েছিলো। অন্তত সেই মানের বা তার চেয়ে বেশি হলেও তাকে দিতে হবে। এই দেয়াটা হচ্ছে লোক দেখানো, এই দেয়াটা হচ্ছে প্রতিযোগিতা, যা স্রষ্টার কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয়। কোরআনের শিক্ষা অনুসারে যে দান দাতার কষ্টের কারণ হয় সেটা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং পরিত্যাজ্য।

**প্রশ্ন :** সামাজিক গিফটটাকে আমরা কী দৃষ্টিতে দেখবো?

**উত্তর :** বিয়ে, বৌভাত, জন্মদিন, আকিকা, সুনুতে খতনা ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে গিফট দেয়াকে আমরা সামাজিক ব্যাধি মনে করি। কারণ এটি সামাজিক সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা অনভিপ্রেত চাপ সৃষ্টি করে। বাধা হিসেবে কাজ করে।

এক বাবা বলছিলেন, তার মেয়ে বাল্মবীর জন্মদিনে যাবে, বিকেলে এসেই চিৎকার-‘বাবা, কী নিয়ে যাবো? কিছুই তো বুঝতে পারছি না, কী নিয়ে যাবো?’ সে জন্মদিনে আনন্দ করবে কী, তার পেরেশানি বা টেনশন হচ্ছে যে, কী নিয়ে যাবে, কী কিনবে। এটা শুধু একজন বাবার কথা নয়, সব বাবা এবং সব ছেলে-মেয়ের ব্যাপার একইরকম।

আসলে সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে উপহার আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে খুব কমই দেই। আমরা দেই বাধ্য হয়ে। নীতিগতভাবেই আমরা এখন থেকে এই ধরনের গিফট দেয়া বা নেয়া বর্জন করতে পারি।

**প্রশ্ন :** প্রিয়জনকে উপহার দেয়ার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি কী?

**উত্তর :** প্রিয়জনকে উপহার দেয়ার জন্যে কোনো দিনক্ষণ লাগে না। প্রিয়জনকে যখন ইচ্ছে যা ইচ্ছে দেবেন, বেশি বেশি দেবেন। কিন্তু অপচয় যেন না হয়। বাজারে গেলেন, এমন একটা জিনিস কিনে নিয়ে গেলেন যা আপনার স্বামী বা স্ত্রীর কোনো কাজেই লাগলো না, সে হয়তো তা পছন্দই করলো না। এরকম গিফট কেনা অর্থহীন, এটা অপচয়। তবে যে জিনিসটা কাজে লাগবে, যেটা আপনার প্রিয়জন ব্যবহার করবেন, নিয়ে আসুন সেটা।

**প্রশ্ন :** উপহার এবং সামাজিক উপহারের মধ্যে পার্থক্য কী?

**উত্তর :** উপহার এবং সামাজিক উপহার-দুটো কিন্তু এক নয়। উপহার হলো শর্তহীন, যার পেছনে কোনো পাওয়ার প্রত্যাশা নেই, আছে কেবল দেয়ার আনন্দ। এটাই হচ্ছে তোহ্ফা বা উপহার। রসুলুল্লাহ (স) এ ধরনের উপহারই গ্রহণ করতেন।

কোনো শর্ত না রেখে, কোনো পাওয়ার প্রত্যাশা না করে আন্তরিকভাবে কাউকে যেকোনো জিনিস দেয়া যেতে পারে যা তার প্রয়োজন পূরণ করবে।

এমন উপহার আল্লাহর কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয়। আপনি বুঝতে পারছেন যে, একজনের একটা জিনিস খুব প্রয়োজন, সে কিনতে পারছে না। সে আপনার ছোট ভাই হতে পারে, ভাতিজা, মামা, খালা যে কেউ হতে পারে। আপনি বুঝতে পারছেন—এই জিনিসটা পেলে তার কাজে লাগবে, উপকার হবে। আপনি তাকে দিন। এটা তার প্রয়োজন পূরণ করবে, এটা হচ্ছে সত্যিকারের উপহার। এই উপহার ফাউন্ডেশন সবসময় উৎসাহিত করে।

আমরা গিফট নিয়ে যাই শুধু লোকলজ্জার কারণে। শুধু লোকভয় যে, না নিলে কী বলবে, না নিয়ে যাই কীভাবে। চট্টগ্রামের এক ঘটনা—আমাদের এক দায়িত্বশীল বলছিলেন, গত ২০ বছর ধরে উনি স্ত্রীকে নিয়ে কোনো বিয়েতে যেতে পারতেন না। কারণ ওনার নিয়ম ছিলো কোনো দাওয়াতে গেলে উনি গিফট নিতেন না। আর স্ত্রীর কথা হলো, গিফট না নিলে আমি তোমার সাথে যাবো না। লোকে কী বলবে, মহিলা এসেছে এরকম সেজেগুজে—গিফট ছাড়া। কিন্তু ওয়ার্কশপে যখন আমরা সামাজিক উপহার বর্জনের কথা বললাম, তিনি খুব খুশি হলেন। স্ত্রীকে বললেন, এবার নিশ্চয়ই তুমি আমার সাথে একমত হবে। স্ত্রী-ও যেহেতু কোয়ান্টামের সদস্য, ওয়ার্কশপের আলোচনায় তিনিও উদ্বুদ্ধ হলেন।

২০ বছর পর প্রথমবারের মতো স্বামী-স্ত্রী একসাথে কোনো বিয়ের দাওয়াতে গেলেন। অথচ আগে স্বামী গেলে স্ত্রী যেতেন না, আর স্ত্রী গেলে গিফট নিয়ে যেতেন তাই স্বামী যেতেন না। এই বৃত্ত আমরা ভাঙতে পারি না কেন? শুধুমাত্র লোকে কী মনে করবে—লোকলজ্জা-লোকভয়। এই লোকভয়ের কারণে আমরা আমাদের বৃত্তে আটকে থাকি এবং এই লোকভয়টা মহিলাদের সবচেয়ে বেশি।

**প্রশ্ন :** অপচয়ের বৃত্ত থেকে বেরোবো কীভাবে?

**উত্তর :** অপচয়ের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে হলে আমাদের ছোট ছোট কিছু কাজ করতে হবে। জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে। আমরা আসলে দুর্দশার বৃত্তে আবদ্ধ হয়ে থাকি।

আমরা সাধারণত অপচয়ের জন্যে ধনীদের দায়ী করি। কিন্তু অপচয় শুধু ধনীরাই করে না, অপচয়ের প্রবণতা আসলে ধনী-দরিদ্র, উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত—সব শ্রেণীর মধ্যেই রয়েছে। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধনীদের চেয়ে গরিবরাই অপচয় করে বেশি। বিনিয়োগের ছদ্মাবরণে ধনীদের আপাত



ব্যয়বাহুল্য দেখে আমরা বিভ্রান্ত হলেও, বুঝি না যে, সেটা তিনি করছেন ভবিষ্যত লাভের কথা মাথায় রেখেই। কিন্তু গরিব অপচয় করে ফেলছে তার অপরিণামদর্শিতার কারণে। সঠিক জীবনদৃষ্টির অভাবের কারণে।

এ থেকে বেরিয়ে আসতে হলে আমাদের ব্যয় করতে হবে আয় অনুসারে, অপব্যয় করা যাবে না। ফালতু ফুটানি করতে গিয়ে এমন কোনো বাহুল্য খরচ করা যাবে না যার পরিণাম ভয়ঙ্কর। আমরা জানি, কবিগুরুর সেই বিখ্যাত ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার কথা-ঋণ নিয়ে ধুমধাম করে মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে দরিদ্র উপেনকে কীভাবে সহায়সম্পত্তি সব হারাতে হয়েছিলো।

কাজেই নিজের সর্বনাশ করবেন না। লোকলজ্জা থেকে বাঁচতে গিয়ে নিজের সবকিছু খোয়াবেন না। ভ্রান্ত সামাজিক সংস্কারের বলি হবেন না। আমাদের আজকের দুর্দশার অন্যতম কারণ ভ্রান্ত সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত অপচয়। অপচয়কারী, অপব্যয়কারী হচ্ছে শয়তানের ভাই। শয়তান যেহেতু অভিশপ্ত, শয়তানের ভাই বা বোন হলে আপনারও অভিশাপ থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন।

তবে মনে রাখতে হবে, অপচয় আর ব্যয় এক নয়। প্রয়োজনীয় ব্যয় করতে হবে, করা উচিত। বরং বলা যেতে পারে, প্রয়োজনীয় ব্যয় করতে পারাটাও একটা আর্ট। প্রয়োজনীয় ব্যয় করতে পারলেই আপনি আপনার আয় বাড়াতে পারবেন। সম্পদ বাড়াতে পারবেন। ক্রয়ক্ষমতাকে বাড়াতে পারবেন। কমতে থাকবে আপনার অভাব-অশান্তি।

কিন্তু অপচয় করবেন না। পণ্যদাসে রূপান্তরিত হবেন না। আসলে অপব্যয়ের মূল কারণ পণ্যদাসত্ব বা কনজুমারিজম। আমরা বিজ্ঞাপনে এতই প্রভাবিত হই যে, আমরা ভাবি, আমাদের আসল পরিচয়-আমরা মানুষ না, আমরা ক্রেতা। কনজুমারিজম আমাদের একটা জিনিসই শিখিয়েছে যে, আমাদের একটাই পরিচয়-আমরা কনজুমার।

আমরা কিনবো যাতে করে তারা লাভবান হতে পারে। কেনার উন্মাদনা, একটার পর একটা। শুধু কেনাতে হবে, এ কারণে একটার পর একটা প্যাকেজ। যেন লোকে মনে করে-এটা নতুন, এটা কিনতেই হবে। সবসময় কেবল মডেল পরিবর্তন। যেন আপনি কেনার জোশে থাকেন সবসময়। কেনার একটা উন্মাদনা যেন আপনার মধ্যে থাকে। তাহলে তারা লাভবান হবে। এই উন্মাদনা থেকে মুক্ত থাকবেন। তাহলেই আপনি বেরিয়ে আসতে পারবেন অপচয়ের বৃত্ত থেকে।

## অন্যের সাহায্যের অপেক্ষায় থাকা

**প্রশ্ন :** কোনো আশা যদি অন্যের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় তাহলে সে আশায় বিশ্বাস রাখলে কি কাজ হবে? সম্পূর্ণ কাজটি নির্ভর করছে তার ওপর।

**উত্তর :** আপনার আশা কখনো অন্য কেউ বাস্তবায়িত করবে না। আপনার আশা বাস্তবায়িত করার যোগ্যতা যদি আপনার না থাকে তাহলে তা কখনো পূরণ হবে না। আসলে আমরা এখানেই ভুল করি। নিজের সাফল্যের জন্যে অন্যের সাহায্যের প্রত্যাশায় থাকি এবং নিজের ব্যর্থতার জন্যে অন্যকে দোষারোপ করি।

প্যারিসে ডিজনিলাণ্ডে বিকেলবেলার আকর্ষণ হচ্ছে প্যারেড। প্যারেড যাচ্ছে। ডিজনির কার্টুন ক্যারেকটারগুলো নাচতে নাচতে যাচ্ছে। সবার শেষে আসে সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্যারেকটার। দর্শক অবাক হয়ে দেখলো, সবার শেষে আসছে আলখেল্লা পরিহিত এরাবিয়ান নাইটস্-এর আলাদিন।

কেন আলাদিনের এই জনপ্রিয়তা? কারণ শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষের চিন্তার প্রতীক হচ্ছে আলাদীন। আলাদীন তার চেরাগে ঘষা দিচ্ছে, যা চাচ্ছে দৈত্য এসে সব তৈরি করে দিচ্ছে। আমরা চাই নিজেরা আলাদীনের মতো নেচে-গেয়ে আরাম-আয়েশে সময় কাটাবো আর আমাদের কাজগুলো আলাদীনের দৈত্যের মতো অন্যরা করে দেবে। দৃষ্টিভঙ্গির এই মৌলিক ত্রুটির কারণে আমরা সফল হতে পারি না।

আসলে অন্যের সাহায্যের প্রত্যাশায় থাকলে কী হয়—তা নিয়ে সুফীদের একটি গল্প আছে। এক গ্রামে মেলা হচ্ছে। হাজার হাজার মানুষের শোরগোল, আওয়াজ, হইচই। মেলার এক কোনায় একটি কুয়ো ছিলো। এর চারপাশে কোনো দেয়াল ছিলো না। এক লোক মেলা দেখতে এসে আনন্দে হুঁশ হারিয়ে হঠাৎ পড়ে গেল কুয়োতে। পড়েই চিৎকার করতে লাগলো—বাঁচাও! বাঁচাও! কিন্তু এত শোরগোলে তার আওয়াজ আর কে শোনে? কেউ আর আসে না।

এর মধ্যে একজন মৌলভী এলেন কুয়ের কাছে। তার তৃষ্ণা পেয়েছিলো। তিনি পানির জন্যে যে-ই কুয়োতে উঁকি দিলেন, অমনি লোকটির চিৎকার আর কান্না শুনতে পেলেন। সব শুনে তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তুমি কোনো পাপ করেছো। সে পাপেরই কর্মফল এটা। তোমাকে কর্মফল ভোগ করতে হবে। অথবা এটা তোমার পূর্বজন্মের কোনো পাপের শাস্তি যা তোমার তকদীরেই

ছিলো। খামোখা চিৎকার করো না, পাপের বোঝা আরো বাড়বে। বরং ভাগ্যকে মেনে নাও।

লোকটি তখন চিৎকার করে বললো, আগে আমাকে বাঁচাও, তারপর তোমার ওয়াজ শুনবো। এ অবস্থায় কোনো ওয়াজ আমার মাথায় ঢুকবে না। সেই ধর্মাচারী ভাবলো, এই পাপিষ্ঠকে সাহায্য করে আমিও হয়তো পাপিষ্ঠ হয়ে যাবো। সে তাড়াতাড়ি করে পড়লো।

এর মধ্যে একজন রাজনীতিক বুদ্ধিজীবী বা বিপ্লবী সেখানে এলেন। এসে কুয়োর ভেতরে ওই মুমূর্ষু লোকটিকে দেখলেন। তাকে দেখে কুয়োর লোকটি চিৎকার করে বলে উঠলো, আমি মরে যাচ্ছি। কেউ আমাকে ওঠাচ্ছে না। আমাকে বাঁচাও। তিনি বললেন, সমাজবিজ্ঞানীরা ঠিকই বলেন—প্রত্যেকটি কূপের চারপাশে দেয়াল থাকতে হবে। তুমি কোনো চিন্তা করো না। আমরা দেশজুড়ে আন্দোলন গড়ে তুলবো, সমাজকে বদলে দেবো। সরকারকে বাধ্য করবো প্রতিটি কূপের চারপাশে দেয়াল নির্মাণ করতে, যাতে ভবিষ্যতে আর দেয়াল ছাড়া কোনো কূপ না থাকে। তুমি নিশ্চিত থাকো।

লোকটি চিৎকার করে উঠলো, ততদিনে তো আমি মরে যাবো! এতে আমার কী উপকার হবে! আমি তো কুয়োয় পড়ে আছি। রাজনীতিক তখন বললেন, এটা কোনো ব্যাপার নয়, ব্যক্তি কোনো বিষয় নয়। সমাজ হচ্ছে আসল। তুমি গভীর তৃপ্তির সাথে মারা যেতে পারো এই ভেবে যে, তোমার জীবন উৎসর্গের মধ্য দিয়ে কূপের চারপাশে দেয়াল নির্মাণের আন্দোলন শুরু হবে। ভবিষ্যতে আর কেউ কুয়োয় পড়ে মারা যাবে না।

সে হতাশ হয়ে ভাবলো, এখন তার কী হবে! কবে সরকার দেয়াল তুলবে আর ততদিনে সে মরে ভূত হয়ে যাবে! এর মধ্যে এলো এক বিদেশি সাহায্য সংস্থার ত্রাণকর্মী বা এনজিও কর্মী। কুয়োর ভেতরে তাকিয়ে লোকটিকে দেখে সে কিছু বলার আগেই নিজের ব্যাগ খুলে সেখান থেকে রশি বের করলো এবং একটা বালতি বেঁধে সেটা কুয়োর মধ্যে ফেলে দিলো।

কুয়োর ভেতরের লোকটি চিৎকার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলো। ত্রাণকর্মীকে দেখে প্রথমে সে বিরক্ত বোধ করলো। ভাবলো, আবার এসেছে একজন, এখন এর বক্তৃতা শুনতে হবে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলো লোকটি কিছু না বলে বালতি ফেলছে তাকে উদ্ধার করার জন্যে। ত্রাণকর্মী চিৎকার করে বললো, এটা ভালো করে ধর। আমি তোমাকে টেনে তুলবো, তোমার উঠতে হবে না, ওঠার কোনো চেষ্টাও করতে হবে না—বলেই ধীরে ধীরে ওপরে টেনে তুললো তাকে।

ওপরে ওঠার পর কৃতজ্ঞতায় লোকটি ঐ এনজিও কর্মীর পায়ে একেবারে লুটিয়ে পড়লো—আপনি দেবতা, আমাকে বাঁচিয়েছেন, আপনার ঋণ আমি জীবনেও শোধ করতে পারবো না।

এনজিও কর্মী মনে মনে হাসলেন আর ভাবলেন, হায়রে আহাম্মক! তুই কোনোদিন জানবিও না যে, এই কুয়োগুলো আমরাই এরকম করে রেখেছি। যাতে করে তোরা বংশানুক্রমে বার বার কুয়োয় পড়িস আর উদ্ধার করার নামে তোদের নিকর্মা করে আমরা দেবতার আসনে বসে শোষণ করতে পারি আর মেদভুঁড়ি বাড়াতে পারি।

**প্রশ্ন :** আমার স্বামী সবরকম চেষ্টা করার পরও পুঁজি এবং মানুষের একটু সহায়তার অভাবে কিছু করতে পারছে না। কী করবো?

**উত্তর :** কারো সহায়তার অপেক্ষায় থাকলে আপনার স্বামী কখনোই কিছু করতে পারবেন না। পুঁজি এবং সহায়তা তো এমনিতে পাওয়া যায় না। একে আকর্ষণ করতে হয়। নিজের ভেতরের শক্তি এবং বিশ্বাসকে জাগ্রত করতে হয়। আর সেজন্যে প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। সেইসাথে অর্জন করতে হবে অন্যদের গ্রহণযোগ্যতা এবং আস্থা। আর পুঁজি তো স্রষ্টাই আপনাকে দিয়ে দিয়েছেন। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখবেন, মস্তিষ্ক নামের এই পুঁজি যিনি যতটুকু ব্যবহার করতে পেরেছেন তিনি ততটুকু সফল হয়েছেন।

আসলে জীবন সবসময় শুরু করতে হয় যা আছে তাই নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের কথা ভাবুন। ১৯৭১ সালে যদি আমরা মনে করতাম যে, আমাদের কামান নাই, বিমান নাই, ট্যাংক নাই, সেনাবাহিনী নাই—আগে কামান আসুক, বিমান আসুক, ট্যাংক আসুক, সেনাবাহিনী তৈরি হোক তারপরে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবে। কেয়ামত পার হয়ে যেত, আমরা যে গোলাম ছিলাম সেই গোলামই থাকতাম। সেদিন আমরা কী করেছিলাম? যার যা আছে তা নিয়েই শুরু করেছিলাম এবং যখন কোনো ব্যক্তি বা জাতি যা আছে তা নিয়ে শুরু করে, বিশ্বাস নিয়ে শুরু করে তখন স্রষ্টার করুণা তার ওপরে বর্ষিত হয়। সে-ই জয়ী হয়। নয় মাসের এত অল্প সময়ে আমরা যে স্বাধীন হতে পেরেছিলাম, এটা এই কারণে।

নবীজী (স)-এর কাছে একবার একজন এসে বললো, কদিন ধরে সে খায় নি। নবীজী (স) কিন্তু তাকে ভিক্ষা দেন নি। তিনি তাকে কোনো ব্যাংক দেখিয়ে দেন নি যে, অমুক ব্যাংকে ক্ষুদ্রঋণ দেয়া হয়। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, তোমার ঘরে কী আছে? সে বলেছে, একটা কম্বলই আছে যেটা তার একমাত্র

সম্বল। নবীজী (স) বলেছিলেন—ঠিক আছে, কঞ্চলটি নিয়ে এসো। নিয়ে আসার পর তাকে বললেন, এটা বিক্রি করে অর্ধেক টাকা দিয়ে খাবার কিনতে আর অর্ধেক দিয়ে একটা কুড়াল কিনতে, যাতে জঙ্গলে কাঠ কেটে সে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।

অতএব আপনার স্বামীর উচিত হবে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা। দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করলে কীভাবে শুরু করতে হবে তা তিনি নিজেই বুঝবেন।

**প্রশ্ন :** যখন বন্ধুদের টাকাপয়সা বাড়ি-গাড়ি দেখি—আমার খুব হতাশ লাগে। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি যদি ওদের মতো সুযোগ-সুবিধা পেতাম জীবনে অনেক ভালো করতে পারতাম।

**উত্তর :** আসলে এই যে যদি—এটা হচ্ছে অলীক কল্পনা। যদি অমুকের ছেলে বা মেয়ে হতাম, অমুক বিখ্যাত ব্যক্তির ভাই বা বোন হতাম, তাহলে কতই না ভালো হতো, কত কিছুই না করতে পারতাম! এরকম চিন্তা করা আমাদের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা।

আমরা যখন স্কুলে পড়তাম তখন পূর্ব পাকিস্তানের শীর্ষ দশ ধনীর এক ধনীর ছোট ভাই আমাদের সাথে পড়তো। সে স্কুলে আসতো গাড়িতে করে। এখন তো শহরের যেকোনো স্কুলের সামনের রাস্তায় ছুটির সময় গাড়ির ভিড়ে ট্রাফিক জ্যাম লেগে যায়! কিন্তু তখন পুরো স্কুলে এই একটাই গাড়ি আসতো। ছেলেটার রেজাল্ট ছিলো মোটামুটি। তাকে গাড়িতে আসতে দেখে সহপাঠীদের কেউ কেউ বলতো, পোড়া কপাল আমার! আমার যদি এরকম একটা ভাই থাকতো! এত সুযোগ থাকতো! রেজাল্ট করে দেখিয়ে দিতাম!

তাদের রেজাল্ট কিন্তু ভালো হয় নি। কর্মজীবনে দুজনই হয়েছিলো কেরানি। কেন? তাদের চিন্তা শুরুই হয়েছে ‘যদি’ দিয়ে। এই যদিও আর পূরণ হয় নি, তাই বাকি যা যা তারা কল্পনা করেছে তার কিছুই ঘটে নি। অথচ যারা রেজাল্ট ভালো করেছে, ফাস্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ হয়েছে, তারা কিন্তু ঐ রকম ভাই ছাড়াই হয়েছে।

আসলে আপনি যেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেটাই আপনার বাস্তবতা। সেটাই আপনার বর্তমান। আপনাকে এখন চিন্তা করতে হবে—এই বর্তমান থেকে আপনি কীভাবে উন্নত ভবিষ্যতের দিকে যেতে পারেন।

আমরা অনেকে কল্পনা করি অতীত নিয়ে। যদি অমুক পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতাম, তাহলে আজকে আমার জীবন এরকম হতো। এটিও অলীক

কল্পনা। শুরু করতে হয় সবসময় বর্তমান থেকে। অতীত থেকে কেউ কখনো শুরু করতে পারে না।

এই অলীক কল্পনা, অলীক স্বপ্ন, অলীক প্রত্যাশা আমাদের সুযোগ ও সম্ভাবনাকে পুরোপুরি নষ্ট করে দেয়। আমাদের মস্তিষ্ক এই অলীক কল্পনাকে বাস্তব মনে করে এক ধরনের সুখানুভূতির মধ্যে থাকে। কিন্তু অলীক সুখের মধ্যে আপনি কিছুক্ষণের জন্যে হারিয়ে যাচ্ছেন। যখন বাস্তবে ফিরে আসছেন তখন অলীক কল্পনা আর থাকছে না এবং আফসোসের বৃত্তে আপনি বন্দি হয়ে যাচ্ছেন, এগুতে পারছেন না। আর জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ সময় অপচয় হয়ে যাচ্ছে। তাই অলীক কল্পনাকে সচেতনভাবে পরিহার করুন।

## চাওয়া বনাম যোগ্যতা

**প্রশ্ন :** আপনি সবসময় বলেন, নেয়ার জন্যে যোগ্য হতে হবে। কেমন যোগ্যতা একটু বুঝিয়ে বলবেন?

**উত্তর :** আসলে আপনার যে লক্ষ্য, যে মনছবি, সেটা অর্জনের জন্যে যে যোগ্যতা প্রয়োজন—সেটাই আপনাকে অর্জন করতে হবে। আপনি যদি প্রেসিডেন্ট হতে চান, আপনাকে রাজনীতির মারপ্যাঁচ বুঝতে হবে, যদি সফল লেখক হতে চান আপনাকে ভালো লিখতে শিখতে হবে, যদি খেলোয়াড় হতে চান ভালো খেলতে হবে—এটাই যোগ্যতা।

**প্রশ্ন :** অন্যের জন্যে দোয়া করলে অন্যের সফলতা আসে কিন্তু নিজের জন্যে এত দোয়া করছি সাফল্য আসছে না কেন?

**উত্তর :** একটি বিষয় সবসময় মনে রাখতে হবে যে, কর্ম ছাড়া প্রার্থনা কবুল হয় না। অন্যরা ঠিকমতো কাজ করছে, তাই তাদের জন্যে দোয়া করলে সাফল্য আসছে। আপনার দোয়াটা তাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে আপনি ঠিকমতো কাজ করছেন না, পাওয়ার প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করছেন না—তাই হচ্ছে না।

যেমন, আপনি বিয়ের প্রার্থনা করলেন, ভালো বিয়ে হোক। কিন্তু বিয়ের তো একটা প্রক্রিয়া আছে। বর বা কনে তো আকাশ থেকে নেমে আসবে না।

পরিচিতদের বলতে হবে। যারা এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ, যারা উদ্যোগ নিতে পারে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। যেমন, এক ছেলে, তার বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে। মা-বাবা বিয়ের কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না দেখে একদিন সে মাকে বললো, মা দেখ, অমুক অমুক (মায়ের পরিচিত কয়েকজনের নাম)-ওরা আমার চেয়ে বয়সে কত ছোট! তারপরও দেখ, একেকজন কীরকম বাবা হয়ে গেছে। মা তখন বুঝলেন, আরে, ছেলে তো তার নিজের বিয়ের কথাই বলছে। মা তখন ছেলের জন্যে পাত্রী দেখা শুরু করলেন।

অর্থাৎ আপনাকে চাইতে হবে এবং পাওয়ার প্রক্রিয়াতেও যেতে হবে। যেমন, কোয়ান্টাম শিষ্টকাননের জন্যে আমাদের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিলো। এজন্যে আমরা যদি ‘আল্লাহ টাকা দাও, আল্লাহ টাকা দাও’ বলে বসে থাকতাম তাহলে কী হতো? কিছুই হতো না। আমরা তাই অর্থ সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় গেলাম। হক্কুল ইবাদ মাটির ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ শুরু করলাম। অর্থাৎ প্রক্রিয়ায় না গেলে হবে না। এ নিয়েও সুফীদের গল্প আছে।

এক এলাকায় প্রবল বন্যায় ঘরবাড়ি, গবাদি পশু, মানুষ-সব ভেসে যাচ্ছে। এসময় একটি লোক আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে উদ্ধার কর। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল, একটি নৌকা আসছে। মাঝি লোকটিকে নৌকায় উঠে আসতে বললো। কিন্তু সে রাজি হলো না। বললো, নৌকার দরকার নেই। আল্লাহই আমাকে উদ্ধার করবেন। সে নৌকায় উঠলো না।

নৌকা চলে গেল। পানি আরো বাড়তে লাগলো। ঘরের অর্ধেকেরও বেশি ডুবে গেল পানিতে। লোকটি ঘরের মধ্যে চৌকি দিয়ে মাচা করে তার ওপর উঠে দাঁড়ালো। এর মধ্যে সেনাবাহিনীর পেট্রোল বোট অর্থাৎ স্পিডবোট এদিক দিয়ে যাচ্ছিলো। তাকে দেখে বললো, উঠে এসো। আমরা বন্যাদুর্গতদের উদ্ধার করছি। সে তাদের বোটেও উঠলো না। বললো, আমি আপনাদের সাথে যাবো না। আল্লাহই আমাকে উদ্ধার করবেন।

স্পিডবোট চলে গেল। পানি বাড়তে বাড়তে তার ঘরের চাল পর্যন্ত উঠে গেল। সে গিয়ে দাঁড়ালো চালের ওপর। এমন সময় ওপর দিয়ে আর্মির একটা হেলিকপ্টার তাকে দেখতে পেয়ে সাথে সাথে রশি ফেলে বললো, এই রশিটা ধর। আমরা তোমাকে উঠিয়ে নিচ্ছি। আমি রশি ধরবো না, আল্লাহই আমাকে উদ্ধার করবেন-এই বলে তার বাঁচার শেষ অবলম্বন হেলিকপ্টারটিকেও সে বিদেয় করে দিলো। পানি আরো বাড়লো এবং একপর্যায়ে পানি তাকেও ডুবিয়ে দিলো। হাবুডুবু খেয়ে শেষ পর্যন্ত সে মারাই গেল।

মারা গিয়ে ফেরেশতাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সে বললো, আমি আল্লাহকে এত ডাকলাম, অথচ তিনি আমার কথা শুনলেন না। ফেরেশতারা বললো যে, দেখ, আল্লাহ তো প্রথমে ডিঙি নৌকা পাঠালেন, তারপর স্পিড বোট পাঠালেন, তারপর হেলিকপ্টার পাঠালেন। কিন্তু তুমি কোনোটাতেই উঠলে না। তুমি যদি না ওঠো তাহলে আল্লাহ তোমাকে কীভাবে রক্ষা করবেন? অর্থাৎ আপনাকে মনছবি করতে হবে। সেইসাথে পাওয়ার প্রক্রিয়ায় কাজও করতে হবে।

**প্রশ্ন :** যোগ্যতা ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না এটা কি সঠিক? মানুষ কি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না? লটারি জেতে না?

**উত্তর :** আসলে যোগ্যতা ছাড়া যদি স্রষ্টা কিছু দিয়েও দেন সেটা আমরা ধরে রাখতে পারবো না। ইংল্যান্ডে ওয়ান মিলিয়ন পাউন্ড অর্থাৎ আমাদের টাকায় ১০ কোটি টাকা লটারি পেয়েছিলেন—এরকম ২৫ জনের সাক্ষাৎকার বিবিসিতে প্রচারিত হয়েছিলো। লটারি জেতার ১০ বছর পর প্রশ্ন করা হয়েছিলো, আপনার আজকের জীবন আর লটারি জেতার আগের জীবনে কী তফাত। এখন কত টাকা আছে আপনার কাছে? প্রত্যেকেই বলেছেন, কিছুই নেই। আগেও যেমন ছিলো এখনো তা-ই আছে। মাঝখানে কিছুদিন বড় বড় হোটেলে থেকেছি, ঘুরে বেড়িয়েছি। অর্থাৎ ১০ কোটি টাকা পেয়ে তারা তাদের ভাগ্যকে বদলাতে পারে নি। কারণ তাদের কোনো প্রস্তুতি ছিলো না। ফলে সেই টাকা তারা ধরে রাখতে পারে নি। ১০ কোটি টাকাকে পুঁজি বা সম্পদে রূপান্তরিত করতে পারে নি।

আবার জাতিগতভাবে দেখুন। আরবদের দিকে তাকান। তাদেরকে স্রষ্টা যে কী পরিমাণ সম্পদ দিয়েছেন—আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর, ১৯৭৩ সালে আরবরা তেল রপ্তানি বন্ধ করে দিলো। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম হু হু করে বেড়ে গেল। পরে তারা চড়াদামে রপ্তানি করতে রাজি হলো। প্রচুর টাকা উপার্জন করলো। কিন্তু এ টাকা দিয়ে নিজেরা কিছুই করতে পারলো না।

ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার আমেরিকান ব্যাংকে জমা করলো। আমেরিকান ব্যাংক থেকে এ টাকাগুলো তখন ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ হলো। ব্যাংকাররা যুক্তি দেখালো, অলসভাবে ফেলে না রেখে অন্যান্য জায়গায় বিনিয়োগ করলে ভালো লাভ পাওয়া যাবে। ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার



বিনিয়োগ করার পর দেখা গেল, সবগুলো খাত ছিলো অলাভজনক। লাভ তো পরের কথা, আসলই বরবাদ হয়ে গেল।

এর কারণ তাদের এ অর্থ কষ্টে উপার্জিত নয়। ইউরোপিয়ানরা যে অর্থ সঞ্চয় করেছে এর পেছনে কষ্ট আছে, শ্রম আছে। কিন্তু আরবদের অর্থের পেছনে পরিশ্রম নেই। পরিশ্রম যদি না থাকে, বুদ্ধি যদি না থাকে, মস্তিষ্কের ব্যবহার যদি না থাকে তাহলে আপনি যা পাচ্ছেন, সেটাকেও আপনি কখনো কাজে লাগাতে পারবেন না।

বাপ-দাদার সম্পদও আপনি রাখতে পারবেন না যদি যোগ্য না হন। অন্যরা তা ভোগ করবে। আপনি চেয়ে চেয়ে দেখবেন আর গান গাইবেন—আমি চেয়ে চেয়ে দেখলাম, তুমি চলে গেলে..। অতএব পাওয়ার জন্যে এবং সেই পাওয়াকে ধরে রাখার জন্যে যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে।

## ধারাবাহিকতা

**প্রশ্ন :** আমি কোনো কাজের আগে খুব ভালো পরিকল্পনা করতে পারি এবং কাজ শুরু করি। কিন্তু সেই কাজ শেষ করতে পারি না। নানা কারণে তা পরিপূর্ণভাবে শেষ করা হয় না। আমি এই সমস্যা থেকে মুক্তি চাই।

**উত্তর :** এটিও আমাদের একটা মৌলিক সমস্যা। শুরুতে আমাদের উৎসাহের কোনো অভাব হয় না। কিন্তু পরে আর আমরা ধারাবাহিকতা রাখতে পারি না। একদিন, দুইদিন, তিনদিন—কাজ করার পরে আবার আলস্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত লেগে থাকে। অতএব এ ব্যাপারে সচেতন থাকবেন। প্রয়োজনে নিজের জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। মনছবির সাথে একাত্মতা বাড়াবেন। যত মনছবির সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন তত ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সহজ হবে। আর একান্তই যদি ছেদ পড়ে যায় তাহলে আবার শুরু করুন। শিশু যখন হাঁটার চেষ্টা করে, সে বার বার পড়ে যায়। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সে হাঁটতে না পারে, সে বার বার উঠে দাঁড়ায়। আপনিও তেমনি বার বার শুরু করতে করতেই এগিয়ে যাবেন।

**প্রশ্ন :** কোনো একটা লক্ষ্য স্থির করে যখন এগুতে শুরু করি তখন বার বার বিক্ষিপ্ত হই। লক্ষ্যচ্যুত হই। কী করবো?

**উত্তর :** এখানেই সফল আর অসফলদের পার্থক্য। যারা সফল তারা কখনো বিশ্বাস হারায় না। তারা কখনো লক্ষ্যচ্যুত হয় না। বরং শত বাধা-বিপত্তিতেও তারা অবিচল থাকে তাদের লক্ষ্যে।

কবিগুরুর একটা বিখ্যাত কাব্যনাট্য ‘কচ ও দেবযানী’। এটা যে সময়ের কাহিনী তখন ত্রিভুবন দখল নিয়ে দেবতা আর অসুরদের মধ্যে লড়াই চলছিলো। ইন্দ্রপুরীতে ছিলেন দেবতাদের পরম পূজনীয় আচার্য বৃহস্পতি। আর অসুর সাম্রাজ্যে ছিলেন শুক্রাচার্য যার আবিষ্কৃত মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের গুণে অসুরেরা হয়ে উঠেছিলো অদম্য। কারণ এ দিয়ে মৃতকে জীবিত করে তোলা যেত। দেবতারা বৃহস্পতিপুত্র কচকে অনুরোধ করলো, সে যাতে শুক্রাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে মৃতসঞ্জীবনীর গুণবিদ্যা আয়ত্ত করার চেষ্টা চালায়।

কচ রাজী হলো এবং চলে গেল অসুররাজ্যের রাজধানীতে। শুক্রাচার্যের গৃহে বিদ্যাশিক্ষা করতে লাগলো আর সেই সময়ের রীতি অনুযায়ী গুরুগৃহের দৈনন্দিন কাজে সাহায্য করতো। কালক্রমে সদালাপী বিচক্ষণ বুদ্ধিমান চৌকস কচ পরিণত হলো শুক্রাচার্যের অন্যতম প্রিয় শিষ্যে।

তবে শুধু শুক্রাচার্য নয়, তার কন্যা দেবযানীর মনও জয় করে নিলো কচ। কচের সুমধুর সংগীত আর অপূর্ব চিত্রকলার প্রতি দেবযানীর মুগ্ধতা একসময় কচের প্রতি ভালবাসায় রূপান্তরিত হলো। কচের ব্যবহারেও দেবযানীর প্রতি অনুরক্ততা প্রকাশ পেতো। তবে তা ছিলো গুরুকন্যার প্রতি কচের স্রেফ শ্রদ্ধাভক্তিরই নিদর্শন—যাকে দেবযানী অনুরাগ ভেবে ভুল করেছিলো।

দেবযানী অপেক্ষা করছিলো কচের শিক্ষাজীবন তথা ব্রহ্মচর্য শেষ হওয়ার। কিন্তু সমস্যা হলো, অসুরেরা ইন্দ্রপুরবাসী কচের অসুররাজ্যে আগমনকে ভালোভাবে নেয় নি। তারা আশঙ্কা করলো, কচ হয়তো মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের খোঁজে এখানে এসেছে। পর পর তিনবার তারা কচকে হত্যা করলো। কিন্তু প্রতিবারই বাবার মৃতসঞ্জীবনীর গুণবিদ্যার সহযোগিতায় কচকে বাঁচিয়ে তুলতো দেবযানী।

ইতোমধ্যে কচের বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হলো। শুক্রাচার্য নিশ্চিত ছিলেন যে, কচ দেবযানীকে বিয়ে করে অসুররাজ্যে থেকে যাবে। কিন্তু কচ জানালো যে, সে ইন্দ্রপুরীতে ফিরে যাবে। গুরুর কাছে এলো বিদায়ী আশীর্বাদ নেয়ার জন্যে। শুনে দেবযানী তো অস্থির। সে কচকে তার ভালবাসার কথা জানালো এবং বিয়ে করতে চাইলো।

কিন্তু কচ তার সিদ্ধান্তে অটল—সে ফিরে যাবেই। দেবযানী নানাভাবে বোঝাতে লাগলো, আবেগ দিয়ে দুর্বল করতে চাইলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু

হচ্ছে না দেখে শেষমেশ জ্রুন্ধ হয়ে উঠলো। অভিশাপ দিলো, ‘যে বিদ্যার তরে মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার সম্পূর্ণ হবে না বশ। শিখাইবে কিন্তু পারিবে না করিতে প্রয়োগ। তুমি শুধু ভার বয়ে যাবে’। অর্থাৎ এই মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা অন্যকে শেখাতে পারলেও কচ নিজে কখনো এটা ব্যবহার করে কাউকে জীবিত করতে পারবে না।

কিন্তু এত বড় অভিশাপ পেয়েও কচ এতটুকু দমে গেল না। সে বরং দেবযানীকে বললো, ‘আমি বর দিনু দেবী তুমি সুখী হবে। ভুলে যাবে সকল গ্লানি বিপুল গৌরবে’। এভাবেই দেবযানীর ভালবাসা উপেক্ষা করে কচ চলে গিয়েছিলো ইন্দ্রপুরীতে তার কর্তব্য পালনে।

অর্থাৎ আপনার লক্ষ্য অর্জনের পথে যে বাধাই আসুক, যে প্রলোভনই আসুক-লক্ষ্যে আপনাকে অটল থাকতে হবে। আপনার মনছবি থেকে আপনাকে কেউ যেন টলাতে না পারে। আপনি আপনার লক্ষ্যে পৌছবেনই।

## দুর্দশার বৃত্ত

**প্রশ্ন :** ব্যবসায়ে একই ভুল বার বার করে ফেলি, যা প্রাচুর্যের প্রতিবন্ধক। ব্যক্তিগত জীবনেও বার বার একই ভুল হয়ে যায়।

**উত্তর :** এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। কথায় বলে, ন্যাড়া একবারই বেলতলায় যায়। কিন্তু আমরা বার বার বেলতলায় যাই। অর্থাৎ আমরা একই ভুল বার বার করি। একজন সফল মানুষ যে ব্যর্থ হন না, তা নয়। কিন্তু তিনি তার প্রতিটি ব্যর্থতা থেকে শেখেন। ব্যর্থতা তাকে হতোদ্যম না করে নতুনভাবে, নতুন কৌশলে কাজ করার উদ্দীপনা যোগায়। আর সাধারণ মানুষ ভুল থেকে শেখে না। একই ভুল বার বার করে।

এ নিয়ে মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডবের একটি ঘটনা আছে-রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে তারা। এমন সময় বড়ভাই যুধিষ্ঠিরের তেষ্ঠা পেলো। ছোটভাই গেল তার জন্যে পানি আনতে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি হ্রদ দেখতে পেয়ে যে-ই না আঁজলা ভরে পানি নিতে গেল, অমনি দৈববাণী শুনলো, থামো! পানি নেয়ার আগে তোমাকে একটি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। আর জবাব দিতে না পারলে তোমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

প্রশ্নটি হলো-জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য কী? ছোট ভাই জবাব দিতে পারলো না। সাথে সাথে মারা গেল। চতুর্থ, তৃতীয়, দ্বিতীয় ভাইও একে একে এলো এবং জবাব দিতে না পেরে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। সবশেষে এলেন যুধিষ্ঠির। এসে দেখলেন হ্রদের তীরে মৃত চার ভাইকে। তাকেও একই প্রশ্ন করা হলো। যুধিষ্ঠির জবাব দিলেন, ‘মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্য হলো, মানুষ কখনো ভুল থেকে শিখতে চায় না।’ যুধিষ্ঠিরের জবাব সঠিক ছিলো। দৈববাণী এলো, তুমি যা বলেছো তা ঠিক। আজলা ভরে পানি নিয়ে তোমার ভাইদের চোখেমুখে ছিটিয়ে দাও, তারা আবার প্রাণ ফিরে পাবে।

অর্থাৎ সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের প্রধান কারণ হলো, সে ভুল থেকে শেখে না। দৃষ্টিভঙ্গি বদলায় না। স্বভাব বা কৌশলের যে ত্রুটির কারণে সে বার বার ব্যর্থ হচ্ছে, সেগুলোকে শোধরাবার কোনো উদ্যোগ তার থাকে না। এবং সে একই ভুল বার বার করে।

যেমন, দৈনন্দিন জীবনেও মানুষ একই ভুল অভ্যাস, আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গিরই পুনরাবৃত্তি করে এবং সমস্যায় পড়ে। হয়তো স্বামী-স্ত্রী রাগারাগি বা ঝগড়া করছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই ঝগড়া-মনোমালিন্য একই ইস্যু নিয়ে, একই প্যাটার্নে। একজন ছাত্র/ ছাত্রী পরীক্ষায় খারাপ করছে-হয়তো অমনোযোগের কারণে, সময় নষ্ট করার কারণে বা বিশেষ কোনো ভুলের কারণে। ভালো রেজাল্ট করতে চাইলেও এই ভুলগুলো সে শোধরাচ্ছে না।

আবার কেউ হয়তো সময় মেনে চলে না। এর জন্যে অনেক বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়লেও যে কারণগুলোর জন্যে তার দেরি হয় সে কারণগুলো সে দূর করছে না। এবং বার বার সময়মতো কাজ না করার ভোগান্তি পোহাচ্ছে। কেউ হয়তো প্রেমে পড়েছে এবং নানা অশান্তি ভোগান্তির মধ্য দিয়ে সম্পর্কটা ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু এই দুর্ভোগ থেকে সে শিক্ষা নিচ্ছে না। কিছুদিন পরই সে হয়তো একই ধরনের ছেলে বা মেয়ের পাল্লায় পড়ে একই রকমভাবে প্রতারিত হচ্ছে।

কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ ভুল থেকে শেখে এবং কার্যকারণ বুঝতে পারে যে, কেন এটা হচ্ছে? ভুলগুলো বিশ্লেষণ করে সমস্যাকে তারা উৎপাটন করে মূল থেকে। আর এর জন্যে মেডিটেশন হলো সবচেয়ে ভালো উপায়। মেডিটেশনের গভীর তন্ময়তায় সে তার ভুল বুঝতে পারে, শোধরাতে পারে। বেরোতে পারে ভুলের বৃত্ত থেকে। তাই আপনি সচেতন হোন। আপনার ব্যর্থতাগুলোকে বিশ্লেষণ করুন। দেখুন, কোন কোন কারণে সমস্যা হচ্ছে। সেটা কি আপনার আচরণ দৃষ্টিভঙ্গি সিদ্ধান্ত কর্মপন্থা বা কর্মকৌশলের কোনো

ভুলের কারণে? না কি অন্য কিছু। ভুলগুলোকে শুধরে নতুন কর্মকৌশল, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করুন। আপনি সফলতার মুখ দেখবেন।

**প্রশ্ন :** বুকে হাত রেখে আমরা কেউ জোর গলায় বলতে পারবো না যে, একই ঘটনায় আমরা বার বার ভুল করি না। এর থেকে বেরোনোর পথ বলে দিন, তাহলে আর ভুল করবো না।

**উত্তর :** আমাদের মৌলিক ত্রুটি হচ্ছে, আমরা অভ্যাসে বা বদ-অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে যাই, কনডিশনড হয়ে যাই। প্রতিটি কাজ আমরা অভ্যাসবশত করি, সচেতনভাবে করি না। যখন আমরা খাই, তখন অভ্যাসবশত খাই। যে আচরণ করি, তা অভ্যাসবশত করি।

কাজেই, সচেতন হবেন—কী করছেন তার প্রতি। এটাতে মনোযোগ দেবেন। আপনি যখন কোনো মহিলার প্রশংসা করছেন, সচেতন হোন যে, কী বলছেন। যা বলছেন তা কি সত্যি, আগে কি কখনো এমন বলেছেন? যখনই সচেতন হবেন, একটা বাঁকুনি খাবেন। যখন রাগ করছেন—একবার ভাবুন, এরকম কারণে আগেও রেগেছেন কি না, এই ব্যক্তির সাথেই রেগেছেন কি না। সচেতন হওয়ামাত্র আপনি ভুলের পুনরাবৃত্তি রোধ করতে পারবেন।

আবার সন্তান প্রত্যেকবার একই ভুল করছে আর আপনি বার বার একই কারণে রাগ করছেন। এতে সন্তানের ভুলের পরিমাণ আরো বেড়ে যাচ্ছে। কারণ সে যে আচরণ এর আগেও করেছে, আপনি তার প্রতিক্রিয়ায় একই আচরণ করছেন। ফলে তার কাছ থেকেও পাচ্ছেন একই আচরণ। কাজেই এবার তাকে একটু অন্যভাবে বলেন। দেখবেন, একটু হলেও তার মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে। সে ভাববে, বাবা তো এখন অন্যপথ নিয়েছে।

অতএব, পুরনো ভুল করা যাবে না। একই ঘটনায় আপনি কখনো একই কাজ করবেন না। নতুন কিছু, ভিন্ন কিছু করবেন। তাহলেই দেখবেন, একই ভুলের পুনরাবৃত্তি আর হচ্ছে না। আসলে যারা ভাগ্যবান তারা বুদ্ধিমানের কাছ থেকে জেনেই শিখে ফেলে। যাদের ভাগ্য এত সুপ্রসন্ন নয়, তাদের শিখতে হয় প্রতিটি ধাপে হাঁচট খেয়ে খেয়ে।

**প্রশ্ন :** আমি একই ভুল একবার দুবার না, পাঁচবার করেছি। কিন্তু যতবারই বলি ‘আর করবো না’—ততবারই করি এবং প্রতিবারই কসম কেটে বলি, এই শেষবার। আমার এ ভুল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে কী করবো?

**উত্তর :** আসলে অবচেতনভাবে আমরা শিখতে চাই না, শিখতে জানি না। অনেক সময় অজ্ঞ থাকটাও কারো কারো অভ্যাসে রূপান্তরিত হয়। জন্মের পর পারিপার্শ্বিকতা থেকে যা আমরা দেখেছি, বুঝেছি—এর থেকে আমাদের মধ্যে যে ধারণা গড়ে উঠেছে, আমাদের মস্তিষ্ক সেই ধারণাকেই জ্ঞান বলে মনে করে।

একবার দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল এক আলোচনা সভায় পৃথিবী যে গোল এবং তা যে সূর্যের চারদিকে ঘোরে, সে কথা বলছিলেন। সে অনুষ্ঠানে শ্রোতা হিসেবে ছিলেন এক বৃদ্ধা। আলোচনার পর তিনি বার্ট্রান্ড রাসেলকে পাকড়াও করলেন। বললেন, ‘যতকিছুই বল হে ছোকড়া, পৃথিবী বসে আছে একটা কচ্ছপের পিঠের ওপর’। বার্ট্রান্ড রাসেল তখন হেসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তা বুঝলাম, কিন্তু কচ্ছপটা বসে আছে কিসের ওপর’? বৃদ্ধাও হেসে বললেন, ‘জানতাম তুমি এটাই জিজ্ঞেস করবে। শোনো, ঐ কচ্ছপটাও বসে আছে আরেকটা কচ্ছপের ওপর। তার নিচে আরেকটা, তার নিচে আরেকটা। এভাবে যত নামতে থাকবে তত একটার পর একটা কচ্ছপই পাবে। ইটস্ টার্টলস্ অল দি ওয়ে’। অর্থাৎ ভ্রান্ত ধারণার শৃঙ্খল থেকে নিজে মুক্তি পেতে না চাইলে অন্য কেউ মুক্তি দিতে পারে না।

অর্থাৎ লার্নিং হাউ টু লার্ন—শিখতে হবে কীভাবে, সেটি জানতে হবে। আপনার কসম কাটার ব্যাপারটিও গালিবের সেই কবিতার মতো—যতবার কসম কাটি যে, তোমার কথা ভুলে যাবো ততবার আরো বেশি করে মনে পড়ে। কাজেই মুখে মুখে কসম কেটে কোনো লাভ নেই। কসম কাটতে হয় ভেতর থেকে। নিজের ভেতর থেকে যদি অনুভূতি আসে যে, এটা ভুল, এটা অন্যায়, এটা আমার করা উচিত নয়, তখনই আপনি এ ভুল থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন।

আর এজন্যে প্রয়োজন প্রশান্ত হওয়া। এ নিয়ে হযরত বাহাউদ্দিনের একটি গল্প আছে। একবার তিনি মুরিদদের নিয়ে বসে আছেন। এমন সময় একটি ছোট পাখি ঐ ঘরের ভেতর ঢুকে গেল—আর বেরোতে পারছে না। একবার এ দেয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে তো আবার ও দেয়ালে। এর মধ্যে পাখিটাকে সাহায্য করার জন্যে একজন মুরিদ উঠতে যাচ্ছিলেন, সাথে সাথে হযরত বাহাউদ্দিন তাকে বললেন—তুমি বস। তোমাকে কিছু করতে হবে না। শিষ্যরা একটু অবাক হলেন। পাখিটা ছটফট করতে করতে একসময় জানালার পাশে গিয়ে বসলো, হাঁপাতে লাগলো। যে-ই একটু স্থির হলো অমনি বাহাউদ্দিন একটা হাততালি দিলেন। চমকে উঠে পাখিটা বেরিয়ে গেল জানালা দিয়ে।

বাহাউদ্দিন তখন বললেন—দেখ, যখন পাখিটা ছটফট করছিলো, ওড়াউড়ি করছিলো, তুমি যত কিছু বোঝাতে চাইতে, সে বুঝতো না। যখন সে শান্ত হলো, নীরব হলো তখন আমার হাততালিতে সে চমকে উঠলো ঠিকই; কিন্তু চমকে উঠেই সে নতুন সত্য উপলব্ধি করলো যে, রাস্তা এইদিকে এবং সে বেরিয়ে গেল।

কাজেই মুক্ত হতে হলে, বৃত্ত ভেঙে বেরোতে হলে আগে স্থির হতে হবে, প্রশান্ত হতে হবে। নইলে বেরোনোর পথ খুঁজে পাবেন না। সবকটা জানালা খোলা থাকলেও আপনি বেরোতে পারবেন না, যদি আপনি জানালা না দেখেন, জানালা কোথায় তা না জানেন। আপনি নিয়মিত মেডিটেশন করুন। কোয়ান্টায়ন করুন। আশা করা যায়, আপনি সুফল পাবেন।

**প্রশ্ন :** সফলতার জন্যে অবশ্যই বৃত্ত ভাঙতে হবে, গন্ডি পেরোতে হবে। বিষয়টা ব্যাখ্যা করলে উপকৃত হবো।

**উত্তর :** সফল আর ব্যর্থ মানুষের পার্থক্য কোথায়? ব্যর্থ মানুষ সবসময় তার চেনা পথে চলতে চায়। সে কখনো অচেনা পথে অগ্রসর হয় না। সে ঢাকা যেতে চায় আবার খুলনাও ছাড়তে চায় না। যার ফলে খুলনায় থাকাও হয় না, ঢাকায়ও যাওয়া হয় না। অর্থাৎ আমরা সাফল্য চাই। কিন্তু যে আজন্মালালিত অভ্যাসের চক্রে পড়ে বার বার ব্যর্থ হই, সেই চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে চাই না। স্বভাবের গন্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে চাই না।

লালিত অভ্যাসের বৃত্ত, স্বভাবের গন্ডিকে নিজেরা বয়ে বেড়াই। এ প্রসঙ্গে একটি সুন্দর উপমা রয়েছে উপনিষদে। সেখানে বলা হয়েছে, মানুষ হচ্ছে মাকড়সার মতো। মাকড়সার জাল থাকে তার নাভিতে। মুখ দিয়ে সে জাল বোনে। যখন সে অন্য কোথাও যেতে চায় তখন জালটাকে নাভির ভেতর গুটিয়ে নেয়। নতুন জায়গায় গিয়ে একইভাবে জাল বোনে। সেখান থেকে অন্য কোথাও যাওয়ার সময় আবার জালটাকে তার নাভির ভেতর গুটিয়ে নেয়। আমরাও তেমনি আমাদের জালকে নিজেদের সাথে বয়ে বেড়াই।

আর সফল মানুষ সবসময় নতুন পথে চলতে চায়, নতুন পরিমন্ডল সৃষ্টি করে, অচেনা পথে যায়। ভ্রান্ত আচরণ-অভ্যাসকে দূর করে মুক্ত আচরণ-অভ্যাস সৃষ্টি করে। তাই সে সফল হতে পারে।

সাধারণ মানুষ বৃত্তকে চিহ্নিত করতে পারে না, সে এটাকে সরল পথই মনে করে। যেমন ধরুন, আপনি হয়তো বার বার চাকরিজীবনে হতাশ হয়ে

পড়ছেন, কারণ আপনার সহকর্মীরা আপনাকে ঈর্ষা করছে। আপনি মনে করছেন—এতে আপনার কিছু করার নেই, কারণ ঈর্ষাকারী তো আপনি নন, তারা। এখানে আপনার বৃত্ত হচ্ছে, এই ঈর্ষার মুখে প্রো-একটিভ না থেকে প্রভাবিত হয়ে পড়া। এটা যখন বুঝতে পারবেন তখন দেখবেন ক্ষুদ্র বা কষ্ট না পেয়ে আপনি স্বাভাবিক থাকতে পারছেন। কারণ চাকরিক্ষেত্রে এরকম ঈর্ষাকাতর দু'একজন সহকর্মী সবসময়ই থাকে। অতএব বৃত্ত ভাঙার জন্যে প্রথম প্রয়োজন বৃত্তকে চিহ্নিত করা।

এরপর বিশ্বাস করতে হবে—আপনি বৃত্তকে ভাঙতে পারবেন। সাহস করে বলতে হবে যে, বৃত্ত ভাঙার শক্তি স্রষ্টা আমাকে দিয়েছেন। আমাকে যে মেধা ও যোগ্যতা দেয়া হয়েছে তা অনন্য। আমি বৃত্ত ভাঙতে পারবো। আর ধৈর্যের সাথে লেগে থাকতে হবে।

বৃত্ত ভাঙতে না পারার আরেকটি কারণ হলো ভয়। আমরা আমাদের চেনা পরিমন্ডলের বাইরে যেতে ভয় পাই। অবচেতনভাবে পুরনো ব্যর্থতার বৃত্তে ঘুরপাক খেতেই নিরাপদ বোধ করি। ভয়ের মধ্যে একটি প্রধান বাধা হচ্ছে লোকভয়, অর্থাৎ কে কী বলবে। ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ ভয় থেকে আপনি যত বেরোতে পারবেন তত যে শেকল আপনাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে সেই শেকলকে ছিন্ন করতে পারবেন।

অর্থাৎ বৃত্ত ভাঙার জন্যে প্রয়োজন সাহস। সাহস এবং বিশ্বাস আবার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একজন বিশ্বাসী মানুষই সাহসী হতে পারে। যখন আপনি বিশ্বাসী হবেন, আপনি সাহসী হবেন। আর এ সবকিছুর জন্যেই প্রয়োজন নিয়মিত দুবেলা মেডিটেশন।

**প্রশ্ন :** মানুষের জীবন অসংখ্য অভ্যাসের সৃষ্টি যার অপর নাম বৃত্ত। আমি অসংখ্য ছোট ছোট বৃত্তে আবদ্ধ এবং এর স্বাভাবিক ফলাফল হলো—চরম ব্যর্থতা। কিন্তু এত বৃত্ত আইডেনটিফাই করেছি—এখন কোন বৃত্ত আগে ভাঙবো? একেকবার একেকটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। বৃত্ত ভাঙার এই বিশৃঙ্খলা কীভাবে দূর করবো বা এই বৃত্ত কীভাবে ভাঙবো?

**উত্তর :** যে বৃত্তটি ভাঙা সবচেয়ে সহজ, আগে সেটি ভাঙুন। একটি বৃত্ত ভাঙলে আপনার মধ্যে যে বিশ্বাসের সৃষ্টি হবে তা অন্য বৃত্তগুলি ভাঙতে সাহায্য করবে। কারণ, ভ্রান্ত বৃত্তগুলো সবসময় একটা আরেকটার সাথে জট পাকিয়ে থাকে। একটা একটা করেই সেগুলোকে ছাড়তে হয়।



## ঋণ ৯

### ঋণের জাল

**প্রশ্ন :** গুরুজী, শুনে খুব ভালো লাগলো যে, আপনি ঋণের ব্যাপারে আমাদের সচেতন করে দিচ্ছেন। আমার খুব নিকট এক আত্মীয়ের ভয়াবহ দুর্দশা দেখে ঋণের পরিণতি আমি খুব ভালোভাবে অনুভব করেছি। আমার মনে হয় সবারই এক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া উচিত।

**উত্তর :** আসলে আপনি বুদ্ধিমান যে, অন্যকে দেখে সতর্ক হয়েছেন। আমরা অধিকাংশই কিন্তু এ জায়গাতে ভুল করি। ভাবি, ওর ক্ষতি হয়েছে তাতে কী, আমি ঠিকই সামলে নেবো! এই করে করে আমরা ঋণের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলি। আর এই ঋণ যে কত করুণ পরিণতি নিয়ে আসে সেটার এক গল্প-মুন্সী প্রেমচাঁদের ‘একমুঠো গম’।

গ্রামের এক নিচু জাতের কৃষক শংকর। খুব সাদাসিধে ও গরিব। কারো সাতপাঁচে নেই। জানতো না কোনো প্রতারণা-চালাকি। পেলে আহার করতো, নইলে আধপেট খেয়েই শান্ত থাকতো। ঘরে কোনো দানাপানি না থাকলে শুধু পানি খেয়েই উদরপূর্তি করে ঘুমিয়ে পড়তো। একবার শংকরের বাড়িতে এক অতিথি এলো, রাত্রিযাপন করবে। তা-ও আবার কীরকম অতিথি-মাথায় লম্বা জটা, গায়ে গেরুয়া পোশাক, হাতে পিতলের বদনা, পায়ে খড়ম, চোখে চশমা-বিশালদেহী এক সাধুবাবা। দেখে ঐসব মহাত্মাদের কথা মনে পড়ে যারা বিত্তবানদের প্রাসাদে বসে তপস্যা করেন, দামি শকটে চড়ে পুণ্যস্থান পরিদর্শনে যান আর যোগসিদ্ধির জন্যে পুষ্টিকর আহারে অভ্যস্ত। এরকম অতিথিকে তো আর যবের আটা খাওয়ানো যায় না। তার জন্যে গমের আটা দরকার।

কিন্তু শংকর গমের আটা পাবে কোথায়? দৌড়ে গেল গ্রামের পুরোহিতের কাছে। তার কাছ থেকে সোয়া-সের গম ধার নিয়ে এলো। শংকরের স্ত্রী সে গম পিষে খাবার বানালা। মহাত্মা সাধু আহারের পর ঘুমিয়ে পড়লেন, সকালে শংকরকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

আগেকার দিনে ইমাম সাহেব বা ঠাকুর/ পুরোহিত ফসলের মৌসুমে সবার বাড়িতে বাড়িতে যেতেন। গ্রামের লোকজন তাকে ফসল থেকে ‘তোলা’ দিতো। শংকর তো সাদাসিধে গরিব মানুষ। প্রথা অনুসারে সে যখন ফসল

থেকে ‘তোলা’ দিলো তখন তার সঙ্গে সোয়া সের পরিমাণ ধারটুকুও মিলিয়ে দিলো। দিয়ে তো সে নিশ্চিত। এদিকে ঠাকুরও এ নিয়ে আর কিছু বলছেন না। অতএব শংকর নিশ্চিত হয়ে বসে আছে। এর মধ্যে সাত বছর পার হয়ে গেছে। শংকরের পরিবারেও কিছু বিপর্যয় এসেছে। ভাইয়ের সঙ্গে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে দুভাগ হলো। ভাগাভাগি করার ফলে দুজনে একটা করে বলদ এবং পাঁচ বিঘা করে জমি পেলো। এক বলদ দিয়ে তো আর জমি চাষ করা যায় না। ফলে যে ছিলো কৃষক সে হয়ে গেল ভূমিশ্রমিক।

একদিন সন্ধ্যায় ঐ ঠাকুর শংকরকে পথে আটকালো। বললো যে, কাল একবার এসো। তোমার গমের দেনা পরিশোধের নিষ্পত্তি করতে হবে। তোমার কাছে আমার সাড়ে পাঁচ মণ গম পাওনা রয়েছে। অথচ তুমি এ ব্যাপারে মোটেই সজাগ হও নি। শংকর তো অবাক-কবে আপনার কাছে গম ধার করেছি? ঠাকুর তাকে সাত বছর আগে ধার নেয়া সোয়া সের গমের কথা স্মরণ করিয়ে দিলো।

শংকর হতভম্ব হয়ে পড়লো। সে ঠাকুরকে ‘দেয়’ বার্ষিক ‘তোলা’ নিয়মিত শোধ করেছে। পূজাপার্বণে উৎসবে ভাগ্যগণনাকালে সর্বদা কিছু না কিছু উপহার দিয়েছে। অথচ ঠাকুর এখন এসব কী বলছেন! শংকর বোঝানোর চেষ্টা করলো-ধার নেয়া গমের বেশিরভাগটা সে প্রথম সুযোগেই শোধ করেছে। আর বাকিটা একটু একটু করে প্রতিবছরই সে দিয়ে দিয়েছে।

ঠাকুর জবাব দিলো, উপহার এক জিনিস আর হিসাব আরেক জিনিস। সোয়া সেরের জায়গায় ২৫ সের দাও-সেটা উপহার। কিন্তু হিসাব ঐ সোয়া সের। হিসাব অনুসারেই তা বেড়ে সাড়ে পাঁচ মণ হয়েছে। তুমি যেকোনো লোককে নিয়ে আসতে পারো। সে তোমাকে হিসেব কষে বুঝিয়ে দেবে। গম ফেরত দিলে নাম কেটে দেবো, নইলে হিসেব চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকবে।

বিস্ময়ে-হতাশায়-দুর্ভাবনায় শংকর দিশেহারা হয়ে পড়লো। ঠাকুর তাকে নরকের ভয় দেখালো। সরল মানুষ শংকর, এই জীবনে এত কষ্ট পেয়েছে, পরের জীবনে যাতে আর কষ্ট করতে না হয় সেজন্যে বললো, ঠাকুর! এখন আমার কাছে দেয়ার মতো কিছু নেই। কারো কাছে ধারকর্জ করে না হয় আপনার পাওনা শোধ করে দেবো।

সাত বছর কেটে গেছে। এখন আর ঠাকুর একদিনের জন্যেও অপেক্ষা করতে রাজি নয়। বললো, যদি গম ফেরত দিতে না পারো তাহলে ঋণ স্বীকার করে দলিল লিখে দাও। শংকরকে তা-ই মেনে নিতে হলো।

দলিল লেখা হলো। গমের বর্তমান বাজার দর হিসেবে ঋণের পরিমাণ

ধার্য হলো ৬০ টাকা। এর ওপরে আবার ৩% সুদ। দলিলে শর্তারোপ করা হলো যে, এক বছরের মধ্যে ঋণ শোধ করতে না পারলে সুদের হার শতকরা সাড়ে তিন ভাগে উন্নীত হবে। দলিল রেজিস্ট্রি এবং স্ট্যাম্প বাবদ ব্যয় এক টাকা আট আনা শংকরকেই বহন করতে হবে।

পরবর্তী একবছর খেয়ে না খেয়ে তিল তিল করে শংকর জমালো তথাকথিত পাওনার আসল বাবদ ৬০টি টাকা। কিন্তু তাতেও পুরোহিতের মন ভরলো না। বললো, আসল তো দিচ্ছে, কিন্তু এর যে সুদ হয়েছে ১৫ টাকা, সেটা কে দেবে শুনি? কিন্তু ঐ মুহূর্তে সুদের টাকা দেয়ার সামর্থ্য শংকরের ছিলো না। সে বললো, দেখি, ধারদেনা করে দিতে পারি কি না। কিন্তু তার মতো চালচুলোহীনকে ধার কে দেবে? সুদের টাকা আর দেয়া হলো না।

এদিকে এসব কারণে শংকর মানসিকভাবে ভেঙে পড়লো। আগে কাজে যে উদ্যম ছিলো তা হারিয়ে গেল। তামাক খাওয়ার অভ্যাস ছিলো তার। এখন মাদকও নিতে শুরু করলো। ঋণশোধ নিয়ে এখন আর সে চিন্তিত নয়। যেন তার এক পয়সাও দেনা নাই। একসময় যে শংকর জ্বর নিয়েও কাজ করেছে, এখন একটুতেই কাজে না যাওয়ার বাহানা খোঁজে সে।

এভাবে কেটে গেল আরো তিন বছর। এর মধ্যে ঠাকুর একবারও তাকে তাগাদা দেয় নি। তিন বছর পর আবার তাকে ধরলো। কারণ তখন সুদের টাকার ওপরেও সুদ হচ্ছে। শংকর বললো, ঠাকুর! এখন আমার কাছে একটি পয়সাও নেই। কিছুই দিতে পারবো না।

ঠাকুর বললো, তাহলে আমার মজুর হিসেবে কাজ কর। বিনা পারিশ্রমিকে আমার ক্ষেতে কাজ করে তোমাকে সুদের টাকা উসুল করতে হবে। আর আসল দেনা শোধ করবে অন্যত্র কাজ করে। জামানত ছাড়া এই বিরাট অঙ্কের পাওনা হারানোর ঝুঁকি আমি নিতে পারবো না।

শংকর বললো, আমি যদি আপনার জমিতে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করি তাহলে খাবো কীভাবে? আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যারাই বা কী খাবে? ঠাকুর বললো, আমি তোমাকে সকালে আধাসের বার্লি দেবো, পরনের জামা দেবো, আর গায়ে দেয়ার জন্যে কম্বল দেবো। আর কী চাও তুমি?

শংকর বললো, এ তো আজীবন গোলামির সমতুল্য। ঠাকুর বললো, এটাকে তুমি চাকরি, গোলামি যা খুশি বলতে পারো। কিন্তু আমার দেনা শোধ না করে তুমি কোথাও যেতে পারবে না। তুমি পালালে তোমার ছেলেকে ধরে আনবো। সে পালালে তার ছেলেকে ধরে আনবো।

গল্পের উপসংহারটা এরকম-শংকর আর বেঁচে নেই। ২০ বছর আগে

ধরার মায়া ত্যাগ করে সে পরপারে চলে গেছে। কিন্তু ১২০ টাকা ঋণের বোঝা থেকে এখনো মুক্তি পায় নি। পুরোহিত ঠাকুর অবশ্য এত নিষ্ঠুর নন। পাছে ঋণের দায়ে গরিব বেচারাকে নরকে কষ্ট পোহাতে হয়, তাই তাকে তিনি মুক্তি দিয়েছেন। বিনিময়ে শংকরের সদ্য যুবক হয়ে ওঠা ছেলেকে এখন তার বাড়িতে বেগার খাটে। একমাত্র ভগবানই জানেন—কবে সে বাবার দায় থেকে মুক্তি পাবে।

আসলে এটাই হলো বাস্তবতা। একজন মানুষ, একটা এনজিও বা ব্যাংক কেন ঋণ দেবে আপনাকে? আপনাকে স্বাবলম্বী করার জন্যে? কক্ষনো না। সে ঋণ দেবে কারণ, এই টাকা থেকে প্রতিমাসে সে মুনাফা চায়। আপনি যদি ঋণ শোধ করে ফেলতে পারেন, তার মুনাফা তো শেষ হয়ে গেল। তাই সে সবসময় আপনাকে ঋণ জর্জরিত করে রাখবে।

আজকাল ব্যাংকগুলো কী করছে? কত রকম কথা—‘আপনার স্বপ্নের বাড়ি আপনার হয়ে যেতে পারে’—খালি অমুক ব্যাংক থেকে একটা লোন নিলেই হলো! গাড়ির ঋণ শেষ হতে না হতে বাড়ির ঋণ দিয়ে দেবে। যাতে সবসময় ঋণ জর্জরিত থাকেন আর ব্যাংক সেই টাকার ওপর মুনাফা করতে পারে। এসব ঋণ যারা-ই নেয়, শোধ দিতে দিতে তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। গাধার মতো পরিশ্রম করে, কিন্তু সবসময় ঋণ জর্জরিতই থাকে। অনেকেই হতাশা ও আতঙ্ক সহ্য করতে না পেরে বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ। চাষী শংকরের ভারতে বর্তমানে কৃষকদের অবস্থা এর চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়।

পি সাইনাথের একটি প্রতিবেদনে উঠে আসে তারই বিস্তারিত। লেখাটির শিরোনাম ছিলো—ভারত : ইতিহাসের বৃহত্তম কৃষক-আত্মহত্যা। এতে বলা হয়, ১৯৯৭ থেকে ২০০৭ সাল অবধি ভারতে কৃষকদের আত্মহত্যার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক লাখ ৮২ হাজার ৯৩৬। এর তিন ভাগের দুই ভাগই ঘটেছে পাঁচটি রাজ্যে : মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে। অন্যান্য রাজ্যেও বাড়ছে কৃষকদের আত্মহত্যার হার। খেয়াল করার বিষয়, যে সময়ে ভারতে কৃষক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে, সেই সময়ে তাদের মধ্যে আত্মহত্যার হারও বাড়ছে। ১৯৯১-২০০১-এর মধ্যে প্রায় ৮০ লাখ কৃষক চাষাবাদ ছেড়ে অন্য পেশায় চলে গেছে।

আত্মহত্যার এই পরিসংখ্যান সরবরাহ করেছে সরকারি প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো (এনসিআরবি)। তারা হয়তো কোনো কারচুপি করে নি। কিন্তু রাজ্য পর্যায়ে যেখানে এই তথ্যগুলো জমা হয়, সেখানে হাজার হাজার আত্মহত্যাকারীকে কৃষক সংজ্ঞা থেকে বাদ দিয়ে সংখ্যাটি কমিয়ে দেখানো

হয়। যেমন, কিশানিদের আত্মহত্যা কে এর মধ্যে ধরা হয় নি। এরকম আরো অনেককেই কৃষক আত্মহত্যার তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। ইতিহাসে সর্বাধিক আত্মহত্যার এই ঘটনাগুলো যখন ঘটছে, ঠিক একইসময় ভারত নব্য উদারনৈতিক দুনিয়ায় প্রবেশ করছে। মুক্তবাজার ও অর্থনীতির উদারীকরণের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কৃষি। বিশেষত ২০০১-এর পর আত্মহত্যার হার অনেক বেড়ে গেছে। ভারতে এখন প্রতি আঘণ্টায় একজন কৃষক বা কিশানি আত্মহত্যা করছে।

যারা এই পথ বেছে নিয়েছে তাদের মধ্যে কিছু মিল লক্ষ করা যায়। তার মধ্যে একটি হলো, এরা গভীরভাবে ঋণে নিমজ্জিত ছিলো। নব্য উদারনৈতিক নীতিমালা গ্রহণের প্রথম দশকে ঋণগ্রহীতা কৃষক পরিবারের হার ২৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৮.৬ শতাংশ হয়েছে। কোনো কোনো রাজ্যে ঋণগ্রহীতার সংখ্যা আরো বেশি। যেমন, অন্ধ্রপ্রদেশে ৮২ শতাংশ কৃষক পরিবারই ঋণগ্রস্ত। আর এর ফলটা বুঝতে পারবেন ন্যাশনাল সোশাল কোয়ালিশনের এই জরিপে-২০০১-'০৬ সালের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ১১ হাজার ৩৮৭ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে, যার কারণ কৃষিঋণ পরিশোধে ব্যর্থতা। কোয়ালিশন জানায়, ভারতে শুধুমাত্র ঋণের দায়ে প্রতিবছর আত্মহত্যা করেন এক হাজারেরও বেশি কৃষক। এর মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলের কর্ণাটক রাজ্যের অবস্থা ভয়াবহ, ছয় বছরে শুধু এই রাজ্যেই আত্মহত্যা করেছে পাঁচ হাজার ৯৮০ জন কৃষক। এছাড়া মহারাষ্ট্রে দুই হাজার ২৮০ জন এবং অন্ধ্রপ্রদেশে এক হাজার ১২৬ জন।

আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে দ্বিতীয় মিল হলো, তারা সবাই তুলা কফি মরিচ আখ ইত্যাদি অর্থকরী ফসল উৎপাদন করতো। কিন্তু আগে তারা খাদ্যশস্য-যেমন, ধান গম ভুট্টা ও যবের আবাদ করতো। নব্য উদারনৈতিক অর্থনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের কোটি কোটি কৃষককে খাদ্যশস্য উৎপাদনের চেয়ে অর্থকরী ফসল উৎপাদনে প্ররোচিত করা হয়। এর মূলমন্ত্র হলো রপ্তানিমুখী অর্থনীতি। অর্থকরী ফসল উৎপাদনের খরচ অনেক বেশি। বেশি পানি ও সার প্রয়োজন বলে কৃষককে অনেক বেশি ঋণ নিতে হয়। এ সবার ওপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে গুটিকয় বহুজাতিক কোম্পানির। অন্যদিকে বিশ্ববাজারে মূল্য ওঠানামার কারণেও তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অর্থকরী ফসল উৎপাদন কীভাবে কৃষকের ক্ষতি করে, তা বোঝার জন্যে কেরালা রাজ্যের একটি উদাহরণ দেয়া যাক। বর্তমানে এক একর জমিতে ধান চাষে খরচ হয় আট হাজার রুপি। কিন্তু তাদের অনেকেই যখন ভ্যানিলা

চাষ করতে গেল তখন তার একর প্রতি খরচ হলো ১৫ হাজার রুপি।

দানবীয় কোম্পানিগুলো এখন তাদের সস্তা হাইব্রিড বীজ অথবা দেশি জাতের বীজ সরিয়ে সেখানে দামি বীজ চালু করেছে। এসব করা হচ্ছে সরাসরি রাষ্ট্রীয় মদদে। \*মনসান্টোর জালে আটকা কোনো কৃষককে এখন তুলার বীজ কিনতে কল্পনাতেই খরচ করতে হয়। [\*মনসান্টো-আমেরিকাভিত্তিক বিশ্বের বৃহত্তম কৃষিবীজ ও প্রযুক্তি উৎপাদনকারী বহুজাতিক কর্পোরেশন]

১৯৯১ সালে এক কেজি তুলার বীজ কিনতে লাগতো সাত থেকে নয় রুপি। আর ২০০৬ সালে বহুজাতিক কোম্পানির বাজারজাতকৃত ৪৫০ গ্রামের এক প্যাকেট বীজের দাম বেড়ে দাঁড়ায় ৩৫০ রুপি। মনসান্টোর ভারতীয় শরিক কোম্পানির বাজারজাত করা ৪৫০ গ্রামের প্যাকেটের দাম এখন ১৬৫০-১৮০০ রুপি। যদিও সরকারি হস্তক্ষেপে এর দাম দাঁড়িয়েছে ৯০০ রুপি। সেটাও আগের দামের থেকে কয়েকশ গুণ বেশি।

গত এক দশকে এশিয়ার উদীয়মান ব্যাঙ্ক দেশগুলোতে বৈষম্যই হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রধানতম মানুষকে। এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে আত্মসী বাণিজ্যিকায়ন কৃষক ও ভূমিহীন মজুরের জীবনধারণের সব উপায় কেড়ে নিয়েছে। তাদের চিকিৎসাব্যয় বহুগুণ বেড়ে গেছে। সন্তানদের বড় অংশই বিদ্যালয়গুলো থেকে ঝরে পড়ছে। তারা গিয়ে কাজ করছে বাবার খামারে। খাদ্য কেনার পেছনেই চলে যাচ্ছে তাদের আয়ের বড় অংশ। ভারতের কোটি কোটি কৃষকই এখন সেখানকার খাদ্যবাজারের প্রধান ক্রেতা। অথচ আগে এর বড় অংশটাই তারা নিজেরা উৎপাদন করতো।

বিশ্বব্যাপী খাদ্যের দাম বেড়ে যাওয়া তাদের আরো নিঃশ্ব করে দিচ্ছে। খাদ্য উৎপাদকেরা নিজেরাই আজ ক্ষুধার সবচেয়ে বড় শিকার। ভারতের প্রখ্যাত কৃষি অর্থনীতিবিদ উৎসা পাটনায়ক দেখিয়েছেন, ১০ বছর আগের তুলনায় এখন একটি কৃষক পরিবার ১০০ কেজি কম খাবার পায়। অন্যদিকে খাদ্যের বাজারেও কর্পোরেশনগুলোর একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম হয়েছে। তারা তাদের ইচ্ছানুযায়ী মূল্য ঠিক করে। পাশ্চাত্যের দেশগুলোর বিপুল ভর্তুকিপ্রাপ্ত সস্তা কৃষিপণ্যের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় আমাদের কৃষকের ভর্তুকিহীন শস্য টিকতে পারে না। এখানেও বাজার তার সঙ্গে প্রতারণা করছে। কম সুদে ঋণদানকারী ব্যাংকগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেখানে ঢুকে পড়ছে ক্ষুদ্রঋণের ব্যাপারীরা। সরকারও কৃষিকে টিকিয়ে রাখার জন্যে আগে যে ভর্তুকি দিতো তা তুলে নিয়েছে। এ সবকিছু মিলে ছোট কৃষকের জীবনধারণ দিনকে দিন অসম্ভব হয়ে উঠছে। ফলে ৯০-এর পর প্রতিটি নতুন

বছরে কৃষকদের আত্মহত্যার হার বেড়েই যাচ্ছে। ভারতের এ কৃষি সংকটকে চারটি শব্দে বলা যায়—কর্পোরেট কৃষির দিকে যাত্রা। এর পথ হলো : গ্রামাঞ্চলের একটানা আগ্রাসী বাণিজ্যিকায়ন এবং এর ফল হলো : ইতিহাসের বৃহত্তম কৃষক উচ্ছেদ। এই কর্পোরেশনগুলো এখনো আমাদের কৃষিজমি বা কৃষির খুঁটিনাটি সব বিষয় সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে না। কিন্তু কৃষি যেসবের ওপর নির্ভরশীল যেমন—বাজারজাতকরণ, দাম নির্ধারণ, পানি প্রাপ্তি, সার, বীজ, কীটনাশক প্রভৃতি তাদেরই নিয়ন্ত্রণে। এসবের মিলিত ফল হলো, ইতিহাসের বৃহত্তম আত্মহত্যার চল। [ওপেন ডেমোক্রেসি থেকে ফার্নক ওয়াসিফ অনূদিত] এ করণ পরিণতি থেকে রক্ষা পেতে তাই ঋণ থেকে দূরে থাকুন।

## ক্ষুদ্র ঋণ

**প্রশ্ন :** মাইক্রোক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমাদের কীভাবে দেখা উচিত? এই জাতীয় ব্যবসায় জড়ানোর বিষয়ে আপনার মতামত কী?

**উত্তর :** আসলে মাইক্রোক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে দরিদ্ররা কতখানি উপকৃত হচ্ছে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। মাইক্রোক্রেডিট ব্যবস্থার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট অনেকেই পরবর্তীতে এই ধারণায় পৌঁছেছেন যে, ঋণশোধের জন্যে এহীতাদের যে শারীরিক মানসিক ও পারিবারিক ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয় তার তুলনায় এর আর্থিক সুফল নেহায়েতই নগণ্য।

৩১ জুলাই ২০০৭-এ দৈনিক ভোরের ডাকের খবর : ‘৩১৯ টাকার জন্যে একমাস ধরে জেলে’। এতে বলা হচ্ছে—‘যে দেশে হাজার হাজার কোটি টাকা মেরে দিয়ে এখনো অনেক নেতা-আমলা বুক ফুলিয়ে কথা বলে, দম্ভভরে চলাফেরা করে সে দেশে মাত্র ৩১৯ টাকা ঋণশোধ করতে না পারায় একজন গরিব কৃষক জেল খাটছেন একমাস ধরে। ভাবতে কষ্ট হয়। চকোরিয়া উপজেলায় এ ঘটনা ঘটেছে। গরিব কৃষক আজম খান। কোস্ট ট্রাস্ট নামে একটি এনজিও-র মাত্র ৩১৯ টাকা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে একটি মামলায় গ্রেফতার হন। একই সংস্থার ২,৩০৫ টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে জেল খাটছেন আরেক কৃষক বেলাল উদ্দীন। বর্তমানে ঋণভয়ে অনেকে গ্রামছাড়া।’

প্রথম আলোর একটা খবরের শিরোনাম—‘রাজশাহীতে নিম্নবিত্তের বিবাহবিচ্ছেদের পেছনে আছে ক্ষুদ্র ঋণ।’ এতে বলা হচ্ছে, রাজশাহীতে দুটো কারণে বিবাহবিচ্ছেদ হচ্ছে। একটি স্বামীর মাদকাসক্তি, এটা সমাজের সব



অংশের জন্যে প্রয়োজ্য। দ্বিতীয়টি ক্ষুদ্রঋণের টাকা পরিশোধ করতে না পারা। এটা শুধু নিম্নবিত্ত পরিবারের ক্ষেত্রে ঘটছে। মেয়েরা যেহেতু ঋণ পায়, স্বামীরা স্ত্রীকে দিয়ে ঋণ নেওয়ায় এবং খরচ করে। এরপর সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে নতুন স্ত্রী গ্রহণ করে।

আসলে জামানত ছাড়া যে ঋণ দেয়া হয় তা উদ্ধার করা হয় কীভাবে? পটুয়াখালীর এক সদস্য ঋণের কিস্তি দিতে পারে নি বলে গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মীরা তার পা ভেঙে দিয়েছে। সিঙ্গাইরে গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মীরা টাকা না পেয়ে কারো গরু নিয়ে গেছে, কারো নোলক নিয়ে গেছে। রংপুরে কিস্তির টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে এক সদস্য আত্মহত্যা করেছে। ঋণ নিয়ে এদের অবস্থা হচ্ছে, কোনো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পাওয়া জমিদারের জমিতে পেটে ভাতে কাজ করে তার বিনিময়ে পুরো ফসলটা জমিদারের গোলায় তুলে দেয়া। জমিদারের বরকন্দাজরা খুবই কড়া মনোভাবের। খাজনা না দিয়ে উপায় নেই এবং মহাজনী ঋণের সাথে এই ঋণের কোনো তফাত নেই।

গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তা সরদার আমিন তার ‘গ্রামীণ ব্যাংক ও ড. ইউনুস : একজন প্রত্যক্ষদর্শীর দৃষ্টিতে’ বইয়ে লিখেছেন, একটা সময়ে এসে তথাকথিত ধনী হয়ে ওঠা এই দরিদ্ররা ঋণের টাকায় ক্রয় করে টেলিভিশন, সাইকেল, ব্যবহার্য নানা উপকরণ আর বিয়েবাড়িতে দাওয়াতে গিয়ে উপহার দেয় বেশ দামি কোনোকিছু। অনেকটা জাতে ওঠার মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে যাতায়াত ও খাওয়াদাওয়ায় খরচ করে বেহিসেবী। আসলে বিষয়টা যেন এমন—কত যুগ বঞ্চিত থেকেছি, সব পুষিয়ে নেবো।

গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতার সংখ্যা হু হু করে বেড়ে ৯০ দশকের শেষে ২২ লক্ষ পরিবার হয়েছে। মাসে দেড় থেকে দুইশ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ হচ্ছে—রহস্যটা কী? ১৪ বা ১৫% সুদে টাকা নিয়ে কত ব্যবসায়ী, মিল মালিক সুদের ভারে পথে বসে আছে। আর নিদেনপক্ষে ২৬.৫০% সুদে টাকা খাটিয়ে গরিব মানুষ দিন দিন চাপা হচ্ছে কীভাবে?

কাজেই ক্ষুদ্রঋণ থেকে যত দূরে থাকবেন তত ভালো। দরিদ্র আছেন, খেতে পারছেন না—এটা একটা কষ্ট। আর লোন নিয়েছেন বলে সকাল-বিকাল পাওনাদাররা বাড়ি এসে হানা দিচ্ছে, জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে, লোকজন জড়ো করে গালি দিচ্ছে—এটা আরেকরকম।

আর ক্ষুদ্রঋণ নেয়া হচ্ছে কড়াই থেকে চুলোয় ঝাঁপ দেয়া। ঋণের জালে একবার জড়িয়ে পড়লে ঋণ ও সুদচক্র আপনাকে সর্বস্বান্ত করে ছাড়বে। এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে।



**প্রশ্ন :** আমাদের দেশের গরিব মানুষ, যাদের জামানত দেয়ার মতো কিছুই নেই তাদের স্বাধীন জীবিকার জন্যে ক্ষুদ্রঋণই কি একমাত্র পথ না? এসব লোকদের তো আগে কেউ ঋণ দেয় নি। যদি ক্ষুদ্রঋণ এতই খারাপ হয়, তাহলে এদের ভাগ্য কীভাবে পরিবর্তন হবে?

**উত্তর :** ক্ষুদ্রঋণ কি আসলেই আমাদের ‘ভাগ্য পরিবর্তন’ করেছে? এনজিও ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গত ২০ বছরে আমাদের দেশে ১৬ হাজার সাতশ ৪৩টি প্রকল্পে মোট যে ঋণ এসেছে তার পরিমাণ তিন লক্ষ সাত হাজার ২৬০ কোটি টাকা। অর্থাৎ আমাদের দুই বছরের বাজেটের চেয়ে বেশি। এটা হচ্ছে দৈনিক যুগান্তরের ৫ জুলাই, ২০১০-এর রিপোর্ট। এবং চার কোটি লোক এই ক্ষুদ্রঋণের আওতায় রয়েছে।

আওতায় থাকার পর কী অবস্থা হয়েছে? যেখানে ১৯৯৫ সালে সরকারি হিসেবে দারিদ্রসীমার নিচে ছিলো ২৩ শতাংশ মানুষ, সেখানে ২০০৫ সালে এই সংখ্যা হচ্ছে ৪৮ শতাংশ। এ কথাটাই কিছুদিন আগে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বললেন যে, ক্ষুদ্রঋণের ফলে দারিদ্রের পরিমাণ বেড়েছে আর এই ঋণ যারা বিতরণ করে তাদের উদরক্ষীতি ঘটেছে। কারণ যেখানে কোনো কমার্শিয়াল ব্যাংকে টাকা রাখলে ব্যাংক আপনাকে সাত/ আট শতাংশ রিটার্ন দেয়, সেখানে ক্ষুদ্রঋণে সুদের পরিমাণ হচ্ছে ২৩ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত!

আসলে পাশ্চাত্য দেশগুলো কী করে? তাদের বিক্রি করার মতো জিনিসও আছে, আবার টাকাও আছে। কিন্তু আপনার কাছে টাকা নাই। জিনিস যদি আপনার কাছে বিক্রি করতে না পারে তাহলে তো তাদের অর্থনীতি সচল থাকবে না। এজন্যে তাদের অলস টাকা তারা গরিব দেশে ইনভেস্ট করে। আসলে বাইরে থেকে যত ঋণ আসছে—সেটা গ্রামীণ ব্যাংকের হোক বা আইএমএফ-এর—সেটা কখনোই আমাদের সাহায্য করার জন্যে না, বরং তাদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্যে। কারণ যে অর্থ তারা দিচ্ছে সেটা আবার বহুগুণে বর্ধিত হয়ে তাদের ওখানেই চলে যাচ্ছে।

এখন আসি আমাদের দেশের মানুষের কথায়। আমাদের মতো গরিব দেশ—যেখানে জামানত দেয়ার মতো অবস্থাও নেই—সেখানে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হচ্ছে যাকাত। যাকাতের এই অর্থনৈতিক গুরুত্বের কারণেই আল্লাহ যাকাতকে ফরজ করেছেন এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

আসলে যাকাতের সিস্টেমটা কী? অর্থনীতিকে গতিশীল রাখার জন্যে টাকাটা দেশে মুভ করছে। একজন ধনীর ধনী থাকার জন্যে যাকাত দেয়া দরকার, কারণ অর্থনীতি গতিশীল না থাকলে তার ধন থাকবে না। বৈদেশিক সাহায্য এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্যটা এখানেই যে, যাকাত একজন মানুষকে স্বাবলম্বী করে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করে আর বৈদেশিক সাহায্য একজন মানুষকে ঋণী করে দেশের অর্থনীতিকে দুর্বল করে দেয়।

এ ধারণা থেকেই কিন্তু আমরা যাকাত ফান্ড করেছি। আর আমাদের যে ‘স্ব-নির্ভরায়ন’ প্রকল্প, সেটা এই যাকাতের অর্থ দিয়েই চলছে। এই ফান্ড থেকে অনেককে আমরা ইতোমধ্যেই স্বাবলম্বী করতে পেরেছি। কারণ আমরা কখনো চাই না—একজন মানুষ সারাজীবন অন্যের টাকায় ভর করে চলুক। আমরা চাই—সে কাজ করুক এবং আগামী বছর নিজে যাকাত দেয়ার মতো সমর্থ হোক।

এবার আপনাকে একটা পরিসংখ্যান দেই যে, কীভাবে আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন সম্ভব। বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতি হচ্ছে পৃথিবীর ৪৮ তম বৃহৎ অর্থনীতি। যেখানে ২০ বছর আগে আমাদের চেয়ে গরিব রাষ্ট্র ছিলো শুধু ভুটান বা নেপাল, সেখানে কিন্তু আমরা এখন বিশ্বের ৪৮ তম অর্থনৈতিক দেশ এবং আমাদের জিডিপি হচ্ছে ২২৫ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ১৫ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকা।

এখন আমাদের গ্রোথ রেট ৫% এবং হিসেব করে দেখা গেছে যে, এটা যদি ৭%-এ চলে যায় তাহলে ২০২৫ সালে বাংলাদেশ বিশ্বের ২২তম ইকোনমিক পাওয়ারে রূপান্তরিত হবে। এটাকে যদি আমরা ১০%-এ নিয়ে যেতে পারি তাহলে আমরা আরো এগিয়ে যাবো; আর ১০%-এ নেয়াটা এমন কোনো কঠিন কিছু নয়। মালয়েশিয়ার গ্রোথ রেট হলো ১২%।

এ নিয়েও মজার ঘটনা আছে। কুয়ালালামপুরে এক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ভাষণ দিচ্ছিলেন। তার বক্তব্যের উপজীব্য ছিলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর গ্রোথ রেট কীভাবে বাড়ানো যায়। অনেকক্ষণ ভাষণ দিলেন—এশিয়ান দেশগুলোকে এই করতে হবে, সেই করতে হবে। এরপর দাঁড়ালেন মাহাতির মোহাম্মদ, তিনি তখন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী। তিনি বললেন, ‘আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা এশিয়ার দেশ। এজন্যে এমন দেশের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে আমাদের পরামর্শ নিতে হচ্ছে যাদের গ্রোথ রেট হচ্ছে ৪%, যেখানে আমাদের গ্রোথ রেট ১২%!’

কাজেই গ্রোথ রেট বাড়ানোটা এমন অসম্ভব কিছু না। এখন আমাদের

বার্ষিক যাকাত ২৫ হাজার কোটি টাকার ওপরে হয়। আমরা যদি ১০০ কোটি টাকার একেকটা সমন্বিত কৃষি-পশু সম্পদ প্রকল্প করি হয় তাহলে প্রতিবছর ২৫০টা প্রকল্প আমরা করতে পারবো। যদি ঠিকমতো চালানো যায় তো তিন বছরে সমস্ত মূলধন উঠে আসবে। তখন ঐ টাকা দিয়ে আবার আরেকটা প্রকল্প করা যাবে। কাজেই দেশের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে যাকাতই যথেষ্ট, এর জন্যে ক্ষুদ্রঋণের কোনো দরকার নেই।

**প্রশ্ন :** আমার প্রশ্নটা ড. ইউনুসকে নিয়ে। একজন মানুষ যদি এত খারাপ কাজই করতেন, তিনি কি কখনো নোবেল পেতেন? তার সমালোচনা করাটা কতটা যুক্তিসঙ্গত?

**উত্তর :** আসলে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নাই, কোনো ক্ষোভ নাই। আমাদের বক্তব্য একটা সিস্টেমের বিরুদ্ধে, তার প্রণীত পদ্ধতির বিরুদ্ধে। এটা যদি মানুষের জন্যে কল্যাণকর হতো আমরা সবসময় তা সমর্থন করতাম। কিন্তু অকল্যাণকর হলে, যে যা-ই বলুক-তিনি যে স্তরেরই মানুষ হোন না কেন-আমরা সবসময় সেটার বিপক্ষে। ক্ষুদ্রঋণের ক্ষতিকর দিক নিয়ে ইদানীং মিডিয়া হাইচাই করলেও এ ব্যাপারে আমরা কিন্তু বলে আসছি গত ২০ বছর ধরে।

সেদিন একটা খবর দেখলাম, জোবরা গ্রামের সুফিয়া, যিনি ঐ গ্রামের প্রথম ঋণ নেয়া মহিলা, তার ঘর নাকি এখন এত নড়বড়ে হয়ে গেছে যে, বর্ষাকালে তাকে অন্যের বাড়ি গিয়ে থাকতে হয়! যারা ডকুমেন্টারি নির্মাণ করতে গিয়েছিলেন, তারাও ওখানে গিয়ে পাকা ঘর দেখেন নাই, জীর্ণ-শীর্ণ ঘর দেখেছেন। সুফিয়ার মতো অন্য ঋণগ্রহীতাদের প্রায় সবার মুখে একই কথা শুনেছেন। প্রত্যেকেই একাধিক ক্ষুদ্রঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন এবং সেই ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে সবার প্রাণান্তকর অবস্থা-কেউ বাড়ি বিক্রি করেছেন, কেউ গরু বিক্রি করেছেন। আবার সাপ্তাহিক কিস্তি শোধ করতে না পারায় কারো ঘরের টিন খুলে নিয়ে গেছে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ এদের সাথে আগেকার দিনের গ্রাম্য মহাজনের কোনো তফাত নাই। এরা হচ্ছে আধুনিক স্যুট-প্যান্টধারী মহাজন।

ব্যাপারটা আমরা আরেকটু সহজভাবে দেখতে পারি। এ পর্যন্ত আমাদের দেশে তিন লক্ষ সাত হাজার কোটি টাকা এসেছে ঋণ দেয়ার জন্যে। এই টাকাটা যদি আসলেই মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে ব্যয় করা হতো তাহলে

আজকের অবস্থা কিন্তু এমন হতো না। ধরুন, এ টাকা দিয়ে যদি আমরা ১০০ কোটি টাকার একেকটা প্রকল্প করতাম তাহলে অন্তত তিন হাজার প্রকল্প হতে পারতো। এবং প্রত্যেকটা উপজেলায় ১০টা করে প্রকল্প হতো এবং প্রত্যেক উপজেলায় এক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হতে পারতো।

এ বিনিয়োগ যদি কৃষিজ-বনজ-ফলজ খাতে ব্যয় হতো তাহলে আজকে তো গরিব লোকই খুঁজে পাওয়া যেত না! তখন শহরে আসার লোক কমে যেত। তারা ভাবতো যে, গ্রামে যাই-ওখানে উপার্জন বেশি। অতএব যারা বিদেশ থেকে ঋণ পাঠায় তারা কখনোই আমাদের স্বাবলম্বী করার জন্যে ‘সাহায্য’ পাঠায় না। তারা ঋণ পাঠায় আমাদের গোলাম বানিয়ে রাখার জন্যে এবং ঐ টাকার ওপর মোটা অঙ্কের মুনাফা করার জন্যে।

ক্ষুদ্রঋণের বিড়ম্বনা নিয়ে ভাষাসৈনিক ও গবেষক আহমদ রফিক এক বিশ্লেষণমূলক নিবন্ধ লিখেছেন। এর অংশবিশেষ হচ্ছে—

কিছু বেসরকারি জরিপের সূত্রে দেখা যায়, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ ভূমির মালিকানা মাত্র ১০ শতাংশ ধনী কৃষক বা ব্যবসায়ী অথবা কৃষক-ব্যবসায়ীর হাতে। আর ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা .... ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ। এ জনসংখ্যার মধ্যে ৪৬ শতাংশ নারী, যারা বেঁচে থাকার প্রয়োজনে ঋণদান সংস্থার কাছে ছুটে যায়, বুঝে বা না বুঝে (গ্রামীণ বেওয়া)। তারপর যা ঘটান ঘটে।

এরাই ঋণ সংস্থার শিকারীদের ‘টার্গেট গ্রুপ’। কারণ এদের খুব সহজে সচল জীবনের স্বপ্ন দেখানো যায়, আর এদের কাছ থেকে জবরদস্তি সুদ আদায়ের কাজটা খুব সহজে করা যায়। সুদের টাকা দিতে না পারলে ছাগলটা কিংবা নিদেনপক্ষে হাঁসটা-মুরগিটা কজা করতে বা চালের টিন খুলে নিতে কোনো অসুবিধা হয় না। শক্ত হাতে বাধা দেয়ার ক্ষমতা এ অসহায় মহিলাদের নেই।

গ্রামের ঐ যে শক্তিমান ১০ শতাংশ মানুষ, তারাই গ্রামের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে, গ্রামীণ সমাজ পরিচালনা করে থাকে। .... ঋণদান সংস্থাগুলো বুঝেবুঝেই তাদের হাতে ঋণ বা ঋণের সুদ আদায়ের দায়িত্ব তুলে দেয়। ....

গ্রামীণ গরিবি দশা এতটাই প্রকট যে, ওই গরিবি ডোবায় ছিপ ফেলতে সবাই বেজায় আগ্রহী। ছোট একটা ঋণের ‘চার’ মুখের সামনে ধরলে ক্ষুধার্ত মাছ ধরা দেবেই। এরপর তাকে নিয়ে খেলানো-যত বেশি খেলানো যাবে তত বেশি লাভ। এ ঘটনা পুরনো কাবুলিওয়ালাদের কাহিনীর মতো—‘সুদ মাংতা, আসলি নেহি মাংতা’।

যে গরিব মানুষটিকে ঋণ নিতে হয়, চরম দারিদ্রের মুখে তার পক্ষে কি এক সপ্তাহের মধ্যে এমন লাভ সম্ভব যে, মূল টাকায় হাত না দিয়ে সে সপ্তাহান্তে সুদ পরিশোধ করতে পারে? .... ঋণ আদায়ের ভয়াবহতা এতটা বেশি যে, গরিব গ্রামীণ মানুষের জন্যে তা আর সেবার পর্যায়ে থাকে না, হয়ে ওঠে ঋণদাতার পক্ষে ব্যবসা তথা মুনাফাবাজি-আজকাল নানা তত্ত্বে এর নাম দেয়া হচ্ছে ‘সামাজিক ব্যবসা’।

স্বভাবতই জানা দরকার, কারা এ ধরনের প্রকল্পের ঋণদাতা, কী তাদের পরিচয়? দ্রুত গজিয়ে ওঠা ‘বেসরকারি সংস্থা’ তথা এনজিওগুলোই (যে নামে এ নব্য মহাজনদের সবাই চেনে, জানে) মূলত ওই ঋণদাতাগোষ্ঠী এবং তা ছোট-বড় নানা আকারের। ক্ষুদ্রঋণদাতা সংস্থা আকারে ক্ষুদ্র হলেও মুনাফার টানে ওই ক্ষুদ্রতা একসময় পাহাড়চূড়ায় উঠে যায়।

ক্ষুদ্র তখন আর ক্ষুদ্র থাকে না। লাভের পরিমাণ অবিশ্বাস্য বলেই বোধ হয় এ ব্যবসায় বিভ্রাকাজ্ঞীরা লাইন দিয়ে নেমে পড়েছেন। বাংলাদেশ তাই কথিত এ সেবার শোষণ ব্যবসায়ের উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়েছে। মাত্র ৫৬ হাজার বর্গমাইলের ছোট বাংলাদেশে এনজিও-র সংখ্যা কয়েক হাজার, কারো মতে ১৩ হাজার, কেউ লেখেন ২৫ হাজার। আর সুদের হার? সংস্থা থেকে সংস্থায় তা বিভিন্ন রকম। এক অর্থনীতিবিদের মতে, সুদের হার ২০ থেকে ৪০ শতাংশ। ভাবা যায়! .....

এ আলোচনা দীর্ঘ হতে পারতো। তবু ইতি টানছি একটি তথ্য দিয়ে। ক্ষুদ্রঋণ যদি গ্রামে দারিদ্রই দূর করবে, তাহলে এতগুলো বছর পর দরিদ্রের সংখ্যা শতাংশ হারে তো কমার কথা। কিন্তু কমছে না।

১৯৯৫ সালে বিআইডিএস-এর জরিপে দেখা যায়, ১৯৯৪ সাল নাগাদ বাংলাদেশে দরিদ্র জনসংখ্যার হার ৪৮ শতাংশ এবং অতীব দরিদ্রের সংখ্যা ২৩ শতাংশ। ....

অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের কাছ থেকে দিনকয় আগে জানা গেল, বেসরকারি জরিপে ২০০৫ সাল নাগাদ যে তথ্য, তাতে দেখা যাচ্ছে, দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা ৪৮ শতাংশের মতো। [অর্থাৎ অতীব দরিদ্রের সংখ্যা বেড়েছে ২৫ শতাংশ।]

সিদ্ধান্তটা তাহলে দাঁড়ায় : ক্ষুদ্রঋণ দানের মহাজনী ব্যবসা গ্রামীণ দারিদ্র নিরসনের বদলে দাতা সংস্থা-শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যই বিকশিত করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভূতির পাহাড় সঞ্চয় এবং বহুমুখী বাণিজ্যের মুনাফায় আকাশচুম্বী। ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের এমন পরিণাম তো প্রত্যাশিত হতে পারে না।

জনাব আহমেদ রফিকের পুরো বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ক্ষুদ্রঋণ অতি দরিদ্রের সংখ্যা না কমিয়ে বাড়িয়েছে দ্বিগুণ। যেখানে ১৮ বছর আগে দেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ মানুষ অতি দরিদ্র ছিলো সেখানে এখন দেশের অর্ধেক মানুষই অতিদরিদ্র। ক্ষুদ্রঋণের সাথে জড়িত সংস্থাগুলোর কাজের পরিণতি আসলেই খারাপ।

আরেকটা বিষয় হলো, আপনি যে নোবেল পুরস্কারের কথা বলছেন সেখানেও প্রকৃত সত্যটা কী? অনেক ক্ষেত্রেই শোষকরা যাকে তাদের স্বার্থের অনুকূলে মনে করে তাকে নোবেল পুরস্কার দেয়। আর স্বার্থের প্রতিকূলে মনে করলে তাকে দেয় না। ধরুন, লিও টলস্টয়-যিনি এত বড় লেখক ছিলেন-তাকে শান্তিতে তো দূরে থাক, সাহিত্যেও নোবেল দেয়া হয় নি। অথচ নোবেল পুরস্কার প্রবর্তিত হওয়ার ১০ বছর পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন। নোবেল পুরস্কার প্রবর্তিত হয় ১৯০১ সালে-টলস্টয় বেঁচে ছিলেন ১৯১০ পর্যন্ত। কেন দেয়া হয় নি? কারণ যারা পুরস্কার দেয়, টলস্টয়কে দিয়ে তাদের কায়েমী স্বার্থ হাসিল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিলো না।

কাজেই নোবেল পুরস্কার যারা পান তাদের সব বক্তব্য ঠিক, সব কাজই ঠিক-এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। ড. ইউনুস নোবেল পুরস্কার পেয়ে চট্টগ্রামে গিয়ে প্রথম যে কথাটি বললেন তা-ই ছিলো ১৬ অক্টোবর, ২০০৬ সালের প্রথম আলোর প্রধান শিরোনাম-‘চট্টগ্রাম বন্দর মুক্ত করে দিন ৥ দেশের চিত্র পাণ্টে যাবে’। অর্থাৎ বিদেশিদের জন্যে বন্দর উন্মুক্ত করে দিলেই দেশের সব ভালো হয়ে যাবে।

নোবেল পুরস্কার পেয়ে তিনি কীরকম বেসামাল হয়ে গিয়েছিলেন তা বোঝা যায় তাকে দেয়া সম্বর্ধনায়। ড. ইউনুস বলেন, ‘বাংলাদেশ এখন নোবেল বিজয়ী দেশ। জাতি হিসেবে আমরা এখন অনেক ওপরে উঠে গেছি। হঠাৎ করে যেন আমরা প্রত্যেকে ১০ ফুট লম্বা হয়ে গেছি। বুকের ছাতি অনেক চওড়া হয়ে গেছে।’

একটা পুরস্কার পেয়ে মানুষ ১০ ফুট লম্বা কীভাবে হয়ে যায়? চিন্তা করুন, হিতাহিত জ্ঞান কতটা লোপ পেলে একজন মানুষ এমন কথা বলতে পারে! অবশ্য থলের বেড়াল বেরোতে সময় লাগে নি। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি ঘোষণা করলেন, রাজনৈতিক দল গঠন করবেন।

সাবেক সচিব কাজী ফজলুর রহমান তার রাজনীতিতে যোগদানের ঘোষণাকে আখ্যায়িত করেন ‘ড. ইউনুস ৥ জোবরা থেকে গণভবন যাত্রা!’। অবশ্য এ ব্যাপারে তার আশাভঙ্গ হয়েছে খুব দ্রুত। অনেক বিশ্লেষকের মতে,

তখনকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেপথ্য চালকদের মাইনাস-২ ফরমুলা বাস্তবায়নের একটা ব্যর্থ উদ্যোগ ড. ইউনুস। ব্যক্তি ইউনুসের ব্যাপারে আমাদের কিছু বলার নেই। আমাদের বক্তব্য সামাজিক ব্যবসা নামক নব্য মহাজনী সুদি শোষণে নিজেরা ফুলে-ফেঁপে উঠে দরিদ্রকে ঋণচক্রে ফেলে আরো দরিদ্র সর্বস্বান্ত করার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে।

**প্রশ্ন :** এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ঋণের জাল থেকে অতি দরিদ্র মানুষের মুক্তির কি কোনো উপায় আছে?

**উত্তর :** অবশ্যই উপায় আছে। এজন্যে আমাদের জাতিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। আসলে ঋণ, তা ক্ষুদ্র হোক বা বড় হোক ঋণগ্রহীতার কোনো কল্যাণ করে না—এটা আমাদের বুঝতে হবে। সেইসাথে বিশ্বাস করতে হবে যে, মস্তিষ্কে ব্যবহার করে আমরাই আমাদের অবস্থা বদলানোর জন্যে যথেষ্ট। এ পথে পরিশ্রম আছে, কষ্ট আছে কিন্তু অর্জনটা হবে অনেক বড়।

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক গত শতাব্দীতে ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন করে বাংলার কৃষককে মহাজনী ঋণের অভিশাপ থেকে বাঁচিয়েছিলেন। সেই একই আদলে নতুন করে ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন করা এখন সময়েরই ডাক। এই বোর্ড ঋণ ও সুদ মওকুফ করে দিলেই নব্য মহাজনদের হাতে বন্দি দুই কোটি ৪০ লক্ষ ঋণজর্জরিত নারী নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারবে। জাতীয় জীবনে আসবে নতুন প্রাণচাঞ্চল্য।

## পণ্যঋণ

**প্রশ্ন :** আমি একটি ব্যাংকে চাকরি করি। আমাদের ব্যাংকে ফ্রিজ কেনার জন্যে চমৎকার কমেডিটি লোনের ব্যবস্থা আছে। আমি কি ঋণ নেবো? গুরুজী, একটা ফ্রিজ আমার খুবই প্রয়োজন।

**উত্তর :** আজকাল ঋণের নতুন সংস্করণ হচ্ছে কমেডিটি লোন—গাড়ি, ফ্রিজ, টিভি কেনার জন্যে ঋণ। আর এর টার্গেট মধ্যবিত্তরা। বড় ব্যাংকগুলো কিন্তু শিল্পপতিদের আর ঋণ দেয় না। কারণ তারা এত ক্ষমতাবান যে, টাকা পরিশোধ না করলেও কিছু করার নেই।

ব্যাংক যদি ব্যবস্থা নিতে যায় তো ওরা তাকেই খেয়ে ফেলে। কিন্তু মধ্যবিত্তকে ধরা খুব সহজ। আপনি গাড়ির ঋণ নিয়েছেন-টাকা দেবেন না, আপনার বাসায় লোক চলে যাবে। আশেপাশের লোকজন জড়ো করে আপনাকে গালিগালাজ করে আসবে। আপনার তো প্রেস্টিজ থাকবে না। অতএব সবকিছু বিক্রি করে হলেও আপনাকে ঋণ শোধ করতে হবে।

আর আজকে যদি আপনি ঋণ নিয়ে ফ্রিজ কেনেন, কালকে আপনি ঋণ নিয়ে টিভি কিনতে চাইবেন, পরশু কিনতে চাইবেন মোটর সাইকেল। কারণ একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে এই চক্র থেকে বের হওয়া খুব কঠিন। তাই আপনি ফ্রিজ কেনার জন্যে টাকা জমাতে থাকুন। একটু সময় লাগবে, কিন্তু আপনি বাড়তি কোনো দুর্দশায় পড়বেন না।

## ব্যবসায়ে ঋণ

**প্রশ্ন :** অনেকদিন ধরে ব্যবসা করছি। প্রথমদিকে ভালো চললেও এখন অবস্থা খুব খারাপ। পরিচিতদের কাছ থেকে ধার আগেই করেছি। এখন ভেবেছিলাম ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আবার শুরু করবো। কিন্তু আপনার কথা শুনে ভয় পাচ্ছি। এখন কী করা উচিত বুঝতে পারছি না।

**উত্তর :** আপনাকে একটা উদাহরণ দেই। পপতারকা মাইকেল জ্যাকসন ২০১০ সালে মারা যান। এই শিল্পীর মৃত্যুর কারণ প্রোপানোলল এবং লোরাযেপামের মতো ওষুধের ওভারডোজ, যেগুলো তিনি সেবন করছিলেন ইনসমনিয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন তার এ ওষুধগুলোর প্রয়োজন হলো? তার ইনসমনিয়ার কারণ কী? জ্যাকসনের সাম্প্রতিককালের বন্ধু এবং সমবয়সী ইনক্রেডিবল হাল্কের অভিনেতা লাও ফেরিগনো সরাসরি বলেছেন, এসবের নেপথ্যে রয়েছে জ্যাকসনের বিশাল অঙ্কের ঋণ এবং এ থেকে সৃষ্ট মানসিক চাপ।

মাইকেল জ্যাকসনকে কেন ঋণ নিতে হয়েছে? তার অবস্থা কি খারাপ ছিলো? শুধু আমেরিকাতেই তার এলবাম বিক্রি হয়েছে ৬১ মিলিয়নের ওপরে। শুধু ক্যাসেট বিক্রি থেকেই তার আয় হয়েছে প্রায় ১০০ কোটি ডলার অর্থাৎ আমাদের দেশি টাকায় সাত হাজার কোটি টাকা। কিন্তু এতকিছুর পরও মৃত্যুর সময় তার ঋণের পরিমাণ ছিলো ৪০ কোটি ডলার অর্থাৎ ২,৮০০



কোটি টাকা। কারণ প্রতিবছরই তিনি ব্যয় করতেন তার আয়ের চেয়ে দুই/তিন কোটি ডলার বেশি যা আমাদের টাকায় ২০০ কোটি টাকারও বেশি।

এসব নিয়ে মৃত্যুর আগের বছরগুলোতে তাকে বেশ কয়েকটি মামলার মুখোমুখি হতে হয়। বাহরাইনের রাজার দ্বিতীয় ছেলে আবদুল্লাহ বিন হামাদ আল খলিফা, যিনি একসময় জ্যাকসনকে প্রচুর অর্থ ধার দিয়েছিলেন এলবাম এবং আত্মজীবনীর জন্যে, পরবর্তীতে হতাশ হয়ে প্রায় ৫০ কোটি টাকার মামলা করেন জ্যাকসনের বিরুদ্ধে।

ঋণ পরিশোধ না করতে পারলে নেভারল্যান্ডসহ সমস্ত সম্পত্তি নিলামে উঠবে—এই আশঙ্কা থেকেই লন্ডনে কনসার্টের সিদ্ধান্ত নেন জ্যাকসন। আশা করছিলেন—এই কনসার্টের আয় থেকে ঋণ পরিশোধের টাকা উঠে আসবে। এজন্যে নিজের শরীরের ওপরও কম অত্যাচার করেন নি তিনি। কিন্তু এতসবের পরও শেষরক্ষা হয় নি। ঋণের চাপে বিলীন হয়ে গেলেন এই ক্ষণজন্মা শিল্পী।

এজন্যে আমরা সবসময় বলি, ঋণ কোনো সমাধান নয়। যদি ঋণ নিলেই পরিবর্তন আসতো তাহলে কোটি কোটি টাকা ঋণ বা বিদেশি সাহায্য নেয়ার পর আমরা ‘সুপার পাওয়ার’ হয়ে যেতাম, ‘সুপার পুওর’ থাকতাম না। আসলে ঋণের বৃত্তে যে একবার প্রবেশ করে সে আর বের হতে পারে না। একবার জড়িয়ে পড়লে ঋণের পরিমাণ বাড়তেই থাকে—সেটা সামান্য কৃষিঋণই হোক, পণ্যঋণই হোক বা ব্যবসার জন্যে ব্যাংক থেকে নেয়া লাখ লাখ টাকাই হোক কিংবা বিদেশি সাহায্যের নামে দাতা সংস্থার অর্থ হোক।

আপনাকে এ কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো, ঋণের ভয়াবহতা বোঝানো। আপনি যে ভাবছেন, ঋণ নিলে অবস্থার উন্নতি হবে সেটা ঠিক নয়। যদি হাতে টাকা না থাকে তো কিছু মেশিন বা ফার্নিচার বিক্রি করে দিতে পারেন। অথবা অন্য কোনোভাবে চেষ্টা করুন। হয়তো সময় লাগবে, কিন্তু আপনি বিপদে পড়বেন না।

**প্রশ্ন :** আজকে যেসব ব্যবসায়ীরা সফল বলে গণ্য তাদের বেশিরভাগেরই মূলধনের চেয়ে ঋণ বেশি। কিন্তু তাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না। আমি যদি তাদের মতো হতে চাই তাহলে আমার কীভাবে এগুনো উচিত?

**উত্তর :** আসলে আপনি যাদের কথা বলছেন তারা এত বড় মাছ যে, তাদের খেতে চাইলে উল্টো তারাই ব্যাংককে খেয়ে ফেলে! একবার শুনলাম

ঋণখেলাপিদের ছবি নাকি পত্রিকায় ছাপানো হবে, যাতে তারা টাকা পরিশোধ করে। কিন্তু সেই ছবি আর ছাপা হয় নি-তাদের নাকি কোনো ছবি পাওয়া যায় নি! অতএব তাদের মতো হতে চাইলেই কিন্তু আপনি তা পারবেন না।

মুন্সী প্রেমচাঁদের ‘একমুঠো গম’ গল্পের নায়ক শংকরকে সোয়া-সের গম ঋণ নেয়ার পরিণতিতে মরতে হয়েছিলো। বাস্তবেও ঋণখেলাপি হয়ে শংকরদের মতো সাধারণ মানুষরাই মরে, শিব শংকররা নয়। কারণ তারা জানে ঋণকে কীভাবে রিশিডিউলিং করতে হয়, যেটা শংকররা জানে না। শেক্সপিয়ারের ‘মার্চেন্ট অব ভেনিস’-এ শাইলক হেরে গিয়েছিলো কেন? কেন চুক্তি অনুসারে এক পাউন্ড মাংস নিতে পারে নি? কারণ প্রতিপক্ষের শক্ত উকিল ছিলো। কিন্তু শংকরদের তো আইনজীবী নিয়োগের পয়সা থাকে না।

আর দ্বিতীয়ত, তাদের মতো হতে চাইলে তো প্রতারক হতে হবে। মানুষেরটা মেরে খেতে হবে। আপনি কেন সেরকম হতে চাইবেন? সবসময় মনে রাখবেন-প্রতারকের ১০ দিন, গৃহস্থের একদিন। অন্যায় যদি করেন, অন্যের ক্ষতি যদি করেন, অন্যকে যদি প্রতারিত করেন-শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে। কারণ প্রকৃতি খুব নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণকারী। পাপের ঘট যখন পূর্ণ হয় তখন ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। তাই অন্যায় করবেন না। অন্যের অধিকারকে হরণ করবেন না। বরং আপনি নিজের মতো থাকুন, সৎভাবে ব্যবসা করুন। কারণ তাদের মতো না হয়েও জীবনে সফল হওয়া যায়, বড় কিছু করা যায় এবং সেটাই দীর্ঘস্থায়ী হয়।

**প্রশ্ন :** ঘুষ-দুর্নীতির যে অবস্থা তাতে মনে হয় বাংলাদেশে কেউ আর ছোটখাটো ব্যবসা করতে পারবে না, সবাইকে চাকরিই করতে হবে। এমতাবস্থায় স্বাধীন ব্যবসা করার জন্যে কী করণীয়?

**উত্তর :** আসলে এটা ভুল ধারণা। আমাদের সারভাইভিং ক্যাপাসিটি অনেক বেশি এবং আমাদের দেশের মানুষের মতো এমন সহ্যশক্তি অন্য কোনো দেশে বিরল। বছর বছর বন্যার পরও কিন্তু আমরা বেঁচে আছি এবং অনেক সময় সুযোগ থাকলেও নিজের জায়গা ছেড়ে আমরা যাই না। বন্যাতে সব ডুবে যায়, তারপর ঠিকই আমরা আবার ভেসে উঠি। আবার জেগে উঠি, আবার কাজ করি। অর্থাৎ টিকে থাকার ক্ষমতা আমাদের অনেক বেশি। ধরুন, এই যে ঘুষের কথা আপনি বলছেন-এটা কি আগে ছিলো না? ছোট ব্যবসায়ীদের ওপর জুলুম কি আগে হয় নি? বরং আমরা তো দেখি, এক লাখ

টাকা ঋণের দায়ে অনেকে ব্যবসা হারায়, আবার কয়েকশ কোটি টাকার ঋণ খেলাপ করেও অনেকে গর্বভরে ঘুরে বেড়ায়।

আসলে জুলুম সবসময় গরিবের ওপরই হয়। বড় মাছ সবসময় ছোট মাছগুলোকে খেয়ে ফেলে। কখন পারবে না? যখন ছোট মাছগুলো সব একত্রিত হবে, যখন ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন সবকিছু নিয়মের মধ্যে আসবে। সে লক্ষ্যেই ভালো মানুষদের সম্ভবদ্ব হতে হবে। ভালো মানুষরা সম্ভবদ্ব হলে পরিবর্তন তো শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র।

বর্তমানে ছোটখাটো ব্যবসা করা যাবে না, এটা অবাস্তব কথা। ছোটখাটো ব্যবসা কি কেউ করছে না? ব্যবসায় লাভ করবেন কি না সেটা নির্ভর করে আপনার আইডিয়ার ওপর, আপনার যোগ্যতার ওপর। চাইলে ছোট ব্যবসা থেকেও অনেক লাভ করা যায়।

আর লাভ করার জন্যে ব্যবসার চিরাচরিত ধারণা বাদ দিতে হবে। আমরা ব্যবসা কখন করতে চাই? যখন দেখি যে, ঐ ব্যবসায় সবাই যাচ্ছে। এটা ঠিক না। প্রত্যেক ব্যবসার একটা অপটিমাম লেভেল আছে—এরপর ঐ ব্যবসাটা স্যাচুরেটেড হয়ে যায়, ওখানে আর লাভ করা যায় না। কাজেই ব্যবসা যখন করতে যাবেন, আপনাকে চিন্তা করতে হবে, নতুন কোন ক্ষেত্রে করা যায়। সেটা যত ছোটই হোক না কেন, আপনি দাঁড়িয়ে যেতে পারবেন—কোনোরকম কম্পিটিশন ছাড়া।

**প্রশ্ন :** একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির একার সম্পদ নয়, এর মাধ্যমে দেশ ও জাতি ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়। অনেক বেকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়, দেশের অর্থনীতি উর্বর হয়। এ কারণে ব্যাংক ৩০% জামানতে শিল্প উদ্যোক্তাকে ১০০% হারে ঋণ প্রদান করে। সুতরাং এ ধরনের শিল্প উদ্যোক্তাকে ঋণগ্রস্ত না ভেবে কি একজন সমাজসেবক ভাবা যায় না?

**উত্তর :** আপনি আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এ কথাগুলো বললেন। এটা নিয়ে বলার আগে আমরা বিদেশের প্রেক্ষাপট একটু দেখি। বিশ্বজুড়ে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে ইউরোপ-আমেরিকার অনেক বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে।

এসব প্রতিষ্ঠানকে বাঁচানোর জন্যে সে দেশের সরকার এগিয়ে এসেছে। যেমন, দেউলিয়াত্ব থেকে বাঁচানোর জন্যে মার্কিন সরকার জেনারেল মটরসকে ৫০ বিলিয়ন ডলার সাবসিডি দিয়েছিলো। একইভাবে ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বড়

ব্যাংক-স্কটিশ ব্যাংককে দেউলিয়াত্ব থেকে বাঁচানোর জন্যে যুক্তরাজ্য সরকার বিশাল অঙ্কের অর্থসাহায্য দিয়েছে।

এখন আপনি বলুন, এ টাকাগুলো কাদের টাকা? জনগণের টাকা। কাকে বাঁচানোর জন্যে দিয়েছে? পুঁজিপতিদের বাঁচানোর জন্যে। অর্থাৎ শোষকদের বাঁচানোর জন্যে দিচ্ছে জনগণের টাকা! কেন? কারণ একটা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যাওয়াটা পুঁজিবাদী অর্থনীতির জন্যে ক্ষতিকর। একটা একটা করে যদি সবগুলো ব্যাংক বন্ধ হয়ে যেত তাহলে আমেরিকার কী অবস্থা হতো? কাজেই সরকার যখন একটা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাতে সাহায্য করে, তার উদ্দেশ্য থাকে পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে রক্ষা করা, সমাজসেবা নয়। যদি একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান সমাজসেবা করে চলতো তাহলে কিন্তু তারা সাহায্য চাইতো না, দেউলিয়া হয়ে গেলে তারা সব বেচে দিয়ে জনগণকে ঐ টাকা বিলিয়ে দিতো। তা কিন্তু হয় না। তারা আমাদের টাকা দিয়ে ব্যবসা করে, আমাদেরকেই শোষণ করে। আবার বিপদে পড়লে আমাদের ট্যাক্সের টাকা দিয়েই তারা টিকে থাকে।

এর পেছনে কিন্তু কোনো একক ব্যক্তি বা সরকার দায়ী নয়। দায়ী হলো সিস্টেম। ধরুন, আমরা এতদিন কী দেখলাম? বিশ্বের প্রথমসারির বেশ কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যতম বৃহত্তম কয়েকটা ব্যাংক হট করে বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং সেগুলোকে বাঁচানোর জন্যে আমেরিকার মতো দেশের সরকারকে বাইরের দেশ থেকে পর্যন্ত অর্থ সাহায্য নিতে হয়। তাহলে এই সিস্টেমটা কত খারাপ!

এবার আসি আমাদের দেশের প্রসঙ্গে। আমাদের দেশে যারা ঋণ নিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন, আজ পর্যন্ত কেউ কি টাকা শোধ করেছেন? খুব কম। কারণ যারা ঋণ নেন, তারা সমাজসেবা করার জন্যে ঋণ নেন না। তারা শিল্প প্রতিষ্ঠান করার জন্যে, ব্যবসা করার জন্যে ঋণ নেন। ঋণখেলাপি হওয়ার জন্যে ঋণ করেন। মার্চ ১৯৯২ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ও বেসরকারি ব্যাংকে ঋণখেলাপির সংখ্যা এক লাখ ২২ হাজার ৪৩৭ জন। আমাদের দেশে তারা হচ্ছেন ‘সম্মানিত ঋণখেলাপি’ কারণ তারা থাকেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

এই যে ঋণের টাকা-এগুলো আসে কোথেকে? জনগণের পকেট থেকে। জনগণের ট্যাক্সের টাকা থেকে। শিল্পকারখানায় যে ঋণ হয়-এই ঋণের অধিকাংশ হচ্ছে বিদেশি ঋণ। আইডিবি বা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এসব ঋণের টাকা দেয়। শিল্পব্যাংকের টাকা এসেছে কোথা থেকে? বিদেশি ঋণ থেকে এবং এই টাকা শোধ দিতে হচ্ছে কাকে? জনগণকে।

অতএব মূল জিনিসটা হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি। আপনি যে ভাবছেন একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশের অর্থনীতির উপকার করছে—সেটা একদিক থেকে ঠিক। কিন্তু উপকারের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করা আর অনেকগুলো ভাঁওতাবাজিকে ঢাকার জন্যে কিছু ভালো কাজ করা—এ দুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে।

আসলে আপনি যদি মানুষের সেবা করতে চান আপনার ঋণের কোনো প্রয়োজন নাই। মানুষই আপনাকে টাকা দেবে। একজন ব্যবসায়ী সে পর্যন্তই সফল থাকে যতক্ষণ সে মানুষের টাকা নিয়ে ব্যবসা করে। যখনই সে ব্যাংকের টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করে, তখন সে আটকা পড়ে যায়। যদিও কথটা আপনাদের কাছে পরস্পরবিরোধী মনে হবে। কিন্তু এটাই বাস্তবতা।

কারণ আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে সিস্টেম। ঋণ নেয়ার মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে, প্রজেক্ট পাশ করানোর মধ্যে অনেক কায়দা আছে। ওগুলো করতে করতে আপনার নিজের পকেট থেকে যে পরিমাণ অর্থ বেরিয়ে যাবে তারপর আপনি নিজেই মনে করবেন যে, এবার অন্যকে টাকা দেয়া বন্ধ করে একটু নিজে কামাই করি।

কারণ স্রেফ সুদ হিসেবে যে পরিমাণ টাকা আপনাকে বছরের পর বছর ব্যাংককে দিতে হবে তারপর আর মূল টাকা ফেরত দিতে চাইবেন না। এবং এতে আপনার যেরকম লাভ, তেমনি ব্যাংকেরও লাভ। মাঝখান দিয়ে বাড়তি ঋণের টাকা গুনতে হয় জনগণকে।

কাজেই একতরফাভাবে কাউকেই দোষারোপ করতে চাই না। আমরা চাই সিস্টেমটা সুন্দর হোক—যেটা জনগণের জন্যে কল্যাণকর হবে। যেখানে মানুষ বিনিয়োগ করবে এবং বিনিয়োগের ফসল সে তুলে নিতে পারবে। তার আগ পর্যন্ত আমাদের বাস্তবতার সাথেই মানিয়ে চলতে হবে।

**প্রশ্ন :** ব্যবসার খাতিরে তিন-চার জায়গা থেকে অল্প অল্প ঋণ নিয়েছি। এ অবস্থায় কি এক জায়গা থেকে বড় ঋণ নিয়ে ছোট ঋণগুলো প্রথমে শোধ করে দেবো? কারণ অনেকগুলো জায়গায় দেনা না রেখে একটা জায়গায় দেনা রাখাই তো ভালো। আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি।

**উত্তর :** এই যে ঋণ রিশিডিউলিং করা—এটা নিয়ে আমাদের অনেকেরই প্রশ্ন আছে। সেদিন পত্রিকায় একটা খবর দেখলাম। এতে বলা হচ্ছে যে, ২০০১ সাল পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকে যারা ঋণগ্রস্ত আছে তাদের অধিকাংশই রিশিডিউলিংয়ের মাধ্যমে নিয়মিত থেকেছে বা খাতায় খেলাপি থেকে গেছে।

অর্থাৎ সবাই কয়েক দফায় ঋণী, এক দফায় নয়। এমন দেখা গেছে যে, গ্রামীণ ব্যাংকের একজন সদস্য, আবার একই সাথে প্রশিকারও সদস্য। সে গ্রামীণ থেকে নিয়ে প্রশিকার ঋণ শোধ করে আবার প্রশিকা থেকে নিয়ে গ্রামীণের ঋণ শোধ করে। অন্যান্য অনেক এনজিও, যেমন ব্র্যাক-এর সঙ্গেও এমন ঘটনা ঘটেছে।

এই ঋণের টাকা নিয়ে তারা কী করে? অধিকাংশ গরিব মানুষ ঋণের টাকা দিয়ে ফুটানি করে। বেঁচে থাকার জন্যে ঋণ নেয় খুব কম মানুষ। একটা সময়ে এসে তথাকথিত ‘ধনী’ হয়ে ওঠা এই দরিদ্ররা ঋণের টাকায় টেলিভিশন কেনে, সাইকেল কেনে, আর বিয়ে-বাড়ি দাওয়াতে গিয়ে উপহার দেয় বেশ দামি কোনো কিছু। মানে ‘জাতে উঠতে’ গিয়ে বেহিসেবী খরচ করে। ছেলে-মেয়ের বিয়েতে ধুমধাম করে। ভাবে-‘একটাই তো ছেলে/মেয়ে, খরচ তো একটু হবেই। পরে কোনোভাবে ধার শোধ করবো।’ সেই ঋণ আর শোধ হয় না বা শোধ করার জন্যে আরেক জায়গা থেকে ঋণ নেয়।

যেহেতু সে ঋণ নিয়েই ঋণ পরিশোধ করছে, কাজেই তার মনে হয় সে খুব ভালো আছে। যেটা সে বোঝে না তা হলো ঋণের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে একসময় তার ভিটাবাড়ি নিলাম হয়ে যাচ্ছে। ভিটাবাড়ির মালিক একসময় গ্রামীণ ব্যাংক না হয় আশা বা ব্র্যাক হচ্ছে।

আর আপনি যেটা বললেন ঋণ রিশিডিউলিং করা-এটা আসলে একটা মানসিক ভ্রম ছাড়া আর কিছু না। ধরুন, এখন আপনার তিন জায়গায় ১০ লাখ টাকা করে ঋণ আছে, প্রতিমাসে তিন জায়গায় আপনাকে টাকা পরিশোধ করতে হচ্ছে।

আপনি ভাবছেন, তিনজনকে টাকা দেয়ার চাইতে একজনকে দেয়া ভালো। কিন্তু কথা তো একই হলো। এক জায়গা থেকে ৩০ লাখ টাকা আর তিন জায়গার ১০ লাখ টাকা করে মোট মাসিক কিস্তি তো একই আসে। বরং বেশি টাকা লোন নিলে সেইখানে আপনার আটকে পড়ার সুযোগ বেশি। বেশি টাকা মানে আপনাকে জামানতও বেশি দিতে হবে-এটা তো সহজ হিসাব। কাজেই আমি বলবো, ঋণ যেগুলো আছে সেগুলো আগে পরিশোধ করুন। এই রিশিডিউলিংয়ের মধ্যে যাবেন না।

**প্রশ্ন :** আমি স্বাধীন পেশায় জীবন গড়তে চাই। কিন্তু আমার অযোগ্যতা হলো আমার বাবার টাকা নেই। আর ব্যবসা করতে হলে তো অনেক টাকা দরকার। ঋণ না নিলে এই টাকা কোথায় পাবো?

**উত্তর :** আসলে বাবার টাকা থাকা না থাকার ওপর কখনো ব্যবসার ভাগ্য নির্ভর করে না। আপনার অযোগ্যতা ওখানে নয় যে, আপনার পরিবারে টাকা নেই। আপনার অযোগ্যতা এখানে যে, আপনি ভাবছেন বাবার টাকা ছাড়া ব্যবসা করা যায় না। বাংলাদেশে কয়জন সফল শিল্পপতি অনেক টাকা হাতে নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছেন? যেসব বড় বড় কোটিপতিকে আজ দেখছেন তাদের কেউ অনেক পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন নি, কেউ-ই না।

বরং যারা অনেক টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে, ব্যাংক লোন নিয়ে ব্যবসায় নেমেছে—তারা কেউ সফল হয় নি। তারা সবসময় ঋণ জর্জরিতই থেকেছে। মনে রাখতে হবে, আপনার অভিজ্ঞতা নেই—অতএব আপনার ভুল হবেই। যখন অল্প পুঁজি নিয়ে নামবেন, ভুলের মাশুল অল্পের ওপর দিয়ে যাবে। আর যখন অনেক টাকা গচ্ছা দিতে হবে, তখন সেই টাকা তুলতে তুলতেই জান বেরিয়ে যাবে; আপনি লাভ করবেন কখন? এজন্যে দেখবেন, যারা ছোট পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে তারা অনেক দূর এগিয়েছে।

ইসলাম গ্রুপের জহিরুল ইসলাম। ১৯৬০ সালে তিনি সুপারভাইজারের চাকরি করতেন। একসময় চাকরি চলে গেলে ছোটখাটো কন্সট্রাক্ট নেয়ার মাধ্যমে তিনি ব্যবসা শুরু করলেন এবং বাংলাদেশ হওয়ার পর তিনি ছিলেন এক নম্বর ব্যবসায়ী। একেবারে শূন্য থেকে তিনি শুরু করেছিলেন। আর এখন তো ঢাকা শহরে এমন কোনো এলাকা নাই যেখানে ইস্টার্ন হাউজিংয়ের এপার্টমেন্ট নাই।

এরকম উদাহরণ কিন্তু অগণিত। আমরা আসলে ব্যবসার মূল ব্যাপারটাই বুঝি না। যে কারণে আমাদের ব্যবসার যে সমৃদ্ধি হওয়া উচিত সেটা হয় না। আমরা চিন্তা করি যে, বাবার কত টাকা আছে। বাবা পেনশনে এত টাকা পাবে, সেটা নিয়ে ব্যবসা করবো। জায়গা জমি যা আছে, এটা বন্ধক দিয়ে ব্যাংক থেকে লোন নেবো, প্রজেক্ট করবো।

আসলে ঋণ নিয়ে কখনো ব্যবসা হয় না। ব্যবসা করতে হবে আপনার যা আছে তা নিয়ে। আপনি বড় শপিং মল করতে চান, আগে ছোট একটা মুদি দোকান দিয়ে শুরু করুন। সেটার লাভ দিয়ে আরেকটু বড় কিছু করুন। যদি সেটা করতে না পারেন তো আপনাকে দিয়ে ব্যবসা হবে না। আগেই যদি বাবার টাকা দিয়ে বিশাল শো-রুম দিতে চান তো নিশ্চিত থাকুন, ঐ দোকান বেশিদিন টিকবে না। কাজেই আপনার বাবার টাকা না থাকটা আপনার অযোগ্যতা নয়, বরং ব্যবসা শুরু করার জন্যে এটাই আপনার বড় শক্তি।

## ঋণ করে বাড়ি করা

**প্রশ্ন :** নগদ টাকা নেই। হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের ঋণ নিয়ে বাড়ি করার ব্যাপারে আপনার মতামত আশা করছি।

**উত্তর :** আসলে এই বাড়ি তৈরি করাকে আমার সবসময় একটা ঝামেলা মনে হয়। তরণ বয়সে বেশ কয়েকজনকে আমি বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে হার্ট-এটাকে মারা যেতে দেখেছি। এ কারণে আমার একটা সময়ে ধারণা ছিলো যে, বাড়ি তৈরি করতে গেলেই মানুষের হার্ট-এটাক হয়!

বেশ কয়েকবছর আগের একটা ঘটনা-আমার কাছে একবার এক গ্রাজুয়েট এসেছিলেন। ভদ্রলোক ব্যাংকার। লোন নিয়ে চার/ পাঁচ তলা বাড়ি করবেন-আমার পরামর্শ চাইতে এসেছেন। আমি বললাম, ‘খামোখা এসব বাড়ি করার কী দরকার!’ তিনি বললেন, ‘সে আপনি বুঝবেন না। আপনার তো এসব ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নাই।’ কিছুদিন পর তার স্ত্রী এসে বললেন, ‘উনি হার্ট-এটাক করে মারা গেছেন, এদিকে বাড়ির কাজ শেষ হয় নি।’

কারণটা কী? বাড়ি তৈরির সাথে কি হার্ট-এটাকের সম্পর্ক? না, সম্পর্কটা আসলে মানসিক চাপের। বাড়ি তৈরির সময় আপনি যে মিস্ত্রিদের সাথে কথা বলবেন, তারা কখনোই এস্টিমেট দেয়ার সময় আসল খরচের ৫০%-র বেশি বলবে না। অর্থাৎ বাড়ি তৈরিতে যদি ৬০ লাখ টাকা খরচ হয় তো আপনাকে বলবে ৩০ লাখ। আপনি হয়তো আরো ১০ লাখ টাকা হাতে রেখে মোট ৪০ লাখ এস্টিমেট করে কাজে নেমে পড়লেন। এর মধ্যে ব্যাংক থেকে নিলেন ২০ লাখ। বাকিটা অন্যান্য সোর্স থেকে ধার-টার করে যোগাড় করলেন। আপনি নিশ্চিত হলেন, যাক, বাড়ি তৈরির খরচের ব্যবস্থা হয়ে গেছে!

শুরু হলো কাজ। হু হু করে খরচ হতে লাগলো। ৪০ লাখের পুরোটা খরচ করেও আপনি একসময় দেখলেন বাড়ি আপনার হয়েছে ঠিকই; কিন্তু সে কেবল কাঠামো। ফিনিশিং কিছুই হয় নি-ফ্লোর হয় নি, দরজা-জানালা হয় নি, বাথরুম হয় নি। আর খরচ বেশি লাগে এসব করতেই।

এদিকে ফিনিশিং না করা পর্যন্ত আপনি না পারছেন নিজে সে বাড়িতে উঠতে, না পারছেন ভাড়া দিতে। ফলে এসব করার জন্যে আরো লাখ বিশেক যোগাড়ের সংগ্রামে নামতে হলো আপনাকে। টেনশনটা এখানেই। কারণ ধার-কর্জ তো আগেই করা শেষ। ওদিকে যত সময় যাচ্ছে লোনের ইন্টারেস্ট বাড়ছে। ব্যস, আপনার আর ঘুম আসবে না। যে ভদ্রলোকের কথা বলছিলাম



তিনিও কিন্তু এই চিন্তায় মারা গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত ঋণের টাকা পরিশোধ না করায় ব্যাংক বাড়িটা নিয়ে নিলো। বাড়িও গেল, উনিও গেলেন। হলো না ছেলে-মেয়ের জন্যেও কিছু।

অবশ্য কেউ এটা ভাববেন না যে, আমি বলছি-বাড়ি করতে গেলেই হার্ট-এটাক হয়! নিজের বাড়ি করার মধ্যে দোষের কিছু নাই। রসুলুল্লাহ (স)-এরও নিজের বাড়ি ছিলো। অতএব নিজের জন্যে বাড়ি করাও একটা সুন্নত। তবে আপনাকে একটা সিস্টেমে যেতে হবে। এস্টিমেশনের ব্যাপারে খুব সাবধান থাকবেন। মিস্ত্রি যা বলবে তার কমপক্ষে ডাবল ধরবেন। দরকার হলে ডাবলের ওপরে আরো টুয়েন্টি পার্সেন্ট ধরেন, পুরো টাকার ব্যবস্থা করে কাজ শুরু করুন। আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। বাড়িও হবে। ভালোভাবে থাকতে পারবেন।

## ঋণ নিয়ে বিয়ে

**প্রশ্ন :** গুরুজী, মা-বাবার অমতে বিয়ে করেছি বলে অনুষ্ঠানের সব খরচ আমাকেই বহন করতে হয়েছে। একটা ব্যাংকে চাকরি করি বলে সহজেই ম্যারেজ লোন পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তখন ঝাঁকের মাথায় ছিলাম, তাই সব শর্ত খেয়াল করি নি। খুব জাঁকজমক করতে গিয়েছিলাম বলে লোনও নিয়েছিলাম প্রচুর। বিয়ের দ্বিতীয় বছরে এসেও পুরো টাকা শোধ করতে পারি নি। এখন প্রতি মাসেই বেতন থেকে বড় অঙ্কের টাকা কেটে রাখছে। সংসার চালাতে খুব কষ্ট হচ্ছে। এখন আমি কী করবো?

**উত্তর :** সবকিছু করে ফেলে দুই বছর পর আপনার মনে হচ্ছে, এখন আমি কী করবো! পুরুষ মানুষ যদি এত বোকা হয়, তাহলে সংসার চালাবেন কীভাবে? আপনি যে বলছেন নিজের পছন্দে বিয়ে করেছেন, আসলে তো পছন্দটা ইম্পার্টেন্ট না, আপনি মা-বাবার সাথে জেদ করে বিয়ে করেছিলেন এবং আপনি যে অনেক ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন-এটা তাদের দেখাতে গিয়ে বিয়েতে বেহিসাব খরচ করেছেন!

আসলে মানুষ যখন চিন্তাভাবনা না করে ঝাঁকের মাথায় কাজ করে তখন এইভাবেই ভুল করে। বিয়েতে সামর্থ্যের চেয়ে বেশি খরচ করতে হবে কেন? এটা কী এমন ঘটনা? আপনার আগে কি দুনিয়ায় কেউ বিয়ে করে নি?

আসলে পুঁজিবাদী চক্র নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থেই ভোজন, বিনোদন এবং জৈবিক চাহিদা পূরণকে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রচার করছে। নিত্যনতুন কৌশল বের করছে মানুষকে ব্যয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে। এক্ষেত্রে তাদের প্রধান অস্ত্র হলো মিডিয়া। যেরকম, সিনেমা-নাটকে বিয়েকে কাল্পনিক এক বিশাল ব্যাপার হিসেবে চিত্রিত করা হয়।

অথচ বিয়ে হলো একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনা। এর মধ্যে আহামরি কিছু নেই। আর ‘ম্যারেজ লোন’ হলো সেইরকম একটা বুজরুকি। কিন্তু আমরা সেটা না বুঝে খরচের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠি। ঋণ করে হলেও এই ফুটানি করতে গিয়ে অনেক পরিবার দুর্দশায় পতিত হয়।

আপনার ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। বিয়ের ব্যাপারে এর চেয়ে বড় ভুল, বড় অবিদ্যা আর কিছু হতে পারে না। কারণ আপনি ঋণ করে নিজের জাঁকজমক প্রদর্শন করে ঐ মেয়েটিকে মোহিত করতে চেয়েছেন। ওই যে আবু হোসেন ছিলো না-একদিনের বাদশা-সেইরকম! আর ঐ মেয়েটি হয় একদিনের রানী। কিন্তু আপনি যে একদিনের বাদশা-এটা তো মেয়েটির মাথায় ঢোকে না। সে ভাবে সারাজীবন তার এরকমই যাবে। আর এই যে ছবি তার মাথায় ঢোকে-সমস্যা শুরু হয় এখান থেকেই।

এজন্যে আমরা সবসময় বলি, পুরুষরা যারা বিয়ে করবেন আগে স্ত্রীকে নিজের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে খুব পরিষ্কার ধারণা দেবেন। বলবেন, এই হলো আমার অবস্থা। আমার সাথে থাকতে হলে এভাবেই থাকতে হবে। দেখবেন, কোনো অশান্তি হবে না।

আর ব্যাংক যে তার কর্মীদের এই ধরনের সুযোগ-সুবিধাগুলো দেয়, তার উদ্দেশ্য হলো কর্মীরা যাতে সহজে প্রতিষ্ঠান ছেড়ে না যায়। আপনার মতোই এক তরুণ কাজ করতো একটি মাল্টিন্যাশনাল ব্যাংকে। তার ব্যাংকে যেহেতু ম্যারেজ লোনের ব্যবস্থা আছে, স্ট্যাটাস বজায় রাখার জন্যে সেখান থেকে ঋণ নিয়ে নিজের বিয়েতে সে এত খরচ করলো-যা এমনি অবস্থায় সে কখনোই করতে পারতো না।

তখন সে ভেবেছিলো, কী আর হবে? আমার ব্যাংকের টাকা দিয়েই তো বিয়ে করছি। কিন্তু টের পেলো তারপর। নিজের ব্যাংক হলে কী হবে। উচ্চহারে সুদ দেয়া থেকে নিস্তার পায় নি সে-ও। আর সে সুদের টাকা গুনতে গিয়ে রাজা-রানীর হালে বিয়ে করা তার সংসারে এখন আক্ষরিক অর্থেই নুন আনতে পানতা ফুরায় অবস্থা। আপনার অবস্থাও অনেকটা তা-ই। যতদিন ঋণ পরিশোধ না হয় ততদিন কিছুই করার নেই। যেহেতু টাকা পাওনা আছে,

এই চাকরি ছেড়ে আপনি যে ভালো কোথাও যাবেন-সেটাও সম্ভব না। আপনাকে এখানেই থাকতে হবে এবং ঋণ শোধ না করা পর্যন্ত চাকরি করে যেতে হবে। তারপর হয়তো অন্য কিছু ভাবতে পারেন।

## প্রসঙ্গ ক্রেডিট কার্ড বা কাবুলি কার্ড

**প্রশ্ন :** গুরুজী, আপনি তো ঋণের কথা বললেন। কিন্তু আমরা যে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করি সেটাও কি এক ধরনের ঋণ না? কারণ ঐ টাকাটা তো আমার কাছে নেই, আমি ব্যাংক থেকে ধার করে খরচ করছি। কাজেই এ ব্যাপারে আপনার মতামত দয়া করে জানাবেন কি?

**উত্তর :** আমি আপনার সাথে পুরোপুরি একমত। আসলে এই যে ক্রেডিট কার্ড, এর সৃষ্টি হলো কীভাবে? মার্কেটিং রিসার্চে দেখা গেল, আমরা যে কেনাকাটা করি তার ২০% মাত্র প্রয়োজনে, বাকী ৮০%-ই আবেগের বশে, চোখের ক্ষুধায়। তখনই কিনে না ফেললে ঐ বস্তুর প্রতি আর আকর্ষণ থাকে না। কিন্তু সাথে টাকা না থাকলে তো আর কেনা যাবে না। তাই ব্যবসায়ীরা বুদ্ধি বের করলো, বাকিতে কেনার সুযোগ দেয়ার।

ক্রেডিট কার্ড প্রচলনের ফলে ‘ঋণ করে ঘি খাওয়া’র যে সংস্কৃতি সৃষ্টি হলো সারা পৃথিবীব্যাপী, তার পরিণাম বিধ্বংসী। সমগ্র পশ্চিমা বিশ্বে bankruptcy বা দেউলিয়াপনার হার দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং এর অন্যতম কারণ এই ক্রেডিট কার্ড। ক্রেতাদের অনেকেই লাগামহীনভাবে একের পর এক জিনিস কিনতে থাকেন।

উটপাখি যেমন মরুভূমিতে ঝড়ের সময় বালিতে মুখ গুঁজে থাকে এই ভেবে যে, সে যদি ঝড়কে দেখতে না পায় তবে ঝড় তার কোনো ক্ষতি করবে না। পণ্যদাসরাও তেমনি ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝাকে অগ্রাহ্য করে আরো আরো কিনতে থাকেন। একটি ক্রেডিট কার্ডের লিমিট পূর্ণ হয়ে গেলে আরেকটি, তারপর আরেকটি—এভাবে চালিয়ে যেতে থাকেন ঋণের পাহাড় মাথায় ভেঙে না পড়া পর্যন্ত। এরপর এই ঋণ থেকে মুক্তির জন্যে নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করেন এবং ব্যাংক তার সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নেয়।

স্কটল্যান্ডের একটি রিপোর্টে দেখা গেছে—প্রতি সপ্তাহে সেখানে গড়ে ১০০ জন মানুষ দেউলিয়া হচ্ছে, ঋণ শোধ করতে না পারার কারণে। ২০০৪

সাল থেকে এরকম দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার সংখ্যা প্রতিবছর বাড়ছে ২০-২৫% হারে। কেন? কারণ ঋণের টাকাটা তো কষ্টের উপার্জন নয়। ফলে খরচ হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। আর সব ঋণদাতাদের মতো ক্রেডিট কার্ড কোম্পানিগুলোও চায়, আপনি চিরকাল ঋণগ্রস্ত থাকুন। তাই তারা কিন্তু আসল ফেরত চায় না, তারা চায় শুধু সুদটুকু—প্রতিমাসে শুধু minimum payable amount জানিয়ে চিঠি পাঠায়। অনেকটা সেই প্রাচীনকালের কাবুলিওয়ালাদের মতো।

ক্রেডিট কার্ডের এই বিধ্বংসী প্রভাব সম্পর্কে এখন অনেকেই সচেতন হয়ে উঠছেন। আমেরিকান ধনকুবের ওয়ারেন বাফেটসহ অনেক বিজ্ঞানজ্ঞই যুবকদের উপদেশ দিয়েছেন, ক্রেডিট কার্ড এবং ঋণ থেকে দূরে থাকতে। অতএব মনে রাখবেন, ক্রেডিট কার্ড আসলে কাবুলি কার্ড। ফুটানি করে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করলে ঋণ ও সুদের চোরাবালিতে আটকে যাবেন।

**প্রশ্ন :** গুরুজী, আপনি বলছেন ক্রেডিট কার্ড খারাপ। কিন্তু উন্নত দেশগুলোতে তো সব লেনদেন ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমেই হয়। বলা হয় যে, ওদের অর্থনীতি ক্রেডিট কার্ডনির্ভর। তাহলে ওরা টিকে আছে কীভাবে?

**উত্তর :** আসলে একটা বড় জাহাজ ডুবতেও বেশ সময় লাগে। পাশ্চাত্যে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক মন্দায় বহু কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার পরও টিকে আছে শুধু জোড়াতালি দিয়ে। আর তাদের এই অর্থনৈতিক ধসের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ক্রেডিট কার্ডের অর্থনীতি। বাকিতে কেনা। কেনার সময় তো হুঁশ ছিলো না, এখন টাকা দেয়ার সময় আর টাকা নাই!

২০১২-এর হিসাব অনুযায়ী—আমেরিকার সরকারি ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ১৫ ট্রিলিয়ন ডলার। মানে ১৫-এর পর ১৫টা শূন্য বসালে যে সংখ্যা হয়, সেটা হচ্ছে তাদের দেনার পরিমাণ। এটা যে অস্বাভাবিক পরিমাণ তা কিন্তু কাউকে বলে দিতে হয় না। সমস্যা হচ্ছে, এই পরিমাণটা কেবলই বাড়ছে।

প্রেসিডেন্ট ওবামার যে ‘ন্যাশনাল ডেব্ট কমিশন’ অর্থাৎ জাতীয় ঋণ কমিশন, তার কো-চেয়ারম্যান ইজকাইন বাওলস। মন্দার পর পর তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছেন—‘দিস ডেব্ট ইজ লাইক এ ক্যাসার। ইট ইজ ট্রলি গোলিং টু ডেস্ট্রয় দি কান্ট্রি ফ্রম উইদিন।’

অর্থাৎ এই ঋণ হচ্ছে ক্যাসারের মতো। ক্যাসার যেরকম ভেতর থেকে ধ্বংস করে দেয়, তেমনি এই ক্রেডিট কার্ডের অর্থনীতি আমেরিকাকে ভেতর

থেকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আবার চীনের আজকের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে দেখুন। চীনারা যা উপার্জন করে তার এক-পঞ্চমাংশ জমা রেখে তারপর তারা কেনাকাটা করে। ঋণ করে ঘি খাওয়ার মধ্যে চীনারা নাই। যে কারণে চীনের আজকের এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি।

**প্রশ্ন :** ক্রেডিট কার্ডের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন বুঝতে পেরেছি, কিন্তু বেশি পরিমাণ টাকা সাথে নিয়ে চলাফেরা করা নিরাপদ নয়। তাহলে ক্রেডিট কার্ড ছাড়াও তো কোনো উপায় নেই।

**উত্তর :** আসলে প্রত্যেকটা কাজের পেছনে যদি একটা যুক্তি থাকে, তো প্রত্যেকটা অকাজের পেছনেও ১০১টা যুক্তি আছে। আপনি একটা চোরকে জিজ্ঞেস করেন, কেন তুমি চুরি করলে? সে চুরির পক্ষে ১০১টা পয়েন্ট বলতে পারবে। কিন্তু সেই ১০১টা পয়েন্ট চুরিকে জাস্টিফাই করে না।

যেরকম, আপনি বলছেন ‘ক্রেডিট কার্ড ছাড়া উপায় নেই’—ক্রেডিট কার্ড যারা বিক্রি করে তারা কিন্তু এই কথাই বলে। আমাদের দেশে এখন ক্রেডিট কার্ড যারা বয়ে বেড়াচ্ছেন তাদের সংখ্যা ছয় লক্ষের বেশি (!) এবং ক্রেডিট কার্ডে ভোক্তা ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ১১ হাজার কোটি টাকা!

আমাদের দেশের আসলে কী অবস্থা? যারা দরিদ্র ছিলো, ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে তাদের অতিদরিদ্র করা হয়েছে; এবার মধ্যবিত্তকে দরিদ্র করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কারণ যত এই ভোগ্যপণ্যের ঋণ বাড়তে থাকবে তত ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বেড়ে যাবে, দাম বেড়ে যাবে এবং মূল্যস্ফীতি ঘটবে। আমাদের এখনকার যে মূল্যস্ফীতি-দামের যে এত বৃদ্ধি—এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ক্রেডিট কার্ড এবং ভোক্তা ঋণ। কাজেই ‘ক্রেডিট কার্ড ছাড়া উপায় নেই’—এমনটা ভাবা হলো বোকামি।

আর টাকা সাথে রাখাটা যেহেতু অসুবিধা, আপনি এটিএম কার্ড করতে পারেন। এখন তো মোটামুটি সবখানেই এটিএম কার্ড-এর ব্যবস্থা আছে। ক্রেডিট কার্ডের চেয়ে এটিএম কার্ড ভালো।

এতে আপনার নিজের একাউন্টের টাকা আপনি তুলছেন এবং অতিরিক্ত ব্যয় করার ব্যাপারে সতর্ক থাকছেন। কারণ নিজের টাকা কেউ বেহিসেবি ব্যয় করতে চায় না। কিন্তু ঋণের টাকার প্রতি ঐ মায়া থাকে না। ওটা দিয়ে অপচয়ও তাই বেশি হয়।

## ঋণ থেকে উত্তরণ

**প্রশ্ন :** হঠাৎ করে ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছি। খুব চেষ্টা করছি ঋণ থেকে উত্তরণের জন্যে, কিন্তু পারছি না। যখনই কোনো ঋণ পরিশোধের জন্যে টাকার ব্যবস্থা করি, তখন নতুন সমস্যা দেখা দেয়। বাঁচার পথ কী?

**উত্তর :** আসলে আপনার প্রক্রিয়ায়, আপনার পরিকল্পনায় অথবা কাজে কোথাও ভুল আছে। সেই ভুলটা খুঁজে বের করুন। দেখবেন যে, ঋণগ্রস্ততা থেকে আপনি বেঁচে যাচ্ছেন। এই ভুলটা হতে পারে বিভিন্নরকম।

হতে পারে—আপনি ভুল কাজে অর্থ ব্যয় করছেন। অথবা হতে পারে—প্রয়োজনের খাতে আপনি ব্যয় করতে ভুলে যাচ্ছেন। ফলে যখন মনে পড়ছে তখন আপনাকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে বেশি টাকা খরচ করতে হচ্ছে। অথবা হয়তো এটা কোনো খরচের মধ্যেই পড়ে না—স্রেফ অপব্যয় বা ফুটানির জন্যে আপনি পয়সা ওড়াচ্ছেন। বাস্তবতা হচ্ছে এই অপব্যয়টাই আমরা বেশি করি। প্রেমচাঁদ-এর শংকরের গল্পেও আমরা দেখলাম ঋণের উৎপত্তি হয়েছিলো কিন্তু অপচয় থেকে। ঠাকুর বা মহাত্মাকে খাইয়ে পুণ্য অর্জনের আশায় সে তার সামর্থ্যের বাইরে খরচ করলো এবং দুর্দশায় পতিত হলো।

আগেকার দিনে জমিদাররা কী করতো? ‘বাবু কহিলেন, উপেন, তোর এক মেয়ের বিয়ে ধুমধাম করে দে। টাকা নে, শুধু একটা কাগজ লিখে দে’—টাকা খরচ হয়ে গেল, আর উপেনের মতো কৃষকের জমি-বাড়ি জমিদারের হয়ে গেল। তাই না?

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রামের সাধারণ মানুষের ঋণও কিন্তু অপচয় করার জন্যে। নিজের খাওয়ার টাকা নেই, এদিকে লোন নিয়ে তারা টিভি কিনছে, সাইকেল কিনছে। অর্থাৎ ঋণের মূল কারণ হচ্ছে অপচয়। ঋণ থেকে মুক্ত থাকতে হলে বা হতে হলে তাকে প্রয়োজন আর অপচয়ের পার্থক্যটা বুঝতে হবে। একজন মানুষ যদি তার সামর্থ্যের বাইরে খরচ না করে, সে কোনোদিন ঋণী হবে না।

সে যদি নিজের সীমাবদ্ধতাকে অনুভব করে যে—এই হচ্ছে আমার সীমা, আমি এটুকু খরচ করতে পারি, এর বেশি আমি খরচ করবো না—সে কোনোদিন ঋণী হবে না এবং কোনোদিন তাকে ঋণজর্জরিত অবস্থায় মারা যেতে হবে না। আসলে দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্যে কিন্তু আমরা ঋণী হই না, ঋণী হই অপচয়ের কারণে, অতিরিক্ত ব্যয় করার জন্যে।

আমাদের এক গ্রাজুয়েটকে তার আরো দুই বন্ধু এসে একটা ব্যবসার প্রস্তাব দিলো। তার যে জায়গা আছে—একটা প্রজেক্ট করে এই জায়গাটা ব্যাংকে মর্টগেজ দিতে হবে। সেই জায়গার দামও অন্তত চার কোটি টাকা। এটা থেকে কমসে কম ১৫ বা ২০ কোটি টাকার প্রজেক্ট তো আসবেই।

ঠিক আছে। প্ল্যান হলো যে, তিনজনই ডিরেক্টর হবে। জায়গা তার, ওরা শুধু ব্যাংক থেকে এটা প্রসেসিং করে দেবে। প্রজেক্ট পাশ হওয়ার পর তারা নাকি প্রথমেই তিনটা ব্র্যান্ড গাড়ি কিনবে যার দাম পড়বে একেকটা এক কোটি টাকা করে! আয়ের কোনো নাম-গন্ধ নেই, প্রথমেই এতগুলো টাকা খরচ! তারপর আছে অন্যান্য খরচ, মেইনটেনেন্স ইত্যাদি। একটা প্রজেক্ট থেকে যদি প্রথমেই তিন কোটি টাকা বেরিয়ে যায়, তো কী লাভ হবে এমন ইন্ডাস্ট্রি থেকে? আর যখন ঋণটা শোধ করতে পারবে না, তখন কী হবে?

আসলে ব্যবসা বলতে আমরা বুঝি যে, ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে হবে এবং সেই ঋণটাকে কোনোদিন শোধ করতে হবে না (!) কারণ ঋণ শোধের জন্যে যে ইনিশিয়েটিভ দরকার এবং প্রথম অবস্থায় যে পরিশ্রম দরকার, কষ্ট দরকার, সেটা আমরা অধিকাংশই করতে চাই না। কাজেই আপনার জন্যে পরামর্শ হলো, সবসময় নিজের ব্যয় সংকোচন করা। ব্যয় করবেন আয় অনুসারে। ফুটানি দেখাতে গিয়ে কোনো ব্যয় করবেন না। প্রয়োজন আর অপচয়ের সীমারেখাটা মেনে চলবেন। আপনি ঋণ থেকে বাঁচতে পারবেন।

**প্রশ্ন :** দারুণ অর্থকষ্টে আছি। ঋণ শোধ করতে পারছি না। আমার ভাইয়ের লন্ডনের ব্যবসায়ও ধস নেমেছে। কীভাবে এ থেকে মুক্ত হবো?

**উত্তর :** এক্ষেত্রে প্রথমে আপনাকে আপনার বর্তমান পরিস্থিতির কথা চিন্তা করতে হবে যে, এখন আমার অবস্থানটা কী এবং এই অবস্থার প্রেক্ষিতে আমি কী করতে পারি। যেকোনো বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্যে অনেকগুলো উপায় থাকতে পারে; কোনটা আপনি গ্রহণ করবেন, সেটা নির্ভর করবে আপনার বিবেচনার ওপর। অর্থাৎ সিদ্ধান্তটা আপনার হাতে। যখন আপনি মাথা ঠান্ডা রাখতে পারবেন, তখন জবাব আপনার মনই আপনাকে বলে দেবে।

আসলে আমরা অস্থির হই কেন? ভেতরের কষ্টের কারণে। যখন টাকা থাকে না, নিজের চলতে কষ্ট হয়, পরিবারে অশান্তি হয় তখন অস্থিরতাটা বেড়ে যায়। আর যদি ঋণ থেকে থাকে তাহলে তো কথাই নেই—আপনার দিনের ঘুম, রাতের ঘুম সব হারাম হয়ে যাবে!

যেরকম গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতারা-যারা ঋণ পরিশোধ করতে পারে না তাদের কী হয়? এটা ড. সৈয়দ শফিউল্লাহ তার ‘স্বপ্ন ও সচেতনতা’ বইয়ে উল্লেখ করেছেন। কয়েকটা লাইন হচ্ছে এরকম-‘...এদের মধ্যে গ্রুপনেতা [যিনি সবচেয়ে বেশি দুঃস্বপ্ন দেখেন] দেখেন যে, তার ওপরওয়ালা অর্থাৎ ম্যানেজার তাকে ঋণ আদায়ের জন্যে সার্বক্ষণিক তাগাদা দিচ্ছেন। আরেকজন সদস্য স্বপ্ন দেখেন, ঋণ সময়মতো শোধ করতে না পারায় গ্রুপের অন্য সদস্যরা তার ঘরের টিন, বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি জোর করে নিয়ে গেছে।’

অর্থাৎ ঋণ আপনার মানসিক শান্তিকে পুরোপুরি নষ্ট করে দেয়। এজন্যে এই অস্থির অবস্থায় মানুষ যে সিদ্ধান্তই নেয় সেটা ভুল হয়। অতএব মাথাটাকে ঠান্ডা করুন, ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন। এজন্যে নিয়মিত মেডিটেশন করুন। সবচেয়ে ভালো হয় যদি একটা নিয়ত নিয়ে টানা ৪০ দিন মেডিটেশন করেন। দেখবেন, আপনার কী করণীয়-এটা কাউকে বলে দিতে হবে না, মন থেকেই আপনি সিদ্ধান্ত পেয়ে যাবেন।

## ঋণ ফেরত

**প্রশ্ন :** আমার একটা সমস্যা হলো কেউ টাকা ধার চাইলে তাকে ‘না’ বলতে পারি না। কিন্তু ঐ টাকা ফেরত পেতে-বিশেষ করে ধনী লোকদের কাছ থেকে-খুবই কষ্ট হয়। অনেকেই আংশিক দেয়, কেউ একেবারেই দেয় না। এক্ষেত্রে ধার দেয়া কি বন্ধ করে দেবো?

**উত্তর :** এ ব্যাপারে ফিলোসফিটা খুব সিম্পল হওয়া উচিত। যদি আপনি মনে করেন, টাকা দিলে সে ফেরত দেবে না-তো টাকা ধার দেবেন না। আর যদি মনে করেন তাকে সাহায্য করা দরকার, সাহায্য হিসেবে দেবেন। ফেরতের প্রত্যাশা করবেন না। টাকাও দিলেন আবার টেনশনও করলেন-দুটো হওয়া উচিত না। টাকাও গেল, সম্পর্কও নষ্ট হলো-এমনটা যাতে না হয়।

**প্রশ্ন :** হাতে একেবারেই টাকা নেই। অনেকের কাছে টাকা পাই, কিন্তু তারা দিচ্ছে না। আমার প্রশ্ন, আমি কীভাবে এই টাকা ফেরত পেতে পারি?

**উত্তর :** আসলে এখন আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে, আপনার কী আছে এবং তা দিয়ে কীভাবে আপনার উপার্জনকে বাড়াতে পারেন। পাওনা টাকা



আদায় করার পেছনে ছোট্টার চেয়ে টাকা উপার্জন করা সহজ। কারণ ওটার পেছনে আপনি যে সময় শ্রম ও মনোযোগ ব্যয় করবেন তা যদি উপার্জন করার জন্যে ব্যয় করেন, তো তার চেয়ে বেশি উপার্জন করতে পারবেন।

আমরা কিন্তু আসলে পাওনা টাকা আদায়ের চক্রে পড়ে যাই। এজন্যে পাওনা টাকা আদায়ের চক্রে পড়বেন না। দিলে ভালো, না দিলে আরো ভালো। কাজেই যখনই বুঝবেন যে, টাকাটা আটকে গেছে, তখনই পাওনা ফেরত পাওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে আয় বৃদ্ধি করার দিকে মনোযোগ দেবেন।

## পেশা যখন ঋণ নিতে উৎসাহিত করা

**প্রশ্ন :** আপনি আমাদের ঋণমুক্ত জীবন গড়তে বলেছেন এবং ঋণকে নিরুৎসাহিত করেছেন। কিন্তু যারা ব্যাংকে চাকরি করে তাদের কী করণীয়? কারণ যে কর্মকর্তা যত বেশি লোন নেয়াতে পারবে সে তত ভালো পারফরমার, এতে তার দক্ষতা প্রকাশ পায়। এ অবস্থায় আমরা কি ব্যাংকে চাকরি করা থেকে বিরত থাকবো?

**উত্তর :** এটা একটা মৌলিক সমস্যা। ব্যাংকে কাজ করবেন না—এটা তো আমি বলতে পারি না। কিন্তু ব্যাংকে আপনার কাজ যদি হয় আরেকজনকে ঋণ নিতে উদ্বুদ্ধ করা, ক্রেডিট কার্ড নিতে উদ্বুদ্ধ করা, তাহলে আপনি মানুষকে শোষণের জালে আবদ্ধ করার কাজে সরাসরি সহযোগী হচ্ছেন। শুনতে অপ্রিয় হলেও এটাই বাস্তব। তাই যদি এর চেয়ে ভালো কাজ করার সুযোগ আপনার থাকে, তবে অবশ্যই চাকরি পরিবর্তন করা উচিত। কারণ আরেকজনকে বিপদে ফেলা—এটা অন্যের জন্যে যেমন ক্ষতিকর, তেমনি আপনার জন্যেও ক্ষতিকর। অতএব ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন।

**প্রশ্ন :** কোনো এনজিও-তে ফিল্ড অফিসার হিসেবে কাজ করাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

**উত্তর :** না করাটাকেই আমরা প্রেফার করবো। কারণ এনজিও-র একজন অফিসার ফিল্ড লেভেলে কী করছেন? সদস্যদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করছেন। এই কাজটাকে আসলে খুব সম্মানজনক বলে আমরা মনে করি না।

আর সার্ভিস চার্জের নামে একজন ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে যে ৩০% সুদ আদায় করা হয়—এটা অমানবিক। এ বিষয়গুলো আমাদের চিন্তা করতে হবে। আপনি এর চেয়ে ভালো চাকরির মনছবি দেখুন। নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন।

## বিবিধ

**প্রশ্ন :** আর্থিক ঋণ ছাড়াও অন্যান্য মানবিক সাহায্যপ্রাপ্তি থেকে যে ঋণ হয়—তা থেকে মুক্তির কি উপায় আছে?

**উত্তর :** এটা খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন। আসলে মানবিক ঋণ তো বটেই, আর্থিক ঋণও কি সবটা পূরণ করা যায়? যায় না। সেজন্যেই হক্কুল ইবাদ। যার কাছে আমি ঋণী তাকে না-ও পেতে পারি বা তার সাহায্যের দরকার না-ও হতে পারে। কিন্তু যাদের সাহায্যের প্রয়োজন আছে তাদের যেন ফিরিয়ে না দেই। হয়তো এই উসিলায় আল্লাহ আমাদের ঐ দেনা থেকে মুক্তি দিতে পারেন।

**প্রশ্ন :** দেশ-বিদেশের বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তাছাড়া ব্যাংকের ওপর যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো অনেকাংশে নির্ভরশীল। এ অবস্থায় ব্যাংকিংপ্রথা নিরুৎসাহিত করে বিশ্ব অর্থনীতিকে কোন পদ্ধতিতে চলার পরামর্শ দেবেন?

**উত্তর :** আমি কিন্তু ব্যাংকিং নিরুৎসাহিত করি নি। আমি বলছি ঋণ নিয়ে আপনি কখনো উপকৃত হবেন না—সেটা ব্যাংক লোন, ক্ষুদ্রঋণ বা ক্রেডিট কার্ড যা-ই হোক। ঋণ থেকে যত দূরে থাকবেন তত আপনি ভালো থাকবেন। আর ব্যাংক কীভাবে চললো সেটা ব্যাংকের ব্যাপার। আপনি ঋণ না করলেই হলো!

**প্রশ্ন :** কোনো অবস্থায়ই কি ঋণ নেয়া যাবে না? ধর্ম কী বলে?

**উত্তর :** আসলে কোনো অবস্থায়ই ঋণ নেয়া যাবে না। টাকার প্রয়োজন হলে আপনার ভাই বা আত্মীয়ের কাছ থেকে ধার নিতে পারেন। কিন্তু ব্যাংক ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ, ক্রেডিট কার্ড—এগুলোর মধ্যে যাবেন না। কারণ একবার যদি আপনি এসব ঋণের মধ্যে জড়িয়ে যান, আপনি আর বের হতে পারবেন না। তা

কেবল বাড়তেই থাকবে। যেমন, ছোটবেলায় যারা গ্রামে বড় হয়েছেন, তাদের অনেকেই হয়তো পাখি শিকারের এ খেলাটা খেলেছেন—একটা পাখিকে জীবিত ধরে একটুখানি সুতো দিয়ে বেঁধে রাখা হতো যাতে পাখিটা অল্প একটু জায়গায় উড়তে পারে। আবার তাকে খেতে দেয়া হতো যাতে মরে না যায়। একটা সময় হয়তো পাখিটা মারা যায়, কিন্তু তার আগ পর্যন্ত একদল কিশোরের আনন্দক্ৰীড়ার উপকরণ হিসেবেই সে ব্যবহৃত হয়।

ঋণজর্জরিত জীবন আসলে এরকমই। একবার ঋণজর্জরিত হয়ে পড়লে আপনি নড়তে চড়তে পারবেন, শ্বাস নিতে পারবেন, একটু হাসতেও পারবেন, কিন্তু সেটা প্রাণখুলে নয়। আসলে সাফল্য ও প্রাচুর্যের জন্যে ঋণ নয়, প্রয়োজন সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের দেশের কথাই ধরুন। যদি ঋণ নিয়ে পরিবর্তন আসতো তাহলে কোটি কোটি টাকা ঋণ সাহায্য নেয়ার পরও আমরা সুপারপুওর হয়ে যেতাম না। আমাদের চেয়ে খারাপ অবস্থা থেকে গুরু করেও কত দেশ এখন আমাদের চেয়ে এগিয়ে। কেন? কারণ আমরা অন্যের টাকায় কাজ করি। অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে আমাদের ভালোর চাইতে বেশি গুরুত্ব দেই দাতাগোষ্ঠীর পছন্দের খাতকে। ফলে আমাদের প্রবৃদ্ধি সব বাইরে চলে যায়। দেশের সম্পদ আর বাড়ে না।

বিদেশি সাহায্য সংস্থাগুলোর কাজ হচ্ছে, নানাভাবে আমাদের ঋণগ্রস্ত করে রাখা। তাহলে আপনি দাস হয়ে থাকবেন—আপনার স্বাধীনতা থাকবে না, স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারবেন না। আসলে চিন্তা বা কথার স্বাধীনতার জন্যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন না হলে, নিজের আয় উপার্জন না থাকলে, সমস্ত অবিচার মুখ বুজে সহ্য করে যেতে হয়। আমাদের দেশের মহিলারা এত নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করে কেন? কারণ তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নাই। কিন্তু যে নারীদের স্বাধীনতা আছে, আত্মপরিচয় আছে, তাদের এত সহজে দমিয়ে রাখা যায় না।

রসূল (স) যে ক’টা জিনিস থেকে পানাহ্ চেয়েছেন, তার মধ্যে একটা হলো—ঋণগ্রস্ত হওয়া। কোরআনের শিক্ষা হচ্ছে—আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পদ অনুসন্ধান করা এবং যাকাতদাতা হওয়া। যজুরবেদে বলা হয়েছে, ‘হে মানুষ! স্বনির্ভর হও। বাইরের সাহায্যের দাসে পরিণত হয়ো না।’ অথর্ববেদে বলা হয়েছে, ‘জীবনের প্রতিটি স্তরে সব ধরনের ঋণ থেকে মুক্ত থাকো।’ ঋণ করে ঘি খাওয়া, প্রতারণা, জুয়া—এগুলো হচ্ছে ধর্মীয় শিক্ষার বিরোধী। যদি আপনি ঋণজর্জরিত থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে যে, ধর্মের শিক্ষা আপনি অনুধাবন করেন নি, ধর্ম অনুসরণের চেষ্টা আপনি করেন নি।

## প্রতারণা ৯

### নেটওয়ার্কিং/ মাল্টিলেভেল মার্কেটিং

**প্রশ্ন :** এমএলএম বা নেটওয়ার্কিং আমাদের দেশে আকর্ষণীয় বিনিয়োগ ও যুব কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করে অনেক শিক্ষিত যুবক মোটা অঙ্কের কমিশনও পাচ্ছে; কিন্তু আপনি এখানে জড়িত থাকতে নিষেধ করছেন—এর কারণ ব্যাখ্যা করবেন কি?

**উত্তর :** আসলে যে নেটওয়ার্কিংয়ের কথা আপনি বলছেন তা পাশ্চাত্যে পিরামিড স্কিম নামে পরিচিত প্রতারণার ১০০ বছরের পুরনো পদ্ধতি। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল কাজ হচ্ছে নতুন সদস্য ভর্তি এবং তাকে কেন্দ্র করে অর্থের আদান-প্রদান। এখানে প্রত্যেক সদস্য ভর্তির সময় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি দিচ্ছে। আবার সে যখন নতুন সদস্য যোগাড় করছে তখন সে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশন পাচ্ছে। এই কমিশনের টাকা আসছে নতুন সদস্যরা ভর্তির সময় যে ফি প্রদান করছে সেখান থেকে।

ব্যবসায়িক মডেল হিসেবে নেটওয়ার্কিং যে ব্যর্থ হতে বাধ্য তা বহুদিন আগেই প্রমাণিত হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, প্রতিটি সমাজেই এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে আগ্রহী বা আর্থিকভাবে সক্ষম মানুষের সংখ্যা সীমিত। একটি সময় আসবেই যখন প্রতিষ্ঠান একটি থিতানো অবস্থায় পৌঁছবে, ভর্তি করার মতো নতুন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর পুরনো সদস্যদের কমিশন যেহেতু আসছে নতুন সদস্যদের ভর্তি ফি থেকে, যারা এই থিতানো অবস্থার কিছুটা আগে সদস্য হয়েছে, তারা কেউ কোনো কমিশন পাবে না। বরং নিজেরা যে ফি দিয়ে ভর্তি হয়েছে তা-ও হারাবে।

যদিও এ ধরনের স্কিমগুলোর অনেক রূপ আছে, তবু আলোচনার সুবিধার্থে ধরুন, আপনি তিন হাজার টাকা দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলেন। প্রতিষ্ঠানের নিয়ম হচ্ছে, দুহাতে দুজন নতুন সদস্য ভর্তি করতে পারলে আপনি দেড় হাজার টাকা কমিশন পাবেন। অতএব ভর্তি হওয়ার জন্যে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করলেন তার সমপরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে হলে আপনাকে চারজন ভর্তি করতে হবে।

এখন মনে করুন, প্রথম স্তরে আপনার মতো মোট পাঁচজন ভর্তি হয়েছে। আপনারা প্রত্যেকেই চারজন করে ভর্তি করলে দ্বিতীয় স্তরের সদস্য সংখ্যা

হবে ২০ জন। তারা প্রত্যেকে চারজন করে ভর্তি করলে তৃতীয় স্তরের সদস্য সংখ্যা হবে ৮০ জন। এভাবে চলতে থাকলে চতুর্দশ স্তরে সদস্য সংখ্যা হতে হবে ৩৩ কোটির বেশি—বাংলাদেশের জনসংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি!

সপ্তদশ স্তরে এসে সদস্য সংখ্যা হতে হবে দুহাজার কোটির বেশি, অর্থাৎ পৃথিবীর জনসংখ্যার চেয়ে তিনগুণ বেশি! অতএব ব্যবসায়িক মডেল হিসেবে এটি কতখানি অস্থায়ী তা সহজেই বোঝা যায়। বাংলাদেশে তিন হাজার টাকা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী লোকের সংখ্যা এর চেয়ে অনেক কম। যদি ৫০ লক্ষও হয়, তারপরও একাদশ স্তরের পর নতুন সদস্য খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ফলে একাদশ স্তরে যে ৫০ লক্ষাধিক সদস্য রয়েছেন তারা প্রত্যেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। অর্থাৎ মোট সদস্যের তিন চতুর্থাংশই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। লক্ষ করণ, যখনই থিতানো অবস্থায় পৌছাক না কেন, শেষের স্তরের প্রত্যেকেই পুরো টাকাটা হারাবেন। যেহেতু প্রত্যেক স্তরে সদস্যসংখ্যা এর আগের স্তরের চারগুণ, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মোট সদস্যের প্রায় তিন চতুর্থাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

এ উদাহরণটিতে আমরা ধরে নিয়েছি, প্রত্যেক সদস্য চারজন নতুন সদস্য যোগাড় করবে। যদিও প্রথম দু'এক স্তরের সদস্যরা প্রত্যেকে আরো বেশি সদস্য যোগাড় করবে এবং প্রতিষ্ঠান আরো দ্রুত থিতানো অবস্থায় পৌছাবে; ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যের অনুপাতও বেড়ে যাবে। সারকথা এটিই যে, এ ধরনের ব্যবসায় লাভবান হন তারাই যারা ওপরের দু'একটি স্তরে থাকেন, অর্থাৎ উদ্যোক্তা বা প্রতারক গোষ্ঠি। আর ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে এই নেটওয়ার্কিং বা পিরামিড স্কিমের কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২০০৮ সালের নভেম্বর মাসের ১২ তারিখে বেশ কয়েকটি পিরামিড স্কিমের ধসের পর কলম্বিয়ার পাস্টো, টুমাকো, পপায়ান ও সান্টাডের দ কুইলিচাও শহরে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার মানুষ উচ্চহারে লাভের লোভে এসব স্কিমে বিনিয়োগ করেছিলো। কোনো আইনের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় কয়েক বছর ধরে স্কিমগুলো অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি পায়। শেষ পর্যন্ত জনগণের বিক্ষোভের মুখে কলম্বিয়া সরকার দেশে ‘অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থা’ ঘোষণা করতে বাধ্য হয় এবং প্রতারকদের গ্রেফতার করে প্রতিষ্ঠানগুলোকে বন্ধ করে দেয়।

বর্তমানে আলবেনিয়া অস্ট্রেলিয়া ব্রাজিল বুলগেরিয়া কানাডা চীন কলম্বিয়া ফ্রান্স জার্মানি হাঙ্গেরি আইসল্যান্ড ইরান ইটালি জাপান মালয়েশিয়া মেক্সিকো নেপাল নেদারল্যান্ড নিউজিল্যান্ড নরওয়ে ফিলিপিন্স পোল্যান্ড পর্তুগাল রুম্যানিয়া শ্রীলংকা সুইজারল্যান্ড থাইল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ও সাউথ

আফ্রিকাসহ বিশ্বের অনেক দেশেই কোনো পণ্য বা সেবা প্রদান ছাড়া শুধুমাত্র কমিশনের বিনিময়ে ক্লায়েন্ট যোগাড় আইনগতভাবে নিষিদ্ধ।

আমাদের দেশেও কিন্তু নেটওয়ার্কিং ব্যবসা নতুন নয়। ১৯৯৭ সালে প্রথম জিজিএন নামে একটি নেটওয়ার্কিং কোম্পানি এলো বাংলাদেশে। আমার এখনো মনে আছে, চট্টগ্রামে পরিচিতি সভা হবে। আগ্রাবাদ হোটেলে ঢুকছি। এক গ্রাজুয়েট হঠাৎ এসে বললো, গুরুজী, আসসালামু আলাইকুম। একটা বড় কাজে যাচ্ছি, দোয়া করবেন। তখন তো গ্রাজুয়েট কম ছিলো, কথা বলার সুযোগ ছিলো, আর আমি একটু আগেও গিয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কী কাজ? সে বললো, ‘জিজিএন’। জানতে চাইলাম, এটা আবার কী জিনিস? আমি তখনো এ সম্পর্কে শুনি নি। সে সবকিছু খুলে বললো।

জিজিএন হচ্ছে গ্লোবাল গার্জিয়ান নেটওয়ার্ক-এভাবে কাজ করে। আমি যেহেতু সাংবাদিকতা করতাম, আমেরিকাতে এ ধরনের প্রতারণার ফাঁদের কথা বহুদিন আগেই শুনেছি। আমি বললাম, তোমার মা-বাবা অনেক নেক কাজ করেছিলেন নিশ্চয়ই, সেজন্যে ওখানে যাবার আগে আমার সাথে তোমার দেখা হয়েছে। টাকাপয়সা দাও নি তো? বললো, না, দিতে যাচ্ছি। বললাম, তাহলে আর জমা দিও না। তুমি খুব ভাগ্যবান। প্রতারিত হওয়া থেকে বেঁচে গেলে। সে আর টাকা জমা দেয় নি।

পরে শুনলাম, আমাদের গ্রাজুয়েটদের মধ্যে কেউ কেউ ঢাকা থেকে চিটাগাং চলে গেছে ক্লায়েন্ট যোগাড়ের জন্যে। তারা বলছে, গুরুজীর স্বপ্ন-সবাই প্রাচুর্যবান হবে। জিজিএন এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যে এসেছে। আবার তারা বলে দিয়েছে, যেন আমার কাছ পর্যন্ত কথা না আসে। খোঁজ লাগালাম, এক এক করে সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম। বললাম, দেখ বাবা, এই নেটওয়ার্কিং, এমএলএম-এগুলো হচ্ছে প্রতারণা। তোমরা দুই বছরের মধ্যে বুঝতে পারবে কত বড় প্রতারণার শিকার হয়েছে। একজন বললো, গুরুজী, আপনি তো ইকোনমিকস-এর ছাত্র না, বুঝবেন না এর কী সম্ভাবনা! দেখবেন এই টাকায় আমি মেডিটেশনের জন্যে এয়ারকন্ডিশনড হল বানাবো। সেই হলে মেডিটেশন করবো, আপনি আসবেন মেডিটেশন করতে।

আমি বললাম যে, মেডিটেশন হল যারা বানানোর, তারা এমনিই বানাবে, তাদের জিজিএন করার প্রয়োজন হবে না। আমরা সাংগঠনিকভাবে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, জিজিএন-এর সাথে যে থাকবে ফাউন্ডেশন থেকে তাকে বহিষ্কার করা হবে। নিরীহ মানুষের সঙ্গে প্রতারণায় ফাউন্ডেশনের কাউকে সহযোগিতা করতে দেবো না। দুবছরের মাথায় আমাদের আরেক গ্রাজুয়েট এসে খবর

দিলো যে, সেই জিজিএনওয়ালা বহিষ্কৃত গ্রাজুয়েট জীবিকার জন্যে এখন বাসে বাসে ফেরি করে কলম, খেলনা ইত্যাদি বিক্রি করছে।

এই হচ্ছে জিজিএন-লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতারিত হয়েছে। এখন আমাদের দেশে যেসব নেটওয়ার্কিং, মাল্টিলেভেল মার্কেটিং প্রতিষ্ঠান কাজ করছে এগুলো সবই জিজিএন-এর ভূত। যখন ‘নেটওয়ার্কিং’ শব্দটার বদনাম হয়ে গেল, জিজিএন ব্যর্থ হলো-তারপর নিউওয়ে বাংলাদেশ, তনচং-আরো অনেক নামে একই ধরনের প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে।

**প্রশ্ন :** আপনি বোধহয় জানেন না এসব প্রতিষ্ঠান পণ্যসেবা দেয়। সেখানে বিনিয়োগ করে মুনাফা লাভের সুযোগ আছে .....

**উত্তর :** যেহেতু শুধু কমিশনের বিনিময়ে ক্লায়েন্ট যোগাড় প্রতারণার মাধ্যম হিসেবে পরিচিত এবং বিশ্বের প্রতিটি সচেতন দেশেই অবৈধ, তাই আইনের চোখ এড়ানোর জন্যে মূল ব্যবসার সাথে কোনো পণ্য বা সেবা জুড়ে দিয়ে একে মাল্টিলেভেল মার্কেটিংয়ের রূপ দেয়া হয়। অর্থাৎ নতুন সদস্য যোগাড়ের পাশাপাশি আপনি কোনো পণ্য বা বিনিয়োগ পরিকল্পনা বিক্রি করছেন অথবা নতুন সদস্যরা আপাতদৃষ্টিতে শুধু ভর্তি ফি দিচ্ছে না, তারা কোনো পণ্য কিনছে, কোচিং সেন্টারে, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ছাত্র হিসেবে ভর্তি হচ্ছে অথবা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করছে যার মুনাফা ১০/১২/১৫ বছর পর পাবার কথা।

এসব পণ্য বা সেবা আসলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো অর্থাৎ মূল নেটওয়ার্কিং ব্যবসাকে আড়াল করার অপচেষ্টা মাত্র। একটু খবর নিলেই জানতে পারবেন, দুই হাজার ছাত্রের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কম্পিউটার রয়েছে ১০টি কিংবা কোচিং সেন্টারে শিক্ষকের নামের তালিকায় অনেক বড় বড় নাম থাকলেও বাস্তবে তাদের কোনো সাক্ষাৎ নেই, ক্লাসের বদলে ছাত্ররা সব নতুন ‘ছাত্র’ ভর্তি করতে ব্যস্ত। অথবা যে প্রতিষ্ঠান বলছে, গাছে বিনিয়োগ করে একটা নির্দিষ্ট সময় পর প্রচুর মুনাফা পাওয়া যাবে, ঐ অঞ্চলে ঐ প্রতিষ্ঠানের কোনো গাছ তো দূরের কথা, নিজস্ব কোনো জমিই নেই।

যারা ব্যবসা সম্পর্কে কিছুটা হলেও জানেন, তারা সহজেই বুঝতে পারবেন বিপণনের মডেল হিসেবে মাল্টিলেভেল মার্কেটিং মোটেই লাভজনক বা ফলপ্রসূ নয়। প্রথমত, ব্যবসায় লাভ করার জন্যে পণ্যের চাহিদা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। ধরুন, আপনি শ্যাম্পু বিক্রি করছেন বোতল প্রতি

১০০ টাকা। বাস্তব দুনিয়ায় যেকোনো প্রতিষ্ঠান চুলচেরা হিসাব করে বের করার চেষ্টা করবে ১০০ টাকা মূল্যের ঐ শ্যাম্পুর চাহিদা কত। কারণ চাহিদার চেয়ে বেশি পণ্য যদি বাজারে ছাড়া হয়, তাহলে বিক্রেতার বিক্রি করতে পারবে না। পণ্য পড়ে থাকবে, প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু এমএলএম পদ্ধতিতে পণ্যের চাহিদা অনুযায়ী যোগান দেয়ার যে স্বাভাবিক নিয়ম আছে সেটা মানার যেন কোনো প্রয়োজন নেই। আরো আরো বেশি পণ্য সরবরাহ করতে, বিক্রেতা নিয়োগ করতে তাদের কোনো দ্বিধা নেই। দ্বিতীয়ত, স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদনকারী ও ক্রেতার মধ্যে বিক্রেতা বা ডিস্ট্রিবিউটরের যতগুলো স্তর থাকবে, উৎপাদকের মুনাফা তত কমে যাবে। অতএব প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিক্রেতা কোনো কোম্পানির চাওয়ার কথা নয়। কিন্তু এমএলএম কোম্পানিগুলো সেটিই করছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন? উত্তর একটিই—তাদের উদ্দেশ্য পণ্য বিক্রি করে মুনাফা করা নয়, উদ্দেশ্য—যত বেশি সম্ভব সদস্যের ভর্তি ফি বা ‘বিনিয়োগ’ নিয়ে কেটে পড়া। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ট্রেড কমিশন খুব পরিস্কারভাবে বলেছে, যদি কোনো ব্যবসায়িক প্রস্তাবে আপনার আয়ের মূল উৎস হয় পণ্য বিক্রির পরিবর্তে শুধু নতুন সদস্য/ ডিস্ট্রিবিউটর যোগাড় করা, তবে তাতে জড়িত না হওয়াই ভালো। কোম্পানিগুলো যতই বলুক যে, শেষের দিকের ব্যক্তির ও লাভবান হবেন, প্রকৃতপক্ষে তা অবাস্তব।

প্রতারণা যখন দেখে যে, যথেষ্ট নতুন বিনিয়োগকারী নেই, পুরনোদের কমিশনের টাকা ওঠানো যাচ্ছে না, তখন তারা টাকা নিয়ে সরে পড়ে, কিছুদিন পর নতুন মুখোশে আবির্ভূত হয়। ভারত নেপাল শ্রীলঙ্কা এবং যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র চীন সুইডেন পোল্যান্ডসহ বিশ্বের ৫২টি দেশে এমএলএম পদ্ধতিতে পণ্য বিপণন নিষিদ্ধ। প্রতারণার দায়ে ২০১১ সালে বিশ্বের বৃহৎ এমএলএম কোম্পানি বলে দাবিদার এমওয়ে-র সব কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে ভারত সরকার।

১৯৪১ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার একটি অপ্রচলিত ভিটামিন বিপণনে প্রথম এমএলএম পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। বেশিরভাগ এমএলএম কোম্পানিই খাদ্যের পরিপূরক, বলবর্ধক, সৌন্দর্যবর্ধক, ওজনহাসকারী ইত্যাদি পণ্য বেছে নেয়। সব দেশেই এ জাতীয় কোম্পানির ব্যবসায়িক কৌশল হলো, ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিশ্বাসকে পুঁজি করা। অর্থাৎ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা—যাদের পক্ষে পণ্যের গুণাগুণ বা মূল্য যাচাইয়ের কোনো সুযোগ থাকে না। গ্রাহক আকর্ষণে বিশ্বের প্রায় সব দেশেরই



এমএলএম কোম্পানিগুলোর চরিত্র প্রায় একরকম। যেমন, প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ব্যবসায়ের অংশীদার করা, শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিদের মাসিক উপটোেকন দেয়া এবং সরকার না চাইলেও সেধে গিয়ে বড় বড় ক্রীড়ানুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্পন্সর হওয়া ইত্যাদি। আমাদের দেশে সম্প্রতি যেসব এমএলএম কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে তাদের কর্মকাণ্ডের কথা মনে করুন। তারাও কিন্তু এসবই করেছে।

কাজেই যেটাকে আপনি বলছেন পণ্যসেবা-তা আসলে প্রতারণার চাল ছাড়া আর কিছুই নয়। আর বিনিয়োগ করে মুনাফা? প্রথমদিকে দুয়েকটা কিস্তির টাকা দিয়ে আপনাকে হয়তো আরো বিনিয়োগে আকৃষ্ট করবে, তারপর একসময় আম-ছালা দুটো নিয়েই সটকে পড়বে ওরা।

সেই হোজার গল্পের মতো। হোজা একবার তার এক প্রতিবেশীর কাছে থেকে একটা হাঁড়ি চেয়ে আনলেন রান্নার জন্যে। কয়েকদিন পর ফেরত দেয়ার সময় ঐ হাঁড়িটার সাথে আরো একটা ছোট হাঁড়ি যখন দিতে গেলেন, প্রতিবেশী তো অবাক। জিজ্ঞেস করলো, হোজা, দুটো হাঁড়ি দিচ্ছে যে। হোজা বললেন, তোমার হাঁড়ি তোমাকে দেবো না তো কাকে দেবো? প্রতিবেশী বললো, আমার হাঁড়ি! আমি তো একটা হাঁড়ি দিয়েছি। হোজা বললেন, তা ঠিক আছে। কিন্তু হাঁড়িটা একটা বাচ্চা দিয়েছে কি না! মা হাঁড়িটা যেহেতু তোমার, কাজেই এর বাচ্চাটাও তো তোমারই হবে। তাই না?

প্রতিবেশী তো খুশিতে আটখানা। আসলে একটা হাঁড়ি দিয়ে দুটো পাওয়ায় সে এতই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলো যে, হাঁড়ি কীভাবে বাচ্চা দেয়-এ প্রশ্ন তার মনে এলোই না। কয়েকদিন পর হোজা আবারো তার বাড়িতে গেলেন হাঁড়ি ধার চাইতে। এবার প্রতিবেশী বেশ অনেকগুলো হাঁড়ি ধরিয়ে দিলো হোজার হাতে। মনে মনে ভাবলো, ইস, এবার প্রত্যেকটা হাঁড়ির সাথে পাবো একটা করে বাচ্চা হাঁড়ি!

এদিকে হাঁড়ি তো আর ফেরত আসে না। অনেকদিন অপেক্ষা করে করে শেষমেশ প্রতিবেশী একদিন হোজার কাছে গিয়ে তার হাঁড়িগুলো ফেরত চাইলো। মুখ খুব ব্যাজার করে হোজা বললেন, দুঃখের কথা কী আর বলবো ভাই। কাল রাতে বাচ্চা দিতে গিয়ে তোমার হাঁড়িগুলো মারা গেছে। প্রতিবেশী বললো, হাঁড়ি আবার মরে কীভাবে? হোজা উত্তর দিলো, হাঁড়ি বাচ্চা দেয় যেভাবে। অর্থাৎ যে হাঁড়ি বাচ্চা দিতে পারে, সে হাঁড়ি তো মারাও যেতে পারে। শেষপর্যন্ত কাজীর দরবারে গিয়েও প্রতিবেশী কোনো সুবিধা করতে পারলো না। কাজীও তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এর আগে হাঁড়ি কি

বাচ্চা দিয়েছিলো? প্রতিবেশী বললো, হাঁ। কাজী বললেন, তাহলে যে হাঁড়ির বাচ্চা দেয়ার কথা তুমি নিজেই বিশ্বাস করেছো, সে হাঁড়ি মারাও যেতে পারে সেটাও তো তোমাকে মেনে নিতে হবে।

অতএব সামান্য একটু দেখেই বিশ্বাস করবেন না বা মতামত দেবেন না। পুরোটা দেখুন, জানুন, বুঝুন, তারপর সিদ্ধান্ত নেবেন।

**প্রশ্ন :** যারা না জেনে এমএলএমে যুক্ত হয়েছে তারা এখন কী করতে পারে? তারা কি ডিলারশিপ বিক্রি করে দিয়ে বিচ্ছিন্ন হবে?

**উত্তর :** যদি না জেনে প্রতারণার সাথে যুক্ত হয়ে থাকেন সম্পর্ক ছেদ করাটাই উত্তম। যত তাড়াতাড়ি ছেদ করতে পারবেন, তত প্রতারক হওয়া থেকে বেঁচে যাবেন। মনে রাখবেন, প্রতারকের পরিণতি সবসময়ই অত্যন্ত করুণ। তাদের কারো জীবনেই শান্তি নেই।

আপনারা সবাই পত্রিকায় পড়েছেন মার্কিন ধনকুবের বার্নার্ড ম্যাডফ-এর কথা যে ২০০৮ সালের ১১ ডিসেম্বর আর্থিক প্রতারণার দায়ে গ্রেফতার হয়। দি ইকোনমিস্ট পত্রিকা তাদের ১৮ ডিসেম্বর ২০০৮-এর ইস্যুতে ম্যাডফ স্ক্যান্ডালকে অভিহিত করে শতাব্দীর সেরা প্রতারণা হিসেবে। একক পরিচালনায় সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রতারণার নায়ক ম্যাডফ হাজার হাজার বিনিয়োগকারীকে প্রতারিত করে। শেয়ার প্রতারণা, মেইল ও ই-মেইল প্রতারণা, মানি লন্ডারিং, পারজুয়ারি (বিচারাধীন কোনো বিষয়ে শপথ করে মিথ্যা বলা), পঞ্জি স্কিম চালানোসহ বিভিন্ন অর্থ সংক্রান্ত জালিয়াতি চালিয়ে যায় কয়েক দশক ধরে।

‘পঞ্জি স্কিম’ শব্দটি পরিচিত হয় চার্লস পঞ্জি নামে এক প্রতারকের বিনিয়োগ ব্যবসার মাধ্যমে। এ ব্যবসায় বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণীয় হারে মুনাফা দেয়া হয় তাদেরই বিনিয়োগ অথবা নতুন বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে, কোনো মুনাফা থেকে নয়। নতুন বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করার এটি একটি ফাঁদ। কারণ পঞ্জি স্কিমে যে মোটা অঙ্কের লভ্যাংশ দেয়া হয়, তা নিয়মিত চালিয়ে যেতে সবসময় অর্থের একটা প্রবাহ প্রয়োজন। তাই নতুন বিনিয়োগকারীরা যাতে বিনিয়োগের টাকা ফেরত না নেয়, সেজন্যে তাদেরকে দেয়া হয় দীর্ঘমেয়াদী নতুন নতুন সব বিনিয়োগ অফার।

ধনকুবের বার্নার্ড লরেন্স ম্যাডফ যুক্তরাষ্ট্রের একজন কোটিপতি ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত ছিলো। বাবা ছিলো ইহুদি কার্ঠমিস্ত্রি; পরে স্টকব্রোকার হয়।

২২ বছর বয়সে ম্যাডফ মাত্র পাঁচ হাজার ডলার পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করে। ১৯৬০ সালে ওয়ালস্ট্রিট ভিত্তিক ফার্ম ‘বার্নার্ড এল ম্যাডফ ইনভেস্টমেন্টস সিকিউরিটিজ’ প্রতিষ্ঠা করে এবং ২০০৮ সালের ১১ ডিসেম্বর প্রেফতার হওয়ার আগ পর্যন্ত সে এর চেয়ারম্যান ছিলো। খুব কম সময়ে ম্যাডফ ওয়ালস্ট্রিটে সফল ব্যবসায়ী হিসেবে সুনাম অর্জন করে। এই সাফল্যের সূত্র ধরেই একদিন সে আমেরিকার সবচেয়ে বড় স্টক এক্সচেঞ্জ নাসদাক-এর চেয়ারম্যান হয়।

ম্যাডফের বিশেষ একটি গুণ হলো—সে খুব কুশলী ছিলো, সহজেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক থেকে তার মক্কেলদের অর্থ হাতিয়ে নিতো। প্রতারিত এ ভুক্তভোগীদের দীর্ঘ তালিকায় রয়েছেন খ্যাতিমান ও বিলিওনিয়ার অনেক ব্যক্তি। যেমন, নিউইয়র্ক মেটস বাস্কেটবল টিমের মালিক, স্টিভেন স্পিলবার্গ, ৯৬ বছর বয়সী ক্লুডিং ম্যাগনেট কার্ল শ্যাপিরো, যার ৫৪৫ মিলিয়ন ডলার হাতিয়ে নিয়েছিলো ম্যাডফ। নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া এলি উইজেল লগ্নি করেন তার পুরস্কারের এক কোটি ৫২ লাখ ডলার। শুধু বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই নন, বড় বড় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকেও ম্যাডফ তার প্রতারণার ফাঁদে ফেলে। স্প্যানিশ ব্যাংক ব্যাঙ্কো সানতান্দার তাদের সুইস কোম্পানিগুলোর ৩০০ মিলিয়ন ডলার হারিয়েছে। বিকল্প বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ফেয়ারফিল্ড গ্রিনউইচ-এর বিনিয়োগ কমপক্ষে সাড়ে সাত বিলিয়ন ডলার। বেশকিছু ইহুদি দাতব্য সংগঠন এখন বন্ধ হওয়ার পথে। এ তালিকায় আছেন হাজারেরও বেশি অবসরপ্রাপ্ত ধনবান ব্যক্তি। এমনকি তার একান্ত শুভাকাজক্ষী বন্ধুদেরও সে বাদ দেয় নি প্রতারণা থেকে।

এই ম্যাডফের এখন কী অবস্থা? বিলাসবহুল বাড়ি, গাড়ি, প্রমোদতরী রেখে ৭৪ বছর বয়সে এখন কারাজীবন ভোগ করছে। ১১টি মামলা ছিলো তার বিরুদ্ধে—যার প্রতিটি জালিয়াতি, অর্থ আত্মসাৎ আর অর্থ পাচারের। যুক্তরাষ্ট্রের আদালত তাকে ১৫০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। শতাব্দী সেরা এ প্রতারণায় বিনিয়োগকারীদের ৬৫ বিলিয়ন ডলার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে যা আমাদের টাকায় ৫৩ হাজার কোটি টাকা। আদালতের ভাষায়—‘সে চরম বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধ করেছে’।

প্রতারণার ফলাফল কেমন শোচনীয় হয়—তা ম্যাডফের পরিবার থেকেই বোঝা যায়। হাজার হাজার মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলেও সে নিজে ফাঁদে পড়ে তারই সন্তানদের হাতে। বাবার এসব অপকীর্তির কথা নিজেরা জানার পরই তা প্রকাশ করে দেয় ফেডারেল কর্তৃপক্ষকে। এর পর পরই সে

থ্রেফতার হয়। ম্যাডফের ভাতিজা রজার ম্যাডফ ২০০৬ সালের এপ্রিলে মাত্র ৩২ বছর বয়সে ব্লাড ক্যান্সারে মারা যায়। মারা যাওয়ার আগে বলে গেছে, ম্যাডফের রক্তকে অভিশাপ দেয়া উচিত। ব্লাড ক্যান্সার নিয়ে টিকে আছে ম্যাডফের ভাই পিটার। ম্যাডফের ছেলে এন্ড্রু-র ক্যান্সারের চিকিৎসা চলছে। বার্নার্ডের আরেক ভাতিজা ব্যস্ত তার মেয়ের ব্লাড ক্যান্সারের চিকিৎসা নিয়ে। পুরো পরিবারে ক্যান্সার ঢুকে গেছে। শতাব্দী সেরা এ প্রতারণার খবর ফাঁস হওয়ার পর ম্যাডফের স্ত্রীও বিস্মিত, সে-ও নিজেকে প্রতারিত মনে করছে।

আসলে শৈশবে শোনা সেই ছোট্ট কথাটি সবসময় মনে রাখবেন-লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে আপনি মানুষের কল্যাণে পরিশ্রম করুন। আপনার জীবনে প্রাচুর্য ও সাফল্য আসবে সহজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

**প্রশ্ন :** আমি জিজিএন জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠানের মেম্বর হওয়ার জন্যে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা দিয়েছি, বিনিময়ে তারা অনেক সুবিধা দেবে এই শর্তে। পরবর্তীতে গিয়ে দেখি অফিস উধাও। আসিম কাজমী নামে এক পাকিস্তানি এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর। তার সাথে আমার যে চুক্তিপত্রটি হয়েছে, তা-ও আছে আমার কাছে। এসব নিয়ে আমার বাবা ও পরিবারের সদস্যরা আমার ওপর ক্ষুব্ধ। আপনার দোয়া ও উপদেশ কামনা করছি।

**উত্তর :** আপনি চুক্তি করে টাকাপয়সা দিয়ে এখন আমার উপদেশ কামনা করছেন। এখন আমি আপনাকে কী উপদেশ দেবো? আর দিয়ে লাভটাই বা কী হবে? সবসময় টাকাপয়সা দেয়ার আগে ভাববেন, পরামর্শ করবেন। পরে নয়। ছাতা হাতছাড়া করে কখনো ‘আমি কার খালু’ হতে যাবেন না।

গল্পটা এরকম-গ্রামের ভায়রাবাড়িতে বেড়াতে গিয়ে হাটের ভিড়ে দাঁড়িয়ে পরিচিত কাউকে খুঁজছিলেন এক ভদ্রলোক। হঠাৎ উদয় হলো সুন্দর চেহারার এক যুবক। লম্বা সালাম দিয়ে এমন আপন ভঙ্গিতে সে কথা বলতে লাগলো, যেন অনেক দিনের চেনা। ভদ্রলোক কিছুটা বিব্রত হয়েই জিজ্ঞাস করলেন, তুমি কে বাপু? তোমাকে তো ঠিক চিনলাম না। সে বললো, চিনলেন না খালু? আমি তো আপনার ভাগ্নে। আপনি আমার খালু হন। ভদ্রলোক ভাবলেন, ভায়রার গ্রাম যেহেতু, হবে বোধহয় ভাগ্নে-টাগ্নে।

এর মধ্যে ছেলেটি বললো, আমি থাকতে আপনি কেন কষ্ট করে ছাতা ধরছেন খালু? আমাকে দিন, আমি ধরছি। ভদ্রলোক ভাবলেন, আহা! ছেলেটা

বড় ভালো! মুরব্বীদের খেদমত করতে জানে! সরল মনে ছাতাটা দিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে দেখেন, ছেলেটি নেই। অনেকক্ষণ দাঁড়ালেন। তা-ও দেখা নেই। এখন খুঁজবেন যে, সে উপায়ও তো নেই। নামধাম কিছু জিজ্ঞাস করেন নি। শেষমেশ হাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চোঁচাতে লাগলেন, আমি কার খালু রে! আমি কার খালু রে! কিন্তু ভাগ্নে পরিচয়ের সেই প্রতারক তো ততক্ষণে পগার পার!

অর্থাৎ কোনো বিনিয়োগ করবার আগে খুব ভালোভাবে খোঁজখবর নিয়ে, যাচাই করে তারপর টাকা দেবেন। কারণ টাকা দেয়ার সময় আপনার কোনো সমস্যা হবে না। সমস্যা হবে টাকাটা তোলায় সময়। আসলে এমএলএমের এই প্রতারণাগুলোর বৈশিষ্ট্যই হলো—এরা কিছুদিন এক নামে ব্যবসা করে। টাকাপয়সা হাতিয়ে নেয়ার পর জনগণ এবং আইন শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ যখন সরব হয়, তখন কয়েকদিন গা ঢাকা দিয়ে আবার এরা নতুন নামে নতুন কৌশল নিয়ে আবির্ভূত হয়। যেমন, ২০০১-০২-এ জিজিএন এলো। প্রতারণা ফাঁস হওয়ার পর তাদের ব্যবসা বন্ধ হলো। কিন্তু অন্য নামে এলো নতুন নতুন এমএলএম।

তেমনি একটি এমএলএম হলো ‘ইউনিপেটুইউ’-২০০৯ সালের অক্টোবরে যারা ব্যবসা শুরু করে ১০ মাসে বিনিয়োগকারীদের দ্বিগুণ লাভ দেয়া হবে—এমন লোভ দেখিয়ে। আর বলে, এটা তারা করবে আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণের ব্যবসা করে। ২০১১ সালের প্রথম নাগাদ যখন বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের কার্যক্রমের ব্যাপারে সচেতন হয়, ততদিনে তারা ছয় লাখ মানুষের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছে এক হাজার কোটি টাকা। পণ্য নেই, কোনো বিনিয়োগ নেই, তারপরও ব্যবসার নাম করে একটি প্রতিষ্ঠান কীভাবে এত টাকা সংগ্রহ করতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর হলো—আপনার মতো সরল কিছু মানুষের ‘আমি কার খালু হয়ে যাওয়ার’ নির্বুদ্ধিতা। অতএব পরামর্শ সবসময় আগে চাইবেন। খোঁজখবর আগে নেবেন। পরে নয়।

**প্রশ্ন :** আমার বন্ধুকে যতই এমএলএম-এর ব্যাপারে সাবধান করার চেষ্টা করছি, সে কিছুতেই শুনছে না। সে বলে, এটা অনেক লাভজনক বিনিয়োগ। তেমন পরিশ্রম না করেই অনেক আয় করা যায়। তাকে কীভাবে বোঝাবো?

**উত্তর :** আসলে যাদের অল্প পরিশ্রমে বেশি লাভের লোভ, ফোকটে পাওয়ার ইচ্ছা—তারা জ্ঞানীর কথার চেয়ে শোষকের কথায়, প্রতারকের কথায় বেশি

প্রভাবিত হয়, এটাই স্বাভাবিক। এ নিয়ে একটি বিখ্যাত গল্প আছে।

একবার এক শিকারি ছোট্ট একটি পাখি ধরে ফেললো। পাখিটি খুব বুদ্ধিমান ছিলো। পাখিটি শিকারির খুব প্রশংসা করতে লাগলো যে, তুমি এতবড় শিকারি! জীবনে অনেক বাঘ মেরেছো, অনেক ভাল্লুক মেরেছো, এই করেছো, সেই করেছো। আমি একটা ছোট্ট পাখি, আমার ওজন ১০০ গ্রামও না, আমাকে খেয়ে তুমি কী করবে? আমাকে খেলে তো তোমার পেটের একটা কোনাও ভরবে না। তার চেয়ে বরং আমাকে ছেড়ে দাও। তোমাকে এমন তিনটি মূল্যবান বাণী শোনাবো যা তোমার সারাজীবন কাজে লাগবে।

এমনভাবে সে কথাবার্তা বলছিলো যে শিকারির মন গলে গেল। কারণ তেল পেতে সবাই পছন্দ করে। আরেকজনকে গলানোর সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে তেল। সে ভেবে দেখলো, ঠিকই তো। এত ছোট্ট পাখি খেয়ে কোনো লাভ নেই। তার চেয়ে শুনি, পাখিটা কী বলতে চায়। হয়তো এতে আমার লাভ বেশি হবে।

শিকারি রাজি হওয়ায় পাখিটি বললো, আমি প্রথম বাক্যটি বলবো তোমার হাতের ওপর বসে, দ্বিতীয় বাক্যটি বলবো এই গাছের ডালে বসে, তৃতীয় বাক্যটি বলবো গাছের মগডালে বসে। শিকারি বললো, ঠিক আছে।

পাখি বললো, ‘কখনো অলীক কল্পনা করো না, যা অবাস্তব সেটা কখনো বিশ্বাস করো না’। শিকারি বললো, খুব ঠিক কথা। সত্যিই তাই। কখনো অবাস্তব কথায় বিশ্বাস করতে নেই।

পাখি বললো, এবার আমাকে গাছের ডালে যেতে দাও। আমি দ্বিতীয় বাক্যটি বলবো। শিকারি ছেড়ে দিলো। গাছের ডালে উঠে পাখি বললো, ‘যা হাতছাড়া হয়ে গেল তা নিয়ে কখনো আফসোস করো না।’ শিকারি বললো, এটাও ঠিক। যা আর আমার নেই, তা নিয়ে আফসোস করা তো বোকামি।

পাখি এবার মগডালে উঠলো। শিকারি বললো, এবার তৃতীয় উপদেশটি বল। পাখি বললো, তৃতীয়টি বলার আগে দেখে নিই, আগের দুটি উপদেশের শিক্ষা তোমার জীবনে কাজে লাগিয়েছো কি না। পাখিটি বললো, আমার পেটে আছে ২০০ গ্রাম ওজনের একটি মুক্তো।

শুনে শিকারি খুব আফসোস শুরু করলো। হায় হায়! এ কী করলাম আমি! এভাবে হাতছাড়া করলাম ধনী হওয়ার এত সহজ সুযোগ! বলেই পাখিকে ধরার ব্যর্থ চেষ্টায় ওপরের দিকে লাফাতে লাগলো। কিন্তু পাখি তো তখন মগডালে। সে হাসলো। বললো, দেখ, আমি আগেই বলেছিলাম, অবাস্তব কথা কখনো বিশ্বাস করো না। আমার ওজনই ১০০ গ্রাম। আমার ভেতরে

২০০ গ্রামের মুক্তো থাকবে কীভাবে? বলেছিলাম, যা হাতছাড়া হয়ে গেল তা নিয়ে কখনো আফসোস করো না। কিন্তু তুমি তা-ই করছো। তোমাকে আর কোনো উপদেশ দেয়া অর্থহীন। কারণ অধিকাংশ মানুষের মতো তুমিও উপদেশ কান দিয়ে শুনেছো। কিন্তু তা থেকে শিক্ষা নাও নি। তোমার মতো বোকা ও লোভীদের কারণেই প্রতারকরা প্রতারণা করার সুযোগ পায়।

তাই যতদিন পর্যন্ত আপনার বন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত না হচ্ছে, ততদিন তিনি প্রতারিত হবেন। আপনি সাবধান করে আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন, বাকিটুকু তার ওপর ছেড়ে দিন।

**প্রশ্ন :** সেদিন একটি এমএলএম প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তার সাথে আমার কথা হলো। খুবই ভদ্র মানুষ। প্ল্যান যা দেখিয়েছে তা-ও আমার খারাপ লাগে নি।

**উত্তর :** যত প্রতারক আজ পর্যন্ত যত প্ল্যান দেখিয়েছে, কোনো প্ল্যান কি খারাপ? খারাপ প্ল্যান কি কেউ দেখায় কখনো? মনে রাখবেন, প্রতারকদের কথা সবসময় মিষ্টি হয়। তা না হলে তারা প্রতারণা করতে পারতো না। ফ্রান্সের জাতীয় প্রতীক আইফেল টাওয়ারও তিনবার বিক্রি হয়ে গিয়েছিলো। একই লোক তিনবার তিনজনের কাছে সেটা বিক্রি করেছে। প্রতারকদের কথা মিষ্টি না হলে কি এটা সম্ভব হতো? আর টাকা দেয়ার সময় কখনোই কোনো অসুবিধা হয় না, অসুবিধা হয় ফেরত নেয়ার সময়।

একটি ছেলের ঘটনা শুনুন তার জবানিতেই—

‘এসএসসি পরীক্ষার পর বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে খুব খরগচে হয়ে উঠেছিলাম। আমি গ্রামে থাকতাম। এর মধ্যেই ডেসটিনির কথা শুনলাম। পাঁচ হাজার টাকায় ভর্তি হয়ে লক্ষ টাকা ইনকাম। শহরে এসে ওদের অফিসের সাজসজ্জা, শিক্ষিত লোকজন—সবকিছু দেখে খুব প্রভাবিত হলাম। সেমিনার দেখার পর আরো লোভ হলো। মা-বাবার নিষেধ না শুনে ‘ব্যবসা’ শুরু করলাম। সেখান থেকে যোগ দিলাম আরেকটা এমএলএম কোম্পানিতে। ওখানকার লোকদের ভাষায় মিথ্যাকে বলা হয় ‘টেকনিক’। এরা সাধারণ মানুষ, ছাত্র, যুবক-যুবতীদের এমনভাবে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে ভর্তি করায় যা অবিশ্বাস্য। প্রতিদিন ১৮ ঘণ্টা করে কাজ করতাম। ছয় মাসে ইনকাম করলাম এক লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। কিন্তু আমার ঘুম, খাওয়া, প্রশান্তি সব নষ্ট হয়ে গেল। এদিকে এক বছর পর স্বয়ং কোম্পানিই হাওয়া। সবাই এসে ধরলো আমাকে। এলাকায় আমার বাবার খুব সুনাম



ছিলো। সবাই এসে তাকে বলতে লাগলো, আপনার ছেলে আমাদেরকে এমএলএম-এ জড়িয়েছে। এখন আমাদের টাকা চাই। শেষমেশ মায়ের সব গয়না বিক্রি করে তাদের টাকা শোধ করতে হলো।’

কাজেই বুঝতেই পারছেন, আপাতত এসব প্ল্যান যতই ভালো লাগুক, আখেরে ভোগান্তি ছাড়া আর কিছু নেই।

**প্রশ্ন :** বাংলাদেশে এমএলএম ব্যবসায়ে ডেসটিনি বেশ সফল হিসেবে দেখা যাচ্ছে। কেউ ইনভাইট করলে কি এই ব্যবসায় হাত দেয়া যাবে? জানালে উপকৃত হবো। [প্রশ্নটি ডেসটিনি নিয়ে সাম্প্রতিক অভিযোগের আগে করা, উত্তরটাও সে সময়েরই। অর্থাৎ যে সতর্কতার কথা কোয়ান্টাম আগেই বলেছে, সময়ের ব্যবধানে তা-ই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে]

**উত্তর :** আপনার প্রশ্ন শুনে মনে হচ্ছে-আপনি যেন একেবারে টাকাপয়সা গুছিয়ে নিয়ে বসে আছেন, কেউ ইনভাইট করামাত্র ঝাঁপিয়ে পড়বেন। আসলে পরিশ্রম না করে ফোকটে লাভ করার প্রবণতা থেকে মানুষ এভাবেই বিপদে পড়ে। ফোকটে কখনো কিছু পাওয়া যায় না। আর পেলেও তা কল্যাণ বয়ে আনে না কখনো। আপনি মনে করছেন যে, খুব লাভজনক হিসেবে দেখা যাচ্ছে। এখন থেকে পাঁচ/ সাত বছর আগে আরেকটি প্রতিষ্ঠান ছিলো। আইটিসিএল। সেটাও খুব লাভজনক দেখা গিয়েছিলো। তারপরে ‘যুবক’ ছিলো। সেটাও খুব লাভজনক ছিলো। যারা এগুলোর খোঁজখবর রাখে তাদের কাছ থেকে জেনে নেবেন যে, এখন এদের কী অবস্থা।

আগের একটি উত্তরে আমরা বার্নার্ড ম্যাডফ নামে পাশ্চাত্যের একজন প্রতারকের প্রতারণার বিস্তারিত বলেছি। তার প্রতিষ্ঠানে ৬৫ বিলিয়ন ডলার মানে ৬৫০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছিলো। যারা বিনিয়োগ করেছে তার মধ্যে ইউরোপের তিনটি ব্যাংক আছে। নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এরকম কয়েকজন আছেন যারা তাদের নোবেল পুরস্কারের সমস্ত অর্থ তাকে দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, ম্যাডফের প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক বা বেশ সফল হিসাব দেখেই কিন্তু তারা এ বিনিয়োগ করেছেন। এখন ম্যাডফের কী অবস্থা? মাত্র ১৫০ বছরের জেল হয়েছে! ৬৫ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৬৫০ কোটি ডলার হাওয়া হয়ে গেছে। যতজন যা কিছু বিনিয়োগ করেছিলো তার সবই হাওয়া।

আমি তো শুধু অবাঁক হই, বিজ্ঞাপনে গাছের ছবি দেখে কতজন টাকা দিয়েছেন! খোঁজ নিয়ে দেখেন কয়টা গাছ আছে। ওরা বলে ১২ বছর পরে



৩০ হাজার টাকা দেবে। আদৌ যদি ১২ বছর পর(!) এই প্রতিষ্ঠান থাকে। আপনি গাছের টাকা নিতে যান, দেখা যাবে যে, একটা গাছের জন্যে ১০০০ লোক গেছে। গাছ চেরাই করতে করতে কাঠ এত চিকন হবে যে, তা দিয়ে হয়তো দাঁত খিলাল করার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারবেন না। তাই ফোকটে কিছু পেতে চাইবেন না। পরিশ্রম করবেন, আপনি পাবেন। আমরা বার বার ধোঁকা খাই একটি জায়গায় এসে। আমরা বিনা পরিশ্রমে অথবা নামমাত্র পরিশ্রমে পেতে চাই। আর পতনের আগে সবাইকে সফলই মনে হয়। পতন হলে বোঝা যায় যে, সাফল্য কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে।

এ পর্যন্ত উত্তরটুকু ২০১০ সালে দেয়া যখন এই প্রশ্নকর্তার মতো অনেকেই মনে করতেন, ডেসটিনি একটি সফল ব্যবসা এবং বিনিয়োগের নামে সাধারণ মানুষ হাজার হাজার কোটি টাকা তুলে দিয়েছে তাদের হাতে। এখন এই ২০১২ সালে এসে কী অবস্থা নিচের খবরগুলোই তার প্রমাণ—

‘দুদকে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন : ৫০০০ কোটি টাকার সবই তুলে নিয়েছে ডেসটিনি’ শীর্ষক দৈনিক প্রথম আলো’র ১২ জুন প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়, ‘ডেসটিনি গ্রুপের ৩৭টি প্রতিষ্ঠান এবং এর পরিচালক ও স্বার্থসংশ্লিষ্টদের নামে বিভিন্ন ব্যাংকে জমা হয়েছে ৪,৯৯৬ কোটি টাকা’। এর মধ্যে ৪,৯৭৫ কোটি টাকাই তুলে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সম্প্রতি দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) পাঠানো প্রাথমিক প্রতিবেদনসূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ডেসটিনি গ্রুপের ৪৪৩টি ব্যাংক হিসাব রয়েছে। ২৫২টি ব্যাংক হিসাব বর্তমানে বন্ধ। বাকিগুলোতে স্থিতি রয়েছে মাত্র ১৭৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে গ্রুপের প্রধান তিনটি কোম্পানি—ডেসটিনি ২০০০, ডেসটিনি ট্রি প্লান্টেশন ও ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের নামে থাকা ২৮১টি হিসাবে স্থিতি রয়েছে মাত্র ২০ কোটি ৫০ লাখ টাকা। বলা হয়, এসব হিসাব থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ডেসটিনি গ্রুপের (কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নাম ছিলো প্রতিবেদনে যা অপ্রকাশিত রাখা হলো) হিসাবে স্থানান্তরিত হয়েছে।

এর আগে ৩০ মার্চ প্রকাশিত প্রথম আলোর আরেকটি প্রতিবেদনে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্তের বরাত দিয়ে ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড প্রসঙ্গে বলা হয়, সমবায় অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন নেয়া এই প্রতিষ্ঠানটি জনগণের কাছ থেকে মাসে ২০ থেকে ২৫ কোটি টাকা তুলে নিচ্ছে। ৪০ লাখ প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যাংকের মতো

রীতিমতো আমানত সংগ্রহ করছে তারা। অন্যদিকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত না হয়েও বিক্রি করছে এর শেয়ার। তথাকথিত শেয়ার বিক্রি করেই প্রতিষ্ঠানটি হাতিয়ে নিয়েছে এক হাজার ৪০০ কোটি টাকা।

সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বহুসংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির যোগসূত্র থাকায় অনেক সাধারণ মানুষ এর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিনব মাল্টিলেভেল মার্কেটিং (এমএলএম) পদ্ধতি অবলম্বন করছে তারা। বিনিময়ে আমানত সংগ্রহকারীদের কমিশন দেয়া হচ্ছে, যা অবৈধ ও অনৈতিক। প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব ভবিষ্যতে হুমকির মুখে পড়তে পারে এবং প্রতারণিত হতে পারে জনগণ।

৩১ মার্চের তথ্য অনুযায়ী ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের মোট সম্পদের পরিমাণ ৩,৩৫০ কোটি টাকা। এর মধ্যে তারা বিভিন্ন প্রমোশনাল কার্যক্রমে ব্যয় দেখিয়েছে ৭১০ কোটি টাকা। এর আগে ২০১০ সালের ৩০ জুন এই প্রতিষ্ঠানের সম্পদ দেখানো হয়েছিলো ৭৩১ কোটি টাকা এবং ২০১১ সালের ৩০ জুন ছিলো ২,৯৯৯ কোটি টাকা। এত অল্প সময়ের ব্যবধানে কী করে এত বেশি সম্পদ দাঁড়ালো, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে প্রতিবেদনে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এই রিপোর্ট জমা হওয়ার পর, দুদকও সিদ্ধান্ত নেয় অনিয়ম অনুসন্ধানের। প্রায় দুই মাস অনুসন্ধান শেষে গত ২৩ মে কমিশনে প্রতিবেদন জমা দেয় তদন্ত দল। ডেসটিনি ২০০০ লিমিটেড এবং এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যাপক আর্থিক অনিয়মের প্রমাণ পায় তারা।

বলা হয়, কোম্পানির শীর্ষ ব্যক্তিরা কয়েকশ কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে। বিদেশ থেকে কম দামে পণ্য আমদানি এবং দেশের মধ্যে কম দামে জমি কিনে তা গ্রাহকদের কাছে বেশি দাম দেখানো হয়েছে। আর ঐ অতিরিক্ত অর্থ কোম্পানির ব্যাংক একাউন্ট থেকে কর্মকর্তারা ব্যক্তিগত ব্যাংক একাউন্টে সরিয়ে নিয়েছে।

সরিয়ে নেয়া অর্থের বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রতিষ্ঠান পর থেকে এমএলএম কোম্পানির ৬৬টি ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় ৫,৯৬০ কোটি টাকা সংগ্রহ করে ডেসটিনি। এর মধ্যে ৩,৫৮৮ কোটি টাকা উত্তোলন করা হয়েছে।

ট্রি প্লান্টেশনের বিভিন্ন প্যাকেজ বিক্রি করে গ্রাহকদের কাছ থেকে ১৩৩টি ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে ৯২১ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়। ঐ অর্থের

মধ্যে ৯০০ কোটি টাকা তুলে নেয়া হয়েছে। এছাড়া ডেসটিনি মাল্টিপারপাসের নামে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রায় ১,৪৪০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে ১,৪১৮ কোটি টাকা তুলে নেয়া হয়।

২২ জুন, ২০১২ বিডিনিউজ ডট কমের এ খবরটা দেখুন—

### ডেসটিনি-২০০০ লিমিটেডের টাকা অফিসগুলোও বন্ধ হচ্ছে—

ঢাকায় থাকা তাদের ২৩টি অফিসের পাঁচটি অফিস বন্ধ হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। এছাড়া রাজধানীর ২৩টি কার্যালয়ের যোগাযোগের নম্বর এখন বন্ধ। গতকাল দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঐসব নম্বরে ফোন করেছেন গ্রাহকরা। কিন্তু নম্বর বন্ধ থাকায় কারো সঙ্গে তারা যোগাযোগ করতে পারেন নি। এতদিন ওই নম্বরগুলোই দেয়া হতো দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা ডেসটিনির বিপুলসংখ্যক বিনিয়োগকারীকে। ওদিকে অবৈধ ব্যাংকিং ও আইন বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর ডেসটিনির অনেকেই গা-ঢাকা দিয়েছেন। এতদিন তাদের যেসব সদস্য সাধারণ মানুষকে রাজধানীতে বহুতল মার্কেট আর দিনে লাখ টাকা আয়ের স্বপ্ন দেখিয়ে এসেছেন তাদের তৎপরতাও কমেছে। হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছে ডেসটিনির প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও (সেমিনার)।

**প্রশ্ন :** আমি ডেসটিনির একজন সদস্য। আমি জানি অন্যান্য এমএলএম কোম্পানিও যথারীতি প্রতারণা করছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ডেসটিনি তো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক মজবুত করেছে। বেকারত্ব হ্রাস করেছে। তাছাড়া আরো উন্নয়নমূলক প্রকল্প রয়েছে। আমি তো এখানে প্রতারণা দেখছি না। [এই প্রশ্নটিও ডেসটিনি বিতর্কের আগে করা]

**উত্তর :** আসলে প্রতারণিত হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রতারণা কখনো চোখে পড়ে না। যেমন আইটিসিএল বা যুবক-সেখানে কোটি কোটি টাকা মানুষ কেন বিনিয়োগ করেছে? প্রতারক মনে করলে কি তারা এটা করতো? তারাও তো অনেক কিছুতে বিনিয়োগ করেছে। সেই টাকাগুলো এখন কোথায়? তখন যারা ‘যুবক’ করতো তারাও কিন্তু যুবককে কখনো প্রতারক মনে করে নি। কিন্তু ফলাফল কী হলো? মানুষের কোটি কোটি টাকা কোথায়?

অতএব বিষয়টা যতক্ষণ পর্যন্ত খোলস পরা থাকে, ততক্ষণ বোঝা যায় না যে ভেতরে কী আছে। ভেতরটা বোঝা যায় যখন খোলসটা খসে পড়ে।

আপনি নিঃসন্দেহে একজন সরল মানুষ, ভালো মানুষ। কিন্তু এত বেশি সরল হবেন না যাতে আপনি বিপদে পড়েন। আপনি যদি প্রতারণা বুঝতেই পারতেন, তাহলে এই চিঠি লিখতেন না। বলতেন না যে, অন্যান্য এমএলএম করলেও আপনারটা কোনো প্রতারণা করছে না। প্রতারিত হওয়ার বা করার আগ পর্যন্ত নিজের ব্যাপারে সবাই এমনটাই মনে করে।

পাঠক, এবার আসুন দেখি এই ২০১২ সালে ডেসটিনি কর্মীদের পরিণতি। মে-জুন মাসের পত্রিকার পাতা ওল্টালে নিশ্চয়ই দেখেছেন এ ধরনের শিরোনাম-সুন্দরগঞ্জে ডেসটিনি কর্মকর্তা অবরুদ্ধ : মালামাল আটক, ডেসটিনি-র ১১ কর্মকর্তাকে দুদক-এর জিজ্ঞাসাবাদ, কক্সবাজারে ডেসটিনি ভবনের চার প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে মামলা, ডেসটিনির এমডি ও অন্য দুজনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা ইত্যাদি।

আর ২৪ জুন, ২০১২ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয় একটি খবর ‘সাভারে ডেসটিনি ডিস্ট্রিবিউটরের আত্মহত্যা’। এতে বলা হয়, ‘গ্রাহকদের অপমান সহিতে না পেরে অবশেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন ডেসটিনির ডিস্ট্রিবিউটর মোয়াজ্জেম হোসেন শাহিন (৪২)। শুক্রবার গভীর রাতে পৌর এলাকার গেভায় ভাড়াবাসায় সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে আত্মহত্যা করেন তিনি। ওই রাতেই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নিকট আত্মীয়স্বজনদের এসএমএস করে জানান, তিনি আর পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চান না।

পুলিশ ও নিহতের পরিবারসূত্রে জানা গেছে, ১০/১২ বছর আগে শাহিন পরিবার-পরিজন নিয়ে সাভারে এসে শুরু করেন উপজেলা চত্বরে কম্পিউটার, ফোন ও ফটোকপি ব্যবসা। একপর্যায়ে তিনি ডেসটিনির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। বেশি লাভের আশায় নিজের টাকা ছাড়াও নিকট আত্মীয়স্বজনসহ বাইরের মানুষের কাছ থেকে সুদে টাকা এনে ডেসটিনিতে বিনিয়োগ করেন।

অতি অল্প সময়ে হয়ে যান ডেসটিনির ডিস্ট্রিবিউটর। স্থানীয় লোকজনকে ডেসটিনির সদস্য বানিয়ে তাদের কাছ থেকেও প্রায় ১০ লক্ষাধিক টাকা বিনিয়োগ করেন। কিন্তু সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছিলেন শাহিন।

একদিকে মোটা অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ, অন্যদিকে গত কয়েকদিন ধরে গ্রাহকরা টাকা ফেরত দিতে তার ওপর চাপ সৃষ্টি করে আসছিলো। পাওনাদার নিকট আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গেও চলছিলো মনোমালিন্য। এতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন শাহিন। আত্মীয়স্বজন ও গ্রাহকদের অপমান সহিতে না পেরে অবশেষে গত রাতে তার কক্ষের দরজা বন্ধ করে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায়

ফাঁস দেন।’ এমএলএমের সঙ্গে জড়ালে এর কারণ পরিণতির ব্যাপারে সেসময় আমরা যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলাম, এই রিপোর্টটি তার যথার্থতাই প্রমাণ করে।

**প্রশ্ন :** এমএলএম কি হারাম না হালাল? হারাম হলে কীভাবে হারাম তা একটু ব্যাখ্যা করবেন। আমি একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট হিসেবে এমএলএম করাটা কি ঠিক হবে?

**উত্তর :** এমএলএম যদি প্রতারণার হাতিয়ার হয় তো এটা অবশ্যই হারাম। এমএলএম-এর নামে যে প্রতারণা করা হচ্ছে, এই প্রতারণা নিঃসন্দেহে হারাম। একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট হিসেবে কখনোই প্রতারণার সাথে যুক্ত থাকা উচিত নয়।

**প্রশ্ন :** আমার বন্ধু একটি কোম্পানিতে সদস্য হওয়ার জন্যে আমাকে খুব চাপাচাপি করছে, সদস্য ফি পাঁচ হাজার টাকা। আমি সদস্য হলে সে কমিশন পাবে এবং আমি অন্য একজনকে সদস্য করাতে পারলে আমার কমিশন হবে। ভবিষ্যতে বিপুল অর্থ পাওয়া যাবে এবং ১২ বছর পর গাছের ৩০ হাজার টাকাও পাওয়া যাবে। ওকে যদি ‘না’ করি তাহলে খুব কষ্ট পাবে। এদিকে আমিও টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি। পাঁচ হাজার টাকা আমার জন্যে অনেক বড় এমাউন্ট। কী করবো প্লিজ বলে দিন।

**উত্তর :** আপনাকে ‘না’ বলতে শিখতে হবে। অনেকেই বলে, আমি ‘না’ বলতে পারি না। জীবনে কখনো প্রয়োজন হয় হ্যাঁ বলার, কখনো প্রয়োজন হয় না বলার। যেখানে না বলা প্রয়োজন সেখানে যদি কেউ না বলতে না পারে, তার জীবনের দুঃখ কেউ দূর করতে পারবে না।

এই যে বন্ধু—‘ওকে যদি না করি তাহলে সে খুব কষ্ট পাবে’। সে তো এখন কষ্ট পাবে। যদি হ্যাঁ বলেন, আপনি ভবিষ্যতে কষ্ট পাবেন এবং সেই সাথে আরো কিছু লোককে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন।

আর যে বন্ধু স্বার্থের জন্যে বন্ধুত্ব করে, সে কি সত্যিকারের বন্ধু? বন্ধুত্ব তো দেয়ার নাম, বন্ধু বন্ধুর জন্যে জান দিয়ে দিতে পারে—এটা হচ্ছে বন্ধুত্ব। বন্ধু বন্ধুর জান নিতে পারে—এটা বন্ধুত্ব নয়। অতএব নিঃসংকোচে না বলুন। তবে সাবধান থাকুন, কোনো বিতর্কে জড়াবেন না।

**প্রশ্ন :** গুরুজী, আমার এক বন্ধু একটি কোম্পানির কথা বলেছে সেখানে পাঁচ হাজার টাকা দিলে তিন মাস পর ৩৭,০০০ টাকা পাওয়া যাবে। আমার পরিচিতের মধ্যে অনেকেই বিনিয়োগ করছে। আমি কী করবো?

**উত্তর :** যেকোনো বিনিয়োগ করবেন সবসময় বুঝে শুনেন। যাকে দিচ্ছেন তার পুরো খোঁজখবর নিয়ে তারপরে বিনিয়োগ করবেন। যখনই শুনবেন যুক্তির বাইরে মুনাফা দিচ্ছে, তখনই সাবধান হয়ে যাবেন। আমাদের দুর্বলতা হচ্ছে, যখনই আমাদের বলে অনেক লাভ দেবে, আমরা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই ঝাঁপ দেই। ভাবি, এরকম সুযোগ জীবনে আর আসবে না। একবারও চিন্তা করি না—এই লাভটা যে দেবে, কোথা থেকে দেবে?

সাধারণ মানুষের এই লোভকে পুঁজি করে প্রতারণার সুযোগ পাচ্ছে অনেক ভুয়া প্রতিষ্ঠান। যেমন, ২০০৯-এর ১৮ মার্চ, দৈনিক প্রথম আলোতে এরকমই একটি খবর ছাপা হয়—

দীপশিখা নামে একটি ভুয়া এনজিও রাজধানীর শ্যামলী মোহাম্মদপুর মিরপুর পল্লবী কাফরুল ফার্মগেট ও মনিপুরিপাড়ার নিম্নবিত্ত বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করে পালিয়ে যায়। একটি সাইনবোর্ড বুলিয়ে ভাড়াবাসাতে শুরু করে এর কার্যক্রম। তিন হাজার টাকা জমা দিলে একমাসের মাথায় ৩০ হাজার টাকা দেয়া হবে—এ লোভনীয় ফাঁদ পেতে নিম্ন আয়ের বিভিন্ন পেশার মানুষকে প্রতারিত করে। শত শত মানুষের কাছ থেকে তিন থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত নেয় তারা। কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরই দুজন ধরা পড়ে প্রতারিতদের কাছে। তাদেরকে থানায় সোপর্দ করা হলেও মূল ব্যক্তি ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়। প্রতারিতরা এখন থানা ঘেরাও, মামলা ইত্যাদি করছে, কিন্তু এতে কী লাভ?

আমরা পত্রিকায় দেখেছি, একটি প্রতিষ্ঠানের হাউজিংয়ের নামে টাকা নিয়ে এখন না জমি দিচ্ছে, না টাকা দিচ্ছে। সে প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করতো তাদের এখন কী অবস্থা? সব পালিয়ে বেড়াচ্ছে মাসের পর মাস ধরে। কিন্তু যখন তারা টাকা নিয়েছিলো, তখন কোনো সমস্যা হয় নি। যারা টাকা দিয়েছিলো তাদেরও টাকা দিতে সমস্যা হয় নি।

মনে রাখবেন, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট ওয়ারেন্টি নেই—এমন বিনিয়োগ সবসময়ই ঝুঁকিপূর্ণ। শিডিউলড ব্যাংকে যখন টাকা রাখছেন, নিশ্চয়তা আছে। কারণ গভর্নমেন্ট হচ্ছে এর ওয়ারেন্টি। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে সবসময় সাবধান থাকবেন।

**প্রশ্ন :** সম্প্রতি টিভিআই এক্সপ্রেস নামক ইংল্যান্ডের একটি কোম্পানি বাংলাদেশে এসেছে। যারা বলছে, এক লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করলে ছয় থেকে সাত মাসের মধ্যে সাত লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। এই কোম্পানির মালিক নাকি ওয়ারেন বাফেট যারা ইউকে ইউএসএ সহ বিশ্বের ১৯০টি দেশে ব্যবসা করছে। এই কোম্পানিতে অংশগ্রহণ করা যাবে কি?

**উত্তর :** করা যাবে যদি নিজেকে আহাম্মক বানাতে চান। দেড় লক্ষ টাকা ছয় মাসে কীভাবে সাত লক্ষ টাকা হবে—সেটা আপনার মধ্যে কোনো প্রশ্নের জন্ম দিলো না! টাকাটা কি তারা হাইজ্যাক করে দেবে, না ব্যাংক লুট করে দেবে? তাকে জিজ্ঞেস করেন, ওয়ারেন বাফেট আপনার খালু না বাবা যে আপনাকে পাঠিয়েছে? আসলে এগুলো সবই প্রতারণা। এই সহজ জিনিসটুকু যদি বুঝতে না পারেন তাহলে কীভাবে হবে?

**প্রশ্ন :** কাছের কিছু মানুষ লোভের বশবর্তী হয়ে এমএলএম জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হচ্ছে বলে কষ্ট পাচ্ছি। তাদেরকে প্রতারণার হাত থেকে কীভাবে রক্ষা করবো?

**উত্তর :** কিছু আহাম্মককে কখনো রক্ষা করা যায় না। খুব দুঃখের সাথে বলছি—যখন প্রথম জিজিএন আসে ১৯৯৭-এ, আমাদের এক গ্রাজুয়েটকে বললাম যে, এখানে এইভাবে প্রতারণা করছে। সে বললো, গুরুজী, আপনি এসব বুঝবেন না। এখানে এভাবে লাভ পাওয়া যাবে, অত লাভ পাওয়া যাবে ইত্যাদি। বোঝাতে না পেরে কোরআনের সেই শিক্ষা অনুসরণ করলাম। কোরআনে বলা হয়েছে, আহাম্মক থেকে দূরে থাকো। আমরা তার কাছ থেকে দূরে থাকলাম। পরে তার করণ অবস্থার খবর পেয়েছি। খুব খারাপ লেগেছে শুনে, কিন্তু কী করার আছে?

প্রতারণার সাথে জড়িয়ে পড়লে জীবন কখনো সুন্দর করা যায় না। প্রতারণার অর্থ কখনো স্থায়ী হয় না। সে অর্থ কখনো সম্পদে রূপান্তরিত হয় না। আজ পর্যন্ত কোনো প্রতারণার অর্থ সম্পদে রূপান্তরিত হয় নি। কোনো শীর্ষ সন্ত্রাসীর অর্থ সম্পদে রূপান্তরিত হয় নি। যে অর্থ শ্রমে উপার্জিত না, তা কখনো সম্পদ হয় না।

অতএব কাছের মানুষদের সতর্ক করতে পারেন। কিন্তু তারা যদি না শোনে তাহলে আপনার আসলে আর কিছু করার নেই, দোয়া করা ছাড়া।

**প্রশ্ন :** আজকাল ফ্রিল্যান্সিং বা আউটসোর্সিংয়ের ব্যাপারে অনেককেই আগ্রহী দেখা যায়। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এ নিয়ে প্রতারণার বেশ কিছু অভিযোগও দেখেছি পত্রিকায়। আমার প্রশ্ন হলো, কী করে বুঝবো আমি ফ্রিল্যান্সিং বা আউটসোর্সিংয়ের নামে কোনো প্রতারণার শিকার হচ্ছি কি না?

**উত্তর :** আসলে প্রথমেই আপনাকে বুঝতে হবে ফ্রিল্যান্সিং মানে কী। এ প্রসঙ্গে দৈনিক সমকালের ১৫ মে, ২০১২ সংখ্যায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিভাগের শিক্ষক নাশিদ শাহারিয়ারের যে বক্তব্য প্রকাশিত হয়, তা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, মূলত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বিদেশি কোনো প্রতিষ্ঠানের কাজ করে দেয়াকেই ফ্রিল্যান্সিং বলে। আর যেসব প্রতিষ্ঠান নিজেদের কাজ বাইরের কর্মীদের মাধ্যমে করিয়ে নেয় তাদের ফ্রিল্যান্সার বলে।

প্রকৃত ফ্রিল্যান্সার প্রতিষ্ঠানগুলো সফটওয়্যার তৈরি, ডাটা এন্ট্রি, গাণিতিক হিসাব, অডিট, অনুবাদ, রাসায়নিক সমীকরণ তৈরি, প্রবন্ধ তৈরি, প্রতিবেদন মূল্যায়নসহ বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ অনলাইনে পাইয়ে দেয়। কাজগুলোও পেতে হয় প্রতিযোগিতামূলক নিলামের মাধ্যমে। যিনি যে কাজ জানেন, তা নিলামের মাধ্যমে পেয়ে কাজ সম্পন্ন করে অনলাইনে জমা দিতে হয়। বিশ্বখ্যাত কয়েকটি ফ্রিল্যান্সার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ফ্রিল্যান্সার ডটকম, ওডেব্লু ডটকম ইত্যাদি। এসব সাইটে নিবন্ধনে কোনো বিনিয়োগ লাগে না। ক্লিক করে টাকা আয়ের কোনো ব্যবস্থাও এখানে নেই।

এখন আসুন দেখি, ফ্রিল্যান্সিংয়ের নামে যেসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে তারা কী করতো। গত ২৪ জুন ২০১২, ভোরের কাগজ পত্রিকায় এ সংক্রান্ত একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ‘ক্লিক করলেই ডলার! অনলাইনে প্রতারণার ফাঁদ’ শিরোনামের এ রিপোর্টটিতে বলা হয়—

ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নিক্কন গুহ রায়। ‘ঘরে বসেই মাত্র ১০০টি ক্লিক করে আয় করুন এক ডলার’—ডুল্যান্সার নামে একটি প্রতিষ্ঠানের এমন বিজ্ঞাপন দেখে তিনি প্রতিষ্ঠানটিতে ছয় হাজার টাকার বিনিময়ে রেজিস্ট্রেশন করেন। তারপর আন্তে আন্তে নিক্কন বুঝতে পারেন এসবই প্রতারণা। তিনি কোনো টাকাই আয় করতে পারেন নি।

রংপুর কারমাইকেল কলেজের ছাত্রী বীথিকা বণিকও একই রকম প্রতারণার শিকার। তিনিও এমন বিজ্ঞাপন দেখে ছয় হাজার টাকা দিয়ে



নিবন্ধন করেন ডুল্যাস্মারে। যথারীতি তিনিও প্রতারিত হন।

নিবন্ধন-বীথিকাদের মতো এমন প্রতারণার শিকার লাখো মানুষ। প্রযুক্তি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতাকে পুঁজি করে কিছু প্রতারক এমন জমজমাট ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। কিছুদিন আগে পুলিশ কলাবাগান এলাকা থেকে প্রতারণার দায়ে এরকম তথাকথিত ফ্রিল্যান্সার প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের গ্রেপ্তারও করেছে। সে সময় এক প্রতারিত গ্রাহক পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন, তিনি একাই দেড় লাখ টাকা খুইয়েছেন। প্রতিটি একাউন্ট ছয় হাজার টাকা করে মোট ২৫টি একাউন্ট খুলেছিলেন দেড় লাখ টাকা দিয়ে। কিন্তু তিনি কোনো টাকা পান নি।

তবে পুলিশ মাঝে মাঝে অভিযান চালালেও এখনো বন্ধ হয় নি এই ‘অনলাইন প্রতারণা’। পুলিশী পদক্ষেপ সীমিত হওয়া এবং সাধারণ মানুষের সচেতনতার অভাব ও অজ্ঞতাকে পুঁজি করে এরা এখনো জমজমাট প্রতারণা করে যাচ্ছে। প্রতারক এসব প্রতিষ্ঠানের স্লোগানগুলোও খুব লোভনীয়। ‘ঘরে বসেই মাত্র ১০০টি ক্লিক করে আয় করুন এক ডলার’, ‘স্বল্প শিক্ষিতদের জন্যে ঘরে বসে অনলাইনে আয়’, ‘ঘরে বসে মাসে ২১ হাজার ডলার আয়’, ‘ক্লিক করলেই টাকা’—এমনই চটকদার এসব বিজ্ঞাপনের ভাষা।

অনুসন্धानে জানা যায়, শুধুমাত্র ঢাকাতেই ৩০টির বেশি এ ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রতারণা করে যাচ্ছে। ফ্রিল্যান্স কাজের যোগানদাতা হিসেবে দাবি করলেও আদতে এসব প্রতিষ্ঠানও এমএলএম কোম্পানিই। ছয় হাজার থেকে সাড়ে সাত হাজার টাকা দিয়ে ভর্তি হওয়ার পরই একজন গ্রাহককে বলা হয় আরো লোক আনতে। আরো লোক আনতে পারলে অর্থাৎ ‘ডান হাত-বাম হাত’ বাড়তে পারলে সে কমিশন পাবে।

জানা যায়, বর্তমানে বাংলাদেশে এই অনলাইন প্রতারণায় নেতৃত্ব দিচ্ছে ডুল্যাস্মার, ব্রাভো আইটি, ল্যান্সটেক, অনলাইন অ্যাড ক্লিক, পেইড টু ক্লিক, সেফটি ক্লিক, স্কাইল্যান্সার, পিটিসি ফর বিডি, এড সোর্সিং, ক্লিক টু পেইডসহ আরো কিছু প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের কোনো আইনগত ভিত্তিও নেই। বাংলাদেশে যে প্রতিষ্ঠানগুলো এই ডিজিটাল প্রতারণার সূচনা করে তাদের মধ্যে সিঙ্গাপুরভিত্তিক স্পিক এশিয়া অনলাইন অন্যতম। কোম্পানিটি ২০১০ সালের ১১ আগস্ট চট্টগ্রামে রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস (আরজেএসসি)-এ নিবন্ধিত হয়ে প্রথম এ ধরনের প্রতারণা শুরু করে। এরপর তারা বাংলাদেশের প্রায় ১৫ লাখ গ্রাহককে প্রতারিত করে ২৫০ কোটি টাকা নিয়ে চলে যায়।

জানা যায়, প্রতিষ্ঠানভেদে একটি প্রিমিয়াম একাউন্টের দাম ছয় থেকে সাত হাজার টাকা। এই সাত হাজার টাকায় একাউন্ট খোলার পর গ্রাহককে ১০০টি ওয়েবসাইট লিংক দেয়া হয়। বলা হয়, লিংকগুলোতে ক্লিক করলে প্রতিদিন এক ডলার করে পাওয়া যাবে—একটা একাউন্টের বিপরীতে মাসে ৩০ ডলার। গ্রাহকদের অনেকে এ কারণে এক-দেড় লাখ টাকা খরচ করে ১০-১৫টি করে একাউন্ট খুলেছে বেশি ডলার কামানোর আশায়। আরো গ্রাহক ধরে আনার ওপরেও আছে কমিশন। অর্থাৎ সেই এমএলএম!

প্রতারণার ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে ডুল্যাম্পার নামে ওয়েবসাইটভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রতারণা করে এ পর্যন্ত তারা হাতিয়ে নিয়েছে হাজার কোটি টাকা। প্রতিষ্ঠানটির দাবিকৃত সবকিছুই ভুয়া। নিজেদেরকে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ডুল্যাম্পার ইউনিকর্পোরেশনের বাংলাদেশি শাখা দাবি করলেও যুক্তরাষ্ট্রে এই নামে কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। বলা হয়, ছয় বছর ধরে এর কার্যক্রম চলছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির ডোমেইন কেনা হয়েছে ২০১১ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি, বাংলাদেশ সময় ভোর ৫টা ৪৬ মিনিটে। সে হিসাবে এর বয়স মাত্র ১৫ মাস।

ডুল্যাম্পারের ওয়েবসাইটে দেখা যায়, তাদের সদস্য সংখ্যা দুই লাখ ৮১ হাজার ৪৬১ জন। ৮৩৭টি প্রজেক্ট শেষে তাদের আয়ের পরিমাণ ২০ লাখ ৪৫ হাজার ৩৫৩ ডলার; কিন্তু কোনো প্রজেক্টের বিষয়ে তথ্য নেই ওয়েবসাইটে। নেই কাজদাতাদের সম্পর্কেও কোনো তথ্য। ফ্রিল্যান্সিংয়ে অভিজ্ঞ প্রকৌশলী মাহমুদুল হাসান জানান, যারা ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ দেয়, অবশ্যই তাদের ওয়েবসাইটে কাজদাতা ও প্রজেক্টের বর্ণনা থাকে। নয়তো ফ্রিল্যান্সাররা কাজ নেবেন কী করে?

বিশিষ্ট তথ্যপ্রযুক্তিবিদ মোস্তফা জব্বার বলেন, বিশ্বের কোনো আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠানই টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করায় না। যারা টাকা বিনিয়োগের কথা বলে, পড়াশোনা না জেনে শুধু বিজ্ঞাপনে ক্লিক করে আয় করা যাবে বলে—তারা ভুয়া। কাজেই ফেসবুকের মতো সামাজিক যোগাযোগ সাইট, বিভিন্ন ব্লগ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশনের মতো জায়গায় যারা এ ধরনের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকবেন। আপনার পরিচিতদের কাছেও পৌঁছে দেবেন সাবধান বাণী।

[পাদটীকা : লক্ষ লক্ষ গ্রাহককে প্রতারণা করে সস্ত্রীক সিঙ্গাপুরে পালিয়েছেন ‘ডুল্যাম্পার’ মালিক রোকন ইউ আহমেদ। মিরপুরে তার স্বশ্রবাবাড়ি ঘিরে রেখেছে শত শত লোক। সূত্র—দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ জুন ২০১২]

## বিদেশে চাকরি

**প্রশ্ন :** আমরা যে বাসায় থাকি ঐ বাসার নিচে একটি মুদি দোকান রয়েছে। সেই দোকানের মালিক একজন হুজুর। উনি মানুষ হিসেবে খুব ভালো এবং আশেপাশের লোকজন তাকে বেশ ভালো হিসেবেই চেনে। আমরা ঐ দোকান থেকে বাকিতে কেনাকাটা করি। আমরা এই বাসায় আছি আড়াই বছর ধরে। ফলে বাবার সাথে দোকানদার চাচার সম্পর্ক বেশ ভালো। একপর্যায়ে উনি বাবাকে জানান যে, তার এক ভাই ইতালিয়ান এম্বেসিতে চাকরি করে এবং তিনি বৈধভাবে মানুষকে ছয় মাস থেকে দুই বছরের জন্যে ভিসা দিয়ে থাকেন। বাবাকে বলেন যে, পরিচিত কারো প্রয়োজন হলে পাঠাতে পারেন। বাবা আগ্রহী হলেন এবং কাগজপত্র নিরীক্ষা করে আশ্বস্ত হলেন যে, তা বৈধ। ফলে বাবা তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বিষয়টি জানান। কারণ তাদের দুই/ এক জন ভাই এবং আত্মীয় বিদেশে যাওয়ার জন্যে চেষ্টা করছিলো। বাবাকে তারা টাকা দেন ভিসার জন্যে এবং বাবা নিজেও কিছু টাকা বিনিয়োগ করেন। মোট ১০ লক্ষ টাকার মতো তিনি জমা দেন। ভিসাপ্রতি ১১ লক্ষ টাকার বাকিটা পরিশোধ করতে হবে পাসপোর্টসহ ভিসা হাতে পাওয়ার পর। ভিসা দেয়ার কথা ছিলো ডিসেম্বরের শেষ দিকে। কিন্তু চাচা আজ দেবো, কাল দেবো বলে গড়িমসি করছিলেন। তখন বাবা চাচাকে ধরে ঐ অফিসে যান এবং ওখানকার লোকজনের সাথে কথা বলে বুঝতে পারেন এটা একটা বিশাল চক্র। বাবা তখন পালিয়ে চলে আসেন। এরপর বাবা ঐ চাচাকে নিয়ে সরাসরি ব্যাংকে যান। কিন্তু ঐদিন আর টাকা তুলতে পারলেন না তিনটা বেজে গেল বলে। তারপর ডিসেম্বরের ২৫, ২৬, ২৭ তারিখ ছিলো টানা তিন দিনের সরকারি ছুটি। রবিবার দিন সকালে ব্যাংক খুললে তিনি যান ঐ চেক নিয়ে এবং জানতে পারেন, চাচার একাউন্টে যে টাকা ছিলো তিনি তা সরিয়ে ফেলেছেন। এসব ঘটনা যে ঘটে গেছে আমরা তার কিছুই জানতাম না। এর পরের অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন। আপনি দয়া করে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন যেন বাবা পুরো টাকাটা উঠিয়ে যাদের টাকা তাদেরকে দিয়ে দিতে পারেন আর আপনার কাছে পরামর্শ চাই—আমরা কী করতে পারি।

**উত্তর :** এটিই আমাদের জীবনের এক বড় চোরাবালি যে, আমরা পরিশ্রম না করে অতি সহজে পেতে চাই। ফলে প্রতারকদের মিষ্টি কথায় ভুলে তার ফাঁদে পা দিয়ে ফেলি। তাই আমাদের পরিণতি হয় গল্পের সেই রাখালের মতো।

এক পাহাড়ি গ্রাম। সেই গ্রামে এক প্রতারক ঢুকলো। সে ছোটখাটো প্রতারণা করছে সফলভাবে। কিন্তু ঐ যে, চোরের ১০ দিন, গৃহস্থের একদিন। একদিন প্রতারকের প্রতারণা ফাঁস হয়ে গেল। গ্রামবাসীরা ধরে ফেললো তাকে। কিন্তু সকালবেলা কাজে যাওয়ার সময় হওয়ায় তারা ঠিক করলো—আপাতত জঙ্গলে গাছের সাথে তাকে বেঁধে রাখা হোক। সন্ধ্যার সময় এসে পাহাড় থেকে সমুদ্রে ফেলে দেয়া হবে, যাতে এই আপদ থেকে সবসময়ের জন্যে মুক্ত থাকা যায়।

গ্রামবাসীরা প্রতারককে বেঁধে রেখে চলে গেল। এর মধ্যে এক রাখাল মেষ চরাতে চরাতে ওখানে চলে এলো। রাখাল ছিলো সহজ-সরল এক যুবক। সে প্রতারককে ঐ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলো, তোমার এ অবস্থা কেন? প্রতারক তার কথা শুনেই বুঝলো যে, এ লোক এই গ্রামের নয়। সে সাথে সাথে ফন্দি বের করে ফেললো। বললো যে, দেখ, আমার অনেক দুঃখ! আমার দুঃখের কথা তুমি শুনে কী করবে? রাখাল বললো, কী দুঃখ?

প্রতারক বললো, আসলে আমি একজন সাধক, নীরবে সাধনা করতে চাই। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছু আমি চাই না। টাকাপয়সা চাই না, ঘরসংসার করতে চাই না। কিন্তু এই গ্রামের লোকজন আমাকেই ধরেছে যে, তাদের সর্দারের মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। সেই সাথে তার সম্পত্তির অর্ধেকও আমাকে নিতে হবে। কারণ, এই গ্রামে মেয়েটিকে বিয়ে করার মতো কোনো পুরুষ নেই। আর বিয়েটাও করতে হবে আজ সন্ধ্যার মধ্যেই। নইলে মেয়েটি বাঁচবে না। এখন বল, আমি একজন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছু বুঝি না। আমি কী করে এসবের মধ্যে জড়াই? হায়রে আমার কপাল! শেষ পর্যন্ত আমার ওপর এই জুলুম!

শুনতে শুনতে রাখাল ছেলেটি লোভাতুর হয়ে উঠলো। জিজ্ঞেস করলো, আমার সাথে কি বিয়ে দেবে? প্রতারক বললো, অবিবাহিত পুরুষ পেলেই বিয়ে দেবে। এ গ্রামে আমি ছাড়া আর কোনো অবিবাহিত পুরুষ নেই বলেই আমাকে ধরেছে।

রাখাল তখন বললো যে, তোমার ওপর এই জুলুম দেখে আমার খুব মায়্যা হচ্ছে। তুমি তো সন্ন্যাসী, তোমার বিয়ের দরকার নেই। কিন্তু আমার তো বিয়ের দরকার আছে। এক কাজ করি। তোমার বাঁধন আমি খুলে দিচ্ছি। তুমি আমার এ ভেড়াগুলো নিয়ে চলে যাও। আর আমাকে এখানে বেঁধে রাখো যাতে সন্ধ্যার সময় তারা এখানে এসে আমাকে পায়। প্রতারক বুঝলো যে, শিকারি টোপ গিলে ফেলেছে। তবুও মুখ শুকনো করে বললো, তোমাকে

আবার এই বিপদের মধ্যে ফেলবো! সর্দারের মেয়ে দেখতে কেমন জানি না, বদমেজাজী কি না তা-ও জানি না। কিন্তু যুবক তো তখন ভীষণ উত্তেজিত। বললো যে, আমি পুরুষ মানুষ, রাগী হয়েছে তাতে কী? রাগ আমি ঠিক করে ফেলবো। বলে সে প্রতারকের বাঁধন খুলে দিলো। প্রতারক তখন রাখালকে আচ্ছামতো বেঁধে ভেড়াগুলো নিয়ে সটকে পড়লো।

সন্ধ্যার সময় লোকজন মশাল জ্বালিয়ে ঢোল বাজাতে বাজাতে এলো-পাহাড় থেকে প্রতারককে ফেলে দেবে। কিন্তু প্রতারকের জায়গায় এখানে যে অন্য একজনকে বেঁধে রাখা হয়েছে তারা তা খেয়াল করলো না। রাখাল নানাভাবে বলতে চাইলো। কিন্তু কেউ শুনলো না। তারা ভাবলো, প্রতারক তো কত কথাই বলে!

পরদিন সকালবেলা গ্রামবাসী তো অবাক! ঐ প্রতারক ভেড়ার বিশাল পাল নিয়ে গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে! গ্রামবাসী বললো, এই, তোমাকে না ফেলে দিয়েছিলাম সমুদ্রে! তুমি এখানে এলে কীভাবে? প্রতারক বললো, আর বলো না! তোমরা আমাকে ফেলেছিলে ঠিকই। কিন্তু এ সমুদ্রে আছে এক জ্বিনের বাদশা। সে খুব দয়ালু। ফেলে দেয়ার সাথে সাথে সে আমাকে তুলে নিলো। বললো যে, আমাদের এ রাজ্যে কারো মরার নিয়ম নেই। কেউ মরবে না। তুমি যেহেতু এসেই পড়েছো, এ রাজ্যের নিয়ম অনুসারে তোমাকে এই ১০০ ভেড়া দিয়ে দেয়া হলো। তারপর আমি ভেড়া নিয়ে চলে এলাম।

গ্রামবাসী তো হতভম্ব! এরকমও হয় নাকি! জিজ্ঞেস করলো, যে পড়বে তাকেই দেবে? সে বললো, হ্যাঁ। ঐ রাজ্যের নিয়মই তাই। ব্যস, গ্রামের পুরুষরা সব বাড়ি-ঘর ক্ষেত-খামার গবাদি পশু ফেলে সন্ধ্যায় একের পর এক পাহাড় থেকে লাফিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে লাগলো। গ্রাম হয়ে গেল পুরুষ শূন্য। আর ঐ প্রতারক বনে গেল গ্রামের নারীসহ সমস্ত সম্পত্তির মালিক।

আসলে আমরা কিন্তু এভাবেই প্রতারিত হই। আমরা ভাবি, পরিশ্রম ছাড়া আলাদিনের মতো শুধু চেরাগ ঘষবো আর মহল তৈরি হয়ে যাবে। আর আমাদের অলীক প্রত্যাশার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে প্রতারকরা।

পরিণামে আমরা নিজেরা শুধু সর্বস্ব খোয়াই না, চারপাশের লোকজনেরটাও খোয়াই। কাজেই আপনার বাবার জন্যে এখন যা করণীয় তা হলো-যতটা সম্ভব টাকা আদায়ের চেষ্টা করা এবং আর কোনোরকম আর্থিক লেনদেনে না জড়ানো, ভবিষ্যতেও আর কোনোরকম প্রতারণার ফাঁদে পা না দেয়া। এসব ক্ষেত্রে একটি বিষয় সবসময়ই মনে রাখা জরুরি যে, আশ্বাসটি বাস্তবভিত্তিক কি না এবং কোনো লোভের বশবর্তী হয়ে আপনি সিদ্ধান্ত

নিচ্ছেন কি না। তাহলেই দেখবেন প্রতারণার হাত থেকে সবসময় মুক্ত থাকছেন। যে যত মিষ্টি কথাই বলুক, বস্তুনিষ্ঠভাবে বিষয়টি দেখতে হবে।

**প্রশ্ন :** দেশে কিছু হচ্ছে না দেখে বিদেশে যেতে চাচ্ছি। এক বন্ধুর সাথে পরামর্শ করেছি। সে বলেছে, কোনোরকমে চলে যা। তারপর ওখানে গিয়ে যা করার করবি। তার পরামর্শ মতো কি কাজ করবো?

**উত্তর :** বিদেশে কাজের জন্যে যেতে চান ঠিক আছে। কিন্তু কোনোরকমে বিদেশে তো যাই আগে, তারপর দেখা যাবে—এই মনোভাব নিয়ে যারাই বাইরে গেছেন তারাই প্রতারিত হয়েছেন, সর্বস্বান্ত হয়েছেন। আমাদের একজন গ্রাজুয়েটের ঘটনা শুনুন—

‘তিন মাসের ভিসা নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় গিয়েছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই তিন মাস পর অবৈধ হয়ে গেলাম। তারপরও কাজ করে যাচ্ছিলাম। কাজটা ভালোই ছিলো। বেতনও ভালো। কিন্তু কয়েক বছর পর নিয়ম হলো যে, কোনো অবৈধ অভিবাসী দক্ষিণ কোরিয়ায় থাকতে পারবে না—ধরপাকড় শুরু হলো। এসময় এক কোরিয়ানের সাথে পরিচয় হলো। সে বললো, তাকে বাংলাদেশি আট লাখ টাকার সমপরিমাণ টাকা দিলে সে আমার স্থায়ী হওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে। নিরুপায় হয়ে তা-ই করলাম। এজন্যে বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধারও করতে হলো। ফিরে এলাম দেশে। দেড়মাস পর এক কোরিয়ানকে পাঠিয়ে আমাকে নিয়ে গেল। কিন্তু পেলাম এক বছরের ভিসা। এবার সে প্রতিমাসেই আমার কাছ থেকে বেতনের ভাগ চাইতো। বাধ্য হয়ে দিতে হতো তাকে। কারণ সে ভিসা করিয়ে না দিলে আমি তো বিপদে পড়বো। আমি অপেক্ষা করছিলাম, দুবছর পর স্থায়ীভাবে বসবাসের আবেদন করতে পারবো সেটার জন্যে। এক বছর যখন শেষ হলো তখন ভিসা করিয়ে দেয়ার বিনিময়ে সে আরো টাকা দাবি করলো। তা-ই দিলাম। কিন্তু এবার ছয় মাসের মাথায় ইমিগ্রেশন পুলিশ এসে আমাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায়। আমার কাগজপত্র না কি সব অবৈধ—এ কথা বলে আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেয়। ঐ কোরিয়ান আমার জন্যে কিছুই করে নি। মাঝখান থেকে আমার ২০ লক্ষ টাকা, জীবনের অমূল্য দুটি বছর—সবই নষ্ট হলো।’

এই হলো একজনের কাহিনী। আরেক মহিলা তার ছেলেকে কাতার পাঠিয়েছিলেন দুই লক্ষ ৬০ হাজার টাকা খরচ করে। বেতন দেয়ার কথা ছিলো নাকি ৩৫ হাজার টাকা। অথচ বিদেশে যাওয়ার পর দেখলো বেতন

বাংলাদেশি টাকায় মাত্র আট হাজার টাকা। আর ভিসাবাবদ টাকাও নিয়েছে ৬০ হাজারের বেশি। কাজেই বুঝতেই পারছেন বিদেশে চাকরির সুযোগ এলে ভালো করে খোঁজখবর নিয়ে যাওয়াটা কত গুরুত্বপূর্ণ।

## চাকরি দেয়ার নামে প্রতারণা

**প্রশ্ন :** আজকাল চাকরি দেয়ার নাম করে অনেকেই মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করে, কেউ কেউ হাতিয়েও নেয়। এগুলোকে কি বিশ্বাস করা উচিত?

**উত্তর :** আসলে চাকরি দেয়ার নাম করে আমাদের সমাজে প্রায়ই এরকম প্রতারণা চলে থাকে। একটি মেয়ের ঘটনা—‘মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ করে বেকার বসে ছিলাম। এ সময়ে আমার এক বান্ধবী জানালো তার এক ভাই আছে, যে মহিলা অধিদপ্তরে একটা চাকরি পাইয়ে দিতে পারবে। তবে তাকে দেড়লাখ টাকা দিতে হবে। বাসায় জানালে আমার বাবা বললেন, লোকটিকে একদিন বাসায় নিয়ে আসতে। বাসায় এসে লোকটি জানালো কম্পিউটার শিখতে হবে। তার কাছ থেকে ৯০০০ টাকায় একটা কম্পিউটার ভাড়া নিতে পারবো। শেখা হয়ে গেলে আবার ফেরত দিয়ে দিতে হবে। টাকাটাও ফেরত পাবো তখন। এরপর একদিন বাসায় এসে বললো, আগামী সপ্তাহেই আমি জয়েন করতে পারবো। তবে টাকাটা দিতে হবে তার আগেই।

আমার বাবা বললেন, আগে জয়েন করুক, আমি সাথে সাথেই টাকা দিয়ে দেবো। একথা শুনে লোকটি সেই যে চলে গেল আর আসার নাম নেই। বুঝলাম, সে আর আসবে না। বাবার সচেতনতার কারণে রক্ষা পেয়েছিলাম এ প্রতারণা থেকে।’

আরেকটি ঘটনা এরকম—এক ভদ্রলোক চাকরি করছিলেন একটি বায়িং হাউজে। কথায় কথায় একদিন এক সহকর্মী তাকে বললো, আগে সে কৃষি ব্যাংকে চাকরি করতো। কিন্তু ষড়যন্ত্রের কারণে সেটা ছেড়ে দিতে হয়েছে। তবে বিভিন্ন ব্যাংকের সাথে তার যোগাযোগ আছে। সে চাইলে ভদ্রলোককে কোনো একটা ব্যাংকে ঢুকিয়ে দিতে পারবে। তারপর একদিন বললো, যুব কর্মসংস্থান ব্যাংকে একসময় সে কাজ করেছে, এমডির সাথে তার পরিচয় আছে। তাকে একটা সিভি-ও দিতে বললো।

কয়েকদিন পর জানালো, ভেতরে ভেতরে প্রসেসিং শুরু হয়ে গেছে। এখন কিছু টাকাপয়সা লাগবে। বিশ্বাস অর্জনের জন্যে তাকে একদিন ব্যাংকে



নিয়েও গেল। কিন্তু এমডির রুমে সে ঢুকলো একা। বললো, একজন ভিআইপি আছেন, তাই আজ তার না যাওয়াটাই ভালো। আরো বললো, খুব শীঘ্রই ভাইভা-র জন্যে ডাকা হবে। তবে তার আগে এমডির একাউন্টে ২০ হাজার টাকা দিতে হবে। আর এপয়েন্টমেন্ট লেটার পাওয়ার পর দিতে হবে বাকি ৩০ হাজার টাকা। এমডির একাউন্ট নম্বর দেখে ভদ্রলোক পুরোপুরি আশ্বস্ত হলেন। পুরো ২০ হাজার টাকা তুলে দিলেন তার হাতে। এরপর শুরু হলো ঘোরানোর পালা। এ সপ্তাহ, ও সপ্তাহ করে যখন ভদ্রলোক সন্দেহ করতে শুরু করলেন, ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। লোকটি গা-ঢাকা দিয়েছে। পরে জানা গেল, লোকটি এই একই প্রক্রিয়ায় তার আরো কয়েকজন সহকর্মীর কাছ থেকেও টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

‘চাকরির নামে প্রতারণা’ নিয়ে গত ৯ জুন, ২০১২-দৈনিক ইত্তেফাকে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। পাঠকদের সুবিধার্থে এর কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো—

‘চাকরি দেয়ার নামে রাজধানীতে চলছে প্রতারণা। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি দেয়ার নামে একটি সজ্জবদ্ধ চক্র চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে প্রকাশ্যে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। বিভিন্ন রাস্তার দেয়ালে, বাসে লোভনীয় চাকরির পোস্টার স্টেটে অথবা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে প্রতারক চক্র আকৃষ্ট করছে বেকার তরুণ-তরুণীদের। এমনকি ফাঁদে ফেলে মেয়েদের ব্যবহার করা হচ্ছে নানা আপত্তিকর কাজে।

### যোগদান করতে গিয়ে প্রার্থী দেখেন নিয়োগপত্রটিই ভুয়া

গত ২৭ মে সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-এর (পিডিবি) ‘নিয়োগপত্র’ নিয়ে চাকরিতে যোগদান করতে গিয়ে শাহানাজ আক্তার নামের এক তরুণী বুঝতে পারেন তাকে সরবরাহ করা নিয়োগপত্রটি ভুয়া। কারণ উচ্চমান সহকারীর যে পদে নিয়োগের কথা কথিত সেই নিয়োগপত্রে উল্লেখ করা আছে, সে ধরনের পদে নিয়োগের জন্যে পিডিবি কোনো বিজ্ঞপ্তিই দেয় নি। অথচ শাহানাজ পত্রিকায় চাকরির বিজ্ঞপ্তি দেখে সে অনুযায়ী লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিয়ে তাতে উত্তীর্ণ হয়েই নিয়োগপত্রটি ডাকযোগে পেয়েছেন। নিয়োগপত্রে উল্লেখ আছে, ‘৩০.০১.১২ ইং তারিখ সকাল নয়টায় তেজগাঁও কলেজে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হয়ে ফুলপুর, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ বিদ্যুৎ অফিসে ৬,২০০ টাকা স্কেলে এবং অন্যান্য সুবিধাসহ নিয়োগ করা হইল।’ কিন্তু ময়মনসিংহের উল্লিখিত স্থানে



বিদ্যুত অফিসে উচ্চমান সহকারীর কোনো পদই নেই বলে পিডিবি জানায়। এমনকি সেদিন তেজগাঁও কলেজেও কোনো নিয়োগ পরীক্ষা হয় নি।

### বাসে, রাস্তাঘাটে চটকদার বিজ্ঞাপন

দেশে যে হারে বেকারত্ব বাড়ছে, সে হারে বাড়ছে না চাকরির সুযোগ। ফলে হতাশ বেকার তরুণ-তরুণীরা চাকরি নামের সোনার হরিণ ধরতে ছুটছে। কোথাও কোনো চাকরির বিজ্ঞাপন দেখলেই সেখানে তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। আর এই সুযোগটাই নিচ্ছে প্রতারকচক্র। আকর্ষণীয় বেতন-ভাতাসহ নানা সুযোগ-সুবিধার প্রলোভন দেখিয়ে চাকরি দেয়ার নামে বেকার ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে তারা হাতিয়ে নিচ্ছে নগদ টাকা। পাশাপাশি নানাভাবে তাদের হয়রানি করছে।

প্রতারক চক্রের প্রধান টার্গেট বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা। পড়াশোনার পাশাপাশি পার্টটাইম চাকরির কথা বলে তাদের ফাঁদে ফেলা হচ্ছে। এরপর নানা কৌশলে টাকাপয়সা হাতিয়ে নিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে চাকরিপ্রার্থী শিক্ষার্থীদের। অনেকে শারীরিকভাবেও লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছে।

দেখা যায়, রাজধানীর বিভিন্ন রুটের বাসের জানালায়, বিভিন্ন ভবনের দেয়ালে ও জনাকীর্ণ স্থানগুলোতে চাকরির বিজ্ঞপ্তি শোভা পাচ্ছে! সরকার অনুমোদিত বৃহৎ গ্রুপ অফ কোম্পানিজ, ফ্যাশন হাউজ, গার্মেন্টস, বায়িং হাউজ, বিভিন্ন রিয়েল এস্টেট কোম্পানিসহ আরো নানা প্রতিষ্ঠানের নামে এসব বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে মার্চেন্টাইজার, সুপারভাইজার, অডিটর, কোম্পানির ম্যানেজার, সহকারী ম্যানেজার, অফিস সহকারী-এরকম নানা পদে নিয়োগের জন্যে প্রার্থী আহ্বান করা হয়েছে। সেইসাথে লোভনীয় নানা সুযোগ-সুবিধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ‘চাকরি পেতে কোনো অভিজ্ঞতা ও জামানত লাগবে না’-আকর্ষণীয় এ শর্তটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বড় করে লেখা থাকে।

### প্রতিবেদক নিজেই যখন চাকরিপ্রার্থী

রাজধানীতে বাসে এমনই একটি বিজ্ঞাপন দেখে সেখানে উল্লিখিত নম্বরে (০১৯১১০৯৮৪৮০) চাকরিপ্রার্থী সেজে ফোন করলে এই প্রতিবেদককে রাজধানীর কলেজ গেট এলাকার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের সামনে যেতে বলা হয়। সেখানে গিয়ে আবার একই নাম্বারে ফোন দিলে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের উল্টোপাশে ঢাকা ল্যাবের সামনে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলা হয়। কিছুক্ষণ পর সেখানে একজন এসে তাদের মোহাম্মদপুর হুমায়ুন

রোডের অফিসে নিয়ে যান এই প্রতিবেদককে। গিয়ে দেখা গেল, অফিস বলতে একটি কক্ষের তিনদিকে তিনটি টেবিল ও চেয়ার পাতা। এই প্রতিবেদককে একটি টেবিলের সামনে বসিয়ে বলা হলো, ‘বস এক্ষুণি আসবেন।’ ‘বস’ এলেন মিনিট দশেক পরে। এসেই বললেন, ‘এখানে চাকরি পেতে হলে প্রথমে ভাইভা পরীক্ষা দিতে হবে। এরপর দুই দিনের একটা প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এজন্যে ৬১০ টাকা লাগবে। টাকা ছাড়া ভাইভা পরীক্ষা নেয়া হয় না।’ এটা কিসের অফিস জিজ্ঞেস করতেই ‘বস’ বললেন, ‘বায়রা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির শাখা অফিস।’ অথচ বিজ্ঞাপনে লেখা ছিলো একটি ‘বৃহৎ গ্রুপ অফ কোম্পানি’র কথা।

আলাপচারিতার এক পর্যায়ে প্রতিবেদক পরদিন গিয়ে ভাইভার টাকা দেবেন জানালে সেই কথিত বস বললেন, ‘দুই-তিনশ থাকলেও হবে। আজকেই পরীক্ষা নিয়ে নেই। বাকি টাকা আগামীকাল এসে দিয়েন।’ পরে এই প্রতিবেদক ২০০ টাকা দিয়ে ‘ভাইভা পরীক্ষা’ দেন। পরীক্ষা শেষে বস বললেন, ‘এখন আপনাকে কমপক্ষে ১০ হাজার টাকার একটা বীমা এনে দিতে হবে। তাহলে আপনি স্থায়ী নিয়োগপত্র পাবেন।’ এ ব্যাপারে বায়রা লাইফ ইন্স্যুরেন্সের প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগ করলে বলা হয়, মোহাম্মদপুরে তাদের কোনো শাখা অফিস নেই—চাকরি দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, এভাবে মৌখিক পরীক্ষা নেয়ার নামে প্রথমেই প্রার্থীদের কাছ থেকে কিছু টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়। এরপর প্রশিক্ষণের নামে করা হয় নানা হয়রানি। একসময় প্রার্থীরা নিজেরাই বিরক্ত হয়ে ভুয়া ঐসব প্রতিষ্ঠানে আর যোগাযোগ করে না। করলে প্রলোভন দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে আরো টাকা নেয়া হয়। একদিন কথিত অফিসই উধাও হয়ে যায়।

এরকম প্রতারণার শিকার এক তরুণী একটি এনজিওতে ভালো পদে চাকরির বিজ্ঞপ্তি দেখে রংপুর থেকে আবেদন করেছিলেন। তাকে বলা হয়, ঢাকায় এসে আবেদনপত্র পূরণ করে একটি প্রশিক্ষণ নিতে হবে। প্রশিক্ষণ শেষে রংপুরে এনজিওটির শাখা অফিসেই তিনি যোগ দিতে পারবেন।

ঢাকায় এসে কথিত সেই এনজিওর সাথে যোগাযোগ করলে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য ফি বাবদ নয় হাজার টাকা দিতে হবে বলে তাকে জানানো হয়। কিন্তু এই টাকার কথা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ ছিলো না। খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, প্রশিক্ষণের নামে টাকা নেয়াই এই ভুয়া প্রতিষ্ঠানটির কাজ—দিনের পর দিন চাকরিপ্রার্থীকে শুধুই হয়রানি করা। এক সময় টাকার মায়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় সবাই। চাকরি ‘সোনার হরিণ’ হয়েই থাকে।

## মেয়েদের নিয়ে ভিন্ন প্রতারণা

চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ফাঁদে ফেলে নানাভাবে মেয়েদের প্রতারিত করা হচ্ছে। কৌশলে ফাঁদে ফেলে অনেককেই আপত্তিকর কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। অনেকেই মাস না পেরোতেই চাকরি ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন।

সম্প্রতি ইত্তেফাক-এ ফোন করে এরকম ভুক্তভোগী এক তরুণী জানান তার প্রতারিত হওয়ার অভিজ্ঞতার কথা। তিনি বলেন, ‘চাকরির সাত দিন না যেতেই চাকরিদাতা ষাটোর্ধ্ব ভদ্রলোক (!) আমার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলা শুরু করেন। এরপর হঠাৎ একদিন তিনি আমাকে তার পাহুপথের বাসায় যাবার আমন্ত্রণ জানান। তার বাসায় যাওয়ার দাপ্তরিক কোনো প্রয়োজন ছিলো না। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, তার পরিবারের অন্য কোনো সদস্য ঐ বাসায় থাকে না।’ তরুণীটি আক্ষেপ করে বলেন, ‘আসলে চাকরি দেয়া নয়, চাকরির নাম করে মেয়েদের নানাভাবে ব্যবহার করাই এই ফ্যাশন হাউজের মালিকের উদ্দেশ্য। পরে বাধ্য হয়ে চাকরিটাই ছেড়ে দেই।’

## নামকরা প্রতিষ্ঠানও প্রতারণা করছে!

চলতি বছরের মার্চ মাসে একটি প্রথম শ্রেণীর বেসরকারি সংস্থায় (এনজিও) জনবল নিয়োগকে কেন্দ্র করে অনিয়মের ঘটনায় রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। প্রতারণার শিকার চাকরিপ্রার্থীরা রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে বিক্ষোভ করে। অভিযোগ, প্রায় ১৬ হাজার চাকরিপ্রার্থীকে প্রবেশপত্র দিয়ে জনপ্রতি ৫০ টাকা করে অন্তত আট লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এনজিওটি। টাকা নেয়ার বিষয়টি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ছিলো না।

## প্রতারণার সঙ্গে জড়িত শক্তিশালী চক্র

এই চক্র অত্যন্ত সূক্ষ্ম কৌশলে এই প্রতারণা করে থাকে। কোনো সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিলে এই চক্র প্রথমে তা সংগ্রহ করে। তারপর দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়োগপত্র দেখিয়ে বেকারদের চাকরি দেয়ার প্রলোভন দেখায়। এভাবে ৫০ থেকে ৬০ জন চাকরিপ্রার্থী যোগাড় করে। পরে রাজধানীতে অফিস নিয়ে সেই চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড বুলিয়ে তাদের পরীক্ষা নেয়া হয়। এমনকি স্বাস্থ্য-পরীক্ষা থেকে শুরু করে পুলিশ ভেরিফিকেশন-সবকিছুই করা হয় প্রতারণার মাধ্যমে। চক্রের এক সদস্যকেই বানানো হয় নিয়োগকর্তা। পরীক্ষা শেষে ঘুষ না দিলে চাকরি হবে না বলে চাকরিপ্রার্থী প্রত্যেকের কাছ থেকে কয়েক লাখ টাকা করে হাতিয়ে নেয়া হয়। এমনকি ডাকযোগে ভুয়া নিয়োগপত্রও পাঠানো হয়।

## টাকা ধার দিয়ে প্রতারণা

**প্রশ্ন :** পরিচিত ও বন্ধুদের টাকা ধার দিলে অনেক সময় ফেরত পাওয়া যায় না। এসব ক্ষেত্রে করণীয় কী?

**উত্তর :** এটা একটা সাধারণ সমস্যা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিচিত ও বন্ধুদের ধার দেয়ার পর ফিরে পাওয়ার অভিজ্ঞতা বেশ তিক্ত। অনেক সময় ফেরতও পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে আপনি যদি মনে করেন পরিচিতদের আর্থিক সংকটে সাহায্য করা দরকার, করতে পারেন। কিন্তু যত সেটা নিঃস্বার্থ এবং নিঃশর্তভাবে করতে পারবেন তত আপনি মানসিক প্রশান্তিতে থাকবেন। কিন্তু যদি কোনো প্রত্যাশা রাখেন তাহলে আশাহত হতে পারেন। মানসিক তিক্ততাও হবে তখনই। একজনের অভিজ্ঞতা শুনুন তার নিজের জবানিতেই—

‘আমার এক বন্ধু কাঠের ব্যবসা করতো। সে একদিন শুনলো যে, ব্যাংকে আমার পাঁচ লক্ষ টাকা আছে। জিজ্ঞেস করলো, ব্যাংকে রাখলে পাঁচ লাখ টাকা থেকে সর্বোচ্চ কত লাভ হতে পারে? আমি বললাম, পাঁচ/ সাত হাজার টাকা। সে বললো, এক লাখে ২০ হাজার টাকা লাভ করা সম্ভব। তোমার পাঁচ লাখ টাকা আমাকে দাও। আমি তোমাকে ২০ দিনের মধ্যে ৪০ হাজার টাকা লাভসহ ফেরত দেবো। সন্দেহ নেই, আমি লোভাতুর হয়ে উঠলাম। ভাবলাম, আমার টাকাগুলো তো ব্যাংকে অলস পড়েই আছে। মাত্র ২০ দিনের জন্যে দিয়ে যদি ৪০ হাজার টাকা পাওয়া যায় ক্ষতি কী? ফেরত পেয়ে আবার রেখে দেয়া যাবে। দিলাম তাকে পাঁচ লক্ষ টাকা।

২০ দিন পার হলো। দিতে পারলো না। বললো, সমস্যা হয়েছে, টাকা দিতে দেরি হবে। পরবর্তী এক বছরেও পেলাম না। না লাভ, না আসল। তারপর গত পাঁচ বছরে অসংখ্যবার ধরনা দিয়ে কয়েক দফায় মোটামুটি ৩০ হাজারের মতো উদ্ধার করা গেছে। কিন্তু এটা করতে গিয়ে তার খুব বিরাগভাজন হয়েছি। পরিচিতদের কাছে আমার নামে অনেক কুৎসা ও মিথ্যা রটিয়েছে। তারপর বলেছে, আর দিতে পারবে না। ব্যবসা নাকি খুব খারাপ, বন্ধ প্রায়। যদিও আমি খবর পাই, তার ব্যবসা ভালোই চলছে।’

কাজেই টাকা যদি ধার দিতেই চান, কোনো প্রত্যাশা ছাড়া যতটুকু দেয়া যায় ততটুকুই দিন। আর যদি মনে করেন, ধার দিয়ে ফেরতের জন্যে ধরনা দিতে চান না বা মানসিক কোনো চাপ নেবেন না, তাহলে সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে যে, ধার আপনি দেবেন কি না।

## আত্মীয়-বন্ধুদের দ্বারা প্রতারণিত

**প্রশ্ন :** আত্মীয়-বন্ধুদের দ্বারা যখন প্রতারণার শিকার হই তখন কী করণীয়?

**উত্তর :** আত্মীয়-বন্ধুরাই করণক বা অন্য লোকে করণক, প্রতারণার ব্যাপারে আপনাকে সবসময়ই সচেতন থাকতে হবে। এমনকি ভাই, বোন বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দ্বারাও আপনি প্রতারণিত হতে পারেন। ঘটনাগুলো খুব দুঃখজনক কিংবা অনাকাঙ্ক্ষিত, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেছে। এক ভদ্রলোক বাহরাইনে নিজস্ব কোম্পানি চালাতেন। হঠাৎ জরুরি কারণে ১৫ দিনের জন্যে তাকে দেশে আসতে হয়। বন্ধুকে দায়িত্ব দিয়ে আসেন। কিন্তু দেশে আসার কয়েকদিন আগে মায়ের মৃত্যু এবং কয়েকদিন পর বাবার মৃত্যু, বাবার শেষ ইচ্ছা হিসেবে বিয়ে করা ইত্যাদি কারণে তার ফিরতে ফিরতে পাঁচ মাস দেরি হয়ে যায়। বাহরাইনে ফিরে গিয়ে নিজেকে তিনি একজন নিঃস্ব, কপর্দকশূন্য মানুষ হিসেবে আবিষ্কার করলেন। কারণ তার অনুপস্থিতির সুযোগে তার সেই বন্ধু এবং কাজিন মিলে কোম্পানিটা নিজেদের নামে করিয়ে নিয়েছে। কোম্পানির গাড়ি, লোকবল, ব্যাংক ব্যালেন্স-সব মিলিয়ে তার প্রায় দেড়কোটি টাকার সম্পদ হাতছাড়া হয়ে গেল শুধু সরলতার কারণে।

আসলে বন্ধু বা আত্মীয় হলে মানুষ যে ভুলটা করে-অতিরিক্ত বিশ্বাস করতে গিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি অনুসরণের প্রয়োজন বোধ করে না। আরেকজন ভদ্রলোক-তিনিও তার খুব ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুকে তার ব্যবসার একটা প্রজেক্টের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। প্রথম প্রথম ভালোই চলছিলো দেখে তিনি পুরো দায়িত্বই তার ওপর ছেড়ে দেন। হিসেবনিকেশ যা দিতো তা-ই ঠিক মনে করতেন। খতিয়ে দেখতেন না। এমনকি কেউ কেউ যখন তাকে সাবধান করতে চাইলো, তিনি উল্টো আরো ভুল বুঝলেন এই ভেবে যে, বন্ধুর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে বোধহয় এরা এসব বলছে। শেষমেশ যখন বুঝলেন তখন অনেক দেরি হয়েছে। তার সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে বন্ধুটি ততদিনে বিশাল অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে নিজের নামে। একই ভদ্রলোক তার ছোট ভাইকে বিশ্বাস করেও একইভাবে ঠেকেছেন। তার ধারণা ছিলো, যে ভাইকে নিজে লেখাপড়া করিয়েছেন, ব্যবসা বুঝিয়েছেন-সে কি এরকম করতে পারে? কিন্তু পারে যে, তা তো সে করেই দেখালো।

আর্থিক বা ব্যবসায়িক যেকোনো বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি সুস্পষ্টভাবে অনুসরণ করলে অনেক প্রতারণা থেকে আপনি রক্ষা পাবেন।

## কেনাকাটা করতে গিয়ে

**প্রশ্ন :** কেনাকাটায় প্রতারণিত হওয়ার মূল কারণ কী?

**উত্তর :** কেনাকাটায় প্রতারণিত হওয়ার একটা বড় কারণ হলো সস্তা জিনিসের প্রতি আকর্ষণ। আমরা অনেক সময় সস্তা শুনেই সেটা কেনার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি। ফলে প্রতারণিত হই। একজনের অভিজ্ঞতা এরকম—

‘একটা প্রিন্টার কেনার জন্যে গিয়েছিলাম আইডিবিতে। প্রথমে শোরুমে গেলাম। ওরা বললো, দাম আট হাজার টাকা। আমি ভাবলাম অন্য দোকান দেখে নিই। ওপরে এমনই একটা দোকানে গিয়ে জানলাম, একই প্রিন্টার ৭,৫০০ টাকা। দামের এই ফারাক নাকি শোরুম হওয়ার জন্যে। আমি ভাবলাম, জিনিস যখন এক, তখন শোরুম থেকে কেনার কী দরকার? নিয়ে এলাম ৭,৫০০ টাকার প্রিন্টার। বাসায় এসে অল্প কয়েকটা প্রিন্ট দিয়েই দেখি কালি শেষ হয়ে গেছে। নিয়ে গেলাম দোকানে। ওরা বললো, আপনাকে তো রিফিল কার্টিজ দিয়েছে। আমি বললাম, নিয়েছি তো আপনাদের দোকান থেকে। প্রথমে স্বীকার করতে চায় না। পরে কেনার রশিদ দেখালে বললো, তা ঠিক আছে। কিন্তু আমরা তো প্রিন্টারের ওয়ারেন্ট দিয়েছি। কার্টিজের ওয়ারেন্ট তো দেই নি। তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারলামই না।’

অর্থাৎ কিছু কিছু কেনাকাটা আছে যা সস্তায় করতে না চাওয়াই ভালো। তাহলে এরকম পস্তাতে হয়। আবার দামাদামি করতে গিয়ে এ ধারণাটাও রাখতে হবে যে, যা কিনতে চাইছেন তা কত কমানো সম্ভব? যেমন, একবার একটি ছেলে চামড়ার জুতো কিনতে গিয়ে ২,৯০০ টাকা দাম শুনে দরাদরি করতে গেল। বিক্রেতা শেষ পর্যন্ত ১,০০০ টাকায় রাজি হলো। কিনে আনার দুদিনের মাথায় যখন জুতোর ওপরের ছাল উঠে গেল তখনই সে বুঝলো, কেন এত কম দামে বিক্রেতা দিয়ে দিয়েছিলো। চামড়ার একটা জুতো এতটা কম দামে কেনা যে সম্ভব না, সস্তায় পাচ্ছে বলে আত্মহারা হয়ে যাওয়ার সে মুহূর্তে তা তার মনে হয় নি।

আর হরহামেশা মানুষ ঠকে যেখানে তা হলো কাঁচাবাজার। আর এর মূল কারণ দেখে না কেনা বা তাড়াহুড়োতে কেনা। যেমন, এক ভদ্রলোক বাজারে গিয়ে মুরগির দোকানে মুরগি অর্ডার দিয়ে সবজি বাজার থেকে ঘুরে আসতে গেলেন। যথারীতি বাজারের ব্যাগে বিক্রেতা মুরগি ঢুকিয়ে দিলো। বাসায় বোনকে যখন কাটতে দিয়েছেন, বোন এসে বললো, ভাইয়া, দেখ, মুরগিটা

যেন কেমন একটু ফোলা ফোলা। আর রক্ত যে বাইরে থেকে গায়ে মাখিয়ে দিয়েছে তা তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। তারা বুঝলেন, না দেখার সুযোগে দোকানদার মরা মুরগি দিয়ে দিয়েছে।

আবার অনেক সময় দেখে কিনলেও আপনি ঠকতে পারেন যদি আপনার দেখাটা পরিপূর্ণ না হয়। যেমন, একবার এক ভদ্রলোক কমলা কিনবেন। অন্য দোকানির চেয়ে দাম চাইলো ১০ টাকা কম। এদিকে রাত তখন আটটা বাজে। একটা হাজারাকের আলো জ্বলছিলো দোকানদারের কমলা বোঝাই রিকশা ভ্যানে। এত কম দামে আর কোথাও পাওয়া যাবে না মনে করে তিনি কিনে নিলেন। দোকানি চোখের পলকে ঠোঙায় ভরে ফেললো এক ডজন কমলা। কোনো পচাটচা আছে কি না দেখতে চাইলে দোকানি খুব জোর গলায় বলতে লাগলো, আমার পুরা বুড়িতে যদি একটা পচা কমলা পান তো আমি ১০০ টাকা দিমু। হাজারাকের আলোয় চকচক করা কমলাগুলোর দিকে তাকিয়ে তারও মনে হলো, সত্যিই তো, এখানে কোনো পচা কমলা থাকা সম্ভব নয়। বাসায় এনে দেখেন অর্ধেক সংখ্যক কমলাই পচা-গলা। আসল ব্যাপারটি ছিলো, দোকানি কমলাগুলোর পচা অংশটা রেখেছিলো নিচের দিকে। আর হাজারাকের আলোয় চকচক করছিলো এর ওপরের অংশগুলো।

**প্রশ্ন :** কেনাকাটায় প্রতারণা এড়ানোর জন্যে কী করা উচিত?

**উত্তর :** কেনাকাটায় প্রতারণা এড়ানোর জন্যে একটি টিপস মনে রাখতে পারেন যে, জিনিস বুঝে না পেয়ে কখনো দাম পরিশোধ করবেন না। এক দম্পতির কথা বলি—

তারা বাসা বদলাবেন। ইন্টারনেটে বাসা খুঁজছিলেন। সেরকম চাচ্ছিলেন সেরকম একটা বাসা পেয়েও গেলেন। ভাড়াও খুব কম। বাড়িওয়ালা পরিচয়ে যে ই-মেইল এড্রেস ছিলো তাতে মেইল করে দিলেন। এরপর একদিন যোগাযোগ করে দেখতে গেলেন বাসাটা। দেখে আরো ভালো লাগলো। তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যত শীঘ্র সম্ভব এ বাসাটাই তাদের চাই। ডিপোজিট কত দিতে হবে জিজ্ঞেস করলেন। বাড়িওয়ালা পরিচয়ধারী লোকটি খুব কম এডভান্সের কথা বললো। সেইসাথে বললো, যদি এখনই ডিপোজিট না দেন তাহলে বাসা অন্য কারো পছন্দ হলে তাকে দিয়ে দেয়া হবে। শুনে স্বামী ভদ্রলোকটি এটিএম বুথ থেকে টাকা তুলে তখনই তাকে দিয়ে দিলেন। লোকটি বললো, চাবিটা আপনাকে কালকে নিতে হবে। কারণ এই ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট কোনো

চাবি নেই। এটা নিয়ে কিছুই চিন্তা করলেন না তিনি। কারণ লোকটির মোবাইল নম্বর তাদের কাছে ছিলো। আর বাসাটাও চেনা। কিন্তু পরদিন তারা অনেকবার কল করেও লোকটিকে আর পেলেন না। বাসায় গিয়ে দেখেন ডোর লক। তাদের এডভান্সের পুরো টাকাটাই মারা গেল।

**প্রশ্ন :** শুধু কেনাকাটা করতে গেলেই কি মানুষ ঠকে? বিক্রি করতে গিয়ে কি ঠকে না? সেক্ষেত্রে করণীয় কী?

**উত্তর :** বিক্রি করতে গিয়েও আপনি ঠকতে পারেন। একজন বিক্রেতার প্রতারণিত হওয়ার কাহিনী শুনুন :

‘মাইডাস আয়োজিত বৈশাখী মেলায় হ্যান্ডিক্রাফটসের স্টল দিয়েছিলাম। প্রথম কয়েকদিন বিক্রি তেমন ছিলো না। মেলার তৃতীয় দিন, তখন প্রায় দুপুর হয়ে এসেছে। এক মহিলা ক্রেতা এসে একটা টেবিলম্যাটের দাম জিজ্ঞেস করলো। আমি বললাম, ৭০ টাকা। মহিলা দাম কমাতে বললো। আমি ৬০ টাকা বললাম। মহিলা ব্যাগ থেকে ৫০০ টাকা বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিতেই বললাম ভাংতি নেই। সে নোটটা তার ব্যাগে রেখে দিলো। পাশে আমার বোন আরেক ক্রেতার কাছে কিছু বিক্রি করে আমাকে টাকা দিলো। আমি দাম রেখে বাকিটা ফিরিয়ে দিলাম। মহিলা তখন বললো, আমার বাকি টাকা? আমি বললাম, আমি তো আপনার টাকা নেই নি! সে বললো, কী বলছেন আপনি? এই না কিছুক্ষণ আগে দিলাম আপনাকে? বলেই এমন জোর গলায় চিৎকার-চ্যাচামেচি শুরু করলো যে, আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমি আবারও ব্যাগ চেক করলাম। সবই আমার টাকা। শেষে কী আর করবো? আমার থেকেই তাকে দিয়ে দিলাম ৫০০ টাকা। তারপরও মহিলার হস্তিত্ব কমছে না। গেটের কাছে গিয়েও চিৎকার করছিলো।

এই মেলারই আরেকদিনের ঘটনা। এক মহিলা দুটো শাড়ি দেখলো। অনেক দামাদামি করলো। বললো একটা নেবে। আমি প্যাকেট করে দিলাম। সে দাম দিয়ে চলে গেল। তখন দেখি অন্য শাড়িটাও নেই। কখন কোন ফাঁকে নিয়ে গেল খেয়ালই করি নি।’ এক্ষেত্রে দুটো ঘটনাই ঘটেছে বিক্রেতার অসাবধানতার কারণে। প্রতারকরা হয়তো কুশলী ছিলো। কিন্তু তার উচিত ছিলো, জিনিস এবং লেনদেনের ব্যাপারে আরো সতর্ক হওয়া। কারণ ক্রেতাবেশী প্রতারকরা যদি সব বিক্রেতাকেই এরকম ঠকাতে পারতো তাহলে তো কেউ আর দোকান চালাতে পারতো না।



## জমি কিনতে গিয়ে প্রতারিত

**প্রশ্ন :** জমিজমা তো খুব ঝামেলার জিনিস। প্রতারিত হবো এই ভয়ে এসব কেনা থেকে দূরে থাকতে চাই।

**উত্তর :** এটা ঠিক-জমিজমা কেনা কিছুটা ঝামেলার কাজ। কিন্তু প্রতারিত হওয়ার কথা আগেই ভাবছেন কেন? আপনি যদি সচেতন থাকেন, অন্যের পরামর্শে প্রভাবিত না হন এবং নিজের যুক্তিবুদ্ধি কাজে লাগান তাহলে আপনি কখনো প্রতারিত হবেন না। আসলে সরল বিশ্বাস অনেক সময় প্রতারিত হতে সাহায্য করে। একটি ঘটনা আপনার চোখ খুলে দিতে পারে—

এক প্রবীণ ব্যক্তি শহর এলাকায় একটি জমি কিনতে চাচ্ছিলেন। দেখে শুনে একটি জমি পছন্দও করলেন। জমির মালিক বললো, বায়না করা আছে। জমির দলিল ও বায়নার দলিলের ফটোকপি তার কাছ থেকে পেলেন প্রবীণ ব্যক্তি। তিনি আবার এগুলো দেখতে দিলেন তার পরিচিত একজনকে এবং আরেকজন উকিলকে—যারা জায়গা-জমি বোঝে। তারা দুজনই বললেন, কাগজপত্র সব ঠিক আছে। তাদের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে প্রবীণ ব্যক্তিটি আরো নিশ্চিত হলেন।

এদিকে জমির মালিক বললো, এখন ১০ লাখ টাকা দিন। বাকি টাকা দিতে পারলে তিন মাসের মধ্যেই আমি জমি রেজিস্ট্রি করে দেবো। তিনি তখন তাড়াহুড়া করে গ্রামের জমি বিক্রি করে সাত লাখ টাকা তুলে দিলেন লোকটির হাতে। তিন মাস পার হলো। জমির মালিক বললো, কিছু সমস্যা হয়েছে। আরো টাকা লাগবে। তিনি আরো এক লাখ টাকা দিলেন। এইভাবে পাঁচ বছরে মোট ২৭ লাখ টাকা তিনি ঐ লোকটিকে দিয়েছেন। প্রতিবার টাকা দেয়ার সময় তিনি ঐ বিশেষজ্ঞ এবং উকিল-দুজনের সঙ্গে কথা বলে নিতেন। তারা তাকে আশ্বাস দিতো, টাকা দিতে উৎসাহ দিতো।

ইতোমধ্যে তিনি আরেকজন উকিলের কাছে গেলেন সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে। উকিল সাহেব সব দেখে শুনে বললেন, বায়না দলিল পুরো ভুয়া। প্রবীণ ভদ্রলোকের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। তাহলে আগের উকিল যে সবসময় সব ‘ঠিক আছে’ বলতো?

জানা গেল, জমির মালিক, উকিল ও বিশেষজ্ঞ—এই তিনজন মিলে একটা জোট। তারাই এতদিন প্রবীণ মানুষটির সরলতার সুযোগ নিয়ে তার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে। হাতিয়ে নিয়েছে তার সারাজীবনের সঞ্চয়।

এখানে নিঃসন্দেহে প্রতারকদের শঠতার নিন্দা জানাবার ভাষা নেই। কিন্তু প্রবীণ ব্যক্তিটিরও কিছু দায় আছে। জমি হাতে না আসা সত্ত্বেও বছরের পর বছর এভাবে টাকা দিয়ে যাওয়া তার ঠিক হয় নি। বিশেষজ্ঞ বা উকিলদের প্রতি এতটা আস্থা রাখাও তার উচিত হয় নি।

## সাহায্য করতে গিয়ে

**প্রশ্ন :** মিথ্যা বলে সাহায্য চেয়ে যারা মানুষের আবেগের অপব্যবহার করে— তারা কি প্রতারক নয়?

**উত্তর :** প্রতারক তো বটেই। একজনের ঘটনা এরকম—

‘তখন আমি এইচএসসির ছাত্র। একদিন রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। হঠাৎ দেখলাম, একটি লোক খুব ক্লান্ত হয়ে হাঁটছে। আমাকে জিজ্ঞেস করলো কয়টা বাজে এবং গাবতলী কতদূর? উত্তর দিতে গিয়ে জানলাম, সে এখন গাবতলীতে হেঁটে যাবে। সেখানে পরনের কাপড় বিক্রি করে কিছু খাবে। আর তারপর পরিচিত কোনো গাড়ি ধরে গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাবে।

আমার কৌতূহল বাড়লো। তার সাথে আরো কথা বলে জানলাম, সে আর তার বাবা গ্রামে কৃষিকাজ করে জীবনধারণ করতো। নিজেদের জমিও আছে। কিন্তু একটা দুর্ঘটনায় তার বাবা গাছ থেকে পড়ে আহত হন। ডাক্তার বলেছে তিন হাজার টাকা হলে অপারেশন করা যাবে। ভালো হয়ে যাবে তার বাবা। সে ঢাকায় এসেছিলো সেই টাকার ব্যবস্থা করতে। ভেবেছিলো, রিকশা চালিয়ে টাকা যোগাড় করবে। কিন্তু আসার পথে তার সবকিছু চুরি হয়ে যায়, আর এ কদিন ঘুরেও সে কোনো কাজ যোগাড় করতে পারে নি। অনাহারে, কপর্দকশূন্য হয়ে কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করে সে এখন ফিরে যাচ্ছে গ্রামে।

তার দেশের বাড়ি আমার নানুর বাড়ির কাছে। ভাষা শুনেও তা-ই মনে হলো। তার হতবাক চেহারাটা দেখে খুবই মায়া হলো। মনে হলো, সত্যি কথাই বলছে। জিজ্ঞেস করলাম, বাবার চিকিৎসার কী হবে? বললো, জমিটা বিক্রি করে দেবে। তার আরো দুটি অবিবাহিত বোন আছে। তাদের ভবিষ্যৎ নিয়েও সে চিন্তিত।

ভাবতে লাগলাম, মানুষ কত অল্প টাকার জন্যে অসহায় হয়ে পড়ে! তাকে বাসা পর্যন্ত এনে দরজার সামনে দাঁড়াতে বললাম। ভেতর থেকে ১,৫০০

টাকা নিয়ে এসে তার হাতে দিলাম। বললাম, বাকিটা নিজেকে যোগাড় করতে। তার হতবিস্ময় চেহারা দেখে আরো মনে হলো, সত্যিই সে বিপন্ন। যাক, একটা ভালো কাজ করতে পেরেছি ভেবে খুব তৃপ্তি পেলাম।

অনেকদিন পর আমার এক কাজিনের কাছ থেকে হুবহু একই ঘটনা শুনে বুঝলাম—একই লোক, সবকিছু একই। অর্থাৎ এটা ছিলো একটা প্রতারণা।’

কাজেই বোকা হবেন না। কাউকে সহযোগিতা করতে গিয়ে একজন পেশাদার প্রতারণার শিকার হচ্ছেন কি না এটা আপনাকে বুঝতে হবে।

**প্রশ্ন :** কারো কষ্টের কথা শুনলে মন দুর্বল হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে কীভাবে সাবধান হবো?

**উত্তর :** উপায়—আবেগপ্রবণ হয়ে যাবেন না। আর এ সমস্ত ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায়, প্রতারণা খুব বেশি আবেগের আশ্রয় নেয়। কারণ সে জানে, আবেগ দিয়েই মানুষের কোমল অনুভূতিকে সে ব্যবহার করতে পারবে তার কাজে। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিস্থিতিটা থাকে একটু অস্বাভাবিক। একজন তরুণের অভিজ্ঞতা এরকম—

‘এক শীতের রাত সাড়ে ১০টার দিকে বাসায় আসছিলাম। রাস্তাঘাট খুবই নির্জন। গেটের কাছে আসতেই শুনি গাছের নিচের অন্ধকার থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখি প্রায় ষাটোর্ধ্ব বয়সের একজন রিকশাওয়ালা রিকশা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে? জানালো, আজ সারাদিন রিকশা চালিয়ে সে যা উপার্জন করেছে তার সব ছিনতাই হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। আগামীকাল ছেলের স্কুলের বই কিনতে হবে। সে এখন কী করবে? জিজ্ঞেস করলাম, কত টাকা? একটা পরিমাণ বললো। আমি ভাবলাম, এ সামান্য কটি টাকার জন্যে একজন মানুষ এত অসহায় হয়ে পড়েছে! পকেট থেকে পুরো টাকাটা তাকে দিয়ে বাসায় এসে ভাবলাম—যাক, একজন মানুষের জন্যে কিছু করতে পারলাম আজ।

কয়েকদিন পর একই সময়ে যখন বাসায় আসছিলাম, পাশের রোডে দেখি সেই লোক রিকশার সামনে দাঁড়িয়ে একইভাবে কাঁদছে। তখনই বুঝলাম, আমার আবেগকে ব্যবহার করেছে সাহায্যের নামে প্রতারণাকারী এই ব্যক্তি।’

আরেক ভদ্রমহিলার কাহিনী এরকম—‘একবার আমি একটা রিকশায় চড়েছি। কিছুদূর যাওয়ার পর গুরু হলো রিকশাওয়ালার কাহিনী বর্ণনা। গতকাল মিটফোর্ড হাসপাতালে সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে তার স্ত্রীর

দুটো জমজ বাচ্চা হয়েছে। হাসপাতালের বিল হিসেবে একটা বড় অঙ্কের টাকা তাকে এখন দিতে হবে। সেই সাথে আছে ওষুধ, বাচ্চাদের জামাকাপড়ের খরচ ইত্যাদি। তখন আবার ছিলো প্রচণ্ড শীতের সময়। বাসায় নামিয়ে খুব করুণভাবে আমার কাছে সাহায্য চাইলো। অনেকগুলো প্রেসক্রিপশন দেখালো। আমার খুব খারাপ লাগছিলো। ভাবলাম, বিপদের কাছে মানুষ কত অসহায়! তাকে টাকা দিলাম, স্ত্রীর জন্যে শাড়ি দিলাম, বাচ্চাদের কাপড় দিলাম (তখন আমার বাচ্চারাত্ত ছোট ছিলো)। রিকশাওয়ালাকে বিদায় করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই শুনি নিচে আমার দেবর কার সাথে যেন রাগী গলায় কথা বলছে। পরে তার কাছে শুনলাম, এক/দেড় মাস আগে এই একই রিকশাওয়ালা একই কাহিনী শুনিয়ে আমার দেবরের কাছ থেকেও পকেট উজাড় করে সাহায্য নিয়ে গেছে। তার মানে সে রিকশা চালায় ঠিকই, কিন্তু পাশাপাশি যাত্রীদেরকে বোকা বানিয়ে এভাবে আরো রোজগার করে’।

## ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে

**প্রশ্ন :** মোবাইল ফোনে প্রায়ই একটা মেসেজ পাই। মেসেজটা হলো—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্—এই কালেমা নাকি পাওয়ার সাথে সাথে ১২ জন মানুষকে পাঠালে ১২ ঘণ্টার মধ্যে যে কারো অবস্থা উন্নতির দিকে যাবে। আর এটা না করলে বড় রকমের ক্ষতি হবে। গুরুজী, আপনার পরামর্শ কী?

**উত্তর :** These are all bogus things. এগুলো হচ্ছে এক ধরনের পাগলামী এবং এক ধরনের প্রতারণা। এসব পাঠালে যদি অবস্থা উন্নতির দিকে যায় তাহলে তো যারা কালেমা প্রকাশ করছে, বই ছাপছে তাদের অবস্থা রাতারাতি উন্নতির দিকে যাওয়া উচিত। তা তো যাচ্ছে না। আল্লাহর কালাম প্রচার করা এক জিনিস, তাতে নিশ্চয়ই বরকত আছে। কিন্তু না করলে ক্ষতি হবে—এই ভয় দেখিয়ে প্রচারে বাধ্য করা ঠিক নয়।

এরকম প্রচারণা আগেও হতো। আগে চিঠি দেয়া হতো—এই চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে কপি করে ৪০টা বিলি করিবেন। বিলি না করায় অমুকের মেয়ে মারা গেছে, অমুকের স্ত্রী বিধবা হয়েছে। ভয়ে লোকজন এগুলো ছেপে বা কপি করে বিলি করতো। এগুলো সব ভুয়া। ইসলামের নাম শুনলে বা

ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্টতার কথা শুনলে আমরা আবেগপ্রবণ হয়ে যাই, অথবা ভয় পেয়ে যাই, না জানি এর কথা না শুনলে আল্লাহর কোন গজব নাযিল হয়। এর সুযোগ গ্রহণ করে প্রতারণা। অতএব যেকোনো পদক্ষেপ নেয়ার আগে ভালোমতো চিন্তা-ভাবনা করে নেবেন।

**প্রশ্ন :** কিছুদিন হলো একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট আমাকে একটা এসএমএস করেছে। সেটি নিম্নরূপ-মক্কা শরীফে একজন লোককে হযরত (স) স্বপ্নে বলেছেন, আমার উম্মতকে বলে দাও-তারা যেন কোরআনের তেলাওয়াত করে, নামাজের তাগিদ করে এবং এই এসএমএসটা যে ১১ জনকে সেভ করবে, সে নয় দিনের মধ্যে ভালো খবর পাবে, নয়তো ১৫ বছর পর্যন্ত কোনো খুশির সংবাদ পাবে না। এখানে আমার, আমাদের করণীয় কী?

**উত্তর :** করণীয় হচ্ছে, এই এসএমএস নিজে না করা এবং অন্য কেউ যাতে না করে সেজন্যে তাকে সচেতন করা। কারণ এটা তো কোনো গ্রহণযোগ্য কথা নয় যে, নবীজী (স) কাউকে বলছেন, তুমি এটা করবে, না করলে তুমি ১৫ বছরে কোনো খুশির সংবাদ পাবে না। আসলে এগুলো হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী চক্রের কিছু ষড়যন্ত্রের নমুনা যারা সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে ব্যবসা করতে চায় এবং এটা বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থেই। যেমন, এই যে এসএমএস-এর লাভ কে পাবে? লাভ পাবে আমাদের দেশে ব্যবসা করেছে যে বহুজাতিক মোবাইল কোম্পানিগুলো, তারা।

প্রতারণা শুধু এসএমএস করেই নয়, প্রতারণা ফোন করেও হতে পারে। একটি ঘটনা-একবার একজন গভীর রাতে মোবাইলে কল পান-রাতে এই সময়ে বাঁশ কাটলে পানি পাওয়া যাবে এবং সেই পানি খেলে যেকোনো রোগ ভালো হয়ে যাবে।

উঠে দেখেন সবাই দা, লাইট নিয়ে বাঁশঝাড়ের দিকে দৌড়াচ্ছে। ঝুঝলেন, তার মতো এরাও কল পেয়েছে। যথারীতি বাঁশ কেটে পানি সংগ্রহ করে তা খেলোও অনেকে। তিনি নিজেও পানি বের করে একজনকে খেতে দিয়েছেন। কিন্তু এই পানি খেয়ে কেউ ভালো হয়েছেন এমন কথা কখনো শোনা যায় নি।

অতএব, আমরা সবাই এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকবো যাতে এ ধরনের কোনো অহেতুক কাজে জড়িয়ে নিজের অর্থ, সময় এবং মেধার অপচয় না করি।

মানুষের দুর্বল মুহূর্তগুলোকেই কাজে লাগায় প্রতারক। এক গ্রাজুয়েটের ঘটনা—‘আমার বাবার মৃত্যুর পর পর একদল লোক হঠাৎ করে আমাদের বাসায় এলেন। দুচার কথার পরে বলা শুরু করলেন, আপনার বাবা আমাদের মাদ্রাসার এক পীরের মুরিদ ছিলেন। একশ ছেলেকে তারা কোরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন। আমার বাবা নাকি বলেছিলেন, উনি সবাইকে কোরআন শরীফ গিফট করবেন। তার মৃত্যু হয়েছে জানতে পেরে এই শেষ ইচ্ছার কথা আমাদের না জানিয়ে তারা শান্তি পাচ্ছেন না। মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি নষ্ট হোক এটা তারা চাচ্ছেন না। তাই আমার ভাইকে বোঝালেন যে, এটা এখনই তার দেয়া উচিত। তারা দোয়া-দরুদ পড়ছিলেন এবং বার বার দরজার দিকে তাকাচ্ছিলেন। বলছিলেন, আপনাদের মেইন গেট বন্ধ রাখেন। আমাদের কাউকে বের হতেও দিচ্ছিলেন না।

প্রথম থেকেই বিষয়টি আমার পছন্দ হচ্ছিলো না এবং অফিসে দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে অস্থির হয়ে যাচ্ছিলাম। ভাইয়া যখন পুরোপুরি ইমপ্রেসড এবং ওদেরকে টাকা দিতে চাচ্ছিলেন, একমাত্র আমি নিষেধ করছিলাম যে, ওদের কাছে টাকা না দিয়ে আমরা কোরআন শরীফ কিনে দিই।

কিন্তু ভাইয়া কোনো কথা না শুনে এটিএম বুথ থেকে ১২ হাজার টাকা তুলে দিয়ে দিলেন। টাকা দেয়ার পর ওর আঙুলে আঙুলে খটকা লাগতে শুরু করলো, এরা কারা। আসলেই এরা মাদ্রাসার লোক ছিলো কি? আমার বাবার মৃত্যুতে ওরা এত কান্নাকাটি করলো কেন! এমনকি একজনও তাদের কোনো নাম বলেনি আমাদের কাছে। কোনো কিছু যাচাই না করে এই দুর্দিনে ঋণ করা টাকা থেকে এই দুই প্রতারককে টাকা দিয়ে কী যে মানসিক অবস্থা হয়েছিলো আমাদের তা বলার না।’

ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে এই প্রতারণার মূল কৌশল ছিলো আবেগ। তার ভাই যেহেতু আবেগপ্রবণ ছিলেন, বাবার কোনো ইচ্ছা যেন অপূর্ণ না থেকে যায় তা নিশ্চিত করার জন্যে উনি এতই উদগ্রীব ছিলেন যে, ঘটনাটি তলিয়ে দেখার কোনো প্রয়োজন মনে করেন নি। আসলে প্রতারকরা কিন্তু খুব ভালো করেই জানে, আমাদের দুর্বল দিক কোনগুলো—কোন কোন ব্যাপারে আমরা আবেগপ্রবণ হতে পারি। সেভাবেই তারা তাদের ফাঁদ রচনা করে। অতএব সাবধান থাকবেন, সকল পরিস্থিতিতেই বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবেন। প্রতারকদের হাতে টাকা তুলে দেয়ার জন্যে অস্থির না হয়ে যুক্তিসঙ্গত কথাবার্তা বলছে কি না সেটা যাচাই করবেন। আমলে নেবেন বন্ধু বা পরিজনদের সাবধান বাণী।

## ইন্টারনেট/ মোবাইলে প্রতারণা

**প্রশ্ন :** গুরুজী, মাঝে মাঝে ইন্টারনেটে দেখি, আমি লটারি জিতেছি। অনেক টাকা পাবো। আমি অবশ্য বিশ্বাস করি নি। তারপরও মনে হয় ভুল করছি।

**উত্তর :** মোটেই ভুল করছেন না। আমাদের এই বিনা পরিশ্রমে অর্থলাভের লোভকে প্রতারণা যে কতভাবে ব্যবহার করছে তার ইয়ত্তা নেই। আজকাল তো প্রতারণার একটি জনপ্রিয় মাধ্যম হচ্ছে ইন্টারনেট। আমাদের এক পরিচিত তার ই-মেইল ওপেন করেই লাফ দিয়ে উঠলেন যে, পেয়েছি। এবং সাথে সাথে নিয়ত করলেন যে, এটা যদি ঠিক হয় তো মাটির ব্যাংকে এক লক্ষ টাকা দেবেন। বুঝতেই পারছেন, কত টাকা হলে মাটির ব্যাংকে লাখ টাকার ব্যাপার আসতে পারে।

ব্যাপারটা হলো, সারা পৃথিবীতে ইন্টারনেট ও ই-মেইল ব্যবহারকারীদের মধ্য থেকে নাকি মাইক্রোসফট এবং গুগল এক হাজার জনকে র‍্যানডম সিলেকশনের মাধ্যমে (ইলেক্ট্রনিক ক্যাশিংয়ের মাধ্যমে) বেছে নিয়েছে যারা প্রত্যেকে এক মিলিয়ন ডলার পাবে। আর এই লিস্টে তার নামও আছে। খুব খুশি হয়ে সে রিপ্লাই দিলো।

এরপর তার কাছে চিঠি এলো—এখন এ টাকাটা তার একাউন্টে ট্রান্সফার করার জন্যে ইউকে থেকে একজন ডিপ্লোম্যাট আসবে যার এয়ারপোর্ট প্রসেসিংয়ের জন্যে ২,৫০০ ডলার এখন পাঠাতে হবে। তিনি এসেই একাউন্ট প্রসেসিং করবেন—ফান্ড ট্রান্সফার হয়ে যাবে। চিন্তা করুন, একজন মানুষ কী পরিমাণ আহাম্মক হতে পারে! যেখানে ওয়ান মিলিয়ন ডলার লটারিতে পাচ্ছে সেখানে তো ২,৫০০ ডলার নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এটা তো একটা কমন সেন্স। ২,৫০০ ডলারে কত হয়—প্রায় দুই লাখ টাকা। ওয়ার্কশপে এসে তার মনে প্রশ্ন জেগেছে, এটা অলীক না বাস্তব? টাকাটা নাকি উনি আবার রেডি করে রেখেছেন যে, আমার সাথে দেখা হলে জিজ্ঞেস করবেন এবং আমি বললে দেবেন। কাজেই ইন্টারনেট বা ই-মেইলে এ ধরনের কোনো অফার পেলেই সতর্ক হবেন। এগুলো আসলে প্রতারণার ফাঁদ।

**প্রশ্ন :** পরিচিতদের কাছে শুনেছি অনেক সময় তাদের মোবাইলে ফোন করে বলা হয়, আপনি লটারিতে এত টাকা জিতেছেন। এখন এটা নিয়ে যান ইত্যাদি। এগুলো কি প্রতারণা?

**উত্তর :** এগুলোও প্রতারণা। আমাদের এক দায়িত্বশীল বলছিলেন, ‘আমার মোবাইলে একদিন একটা কল এলো, আমি অমুক (দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় মোবাইল কোম্পানির নাম) কোম্পানি থেকে বলছি। আপনি আমাদের লটারিতে ৮০ হাজার টাকা জিতেছেন। আপনার কোনো ব্যাংক একাউন্ট থাকলে নম্বরটা দিন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনার একাউন্টে টাকা পৌঁছে যাবে। তবে এজন্যে সরকারকে ভ্যাট দিতে হবে ৭,৫০০ টাকা। টাকাটা আপনাকেই দিতে হবে।

এতগুলো কথা একসাথে শুনে আমি তখন রীতিমতো ঘামছি। বললাম, কীভাবে দেবো টাকাটা? সে আমাকে চারটা মোবাইল নম্বর দিয়ে বললো, ‘এই নম্বরগুলোতে এসএমএস করে তিন কিস্তিতে পাঠাতে হবে। তবে এক মোবাইলের দোকান থেকে পাঠাবেন না’। ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটলো যে, আমি কিছু বোঝার আগেই ৬০০ টাকা ফ্লেক্সি করে পাঠিয়ে দিলাম। সম্বিত ফিরে এলো তারপরই। এ আমি কী করছি? এ তো প্রতারণা।’

আরেকটি ঘটনা—‘বেশ কয়েক বছর আগে আমার আব্বার কাছে একটা ফোন এলো—আপনার নাম লটারিতে উঠেছে। আগামীকাল সন্ধ্যায় আমাদের ঠিকানায় এলে আপনাকে বিশেষ পুরস্কার দেয়া হবে। ব্যাপারটা খোঁজ নেয়ার জন্যে তিনি আমাকে বললেন। আমি ফোন করে তাদের কথা শুনে মুগ্ধ। ঠিকানা নিয়ে নিলাম। পরদিন সন্ধ্যায় ট্যাক্সি নিয়ে মা-বাবা, বোনকে নিয়ে আমি রওনা হলাম মহাখালীতে তাদের অফিসে। গিয়ে দেখি আমাদের মতো এরকম আরো অনেকে এসেছে। আমাদেরকে বসানো হলো একটা রুমে। কিছুক্ষণ পর এলেন স্যুট-টাই পরা এক যুবক। দীর্ঘক্ষণ ধরে অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় তিনি আমাদেরকে যা বোঝালেন তা হলো, আমরা বিশেষভাবে সিলেক্টেড। ৬০ থেকে ৯০ হাজার টাকা দিয়ে তাদের সদস্য হলে ফ্রি বিশ্বভ্রমণ করতে পারবো। আরো নানান সুবিধা আছে, সময় বেশি নেই ইত্যাদি। যা-ই হোক, ফিরে এলাম আমরা বেশ বিমর্ষ হয়ে। মনে হলো, ট্যাক্সিতে আমাদের যাওয়া-আসার খরচ, সময়-সবই নষ্ট হলো এই প্রতারণাদের কথায় প্রলুব্ধ হয়ে।’

আরেকজনের মোবাইলে একটা ফোন এলো—‘আপনি আমাদের লটারিতে একটি মোটর সাইকেল জিতেছেন। এই নম্বরে পাঁচ হাজার টাকা ফ্লেক্সিলোড করে দিলে আমাদের লোক আপনার বাসায় গিয়ে মোটর সাইকেল পৌঁছে দেবে। শুনে সে এতটাই উৎফুল্ল হয়ে উঠলো, একবারের জন্যেও তার মনে হলো না যে, এটা প্রতারণা জাতীয় কিছু হতে পারে। বরং সেই মুহূর্তে তার



কাছে পাঁচ হাজার টাকা ছিলো না। পড়িমরি করে দুই হাজার টাকা যোগাড় করে ফ্লেক্সি করে দিলো। পরে বুঝলো যে, সে প্রতারণিত হয়েছে।

**প্রশ্ন :** আমি একটা ই-মেইল পেয়েছি যাতে ফ্রাঙ্ক দুয়েজ নামে এক ব্যক্তি নিজেকে লন্ডনের একটি ব্যাংকে কর্মরত একজন ফিন্যান্সিয়াল এক্সপার্ট পরিচয় দিয়ে আমাকে বলছে, এ বছর বার্ষিক অডিটিংয়ের সময় সে তাদের ব্যাংকের এমন একজন গ্রাহকের একটা গোপন একাউন্ট খুঁজে পেয়েছে যিনি সম্প্রতি মারা গেছেন। যেহেতু গ্রাহকের পরিবার বা বন্ধুদের কেউই এর কথা জানে না, অতএব ৫২ মিলিয়ন ৯৫৪ হাজার পাউন্ডের এ বিশাল অঙ্কের ডিপোজিটের অর্ধেক মালিকানা সে আমাকে দিতে চায়। কারণ ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী এ টাকার অংশীদার হতে হলে তাকে একজন বিদেশি হতে হবে। গুরুজী, ই-মেইলটা পড়েই আমার কাছে মনে হয়েছে ভুয়া। তবুও সবাইকে সচেতন করার জন্যে আপনার মাধ্যমে জানালাম।

**উত্তর :** আপনাকে ধন্যবাদ। জানালাম সবাইকে। এ ধরনের ই-মেইল পেলে সাথে সাথে সেটাকে ডিলিট করে দেবেন। ভালো হয় যদি এ জাতীয় ই-মেইলগুলো স্প্যাম বক্সে আপনা-আপনি চলে যায় সে ব্যবস্থা করেন।

## প্রেমে প্রতারণা

**প্রশ্ন :** আমার মোবাইলে এক ভাইয়ার সাথে আলাপ হয়েছে। ভাইয়া খুব সুন্দর করে কথা বলে। আমরা প্রায়ই রাতের বেলা অনেকক্ষণ কথা বলি। এখন ভাইয়া দেখা করতে চাচ্ছে। গুরুজী, আমি কী করবো?

**উত্তর :** মোবাইল বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিচিত ব্যক্তিদের ব্যাপারে বিশেষভাবে সাবধান থাকবেন। এখন প্রতারকদের কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছে মোবাইল এবং ইন্টারনেট।

আমাদের অনেকগুলো লোভের মধ্যে একটি হচ্ছে প্রশংসার লোভ, মনোযোগের লোভ। এই প্রশংসা ও মনোযোগ যদি বিপরীত লিঙ্গের হয় তাহলে তো কথাই নেই। প্রতারকরা এই দুর্বলতার কথা খুব ভালোভাবেই জানে। এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে প্রেমের নামে, বন্ধুত্বের নামে তারা

নানা ধরনের প্রতারণা করে। এ ধরনের প্রতারণার সবচেয়ে কম ক্ষতিকর রূপ হচ্ছে ‘নাচানো’, অর্থাৎ কিছুদিন প্রেমালাপ করে উধাও হয়ে যাওয়া। এরপর টাকা ধার করে ফেরত না দেয়া এবং আরো কত রকমের প্রতারণা যে রয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না।

উচ্চশিক্ষিত পরিবারের টিনএজ মেয়ে, ভালো ছাত্রী। মা-বাবাকে অনেক কষ্টে রাজি করিয়ে মোবাইল কিনলো। কেনার কিছুদিনের মধ্যেই মোবাইলের মাধ্যমে একটি ছেলের সাথে পরিচয় হলো, বন্ধুত্ব হলো। প্রায়ই রাত জেগে কথা হয়। একসময় ঠিক করলো, তারা দেখা করবে-ফাস্ট ফুড শপে। এভাবে দেখা করতে যে অস্বস্তি লাগে নি তা নয়। কিন্তু মনে হলো, এত মানুষের সামনে ছেলেটি তার এমন কীই-বা ক্ষতি করতে পারবে।

দেখা হলো, গল্প চলছে। ছেলেটা হঠাৎ বললো যে, তার একটা জরুরি ফোন করা প্রয়োজন। কিন্তু তার ফোনে টাকা নেই। মেয়েটি তখন নিজের মোবাইলটি তাকে দিলো ফোন করার জন্যে। ছেলেটি ফোন করে কিছুক্ষণ হ্যালো হ্যালো করলো। রেস্টুরেন্টে এত শব্দের মধ্যে নাকি কিছুই শোনা যাচ্ছে না। ‘এক্ষুণি আসছি’, বলে বাইরে চলে গেল সে।

এদিকে মেয়েটি বসে আছে তো আছেই। ছেলেটির আসার নামগন্ধ নেই। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর সে বুঝতে পারলো-ছেলেটি আর আসবে না, তার মোবাইলও আর পাওয়া যাবে না। এত কিছুর উদ্দেশ্য ছিলো-মোবাইল চুরি! আসলে মোবাইলে বা ইন্টারনেটে অভিব্যক্তি বা বডি ল্যাংগুয়েজ দেখার কোনো সুযোগ থাকে না বলে এখানে কথার জাল বুনে প্রতারণা করা আরো সহজ। অতএব মোবাইল-বন্ধুর(!) কথায় বিভ্রান্ত হবেন না।

**প্রশ্ন :** গুরুজী, আজকাল গুরু হয়েছে ঘনিষ্ঠ শারীরিক সম্পর্ককে গোপনে ভিডিও-টেপ করে ব্ল্যাকমেইল করা। এ সম্বন্ধে কোয়ান্টাম পরিবারের সবাইকে সাবধান করার অনুরোধ করছি।

**উত্তর :** খুব ভালো অনুরোধ। ধরুন, আপনার সাথে এক তরুণের পরিচয় হলো-সুদর্শন, স্মার্ট, বিত্তবান। হয়তো প্রবাস-ফেরত। আপনার ব্যাপারে তার আশ্রয়ের শেষ নেই। সুন্দর সুন্দর কথা বলে। আজ ভ্যালেন্টাইন, আজকে রাত ১২টা এক মিনিট থেকে তোমার কথা মনে করে দাঁড়িয়েছিলাম। আরেকজনের লেখা কবিতা দিয়ে বললো, দেখ, তোমাকে নিয়ে এই কবিতা লিখেছি। তোমার জন্যে জীবন দিয়ে দেবো। কতরকম কথা।

আপনি তো ভাবলেন, আহ! এইরকম মজনু পেয়েছি! আমার সবকিছু দিয়ে বিশ্বাস করি তোমাকে। নিজের সবকিছু উজাড় করে দিলেন। সে কী করলো? সে গোপনে ভিডিও করে রাখলো। পরে আপনাকে দেখালো এবং বললো, বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসো, না হলে ইন্টারনেটে ছেড়ে দেবো। এই হলো মজনুর আসল রূপ। হাতির দেখানো দাঁত এক আর খাওয়ার দাঁত কিন্তু ভিন্ন।

আসলে আমরা প্রেমে প্রতারিত হই কখন? যখন আমরা স্বপ্নের পুরুষ বা স্বপ্নের নারীর সন্ধান করি, সাধারণ নারী বা সাধারণ পুরুষের সন্ধান করি না। কাউকে স্বপ্নের পুরুষ বা স্বপ্নের নারী মনে করলে আমরা আর তাকে সাধারণভাবে বিচার করি না। তাকে বিচার করি তার সুন্দর অবয়ব, না হয় হাসি, না হয় কথা দিয়ে। তার ভেতরে ঢোকার প্রয়োজন মনে করি না।

কেন? কারণ তখন আমরা মনে করি, আমি যা দিচ্ছি তার চেয়ে বেশি পাচ্ছি। আমি ইনফিরিওর, সে সুপিরিয়র। অতএব সে যেন কিছুতেই হাতছাড়া না হয়ে যায়। অর্থাৎ এখানেও কিন্তু কাজ করছে লোভ। আপনি জিততে চাচ্ছেন, আপনার যা প্রাপ্য বলে আপনি বিশ্বাস করেন তার চেয়ে বেশি চাচ্ছেন। আপনি দিতে যাচ্ছেন না, আপনি আসলে নিতে যাচ্ছেন। তাই আপনি প্রতারিত হচ্ছেন।

**প্রশ্ন :** আমি একটি ছেলেকে ভালবাসি। ছেলেটি খুব ভালো। আমাকে সবসময় গাইড করে। আমার মনে হয়, তার মতো একজন জীবনসঙ্গীই আমার দরকার।

**উত্তর :** প্রেমে পড়লে সব প্রেমিকার কাছেই তার প্রেমিককে খুব ভালো মনে হয়। একটি মেয়ের ঘটনা শুনুন—‘তখন আমার বয়স ২৫ বছর। প্রেমজাতীয় বিষয়কে এড়িয়েই চলতাম। একবার একটি ছেলে আমাকে প্রস্তাব দিলো। আমি এড়িয়ে গেলাম। কিন্তু ছয় মাস ধরে সে আঠার মতো লেগে রইলো। পৃথিবীতে সে নাকি আমার জন্যেই এসেছে, আমাকে ছাড়া বাঁচবে না ইত্যাদি। আমি নামাজ পড়তাম না। আমাকে বলে বলে নামাজ পড়াতো। ধীরে ধীরে সে আমার জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে এমনভাবে জড়ালো যে, নিজের অজান্তেই তাকে পছন্দ করতে শুরু করলাম। বিশেষ করে সে যে ধার্মিক—এ দিকটা আমার ভালো লাগলো। মনে হলো, আর যা-ই হোক, সে একজন ভালো মানুষ।

এমন সময়ে একটা ফোন পেলাম, যা আমার জীবনকে একদম উল্টাপাল্টা করে দিলো। একটি মেয়ে ফোন করে যা বললো তার সারমর্ম হলো—এই ছেলেটি এই একই রকমের কথা-আচরণ দিয়ে তাকেও পটিয়ে ফেলেছিলো। শুধু তা-ই নয়, এর আগে আরো এক মেয়েকেও সে বশ করেছে একইভাবে। তার কৌশল হলো—যার যেখানে দুর্বলতা তাকে সেটা দিয়ে কাবু করা। সবকিছু শুনে এমনভাবে ভেঙে পড়লাম যে, মনে হলো মারা গেলেই বোধ হয় ভালো ছিলো’।

তার মানে বুঝতে পারছেন, ছেলেরা কীভাবে পটায়। আর এ সমস্ত ক্ষেত্রে মেয়েরা সবচেয়ে বড় যে ভুলটা করে—সম্পর্ক খানিকটা ঘনিষ্ঠ হলে ছেলেটি যখন শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব দেয়, মেয়েটি তাতে সাড়া দেয়—বা অনেক সময় দিতে বাধ্য হয় ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইলিংয়ের কারণে।

আরেকটি মেয়ের কাহিনী—‘ক্লাস সেভেন থেকেই আমরা চার ভাইবোন তার কাছে পড়তাম। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় আমাকে প্রেমের প্রস্তাব দিলো। মাঝে মাঝেই আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতো। প্রথম প্রথম খারাপ লাগলেও আস্তে আস্তে ভালো লাগতে শুরু করলো। আমার এসএসসি-র কয়েকদিন আগে শুনলাম সে বিদেশে চলে যাচ্ছে।

আমাকে একদিন বললো, বিদেশে যাওয়ার জন্যে তাকে মেডিকেল টেস্ট করতে হবে। কিন্তু ডাক্তার বলেছে তার শারীরিক সমস্যা আছে—যা বিয়ে করলে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে তার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব না। এদিকে মেডিকেল টেস্টে ফিট দেখানোর জন্যে তার দরকার কোনো মেয়ের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন। এখন সে তো আমাকেই ভালবাসে। আমাকেই বিয়ে করতে চায়। আমি কি তাকে সাহায্য করতে পারি না?

আমার বয়স কম ছিলো। আর তাকে ভালোও বাসতাম। তাই একপর্যায়ে রাজি হয়ে গেলাম। এরপর কয়েকবার আমরা মিলিত হই। কিন্তু হঠাৎ আমার খুব অনুশোচনা হতে লাগলো। এ আমি কী করছি? এ-তো পাপ। এরপর তার অনেক জোরাজুরিতেও আর রাজি হই নি। এর মধ্যে সে বিদেশে চলে গেল। চিঠিতে যোগাযোগ হতো। কয়েক বছর পর আমার বিয়ের কথাবার্তা শুরু হলো। অনেকবার তাকে বলেও কোনো সাড়া পেলাম না। একসময় চিঠি দেয়াও বন্ধ করে দিলো। আরেকজনের সাথে বিয়ে হয়ে গেল আমার।

আসলে একটি জিনিস সবসময় মনে রাখবেন, কোনো মেয়ে যদি কোনো ছেলের সাথে বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে, এরপরে আর ছেলেটির কোনো আকর্ষণ তার প্রতি থাকে না এবং ছেলেটি তাকে বিশ্বাসও

করে না। সে ভাবে, যদি আমার সাথে সে বিছানায় যেতে পারে, তাহলে আমার অগোচরে অন্য কারো সাথেও সে তা করতে পারে। অনেক সময় মেয়েটি তার কষ্টার্জিত উপার্জনের অর্থ তুলে দেয় ছেলেটির হাতে। কিন্তু তা-ও তাকে ধরে রাখার জন্যে যথেষ্ট হয় না।

**প্রশ্ন :** শুধু কি মেয়েরা প্রতারিত হয়? ছেলেরা কি হয় না?

**উত্তর :** হয়। ছেলেরাও প্রতারিত হয়। একটি ছেলের ঘটনা—মেয়েটি প্রথমে রাজি না হলেও বছরখানেক পর সে নিজেই প্রস্তাব দেয় ছেলেটিকে। ছেলেটি তো খুশিতে আত্মহারা হয়ে মেয়ের নামে ব্যাংক একাউন্ট খুলে দেয়া থেকে শুরু করে বোনের বিয়েতে টাকা দেয়া, ভাইয়ের অপারেশনে সাহায্য করা, মাকে ঋণমুক্ত করা ইত্যাদি অনেকভাবে আর্থিক সাহায্য করতে লাগলো। সবই করেছে মেয়েটির পছন্দের মানুষ হওয়ার জন্যে। কিন্তু কিছুদিন পর মেয়েটি অন্য আরেকটি ছেলের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুললো। ছেলেটিকে শ্রেফ জানিয়ে দিলো, তার কাছে সে কেবল তাদের পরিবারের একজন পাওনাদার ছাড়া আর কিছু নয়।

আরেকটি ঘটনা। এটা ছেলেটির নিজের জবানিতেই শুনুন—

‘আমি ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ছিলাম। আমার একটা রোগ ছিলো—প্রেমরোগ। চার/ পাঁচটা মেয়ের সাথে প্রেম করেছিলাম। কিন্তু প্রতারিত হয়েছি সবখানেই। সবাই আমার মেধাকে তাদের লেখাপড়ার কাজে ব্যবহার করে আমাকে ছুঁড়ে ফেলতো ডাস্টবিনে। তবে সবচেয়ে বেশি প্রতারিত হয়েছি যেখানে সে ঘটনাটাই এখন বলবো।

আমি একটি মেয়েকে পড়াতাম। শ্যামলা বর্ণের সুন্দর চেহারার এ মেয়েটির প্রেমে পড়লাম কয়েকদিনের মধ্যেই। সে-ও আমাকে পছন্দ করতো। একপর্যায়ে তাকে বিয়েও করে ফেললাম। এরপর আমার সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দিলাম তার প্রতি। এক ঘণ্টার জায়গায় সাত ঘণ্টা পড়াতাম। এক সাবজেক্টের পরিবর্তে ১১ সাবজেক্ট পড়াতাম। সে ছাত্রী হিসেবে ভালো ছিলো না। কিন্তু আমার কারণে এসএসসিতে ভালো করে ভর্তি হলো খুব ভালো একটা কলেজে। ইতোমধ্যে আমাদের বিয়ের কথা আমার পরিবার জেনে গেলেও তারা মেনে নিলো। তার মোবাইল খরচ থেকে শুরু করে ড্রেস, কোচিং, বইখাতা ইত্যাদি বাবদ প্রায়ই টাকা দিতাম। সব মিলে তার জন্যে প্রায় দুলক্ষ টাকা খরচ করেছি।

এর মধ্যেই জানতে পারলাম, সে আরেকটি সন্তাসী টাইপের ছেলের সাথে সম্পর্ক গড়েছে। আমার দেয়া টাকায় তার সাথে কথা বলে, তাকে উপহার দেয়, ঘোরাঘুরি করে। এমনকি তাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্কও হয়েছে। শুনে আমার তো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। কঠিন অসুখে পড়লাম। আমার বাবা স্ট্রোক করে মারা গেলেন। কয়েকদিনের জন্যে আমাদের পুরো পরিবারটার ওপর একটা ঝড় বয়ে গেল।

**প্রশ্ন :** প্রায় পাঁচ বছর আগে মোবাইল ফোনে একটি মেয়ের সাথে আমার পরিচয় হয়। ধীরে ধীরে এটি প্রেমে রূপ নেয়। পরে জানতে পারি, মেয়েটি বিবাহিত। কিন্তু ততদিনে তার প্রতি আমি দুর্বল হয়ে পড়ি। এখন আমি কী করবো বুঝতে পারছি না। কোনোভাবেই ওকে ভুলতে পারছি না। জীবনটা এখন জাহান্নাম মনে হয়। লক্ষ্য স্থির করতে পারছি না। গুরুজী, দয়া করে আমাকে পরামর্শ দিন, এ জীবন থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই।

**উত্তর :** আপনার জন্যে করুণা হয়, মায়া হয়। আমাদের সমাজে এখনো এ ধরনের আহাম্মকদের সংখ্যা অনেক, যারা মোবাইল ফোনে প্রেমে পড়ে যায়। এদের মধ্যে যেমন আহাম্মক ছেলে আছে, তেমনি আহাম্মক মেয়েও আছে অনেক। এটা আসলে একটা রোগ। একশ্রেণীর পুরুষ এবং মহিলা বুঝতে পারে না এবং অধিকাংশ সময়ই তাদের জীবনটা আসলে জাহান্নাম হওয়া ছাড়া কিছু বাকি থাকে না।

আগুনে হাত বুঝে দিলেও পুড়বে, না বুঝে দিলেও পুড়বে। আপনি পরকীয়ায় জড়িয়ে সে আগুনে হাত দিয়েছেন। আপনার জীবনও জাহান্নাম ছাড়া কিছু হবে না। আজ থেকে তওবা করুন, এ সম্পর্কে আর জড়াবেন না। আর আপনি অবিবাহিত। বিবাহযোগ্য হলে দ্রুত বিয়ের সিদ্ধান্ত নিন।

আসলে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রেম আজকাল অনেক সহজ আর সস্তা হয়ে গেছে। একেবারে সাবানের ফেনার মতো সবসময় ফেনায়িত হতে থাকে। অথচ প্রেম তো অনেক বড় বিষয়, অনেক মহৎ বিষয়। প্রেম হলো দেয়ার নাম, নেয়ার বা পাওয়ার নাম নয়। এখন যেটাকে প্রেম বলা হয়—সেটা হলো কাম। অতএব এগুলো থেকে বেরিয়ে এসে জীবনের সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণে মনোযোগ দিন।

আর মোবাইলে যে কারো সাথে আলাপ করার সময় সতর্ক থাকবেন—আবেগের ফাঁদে পা দিয়ে যেন নিজের সর্বনাশ ডেকে না আনেন।

**প্রশ্ন :** ভদ্রবেশী মিথ্যুক, প্রতারকদের সম্পর্কে কিছু বলুন, যারা মনে করে যত বেশি মেয়ের সাথে মেলামেশা করা যাবে ততই স্ট্যাটাস বাড়বে। এ ব্যাপারে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকায় একসময় অনেক রাগ-ক্ষোভ ছিলো। অবশ্য কোর্স করে তা থেকে মুক্ত হয়েছি।

**উত্তর :** প্রতারকরা সবসময় ভদ্রবেশী এবং মিষ্টভাষীই হয়। তারা অবশ্যই নিন্দনীয়। কিন্তু প্রতারিত হওয়াটাও খুব সম্মানের নয়। কারণ এটা প্রমাণ করে যে, আপনি কোনো বিচার-বিবেচনা না করেই মিথ্যুক ও ঠকবাজের মিথ্যা, মনভোলানো কথাকে বিশ্বাস করেছেন, প্রভাবিত হয়েছেন যা বোকাদের কাজ। যদি যুক্তি-বুদ্ধির ন্যূনতম প্রয়োগ করতেন—তাহলেই মনে প্রশ্ন জাগতো, হঠাৎ করে অচেনা-অজানা একজন লোক কেন এত আগ্রহী হয়ে উঠলো, কী তার মতলব। তখনই সত্যটা ধরা পড়তো। কাজেই প্রতারণা করা অপরাধ—সেটা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য। কিন্তু প্রতারিত হওয়া তার চেয়েও বেশি অসম্মানের। প্রতারিতরাও তার বোকামিকে অস্বীকার করতে পারবে না।

## বিয়েতে প্রতারণা

**প্রশ্ন :** আমাদের সমাজে বিয়েতে প্রতারণার ঘটনা প্রায়ই ঘটে। এক্ষেত্রে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অভিভাবকদের দায় বেশি। আপনি কী বলেন?

**উত্তর :** এটা ঠিক। অনেক সময় আমাদের অভিভাবকরা পাত্র বা পাত্রী সম্পর্কে ভালো করে খোঁজখবর না নিয়েই বিয়ের আয়োজন করতে লেগে যায়। ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়। দাম্পত্য জীবন অশান্ত, দুর্বিসহ হয়ে ওঠে এবং বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

এক মায়ের কথা বলি—বড় বোনের প্রবাসী ছেলের সাথে ১৮ বছর বয়সী মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন তেমন কোনো চিন্তাভাবনা না করেই। ভেবেছিলেন, পরিবারের মধ্যে বিয়েতে এত দেখাদেখির কী আছে? কিন্তু বিদেশে যে ছেলে থাকে, তার লাইফস্টাইল, পছন্দ, দাম্পত্যচাহিদা—এসবকিছুর সঙ্গে তার ঘরকুনো, সাদাসিধে, অল্পবয়সী মেয়েটি খাপ খাওয়াতে পারবে কি না—তা ভেবে দেখলেন না। ফলে কয়েক বছর পর ডিভোর্স হয়ে গেল। কিন্তু ততদিনে মেয়েটির যা ক্ষতি তা তো হয়েই গেছে।

এটা পাত্রীর ক্ষেত্রেও হতে পারে। শুনুন একটি ছেলের জবানিতে—আমি আমেরিকায় থাকি। নয় বছর আগে দেশে এসে কিছুটা তড়ালুড়োতে আমাকে বিয়ে করালেন আমার মা। তারপর থেকেই শুরু হলো অশান্তি। বিয়ের পর বুঝলাম, বায়োডাটার অধিকাংশ তথ্যই ছিলো মিথ্যায় ভরা। পাত্রীর পরিবার জেনেগুনেই এসব করেছিলো। মানসিকতায় কোনো মিল নেই। ধর্মাচার থেকে শুরু করে সততা, দানশীলতা, পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীলতা ইত্যাদি যে বিষয়গুলো আমার মধ্যে আছে তার কোনোটাই তার মধ্যে নেই। স্বাভাবিকভাবেই এগুলো নিয়ে দ্বন্দ্ব হতে লাগলো। এদিকে বছরখানেকের মধ্যে আমাদের একটি মেয়ে হলো, যা হয়তো না হলেই ভালো হতো। এখন শুধু মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়েই তার সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছি। কিন্তু আমি জানি তাকে নিয়ে আমি কখনো সুখী হতে পারবো না।

ঘটনাগুলো যেমন খোঁজখবর না নিয়ে বিয়ে করার পরিণতি, পাশাপাশি পাত্র বা পাত্রীরও কিন্তু দায় আছে। বিশেষত, পাত্রের। কারণ বিয়ের আগে খুব ভালো করে তার বুঝে দেখা উচিত—কনের সঙ্গে তার এডজাস্টমেন্ট হবে কি না। সিদ্ধান্ত নিতে হবে বিয়ের আগে, পরে নয়। কারণ তাতে একটি মেয়ে, একটি পরিবার এবং অনেক সময় সম্ভানের জীবনও জড়িয়ে যায়।

**প্রশ্ন :** বিয়ের মতো পবিত্র সম্পর্কের ক্ষেত্রেও যদি প্রতারণা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয় তাহলে কী করে হবে?

**উত্তর :** আসলে বিয়েতে প্রতারণা হতে পারে। হতে পারে বিয়ের মাধ্যমে ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা। একটি ছেলের ঘটনা—

‘পারিবারিকভাবে একটি মেয়ের সাথে বিয়ে ঠিক হওয়ার পর মেয়েটিই বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং বিয়ে ভেঙে যায়। তারও এক বছর পর আবার তাদের আগ্রহেই বিয়ে হয়। কিন্তু তারপরই স্বশুরপক্ষের আচরণ বদলাতে থাকে। আমার স্ত্রীর দাবি—আলাদা বাসা নিতে হবে, বাচ্চা নেয়া যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু এর মধ্যে ওর প্রেগনেন্সি রিপোর্ট পজিটিভ হলে ও আমাদের বাসা থেকে সমস্ত গয়নাগাটি নিয়ে বাবার বাড়ি চলে যায়। ক্লিনিকে গিয়ে গর্ভপাত ঘটায়।

কিন্তু আমাকে বলে, স্বাভাবিকভাবেই তা হয়েছে। কিন্তু ইনফেকশনের কারণে আবার হাসপাতালে ভর্তি হলে রিপোর্ট পড়ে আমি সব বুঝতে পারি। সবচেয়ে অবাক হই কাবিননামা পড়ে। বিশেষ একটি শর্ত ছিলো



তাতে—‘বিবির মনোনীত বাসস্থানে বর থাকিতে বাধ্য থাকিবে।’ সেইসাথে ১২ লাখ টাকার কাবিনে উসূল দেখানো আছে দুই লাখ টাকা। অথচ হওয়ার কথা সাত লাখ টাকা—যে মূল্যমানের স্বর্ণালংকার সে নিয়েই গেছে। এ বিয়েটা যে ব্যবসার বিয়ে তা পুরোপুরি নিশ্চিত হই যখন আমার স্ত্রী সাড়ে ১০ লাখ টাকা কাবিনের জন্যে মামলা দায়ের করে। সে টাকাটা এখন আইনত আমাকে পরিশোধ করতেই হবে। বিয়ে আমাকে আর্থিকভাবে নিঃস্ব করে দিয়েছে। অবিবাহিত ছেলেদের প্রতি অনুরোধ, আপনার বিয়ের কাবিননামায় স্বাক্ষরের আগে বিস্তারিত পড়ে দেখবেন। নইলে আমার মতো ঠকতে হতে পারে।’

অতএব বুঝতেই পারছেন, আবেগ বলুন আর পবিত্র সম্পর্ক বলুন, বাস্তবতাকে মাথায় রাখবেন। কোথায়, কেন, কীভাবে স্বাক্ষর করছেন তা ভালোভাবে বুঝে নেবেন।

**প্রশ্ন :** আজকাল বিয়ের জন্যে পাত্র-পাত্রী বেছে নিতে ম্যারেজ মিডিয়ার দ্বারস্থ হন অনেকেই। এগুলো কি নির্ভরযোগ্য?

**উত্তর :** সবকিছুই নির্ভরযোগ্য যদি যাচাই করে নেন। আর কোনোকিছুই নির্ভরযোগ্য নয়, যদি যাচাই না করেন—যদি প্রজ্ঞা, বাস্তববুদ্ধি প্রয়োগ না করেন তাহলে আপনি প্রতারণিত হবেন। ম্যারেজ মিডিয়ার নামে প্রতারণার যে নানা কৌশল চলছে, ২১ জুন, ২০১২-এর দৈনিক ইন্ডেফাকের একটি অনুসন্ধানী রিপোর্টে উঠে এসেছে তার কিছু তথ্য—

‘ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশের প্রবাসী পাত্রীর পাত্র চাই। পছন্দ হলে পাত্রীর খরচে পাত্রকে বিদেশে নেয়া হবে। পাত্র বিপত্নীক হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ করুন সরাসরি, মোবাইল নম্বর...।’ এভাবেই বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে চটকদার বিজ্ঞাপন ছেপে দেশের বেকার ও বিদেশ গমনেচ্ছুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এরপর বিবাহ-ইচ্ছুক পাত্র তাদের অফিসে এলে কথিত পাত্রীসহ তারা যেকোনো হোটеле বসে কথাবার্তা চূড়ান্ত করে। লিখিত চুক্তি হয়।

এরপর বিয়ে ও অন্যান্য খরচের কথা বলে পাত্রের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করে। বিয়ে তো হবেই—এ বিশ্বাসে পাত্ররাও দেয়। তবে বিয়ের দিনক্ষণের পূর্বেই লাপাত্তা হয়ে যায় পাত্রী। এভাবে অবিবাহিত ও ভাগ্য পরিবর্তনে প্রত্যাশী পুরুষদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে ‘ম্যারেজ মিডিয়া’ পরিচয়ধারী প্রতারণা প্রতিষ্ঠান।

গোয়েন্দা পুলিশের মতে, ঢাকা শহরে এ ধরনের অন্তত একশ প্রতারণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাদের রয়েছে পাত্রী পরিচয়ধারী নারী-প্রতারক। এ মহিলারা পাত্রী হিসেবে একবার সাক্ষাৎকার দিলেই পায় এক হাজার টাকা। গত রবিবার রাতে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) এ ধরনের প্রতারণার অভিযোগে রামপুরার বনশ্রী এলাকা হতে ম্যারেজ মিডিয়া চক্রের আমেরিকা ও কানাডা প্রবাসী দুই ভুয়া পাত্রীসহ নয়জনকে গ্রেফতার করেছে।

ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা ও অপরাধ তথ্য বিভাগ জানায়, এ চক্রটি অনেকদিন থেকে পত্রিকায় ‘পাত্র চাই’ বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতারণা করে আসছিলো। বিজ্ঞাপন দেখে লোকজন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে প্রবাসী পাত্রী হিসেবে কথিতদের দেখিয়ে টাকা হাতিয়ে নিতো।

পুলিশ তাদের কাছ থেকে ২২টি পাসপোর্ট, বিভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠানের মালিক পরিচয়ের ২৫টি জাল আইডি কার্ড, ৪০টি জাল ইমিগ্রান্ট ভিসা ফরম, ১০টি নকল ভিসা, ৭৬টি বায়োডাটা ফরম, একটি ল্যাপটপ ও বিভিন্ন ধরনের জাল কাগজপত্র উদ্ধার করেছে। তারা আরো জানান, এ চক্রের দুজনকে এর আগেও গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেফতার করেছিলো। সম্প্রতি তারা আদালত থেকে জামিন নিয়ে কারাগার থেকে বের হয়ে পুনরায় ম্যারেজ মিডিয়ার অফিস খুলে তাদের ব্যবসা শুরু করে।

এই চক্রের প্রতারণার শিকার একজন জানান, তিনি ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে এই ম্যারেজ মিডিয়ার একটি বিজ্ঞাপন দেখে যোগাযোগ করেন। এরপর তাদেরকে বায়োডাটা দেন। এর চারদিন পরে ম্যারেজ মিডিয়ার লোকজন তাকে কথিত আমেরিকা প্রবাসী এবং গার্মেন্টস মালিক পরিচয়ে রীদিতা জামান নামের এক পাত্রীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেন।

এই পাত্রী এক বসাতেই ওয়াজিউল ইসলামকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যান। এর দুই সপ্তাহ পরে রীদিতা জামান তার কাছে ৩০ হাজার টাকা ধার চান এবং জানিয়ে দেন বিয়ের পরে সেটা তাকে ফেরত দেয়া হবে। ওয়াজিউল ইসলাম সরল বিশ্বাসে রীদিতাকে ৩০ হাজার টাকা দেন। এর একমাস পরে রীদিতা ও ম্যারেজ মিডিয়ার লোকজন বিয়ের খরচ হিসাবে তাকে দেড় লাখ টাকা দিতে বলেন। তখন ওয়াজিউল ইসলামের সন্দেহ হয় এবং তিনি ঘটনাটি গোয়েন্দা পুলিশকে জানান।

## প্রতারণা : আরো নানা ধরন

**প্রশ্ন :** আমি ব্যথা-বেদনা কমানোর জন্যে বিজ্ঞাপন দেখে এক চাইনিজ ডাক্তারের কাছে গেলাম। বাংলা তো দূরের কথা, ইংলিশও ভালো বলতে পারেন না। উনি আমার প্রশ্নের দেখলেন, নাড়ি দেখে একগাদা ওষুধ দিলেন, পরে আমাকে মাসাজ দেয়া হলো, সবকিছু মিলিয়ে আমার দুহাজার টাকা গচ্চা গিয়েছিলো। এটাও কি প্রতারণা?

**উত্তর :** এটা মিডিয়ার প্রভাব। বিজ্ঞাপন দেখে খোঁজখবর না নিয়ে চাইনিজ নাম শুনে চলে গিয়েছেন। চাইনিজ ডাক্তার তো শুধু ওষুধ দেয় না, তারা আকুপাংচার করে। সুঁই দিয়ে ফুটা করে নি তো আবার?

আসলে এটা আপনি বোকামি করেছেন। সবসময় মনে রাখবেন, প্রতারণাদের একটি বড় অংশের টার্গেট অসুস্থ ব্যক্তির—বিশেষত প্রচলিত চিকিৎসাপদ্ধতিতে যাদের রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। যেকোনো মূল্যে রোগীর নিরাময়ের আকাঙ্ক্ষাকে সম্বল করে প্রতারণার ফাঁদ পেতে বসে প্রতারণা করা।

ওষুধ, ব্রেসলেট, কবচ, ফিতা, যন্ত্রপাতি ও নানা ধরনের অভিনব, ‘প্রাচীন’ বা ‘রুহানী’ চিকিৎসাপদ্ধতির মাধ্যমে এইডস, ক্যান্সার, অটিজম ও আলঝেইমার নিরাময়; স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি, টাকে চুল গজানো, ‘গোপন’ রোগের চিকিৎসাসহ নানা ধরনের অবিশ্বাস্য নিরাময়ের আশ্বাস দেয় তারা। পত্রিকা, টিভি ও ইন্টারনেটে চকচকে বিজ্ঞাপন দিয়ে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে ক্রেতাদের। অনেকক্ষেত্রে কাজ না হলে মূল্য ফেরতের আশ্বাস দিলেও বাস্তবে মূল্য ফেরত পাওয়া যায় না। এ ধরনের প্রতারণার ফলাফল শুধু অর্থনাশ হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর প্রভাব আরো মারাত্মক।

চিকিৎসাসংক্রান্ত ঠকার একটা মূল কারণ তথ্যগত বিভ্রান্তি। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য নিয়ে তবেই চিকিৎসা গ্রহণ করা ভালো। কোনো বিজ্ঞাপনে যদি নিম্নোক্ত বিষয়গুলো থাকে, তাহলে বুঝবেন চিকিৎসাপদ্ধতিটি প্রতারণা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি—

- ১.□ কোনো ব্যথা বা অস্বস্তি ছাড়া দ্রুত ও নাটকীয় নিরাময়ের আশ্বাস।
- ২.□ দাবি করে যে চিকিৎসাপদ্ধতিটি কোনো ‘বিশেষ’ গোপন দুর্লভ প্রাচীন বা রুহানী পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত অথবা কোনো অভিনব আবিষ্কার।
- ৩.□ ঐ বিশেষ পণ্য বা চিকিৎসা শুধুমাত্র একটি কোম্পানি বিক্রি করে।

- ৪.□ ওষুধ বা চিকিৎসাসামগ্রীটি শুধুমাত্র ডাকযোগে পাওয়া যায়।
- ৫.□ বলা হয়, ওষুধ বা চিকিৎসাসামগ্রীটি একসাথে বহু রোগের নিরাময় করে।
- ৬.□ বিফলে মূল্য ফেরতের আশ্বাস দেয়।
- ৭.□ পণ্য পাওয়ার আগেই মূল্য শোধ করতে হয়।
- ৮.□ স্টক সীমিত বলে দাবি করে।
- ৯.□ এমন কোনো কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি দাবি করে, যার নাম আপনি জানেন না।

১০. প্রমাণযোগ্য নয়-এরকম নানা অবিশ্বাস্য নিরাময়ের বর্ণনা দেয়।

**প্রশ্ন :** আমার এক কাজিন আছে সহজে ওজন কমানোর যেকোনো আশ্বাস দেখলেই তার পেছনে দৌড়ায়। ও যে কতভাবে ঠেকেছে তার ইয়ত্তা নেই। আসলে কি সহজে ওজন কমানোর কোনো উপায় আছে?

**উত্তর :** আপনার কাজিন একা নন। ২০০৫ সালে আমেরিকার ফেডারেল ট্রেড কমিশন প্রতারণার ওপর এক জরিপ পরিচালনা করে। সেখানে দেখা যায়, লটারি বা জিজিএন জাতীয় পিরামিড স্কিমকে পেছনে ফেলে মানুষকে সবচেয়ে বেশি প্রতারিত করার 'গৌরব' লাভ করেছে অতি সহজে ওজন কমানো সংক্রান্ত প্রতারণা। এসব প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপনে কোনো অভিনব ডায়েট, ওষুধ, ক্রিম বা যন্ত্রের সাহায্যে বিনা পরিশ্রমে বা নামমাত্র পরিশ্রমে বিপুল পরিমাণ ওজন কমানোর আশ্বাস দেয়া হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বলা হয় ব্যায়াম বা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন ছাড়াই ওজন কমবে।

ছয় ঘণ্টায় ১৫ পাউন্ড ওজন বা নয় ইঞ্চি কোমর কমানোর প্রলোভনে আমাদের দেশেও অনেকেই এ ধরনের প্রতারণার ফাঁদে পা দিচ্ছেন। অর্থাৎ এখানেও বিনা পরিশ্রমে ফল লাভের স্বপ্ন। সবসময় মনে রাখবেন, বিজ্ঞাপনে যা বলা হয় তা চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করা আহাম্মকির লক্ষণ ছাড়া আর কিছু নয়। ২০০২ সালে আমেরিকার ফেডারেল ট্রেড কমিশনের একটি রিপোর্টে বলা হয়, ওজন কমানোর ৫৫% বিজ্ঞাপনই ভ্রান্ত বা অপ্রমাণিত তথ্য দেয়।

**প্রশ্ন :** আমরা চারজন মিলে ব্যবসা করার সব প্রস্তুতি শেষ। এর মধ্যে দুই জনের মানসিকতা হলো মেরে খাওয়া। একজনের দোষ আরেকজনের ওপরে চাপিয়ে দেয়া। বুঝিয়ে কিছু বলতে পারছি না। সরে এলে আমার টাকাপয়সার সমস্যা হবে। এতে করণীয় কী?

**উত্তর :** আপনারা চারজন। এখন এই দুইজন মিলে কাকে মারছে? তৃতীয় জনকে। এই তৃতীয়জনকে যখন মারা শেষ হবে, এরপরে কাকে ধরবে? আপনাকে ধরবে। আপনার টাকাপয়সা মারা যাবে—এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন। কায়দা-কৌশল করে যতটা উঠিয়ে নিয়ে আসতে পারেন সেটাই ভালো। কারণ অসৎ সঙ্গে যখনই আপনি যাবেন, সর্বনাশ হবে আপনার। যে কারণে বলা হয় অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

**প্রশ্ন :** গুরুজী, সেদিন এটিএম মেশিনে আমার কার্ড আটকে গিয়েছিলো। এক ভদ্রলোক সাহায্য করতে চাচ্ছিলেন কিন্তু আমি দেই নি। কার্ড রেখে চলে এসেছি। পরের দিন ব্যাংক থেকে তুলেছি। ঠিক করেছি না?

**উত্তর :** ঠিক করেছেন। অপরিচিত কেউ যদি এটিএম কার্ডের ব্যাপারে সাহায্য করতে চায় সেক্ষেত্রেও সাবধান থাকবেন। আজকাল তো আমরা অনেকেই টাকা তোলার জন্যে এটিএম মেশিন ব্যবহার করি। এই এটিএম মেশিন নিয়েও কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা প্রতারণার ঘটনা ঘটে।

ধরুন, আপনি এটিএম মেশিনে কার্ড ঢুকিয়েছেন। পিন নাম্বার দিয়েছেন, টাকার পরিমাণ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু টাকা আসছে না। কার্ড বের করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বের হলো না। বুঝলেন, কার্ড মেশিনে আটকে গেছে। আশেপাশে তাকালেন। দেখলেন—আরেক মেশিনে আপনার মতোই কার্ড ঠেলাঠেলি করছেন আরেকজন।

ভদ্রলোক এসে বললেন, তারও আপনার মতো অবস্থা। অনেক কষ্টে তিনি কার্ড ফেরত পেয়েছেন। আপনার কাছে এসে বললেন, পিন নম্বরটা আবারো চেপে দেখতে। তা-ই করলেন। কিন্তু দুজনে মিলে অনেক চেষ্টার পরও কার্ড ফেরত পেলেন না। শেষ পর্যন্ত আপনি বাড়ি চলে এলেন।

পরে জানতে পারলেন, আপনার একাউন্টের সব টাকা হাওয়া। আসলে ঘটনা কী ঘটেছিলো? আপনি বুথে ঢোকার আগেই প্রতারকের দল মেশিনের স্লটে একটা প্লাস্টিকের আবরণ ঢুকিয়ে রেখেছিলো, যেন মেশিন আপনার কার্ড রিড করতে না পারে। ফলে অনেক টেপাটেপি করেও কোনো লাভ হলো না। ঐ ভদ্রলোকের(?) আসল উদ্দেশ্য ছিলো—সাহায্য করার ছুতোয় কোনোভাবে আপনার পিন নম্বর জেনে নেয়া। আপনি চলে আসামাত্র প্লাস্টিকের কোণা (যা আপনি খেয়াল করেন নি) ধরে প্লাস্টিকের আবরণসহ কার্ডটা বের করে নিয়েছে। তারপর তো বুঝতেই পারছেন...

**প্রশ্ন :** রোগ নিরাময়ের জন্যে অনেকেই হাতে এক ধরনের চেইন ব্যবহার করে। এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কী? আমার জানামতে এর বিক্রয় প্রক্রিয়া এমএলএম ব্যবসায়ের মতো। কোয়ান্টামের অনেকেই ব্যবহার করেন।

**উত্তর :** কোয়ান্টামের অনেকেই ‘কোয়ান্টাম বালা’ ব্যবহার করেন, কিন্তু এক ধরনের চেইনের ব্যাপারটা আমাদের জানা নেই। অষ্টধাতুর তৈরি কোয়ান্টাম বালা কারো কারো দেহের মেটালিক বা ধাতুগত ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক। তবে কোয়ান্টামের অনেক সদস্যই এটা পরেন স্রেফ ফ্যাশন হিসেবে। মজার ব্যাপার হলো, বাইরে অনেক সময় গ্রাজুয়েটরা একে অপরের সাথে পরিচিত হন এই বালার সুবাদে। হাতে বালা দেখে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কোয়ান্টাম? আমিও কোয়ান্টাম। ব্যস, হয়ে গেল পরিচয়।

তবে আপনি যে চেইনের কথা বলছেন—এটা আসলে প্রতারণা। ব্রেসলেটের মতো এই চেইনে চুম্বক থাকে। চুম্বকের কিছু গুণ হয়তো আছে। কিন্তু আপনি যে বিক্রয় প্রক্রিয়ার কথা বলছেন, সেখানে মাত্র ২০০, ৩০০ বা ৫০০ টাকা মূল্যমানের এ চেইনগুলোর দাম হাঁকা হয় পাঁচ হাজার টাকা! অর্থাৎ এটা হলো প্রথমদফা প্রতারণা। তারপর বলছে, আপনিও যদি একটা বিক্রি করে দিতে পারেন তাহলে কমিশন আছে। এটাই হচ্ছে নেটওয়ার্কিং, এটাই হচ্ছে এমএলএম। আগের প্রশ্নোত্তরগুলোতে এ ধরনের প্রতারণার বিস্তারিত নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। অতএব বোকার মতো ঠকবেন না।

**প্রশ্ন :** একটি প্রতিষ্ঠান ‘আয়ন বালা’ বলে একটি রিস্টব্যান্ড বাজারজাত করছে। যার বিষয়টি হলো ‘মোবাইল ফোন ব্যবহার করলে শরীরে নেগেটিভ আয়ন কমে যায়। আয়ন বালা ব্যবহার করলে বালা নিজেই নেগেটিভ আয়ন তৈরি করে মোবাইল ফোনের ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে’। এ ব্যাপারে সবাইকে সাবধান করে দেয়া উচিত।

**উত্তর :** একটা বালা নিজে নিজে আয়ন কীভাবে তৈরি করে? এ ব্যান্ড সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। এটা প্রতারণার কোনো ফাঁদ হতে পারে।

**প্রশ্ন :** কোয়ান্টাম প্যাডেন্ট নামে একটি আগ্নেয়শিলা ব্রেসলেট বিক্রি হচ্ছে—যা কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের বলে এই কোম্পানির কাউন্সিলররা বলছে। অন্য অনেকেও তা-ই মনে করছে।

**উত্তর :** ‘কোয়ান্টাম প্যাডেন্ট’ নামে কোনো আগ্নেয়শিলার ব্রেসলেট আমাদের নেই। আসলে কেন্দ্রসহ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য কার্যালয়ে যে সেলস আইটেমগুলো রয়েছে, শুধুমাত্র সেগুলোই আমাদের অনুমোদিত বিক্রয় পণ্য। এর বাদে কোয়ান্টামের নামে অন্য যা-ই হোক, সেটাকে কোয়ান্টামের মনে করার কোনো কারণ নেই। একটা সময় কোয়ান্টামের নামে বাজারে অনেক কিছুই আসবে-কোয়ান্টাম শেভিং ক্রিম, কোয়ান্টাম ক্লিপ, কোয়ান্টাম অমুক, কোয়ান্টাম তমুক ইত্যাদি। একটা নাম যখন জনপ্রিয় হয় তখন সেই নামের অনেক কিছু বাজারে আসতে পারে। কিন্তু সবকিছুই তো আর কোয়ান্টামের নয়। আর এই ব্রেসলেটগুলো কেনা অর্থহীন। শুধু পয়সা নষ্ট করা।

## প্রতারিত হওয়ার কারণ

**প্রশ্ন :** গুরুজী, আমি বার বার প্রতারণার শিকার হই। কী করবো?

**উত্তর :** আমরা প্রতারিত হই প্রধানত তিনটি কারণে। প্রথমত, লোভ অর্থাৎ পরিশ্রম না করে সহজে কিছু পেতে চাওয়া। সেটা অর্থ হতে পারে, খ্যাতি হতে পারে, প্রশংসা, প্রেমিক-প্রেমিকা বা স্বামী-স্ত্রী হতে পারে। দ্বিতীয়ত, কোনো কারণে আবেগকে যুক্তির উর্ধ্বে স্থান দেয়া, তৃতীয়ত, যাচাই-বাছাই না করে সবাইকে ভালো মানুষ মনে করা।

আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি হয়তো সবাইকেই বিশ্বাস করেন। সরল হওয়া ভালো, কিন্তু সরলতাকে কখনো বোকামির পর্যায়ে নিয়ে যাবেন না-নাসির উদ্দিন হোজার মতো।

হোজা অনেকদিন পরে বাড়িতে ফিরছে। যখন বাড়ির খুব কাছাকাছি চলে এসেছে, তখন এক লোক তাকে ডেকে বললো, হোজা, তুমি অনেকদিন পরে বাড়িতে ফিরলে। কিন্তু তোমার স্ত্রী তো বিধবা হয়ে গেছে। এখন কী হবে? হোজা সেখানে বসেই কাঁদতে শুরু করলো। কিছু লোক জড়ো হয়ে গেল। একজন জিজ্ঞেস করলো, হোজা তুমি কাঁদছো কেন? হোজা বললো, আমার স্ত্রী বিধবা হয়ে গেছে। কাঁদবো না তো কী করবো। কয়েকজন তখন বললো, তুমি বেঁচে থাকতে তোমার স্ত্রী বিধবা হয় কীভাবে? তার হুঁশ হলো। তাইতো, আমি বেঁচে থাকতে আমার স্ত্রী বিধবা হয় কীভাবে?

শুধু গল্পে না, এই হোজারা বাস্তবেও আছে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় একটি জেলায় এক ভদ্রলোকের ছিলো ৯০০ বিঘা জমি, যেখানে তিনি চিংড়ির

ঘের করেছিলেন। পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তার পোস্টিং ছিলো আবার অন্য জায়গায়। দুতিনজন লোককে ব্যবসায়ের কোনো শর্ত ছাড়াই অংশীদার করে তাদের হাতে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন। তারা প্রায়ই বিভিন্ন লোকসানের কথা বলে তার কাছ থেকে টাকা নিতো। এদিকে ব্যবসায়ে ভালো মনোযোগ দেয়ার জন্যে তিনি তার চাকরিটা ছেড়ে যখন সেখানে যান, দেখেন-ঐ লোকগুলো ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সবকিছু নিজেদের দখলে নিয়ে নিয়েছে। চাকরি, ব্যবসা-দুটোই হারিয়ে এখন কোনোরকমে চলে তার সংসার।

আসলে প্রতারিত হওয়ার ঘটনাগুলো কষ্টের, দুঃখের। কিন্তু এর পেছনে প্রতারিতের দোষগুলোও খুব উল্লেখযোগ্য। এক ব্যাংকারের ঘটনা বলি- ব্যাংক থেকে তো বটেই, বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজন সবার কাছ থেকে ধার করে তিনি ১৭ লাখ টাকা দিয়েছিলেন ঘড়ি ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দিয়েছিলো এমন এক লোককে। এমনকি লোকটিকে তিনি ভালো করে চিনতেনও না। শুধু তিনি না, তার দেখাদেখি ঐ অফিসের আরো অনেকে টাকা দিয়েছিলো এই লোকটিকে। লোকটি প্রথম কয়েকদিন লভ্যাংশের নামে কিছু কিছু করে টাকা দিলো। এর কয়েক মাস পরে একদিন লোকটি উধাও। তাকে আর পাওয়া যায় নি। সেই ব্যাংকার এখনো সেই ঋণের ভার বয়ে চলেছেন। তিনি লোভ করেছিলেন। ভেবেছিলেন-পরিশ্রম না করে যদি বসে বসে পাওয়া যায় ক্ষতি কী? আর সেই সাথে দিয়েছিলেন চূড়ান্ত সরলতার পরিচয়-ভালো করে লোকটির খোঁজখবর না নিয়ে।

**প্রশ্ন :** আজকাল যে অবস্থা কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। শোকর আলহামদুলিল্লাহ কোয়ান্টামে সবাইকেই বিশ্বাস করা যায়।

**উত্তর :** এটাও কিন্তু ভুল দৃষ্টিভঙ্গি। কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট বা কোয়ান্টাম মাস্টার হয়ে গেলেই সে ভালো মানুষ, অনন্য মানুষ হয়ে গেছে-এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। একজন কোয়ান্টাম মাস্টার মানে তিনি ভালো মানুষ বা অনন্য মানুষ হওয়ার চেষ্টা করছেন; হয়ে গেছেন এমনটি নয়। কাজেই কেউ নিজেকে কোয়ান্টাম সদস্য পরিচয় দিলেও আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকবেন।

এর মধ্যে অভিযোগ এলো-কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করতে এসে এক প্রতারক প্রথম পরিচয়েই আরেক অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে ব্যবসার নাম করে ৭০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। সাথে সাথে আমরা সেই প্রতারককে



বহিষ্কার করলাম, কিন্তু টাকা তো ততক্ষণে দেয়া হয়ে গেছে। যার খোয়া গেছে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোনো খোঁজখবর না নিয়ে প্রথম পরিচয়েই কেন একজন মানুষকে ৭০ হাজার টাকা দিয়ে দিলেন! বললেন, ভাবলাম একসাথে কোর্স করতে এসেছি। নিশ্চয়ই ভালো মানুষই হবে।

এটা কিন্তু বোকামি। শুধু কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট বা মাস্টার শুনেই কারো হাতে টাকাপয়সা তুলে দেবেন না। লেনদেন করার আগে অবশ্যই তার ব্যাপারে বিস্তারিত জেনে নেবেন—এর আগে সে কার সাথে ব্যবসা করেছে, ব্যবসার ফলাফল কী, কাদের সাথে তার যোগাযোগ ছিলো ইত্যাদি। কারণ আমাদের এখানে অধিকাংশই ভালো মানুষ হওয়ার জন্যে আসেন। কিন্তু দুচারজন যে প্রতারণার উদ্দেশ্য নিয়ে আসে না, সেটা বলা যাবে না। তারা ভাবে যে, এখানে সব ভালো মানুষ, সরল মানুষ। এদের ঠকানো খুব সহজ। আর সে উদ্দেশ্যেই আসা।

আর একটি বিষয় মনে রাখবেন, কোনো কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট বা প্রো-মাস্টারের সাথে অর্থনৈতিক লেনদেন করলে নিজ দায়িত্বে করবেন। কোয়ান্টাম সদস্যদের মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক লেনদেনের দায় ফাউন্ডেশন বহন করে না। পরে কোনো সমস্যা হলে এর সাথে ফাউন্ডেশনকে জড়াবেন না এবং কমপ্লেইন নিয়ে আসবেন না।

**প্রশ্ন :** অপরিচিত ক্ষেত্রেই কি শুধু প্রতারণার ব্যাপারে সাবধান হতে হবে?

**উত্তর :** না, শুধু অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত নয়, প্রতারণার ব্যাপারে সাবধান হতে হবে পরিচিতদের ক্ষেত্রেও। কারণ একজনের সাথে দীর্ঘদিনের পরিচয়, আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব এক জিনিস, আর অর্থনৈতিক লেনদেনে বিশ্বস্ততা আরেক জিনিস। পরিচিতদের দ্বারাও আপনি প্রতারিত হতে পারেন—

একটি ঘটনা এরকম মামুন সাহেব থাকেন ঢাকার অদূরে শহরতলীতে। হঠাৎ রাস্তায় একদিন দেখা তাদের অনেক পুরনো এক ভাড়াটিয়া শফিকের সঙ্গে। প্রায় ১০/১২ বছর আগে শফিকরা মামুন সাহেবদের বাসায় ভাড়া থাকতো। দীর্ঘ পাঁচ বছর ভাড়া থাকার সময় শফিককে একজন শান্ত ভদ্র হাসিখুশি সদালাপী ভালো মানুষ হিসেবেই মনে করতেন মামুন সাহেব। শফিক আলাপে জানালো, সম্প্রতি সে এখানকার জনতা ব্যাংকে অফিসার হয়ে এসেছে। দীর্ঘ আলাপে বললো তার উন্নতি, প্রতিষ্ঠার কথা। শুনে মামুন সাহেব খুশি হলেন। এর মধ্যে একদিন সে বাসায় এসে মামুন সাহেবদের

পরিবারের সবার সাথেও দেখা করে গেল। এতদিন পরে তাকে দেখে তারাও খুব উল্লসিত। কয়েকদিন পর সিঙ্গার শোরুম থেকে একটা ফোন এলো মামুন সাহেবের কাছে। তিনি গিয়ে দেখলেন, শফিক হাসিমুখে বসে আছে। বললো, মামুন ভাই, কিস্তিতে একটা ফ্রিজ কিনবো। একজন জামিনদার লাগবে। এখানে তো আপনারা ছাড়া আমার কেউ নাই। কী করি বলেন তো?

মামুন সাহেব ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলেন, কী করতে পারি? ম্যানেজার বললো, আপনি জামিনদার হলে পুরো দোকান দিয়ে দিতে পারি। আসলে একটা স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় অবস্থান ইত্যাদি কারণে মামুন সাহেবের একটা অন্যরকম গ্রহণযোগ্যতা ছিলো সবার কাছে। একমুহূর্ত চিন্তা করলেন তিনি-শফিক এতদিনের পরিচিত মানুষ। তাছাড়া চাকরিও করে খুব ভালো। আহা বেচারি, কেমন সরল চোখে তাকিয়ে আছে! জামানত কাগজে নির্দিধায় সহ করে দিলেন।

কিন্তু অবাক হওয়ার পালা তারপর। বেশ কয়েকবার ফোন করেও তাকে পেলেন না। ভাবলেন মোবাইল বদল করেছে হয়তো। একমাস পর সিঙ্গার শোরুম থেকে ফোন এলো। কিস্তির জন্যে তাগাদা। কেন? শফিক কোথায়? তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। গিয়ে শুনলেন, এক মাস আগেই সে বাসা ছেড়ে দিয়েছে। কোথায় গেছে কেউ বলতে পারে না। অগত্যা কী আর করা! পরের ১১টা মাস মামুন সাহেবকে গুণতে হয়েছে কিস্তির টাকা। প্রতিমাসের টাকাটা দেয়ার সময়ই তিনি ভাবতেন, এমন বোকামি কেউ করতে পারে! কাজেই পরিচিত হলেই ভাববেন না যে, আপনি নিশ্চিন্ত। ভালো করে খোঁজখবর না নিয়ে সরল মনে কখনো কারো সাথে আর্থিক বিষয়ে জড়িত হবেন না।

**প্রশ্ন :** কেউ যদি আমার সাথে প্রতারণা করে তাহলে সরাসরি প্রতিশোধ নেয়া অথবা স্ট্রোর কাছ থেকে প্রতিদানের অপেক্ষা-কোনটা ভালো হবে?

**উত্তর :** এটা নির্ভর করছে প্রতারণার ধরনের ওপরে। যেমন, আমার কথা বলতে পারি। আমি কখনো কখনো প্রতারিত হয়ে আনন্দিত হয়েছি। কারণ ঘটনাটা থেকে আমি শিখতে পেরেছি। যেমন, একবার মাছ কিনতে গিয়েছিলাম বাজারে। বিয়ের আগে যেহেতু বাজার সদাই করার বালাই ছিলো না, বাজার আমি খুব একটা বুঝতামও না। সেদিন চেষ্টার থেকে রাতে বাসায় যাওয়ার পথে মাছের বাজারে ঢুকতেই দোকানি অল্প দামে গছিয়ে দিলো বিরাট এক মাছ। আর আমিও সস্তায় পেয়েছি ভেবে বেশ তৃপ্ত মনে ফিরলাম।

বাসায় ফিরে আমার সহধর্মিণীর হাতে মাছটা দিতেই উনি বুঝলেন, পচা মাছ এটা। আমরা তখন থাকতাম একটা ফ্ল্যাটের চারতলায়। বাসার পাশেই ছিলো পুকুর। বারান্দা দিয়ে তিনি তখনই মাছটাকে ফেলে দিলেন সেই পুকুরে। সেদিনই আমার শিক্ষা হলো যে, মাছওয়ালার কথা শুনে কখনো মাছ কেনা যাবে না। মাছ কিনতে হবে নিজে দেখে।

ছোটখাটো ব্যাপার হলে শিক্ষা নেয়াটা উত্তম-সতর্ক হয়ে যাওয়া, সেই ভুল আর না করা যাতে দ্বিতীয়বার প্রতারিত না হন। কিন্তু প্রতিশোধ নিতে গিয়ে যদি আইন নিজের হাতে নেন, আপনি আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী হয়ে যাবেন। তাই আইন নিজের হাতে নেবেন না। শান্তির ভার স্রষ্টার ওপরে ছেড়ে দিন।

আর যদি আপনার আইনগত পদক্ষেপ নেয়ার শক্তিসামর্থ্য থাকে তাহলে নেবেন। তবে মনে রাখবেন, কাউকে যদি পানিতে চুবাতে চান তাহলে আপনাকেও কোমর পানিতে নামতে হবে। অতএব যা করবেন ঠান্ডা মাথায়, ভেবেচিন্তে-যা আপনার জন্যে সঙ্গত। প্রতিক্রিয়া হিসেবে, বেশি মাসুল দিতে হতে পারে এমন কোনো কাজ করবেন না।

**প্রশ্ন :** গুরুজী, আপনি বলেছেন সবসময় মানবতার কল্যাণে কাজ করতে। আমি মানুষকে বিশ্বাস করি, উপকার করি। কিন্তু মানুষের দ্বারা অনেক প্রতারিত হয়েছি। প্রতারিত হওয়ার কষ্ট ভুলবো কী করে?

**উত্তর :** মানুষের উপকার করা আর প্রতারিত হওয়া এক নয়। মানবতার কল্যাণে আপনি অবশ্যই কাজ করবেন। কিন্তু প্রতারিত হওয়ার ব্যাপারে সচেতন থাকবেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ প্রতারিত হয় তার ভুলের কারণে, বোকামির কারণে। বোকার মতো সাহায্য করতে গিয়ে মানুষ কীভাবে ভোগান্তির শিকার হয়, তার আরেকটি কারণ ঘটনা শুনুন ভুক্তভোগী মানুষটির নিজের জবানিতে—

‘আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু একদিন বললেন, তার স্ত্রীর একটা চাকরি দরকার। আমি কোনো সাহায্য করতে পারবো কি না। আমি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের একটা উপজেলার টিএনও-এর টাইপিস্ট হিসেবে কর্মরত। আমার মতো একজন ছা-পোষা সরকারি চাকরিজীবীর পক্ষে এ সাহায্য করার কোনো সুযোগ ছিলো না। তাই এড়িয়ে গেলাম।

কিন্তু এর মধ্যে আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় একদিন আমার বাসায় এসে কথায় কথায় বললেন, তিনি সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে চাকরি দিতে

পারেন। কারো চাকরির প্রয়োজন হলে যেন তাকে বলি। আমার তখন মনে পড়লো বন্ধুর স্ত্রীর কথা। বন্ধুর সাথে তার আলাপ করিয়ে দিলাম। বন্ধুকে সে বললো, কিছু টাকার বিনিময়ে একটা চাকরির ব্যবস্থা সে করে দিতে পারবে। বন্ধু রাজি হলো। কিন্তু কয়েকদিন পর আমার আত্মীয়টি বন্ধুর কাছে এক লক্ষ টাকা দাবি করলো। বললো, চাকরিটা কনফার্ম করার জন্যে টাকাটা লাগবে। আমার বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করলো। আমি বললাম, ‘তুমি ভেবে দেখ, ঝুঁকি নেবে কি না। তবে আমার আত্মীয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো। চাকরি না হলে উনি টাকাটা অবশ্যই ফেরত দিয়ে দেবেন।’

আমি আসলে আমার আত্মীয়ের চটকদার কথাবার্তায় বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। লেনদেন হয়ে গেল। আত্মীয়ের কথামতো ঢাকায় এসে আমার বন্ধু টাকাটা তার হাতে তুলে দিলো। কিন্তু চাকরি তো আর হয় না। আজ দেই, কাল দেই করে টাকা ফেরত দেয়ারও আর কোনো আলামত নেই। এদিকে টাকার টেনশনে আমার বন্ধু একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়লো। বাসার লোকজন দৌড়ে এসে বললো, জ্ঞান ফিরে সে যদি টাকাটা দেখতে পায় বা টাকা পাওয়ার নিশ্চয়তা পায়, তাহলে সুস্থ হবে, নইলে হার্ট-এটাক হতে পারে। আমি পড়লাম মহাসংকটে। একদিকে বন্ধুর জীবনসংশয়-আমার সূত্রে পরিচিত হয়ে আমারই আত্মীয়ের প্রতারণার শিকার হয়ে আজ তার এ অবস্থা! অন্যদিকে আমি একজন ছা-পোষা কেরানী। মাসিক পে-স্কেলের ৯,১৬০ টাকা দিয়ে বাসাভাড়া, সংসার খরচ ইত্যাদি সামলাতে গিয়েই নুন আনতে পান্তা ফুরায়। সেখানে এতগুলো টাকা এখন আমি কীভাবে ম্যানেজ করবো!

ছুটে গেলাম আমার অফিস যে ব্যাংকের সাথে লেনদেন করে সেখানে। ম্যানেজার স্যারকে বিপদের কথা খুলে বললাম। ফার্নিচার লোন হিসেবে তিনি এক লক্ষ টাকা দিতে রাজি হলেন। কিন্তু মাসে কিস্তি দিতে হবে ৩,৪২০ টাকা। মাসে যার বেতনই নয় হাজার টাকা, সে কীভাবে সাড়ে তিন হাজার টাকার কিস্তি টানবে-এসব যুক্তি-বুদ্ধির কথা ভাববার সময় তখন ছিলো না। টাকাটা নিয়ে বন্ধুর হাতে দিলাম। সে সুস্থ হলো। কিন্তু আমি আজো বয়ে চলেছি এই ঋণের বোঝা। এর মধ্যে সাতটি কিস্তি খেলাপ হয়েছে। ব্যাংক নোটিশ দিয়েছে-আমার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবে। আমি চেষ্টা করলে চাকরি থেকে অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে ঋণটা শোধ করতে পারি। কিন্তু একটি ক্ষত থেকে আরেকটি নতুন ক্ষত হোক, তা আমি চাই না।

আসলে এই হচ্ছে বোকার মতো সাহায্য করতে যাওয়ার পরিণতি। আপনাকে তো যাচাই-বাছাই না করে অন্যকে বিশ্বাস করতে বলা হয় নি।

আপনি বিশ্বাস করবেন স্রষ্টাকে। বিশ্বাস করবেন নিজেকে। মস্তিষ্কে কাজে লাগাবেন। আপনি যখন মস্তিষ্কে কাজে লাগাবেন, নিয়মিত মেডিটেশন করবেন, আপনার প্রজ্ঞা কাজ করবে। প্রতারিত হওয়া থেকে সবসময় আপনি বেঁচে যাবেন। তখন আর বোকামি হবে না, লোভ কমে যাবে।

আর লোভ কমে গেলেই মানুষ সবসময় প্রতারণা থেকে রক্ষা পায়—অন্যের কল্যাণ করে তার কাছ থেকে প্রতিদান প্রত্যাশা করে না। কারণ প্রতিদান প্রত্যাশা করছেন বলেই নিজেকে প্রতারিত মনে করছেন। আমরা কোয়ান্টাম মেথড কোর্সেই বলি, যার উপকার করবেন সে আপনার ক্ষতি করতে পারে, আপনার বদনাম করতে পারে। কিন্তু আপনি যদি নেক নিয়তে উপকার করে থাকেন, সে উপকার প্রকৃতিতে জমা থাকবে। যখন প্রয়োজন হবে, এমন মানুষের সাহায্য পাবেন—যাকে জীবনে দেখেন নি, চেনেন না। অতএব বুদ্ধি প্রয়োগ করে সামর্থ্যের মধ্যে অন্যের উপকার করবেন।

## শেয়ার বাজার ॥ জুয়া বাজার

**প্রশ্ন :** রিটার্ন করার পর প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ প্রাপ্ত টাকাটা ব্যাংকে রাখতে চাচ্ছি না। কারণ এটা সরাসরি সুদের অন্তর্ভুক্ত। এদিকে বাড়তি কিছু আয় ছাড়া সংসার চালানো সম্ভব নয়। তাই আমি শেয়ার ব্যবসায় জড়িত হতে চাই। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত জানানবেন।

**উত্তর :** আপনি কিন্তু কন্ট্রাডিকশনে ভুগছেন। যদি সুদ নেয়াটা আপনার অপছন্দের হয়, তাহলে শেয়ার বাজার নামের জুয়া বাজারের টাকাকে আপনি কীভাবে হালাল মনে করেন? আসলে শেয়ার ব্যবসা সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

শেয়ার ব্যবসার প্রথম ধাপ হচ্ছে প্রাইমারি শেয়ার। প্রাইমারি শেয়ার হলো—একটি কোম্পানি যখন তার মূলধন সংগ্রহের জন্যে বাজারে শেয়ার ছাড়ে এবং ছোট-বড় বিনিয়োগকারীরা সেই শেয়ার কিনে নিয়মিত ব্যবধানে ডিভিডেন্ড বা লভ্যাংশের ভাগীদার হন। কোম্পানি যদি লাভজনক হয়, যদি অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্ত হয়, আপনার লস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ শেয়ার ব্যবসা বলে যা বোঝে তা হচ্ছে শেয়ার বাজার। আর এই শেয়ার বাজার আসলে জুয়ার বাজার ছাড়া

আর কিছু নয়। এটা আমরা বলে আসছি গত ৩০ বছর ধরে। কারণ এস্ট্রলজি করার সময় আমার যেসব ক্লায়েন্ট শেয়ার বাজারে ছিলেন, তাদেরকে কাছে থেকে দেখেছি। দেখেছি তাদের সর্বস্বান্ত হওয়া। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, কোন শেয়ারটা বাড়বে, কোনটা কমবে। আমি বলতাম, দেখুন, শেয়ার দর নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে হলে তো আমাকে শেয়ার ব্যবসায়ী হতে হবে। কিন্তু শেয়ার বাজারের প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই। কারণ এখানে জিততে হলে মাফিয়া চক্রের অংশ হতে হবে। আর তা হতে না পারলে আপাতত যতই ফুলেফেঁপে ওঠেন, একসময় সর্বস্বান্ত হতে হবে।

কারণ আমার মনে ছিলো তরুণ বয়সে দেখা তিন তাসের খেলার পরিণতি—যেখানে জুয়ার আয়োজকদেরই সবসময় আমি জিততে দেখেছি, সাধারণ জুয়াড়িদের নয়। কিন্তু তাদেরকে কীভাবে প্রলুব্ধ করা হতো তা দেখেছি। হয়তো আয়োজকদেরই একজন খেলছে। তাকে ঘিরে আছে তিন/চার জন, তারাও একই দলের, কিন্তু বাকিরা তা জানে না। ঐ জুয়াড়িকে জিততে দেখে যখন নতুন কেউ এলো তাকে খুব উৎসাহ দিয়ে খেলায় নামানো হলো। প্রথমদিকে সে বেশ কয়েকটা দান জিতেও গেল বা তাকে জেতানো হলো। এরপর হারতে শুরু করলো। কিন্তু যত হারছে, তত তার জেদ বেড়ে যাচ্ছে। সে ভাবতে থাকে—একবার হেরেছি তাতে কী, পরেরবার যদি জিততে পারি এই পুরো হারটা উসূল করে ফেলবো। সে আবার বাজি ধরে এবং একসময় সর্বস্বান্ত হয়ে বিদায় নেয় জুয়ার আসর থেকে। এই পরিণতি তিন তাসের খেলায় যেমন, এখনকার ক্যাসিনোর আসরেও তেমন। ক্যাসিনোতেও জেতে ক্যাসিনোর লোকরাই, সাধারণ জুয়াড়িরা নয়। আর শেয়ার বাজার হচ্ছে এর নব্য সংস্করণ।

এখানে প্রথমে মাফিয়া চক্র নানাভাবে গুজব ছড়িয়ে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার কিনতে থাকে—ফলে সে শেয়ারগুলোর দাম বাড়তে থাকে। ১৯৯৬ সালে এমনও হয়েছে যে, ১০ টাকার শেয়ার ১১ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। দাম বাড়ার একপর্যায়ে সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যে যখন সেই শেয়ার কেনার ক্রেজ সৃষ্টি হয়, তখন মাফিয়া চক্র তাদের শেয়ারগুলো আস্তে আস্তে বিক্রি করে। এভাবে বাড়তি দামে মাফিয়াদের সব শেয়ার যখন বিক্রি হয়ে গেল, তখনই দেখা গেল যে, ধাঁই ধাঁই করে শেয়ারের দাম পড়ে গেল। হাজার হাজার টাকায় কেনা শেয়ারগুলো সব কাগজ হয়ে গেল।

১৯৯৬ সালে যা হয়েছিলো ২০১০ সালেও এর ব্যতিক্রম কিছু নয়। সে সময়ের একটা রিপোর্ট অনেকটা এরকম—বেশ কয়েকদিন ধরেই দেশের

শেয়ার বাজার ছিলো চড়া। বদৌলতে একের পর এক লেনদেন ও সূচক বাড়ার রেকর্ড হতে থাকে। কিন্তু গতকাল শেয়ার বাজারে সম্পূর্ণ উল্টো পরিস্থিতি দেখা গেছে। এদিন ডিএসই'র সাধারণ সূচক ১৪৭ পয়েন্ট পড়ে যায়। সারাদিনে ২৪৪টি কোম্পানির শেয়ার লেনদেন হয়। এর মধ্যে দরপতন ঘটে ১৮১টির। বাড়ে মাত্র ৬৩টি। দিনশেষে ব্রোকারেজ হাউজগুলো থেকে অনেক ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীকে বিমর্ষ অবস্থায় বাড়ি ফিরতে দেখা যায়। মোট লেনদেন হয়েছে ২,৭১০ কোটি টাকার। [প্রথম আলো, ৭ ডিসেম্বর, ২০১০]

একই রিপোর্টের আরেক জায়গায় আছে, 'যারা শেয়ারের দাম কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে ফায়দা লুটতে চায় তারা আন্তর্জাতিকভাবে বুল কার্টেল হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশের শেয়ার বাজারে বর্তমানে এ ধরনের ১০ থেকে ১৫টি কারসাজিকারী চক্র সক্রিয় রয়েছে। এই বুল কার্টেল চক্র ঢাকা শহরের পাঁচ তারকা হোটেলগুলোতে বিভিন্ন কোম্পানির সঙ্গে বৈঠক করে তাদের সম্পদের পুনর্মূল্যায়ন, বোনাস শেয়ার ইস্যু বা রাইট শেয়ার ইস্যুর মতো বিষয়গুলো গোপনে নির্ধারণ করিয়ে নেয়। এসব বিষয়ে কী ঘোষণা দিতে হবে তারও নির্দেশনা দেয় এই চক্র। তাদের নড়াচড়ার ওপরই নির্ভর করে প্রতি সপ্তাহে দেশের শেয়ার বাজার কেমন যাবে। কোন খাতে শেয়ার বেশি কেনাবেচা হবে। এই জালে আটকা পড়ে প্রতিদিনই সর্বস্বান্ত হচ্ছে অনভিজ্ঞ নতুন অনেক ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী।'

অর্থাৎ ক্যাসিনোর মতোই হারজিতের খেলা, চক্রের সহায়তায় সাধারণদের প্রতারিত করা। আবার দেখুন, এই যে ২,৭১০ কোটি টাকার লেনদেনের কথা বলা হলো—এই টাকায় একদিনে কী কাজ হয়েছে? জাতীয় অর্থনীতির কী উপকার হয়েছে? টাকাটা কি কোনো খাতে বিনিয়োগ হয়েছে, না কোনো পণ্য সৃষ্টি করেছে? এ কথাগুলো আমরা গত ৩০ বছর ধরে বিভিন্ন সময় বলে আসছিলাম। এখন তারই পুনরাবৃত্তি করছেন বিশেষজ্ঞরা।

গত ১৭ জানুয়ারি, ২০১১ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয় কম্যুনিষ্ট নেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের লেখা নিবন্ধ—বাংলাদেশের শেয়ার মার্কেট : ক্যাসিনো অর্থনীতিতে জুয়ার বাজার। এতে তিনি বলেন, আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে শেয়ার বাজারের গোটা ব্যাপারটি প্রধানত এক ধরনের ফটকা ব্যবসার ভিত্তির ওপর স্থাপিত ও পরিচালিত। প্রকৃতিগতভাবেই শেয়ার ও স্টক মার্কেটের ব্যবসা এক ধরনের জুয়াখেলার মতো ব্যাপার। এখানে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ ও সংস্থা কর্তৃক নিবন্ধিত বিভিন্ন কোম্পানি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মূলধনের অংশ বা শেয়ার বিক্রির জন্যে বাজারে ছাড়া হয়।

বিনিয়োগকারীদের হাত ঘুরে ঘুরে এসব শেয়ারের কেনাবেচা চলে। কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি-অবনতির সাথে সাথে তার শেয়ারের দাম ওঠানামা করবে, এমনটাই তাত্ত্বিকভাবে হওয়ার কথা। কোম্পানির পারফরমেন্সে উন্নতি ঘটবে অনুমিত হলে বিনিয়োগকারীরা পরে বিক্রি করে আরো বেশি দাম পাওয়ার আশায় চলতি দামে তার শেয়ার কিনে রাখে। শেয়ার বাজারে স্টকের (কিনে রাখা শেয়ারের) দাম ওঠানামা সম্পর্কে মনোগত অনুমানের ওপর ভিত্তি করে জুয়াখেলায় ভাগ্য খুঁজে পাওয়ার আশায় তারা শেয়ারের ‘রাখি ব্যবসায়’ টাকা খাটায়। অনেকটাই ঘোড়দৌড়ের খেলায় ঘোড়ার পেছনে বাজি ধরার মতো ব্যাপার।....

শেয়ার বাজার বহুলাংশেই ক্যাসিনো তথা জুয়ার বাজারের মতো একটি স্থান। রাতারাতি বাজিমাত করার লোভ দেখিয়ে লাখ লাখ মানুষকে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে প্রলুব্ধ করা হয়। সহজে মুনাফা লাভের আশায় লোভে পড়ে পেনশনের টাকায়, ঘর-বাড়ি বিক্রি করে, ঋণ করে-নানাভাবে অর্থ সংগ্রহ করে তারা ছুটে আসে শেয়ার বাজারে। উৎপাদনশীল বিনিয়োগ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে স্থবিরতা চলছে এবং শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে ‘সহজে টাকা কামাই’-এর এই প্রলোভনে মরণঝাঁপ দেয়াটা দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের জন্যে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ‘স্বাভাবিক’ নিয়মেই যখন শেয়ার বাজারে ‘অস্বাভাবিক’ ধস নামে, তখন তাদের পথে বসা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না।

এই পরিণতি নেমে আসে সাধারণ ক্ষুদে বিনিয়োগকারীদের ভাগ্যে। কিন্তু শেয়ার বাজারের বড় বড় চাঁই ও প্রতিষ্ঠানগুলোর অপার আর্থিক সামর্থ্য থাকায় তারা শেয়ার বাজার ধসের সময়ের সংকট উৎরে উঠতে সক্ষম হয়। ফলে ধসের পর শেয়ার বাজার যখন আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে তখন পথে বসা লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে বিনিয়োগকারীর হারানো টাকা এসে জমা হয় এই সব বড়-বড় বিনিয়োগকারীর হাতে।....

গত এক মাসের মধ্যে পর পর দুই দফায় আবার শেয়ার বাজারে রেকর্ড দরপতন ঘটেছে। প্রথম দফায় কয়েকদিনে দেড় হাজার পয়েন্ট এবং পরেরবার প্রায় দুই হাজার পয়েন্ট দরপতন ঘটেছে। শেয়ার বাজারের ৩৩ লক্ষ সাধারণ বিনিয়োগকারীর অধিকাংশই ইতোমধ্যে বিপুল লোকসানের শিকার হয়েছে। মোট লোকসান হয়েছিলো প্রথম দফায় প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় দফায় প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা। ১০ জানুয়ারি এক দিনে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক পড়ে গিয়েছিলো ৬৬০ পয়েন্ট।



দেশের গোটা অর্থনীতি এক ধরনের গোড়ায় গলদ নিয়ে চলছে। শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগের যে বিশাল বিস্তৃতি ঘটেছে, সেই তুলনায় পণ্য ও সেবাখাতে প্রবৃদ্ধি অতি নগণ্য। সুতরাং কোনো বস্তুগত ভিত্তি ব্যতিরেকে অনেকটা কেবলমাত্র হাওয়ার ওপরে শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে চলেছে। এই অবস্থা বাতাসের বুদবুদ অথবা ফোলানো বেলুনের মতো অতি ভঙ্গুর হতে বাধ্য। ইংরেজিতে একে ‘বাবল ইকোনমি’ বলা হয়। এক মুহূর্তের খোঁচায় ফোলানো বেলুনের চূপসে যাওয়ার মতো বাজার সম্পূর্ণ ধসে পড়ে মহামন্দার পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পণ্য ও সেবাখাতে বিনিয়োগের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার বদলে দ্রুত মুনাফার লোভে শেয়ার বাজারে ঢুকে পড়েছে। এর ফলে শেয়ার বাজার জিম্মি হয়ে পড়েছে বড় বড় বিনিয়োগকারীদের হাতে।

জুয়া এমনিতাই ভাগ্যের খেলা, যে খেলা একসময় নেশার টানে পাকা জুয়াড়িকেও পথের ভিখারি বানিয়ে দেয়। তার ওপরে জুয়ার আসরে যদি জোচ্ছুরি থাকে, তাহলে সাধারণ খেলোয়াড়দের সব হারিয়ে ফকির হওয়াটা প্রায় নিশ্চিত একটি ব্যাপার। শেয়ার বাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারীরা অবস্থার ফেরে আজ সেই সর্বনাশা ‘ভাগ্যের খেলার’ অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছে।’ এই বিস্তারিত আলোচনার পর এখন আপনিই ঠিক করুন কষ্টের সঞ্চয়গুলো এই মাফিয়া চক্রের হাতে তুলে দেবেন কি না।

**প্রশ্ন :** সেকেন্ডারি শেয়ার ব্যবসা করতে ইসলামি শরিয়তে বাধা আছে কি না? সেকেন্ডারি শেয়ার ব্যবসায় যদি লাভবান হই, সে আয় বৈধ কি না?

**উত্তর :** এটাতো যারা ফকীহ, মুফতি তারা বলতে পারবেন। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে, সেকেন্ডারি শেয়ার ব্যবসা মানে শ্রেফ জুয়া। জুয়া ইসলামে বৈধ, না অবৈধ তা আপনারা জানেন। জুয়া যদি বৈধ হয়, জুয়ার আয় যদি হালাল হয়, তাহলে এটাও হালাল, এটাও বৈধ। আর যদি জুয়া বৈধ না হয়, তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই।

জুয়াতে বা তিন তাসের খেলায় যেরকম আয়োজকরা জেতে, শেয়ার ব্যবসাতেও সেরকম জড়িত কিছু চক্রই লাভবান হয় আর সাধারণ বিনিয়োগকারীরা সর্বস্বান্ত হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত কম্যুনিষ্ট নেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের একটি নিবন্ধ থেকেই বোঝা যায় এর ভয়াবহতা—

‘বাংলাদেশের শেয়ার বাজারে এখন ইতিহাসের ভয়াবহতম বিপর্যয় চলছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নয় হাজার থেকে নেমে ইতোমধ্যে ছয় হাজারের ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। দৈনিক লেনদেনের পরিমাণ ৩০-৩২ হাজার কোটি টাকা থেকে মাত্র পাঁচ/ছয়শ কোটি টাকায় নেমে এসেছে। দুই মাসে বাজার থেকে মূলধন হাওয়া হয়ে যাওয়ার পরিমাণ ৭০-৭৫ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে।.....

‘বঙ্গবন্ধু রেসখেলা বন্ধ করেছিলেন, শেয়ার বাজার নিয়ে তবে উল্টো পথ কেন’ শীর্ষক এই নিবন্ধে তিনি আরো বলেন, বর্তমানে দেশে সবচেয়ে বড় জুয়াখেলার ক্ষেত্র হলো শেয়ার বাজার। ক্যাসিনো মালিকরা যেমন কাঁচা জুয়াড়ীদের নানা প্রলোভনে আসক্ত করে পাতা ফাঁদে টেনে এনে পয়সা কামাইয়ের ব্যবস্থা করে, শেয়ার মার্কেটের কতিপয় পাকা জোচ্চোরও একইভাবে লোভের ফাঁদ বসিয়েছে। ..... ঘোড়দৌড়ের জুয়ায় যেমন হতো, শেয়ার বাজারের জুয়ার আসরেও তেমনটিই হচ্ছে। মধ্যবিত্ত এমনকি দরিদ্র শ্রেণীর ৩২-৩৩ লাখ মানুষ এই প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে তাদের আয় সঞ্চয় সম্পদ জমিজমা সোনাদানা বিক্রি করে টাকা খাটিয়েছে শেয়ার বাজারে। আর তাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে হাজার হাজার কোটি টাকা কামিয়ে নিচ্ছে স্বল্পসংখ্যক চালবাজ, অসৎ ও মহাধুরন্ধর বিনিয়োগকারী।’

[পাদটীকা : অতএব আপনিই ঠিক করুন, জুয়ায় জড়িয়ে সর্বস্বান্ত হওয়ার জন্যে শেয়ার বাজারে জড়িত হবেন কি না বা সে আয় বৈধ হবে কি না।]

**প্রশ্ন :** শেয়ার বাজারের প্রতি আমার কখনো আগ্রহ ছিলো না। তবে সেদিন কৌতূহলবশত একটা প্রাইমারি শেয়ারের জন্যে আবেদন করেছি এবং সেটা পেয়েও গেছি। এখন এটা নিয়ে কী করতে পারি?

**উত্তর :** প্রাইমারি শেয়ার কিনতে পারেন। আমরা আসলে সতর্ক করছি সেকেন্ডারি শেয়ারের ব্যাপারে যেখানে জুয়াবাজারের মতোই শেয়ারের দাম বাড়ানো-কমানো হয় শুধু বিশেষ কয়েকজনকে লাভবান করার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু প্রাইমারি শেয়ারের ব্যাপারটা এরকম নয়। একটা ভালো কোম্পানির প্রাইমারি শেয়ার যদি আপনি কেনেন, এখন থেকে আপনি লাভ পাবেন। বোনাস শেয়ারও পেতে পারেন। আবার বেশ কয়েকদিন নিজের কাছে রেখে পরে আপনি চাইলে তা বিক্রিও করে দিতে পারেন। সেকেন্ডারি শেয়ারের মতো এটা জুয়াবাজারি নয়।

**প্রশ্ন :** আমার এক ক্লাসমেট আছে খুবই ইমোশনাল। সে একটা চাকরি করেছে। সেখানে এক কলিগের কষ্ট দেখে খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলো। ঐ কলিগ তার সর্বস্ব দিয়ে শেয়ার ব্যবসা শুরু করে। কিন্তু অনেক টাকা লস করলো। ফলে নেমে এলো তার পারিবারিক বিপর্যয়ও। তার বাবার হার্ট-এটাক হলো। টাকার অভাবে ভেঙে গেল তার বোনের বিয়ে। মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে লোকটি একবার আত্মহত্যার চেষ্টাও করলো। এসময় আমার ক্লাসমেট তার পাশে দাঁড়াতে চাইলো। লোকটি কিছু শেয়ার কিনেছিলো একটি নামকরা কোম্পানি থেকে, যেখানে আমার বাবা প্রশাসন প্রধান হিসেবে কর্মরত। আমার ক্লাসমেট আমাকে অনুরোধ করে যে, আমি যেন বাবার সহযোগিতায় ঐ কোম্পানির শেয়ারের কিছু তথ্য যোগাড় করে দেই। কিন্তু আমার বাবার মতো একজন সৎ মানুষকে এভাবে ব্যবহার করার প্রস্তাবকে আমি গ্রহণ করতে পারি নি। বলেছি, প্রথমত, শেয়ারের ব্যাপারে আমার বা আমার বাবার কোনো আগ্রহ নেই। দ্বিতীয়ত, রাইট শেয়ারের কোনো তথ্য এভাবে তার কাছ থেকে নেয়াটা একটা অনৈতিক ও অবৈধ কাজ হবে বলে আমি মনে করি। এর কয়েকদিন পর শুনি লোকটি আত্মহত্যা করেছে। আমার ক্লাসমেট আমাকে ফোন করে বলে তুই যদি তোর বাবার কোম্পানির শেয়ারের তথ্যগুলো দিতি, তাহলে হয়তো লোকটা আত্মহত্যা করতো না। তাকে বাঁচাতে পারতাম। গুরুজী, আসলেই কি তাই? লোকটির আত্মহত্যার জন্যে কি আমি দায়ী? আমার এক্ষেত্রে আর কী করার ছিলো?

**উত্তর :** আপনি তাই করেছেন যা আপনার করা উচিত ছিলো। আপনার সৎ বাবাকে দিয়ে কোনো অসৎ কাজ করান নি। আর শেয়ার বাজারের এই যে পরিণতি-এটা ঘটবেই। এর আগের প্রশ্নোত্তরগুলো থেকে এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনার কাছে সেটা পরিষ্কার হয়েছে।

আসলে কেউ যদি নিজের পায়ে কুড়াল মারে তাকে কেউ বাঁচাতে পারে না। আপনার বন্ধুর যে কলিগের কথা বলছেন, তার মৃত্যুর সমস্ত দায়-দায়িত্ব তার নিজের। আপনার এ ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব নেই। বরং আপনি যদি আপনার বাবার কাছ থেকে তথ্য নিয়ে তাকে দিতেন, সেটা হতো অপরাধ।

# প্রাচুর্যের পঞ্চসূত্র



## প্রাচুর্য কী?

**প্রশ্ন :** আমি প্রাচুর্য চাই। কিন্তু আমার চারপাশের প্রাচুর্যবান মানুষদের অসুখী জীবন দেখে আমি বিভ্রান্ত। তাহলে কি ধনবান হতে চাওয়া ঠিক নয়?

**উত্তর :** আপনার চারপাশের যে প্রাচুর্যবান মানুষের কথা আপনি বলছেন, তারা তথাকথিত প্রাচুর্যবান। আসলে ধনবান হওয়া আর প্রাচুর্যবান হওয়া এক নয়। অর্থাৎ প্রচুর অর্থের মালিক হলেই প্রাচুর্যবান হওয়া যায় না, যদি না সে অর্থ আপনাকে অভাববোধ থেকে মুক্তি দিতে পারে।

আমার পরিচিত এক ব্যবসায়ী ছিলেন, কোটি কোটি টাকার মালিক। একবার বিদেশ থেকে তার ফোন পেলাম। তখন সেখানে মধ্যরাত। আমি প্রশ্ন করলাম, এত রাত, আপনি ঘুমাচ্ছেন না? উত্তরে জানানেন, পরদিন তার একটি বড় কন্ট্রাক্ট সাইন হওয়ার কথা ছিলো, কিন্তু তাতে কিছু সমস্যা দেখা গেছে। তাই টেনশনে তার রাতে ঘুম হচ্ছে না।

সাদরে ইম্পাহানী একবার নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন, 'I am a poor millionaire'.—মিলিয়নিয়ার হওয়ার পরও তিনি নিজেকে দরিদ্রই ভাবছেন।

খ্রিস্টের ধনকুবের এরিস্টটল ওনাসিস, যিনি প্রেসিডেন্ট কেনেডির বিধবা স্ত্রী জ্যাকুলিন কেনেডিকে বিয়ে করেছিলেন। তার এক পুত্র আলেকজান্ডার ওনাসিস, এক কন্যা ক্রিস্টিনা ওনাসিস। পুত্র আলেকজান্ডার ওনাসিস মাত্র ২৪ বছর বয়সে প্লেগ ক্র্যাশে মারা যান। এরিস্টটলের মৃত্যুর পর তার অগাধ সম্পদের ৫৫ শতাংশের উত্তরাধিকারী হন কন্যা ক্রিস্টিনা। ৩৭ বছর বয়সে তিনি তিন বছরের শিশু কন্যাসন্তানকে রেখে আত্মহত্যা করেন। এরিস্টটল ওনাসিসের বিখ্যাত প্রমোদতরী ‘ক্রিস্টিনা’ কিনেছিলেন সৌদি ধনকুবের ও অস্ত্র ব্যবসায়ী আদনান খাসোগী।

আপনি যাদের প্রাচুর্যবান বলছেন তারা এদের মতোই অনেক অর্থ-বিল্ড থাকার পরও অভাবগ্রস্ত। কারণ প্রতিনিয়ত তারা আশঙ্কায় ভোগেন এই বুঝি তার অর্থ কমে গেল, নষ্ট হলো বা হারিয়ে গেল। কারণ প্রাচুর্যের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তারা ধারণ করতে পারেন নি।

প্রাচুর্যের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে এ প্রশঙ্গে ইমাম ইবনে তাঈমিয়া তাঁর ‘মজনু আল ফতোয়া’য় এক চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইমাম তাঈমিয়ার এই উদ্ধৃতিটি অনুধাবন করলে অর্থ এবং প্রাচুর্যের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করতে এবং তথাকথিত প্রাচুর্যবানদের বিভ্রান্তি ও অস্থিরতা বুঝতে পারবেন।

'One should have money with grace so that it is blessed for him. One should not have it with greediness. Money should be like restroom. He should go to it when he needs it. It should never exist in his heart. One should manage his wealth just as he needs his bathroom.'

অর্থাৎ অর্থ সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করলেই তা আমাদের জন্যে আশীর্বাদ হতে পারে। অর্থকে দেখতে হবে প্রয়োজন হিসেবে—অনেকটা বাথরুমের মতো। প্রয়োজনের সময় আমরা বাথরুম ব্যবহার করি কিন্তু সারাক্ষণ এর কথা চিন্তা করছেন, এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অর্থকেও তেমনি দেখতে হবে প্রয়োজন হিসেবে, এর প্রতি মোহগ্রস্ত বা আসক্ত হলে আপনি রোগজর্জরিত হবেন।

**প্রশ্ন :** প্রাচুর্যকে আমরা কীভাবে সংজ্ঞায়িত করবো? প্রচুর ধনসম্পদ অর্জন করলেই কি প্রাচুর্যবান হওয়া যাবে?

**উত্তর :** প্রাচুর্য শুধু অর্থ বিত্ত সম্মান খ্যাতি প্রতিপত্তি নয়। প্রাচুর্য হচ্ছে অভাববোধের অনুপস্থিতি। কারণ সত্যিকার প্রাচুর্য হলো দেহ-মনের এমন একটি অবস্থা—যুক্তিসঙ্গত প্রতিটি চাওয়া যেখানে পাওয়ায় রূপান্তরিত হয় সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায়। সহজবোধ্য বাংলায় প্রাচুর্যকে আমরা বলতে পারি সাফল্যের জোয়ার। অর্থাৎ ক্রমাগত সাফল্য ধরে রাখার ফলাফলই হচ্ছে প্রাচুর্য। আপনি যা-ই ধরছেন তাই যখন সোনা হয়ে যাচ্ছে তখনই আপনি প্রাচুর্যবান। সাফল্য হচ্ছে প্রথম ধাপ, প্রাচুর্য পরবর্তী ধাপ।

আপনি প্রাচুর্যবান কি না, এটা বোঝার জন্যে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে, আপনি দিতে পারছেন কি না। অর্থাৎ দান, সেবা, সৎকর্মে আপনি স্বতঃস্ফূর্ত কি না? কারণ তিনিই দিতে পারেন—যার আছে, যিনি অভাববোধ থেকে, অনিশ্চয়তাবোধ থেকে মুক্ত। আর যদি অর্থকে কুক্ষিগত করে রাখার প্রয়োজন অনুভব করেন, তবে আপনি প্রাচুর্যবান নন।

**প্রশ্ন :** লেখাপড়া শেষ করে গাড়ি-বাড়ির স্বপ্ন দেখতাম। মেডিটেশন করেছিও এজন্যে। তাহলে এখন কি গাড়ি-বাড়ি চাইবো না?

**উত্তর :** লেখাপড়া শেষ করে আপনি যখন মানুষের জন্যে কাজ করবেন, মানুষকে সর্বোত্তম সেবা দেবেন, অর্থ আপনার আসবেই। গাড়ি-বাড়ি এমন

কিছু নয় যে, এটাকে চাইতে হবে। আপনি যদি দক্ষতা সৃষ্টি করেন তাহলে গাড়ি-বাড়ি আপনার এমনিতেই আসবে। কিনলেও গাড়িতে চড়বেন, না কিনলেও গাড়িতে চড়বেন। তাই মনছবি হবে দক্ষতা, মেধাকে সর্বোত্তম কাজে লাগানোর।

যেমন, পাকিস্তানের বাবা ইদি। দাতব্য সংগঠন ‘ইদি ফাউন্ডেশন’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে মানবকল্যাণমূলক কাজের জন্যে যিনি প্রশংসিত। তিনি খুব সাধারণ জীবনযাপন করেন। তার স্ত্রী নার্স ছিলেন। তিনি একটি ছোট দোকান দেখাশোনা করতেন। সেখান থেকে সব ছেড়ে তারা সেবার কাজ শুরু করলেন। বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ালেন।

আজকে অ্যাম্বুলেন্স হিসেবে বাবা ইদির গাড়ির সংখ্যাই সাতশর বেশি। হেলিকপ্টার, এরোপ্লেনকেও তিনি অ্যাম্বুলেন্স হিসেবে ব্যবহার করেন। একবার ডাকাত দল তার বাড়িতে ডাকাতির সিদ্ধান্ত নিলো। কিন্তু গিয়ে দেখলো খাটিয়া, বালিশ আর কিছু হাঁড়ি-পাতিল ছাড়া আর কিছুই নেই। ডাকাতরা আর কী করবে? মনের দুঃখে সবকিছু ভেঙেচুরে চলে গেল। অর্থাৎ যারাই সেবা করার উদ্দেশ্যে কাজ করেছেন, তারা হয়তো স্বেচ্ছায় সাদামাটা জীবনযাপন করতে পারেন, কিন্তু তাদের অর্থের অভাব হয় না।

**প্রশ্ন :** অর্থ, প্রাচুর্য—একটি কি আরেকটির পূর্বশর্ত। নাকি কোনো সম্পর্ক নাই?

**উত্তর :** আসলে শুধু অর্থই প্রাচুর্য নয়। কিন্তু অর্থ ছাড়াও প্রাচুর্য হয় না। প্রাচুর্য আসতে হলে আপনার প্রয়োজনের সময় অর্থ আসতেই হবে। প্রাচুর্য হচ্ছে আপনি যা চান সেটা পাওয়ার জন্যে আপনার যা যা প্রয়োজন, যা যা উপকরণ দরকার সেটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসতে থাকা। অর্থাৎ শুধু অর্থ প্রাচুর্য সৃষ্টি করে না। আবার অর্থ ছাড়াও প্রাচুর্য হয় না।

**প্রশ্ন :** আপনি বলেছেন, অর্থের মোহে অভাব সৃষ্টি হয়। আবার অর্থ নেই মানে প্রাচুর্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা। এই দুইয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্য কী?

**উত্তর :** একটি হচ্ছে নেই; আরেকটি হচ্ছে, থেকেও নেই। কেউ অর্থ নেই বলে অভাব বোধ করছেন, আবার কেউ অর্থ থাকার পরও অভাব বোধ করছেন। থেকেও কীভাবে না থাকে এ নিয়ে অনেক মজার ঘটনা রয়েছে। আমাদের এক পরিচিতজন—যিনি একাধারে সুরকার, গীতিকার এবং গায়ক



ছিলেন। পেশায় ব্যাংকার। ৭৪ সালে মরিচের অভাব সৃষ্টি হলো। তিনি মরিচ কিনে অফিসে রেখে দিতেন। প্রতিদিন বাসায় আসার সময় চার/ পাঁচটা সাথে করে নিয়ে আসতেন। তার ভয় ছিলো, এত দামের মরিচ বাসায় রাখলে সবাই খেয়ে ফেলবে। তিনি তার স্ত্রী এবং ছেলে মিলে তিনজন হলেও সবসময় কলা কিনতেন দুটো করে। মৃত্যুর সময় অনেক ব্যাংক ব্যালেন্স রেখে গেছেন ঠিকই কিন্তু সে অর্থ তার কোনো কাজে আসে নি।

আসলে অর্থের প্রতি যখন মোহ সৃষ্টি হয় তখন কেউ আর সে অর্থ খরচ করতে পারে না। ধনীরা যখন প্রচুর পয়সা দিয়ে কিছু কেনে, তা নিজের জন্যে কেনে না, বিনিয়োগের জন্যে কেনে। অর্থের মোহ যখন সৃষ্টি হয় জীবন তখন অর্থহীন হয়ে যায়। এটি প্রাচুর্য নয়।

আরেক পরিচিতজনের ঢাকায় ১১টা বাড়ি। এখন থেকে ১৫ বছর আগে মাসে বাড়িভাড়াই পেতেন সাত/ আট লক্ষ টাকা। অথচ টাকা খরচ হয়ে যাবে ভয়ে তিনি একটা ভালো স্যান্ডেলও পরতে পারতেন না। এত অর্থ, কিন্তু তার কোনো কাজে আসছে না। একজনের প্রচুর অর্থ থাকার পরও অর্থ নেই মনোভাব, আর যার নেই তার তো নেই-ই। এখানেই দুটোর পার্থক্য।

**প্রশ্ন :** প্রাচুর্যের জন্যে একজন মানুষের কী পরিমাণ অর্থ থাকা প্রয়োজন?

**উত্তর :** যে পরিমাণ অর্থ থাকলে সে অভাববোধ করবে না-সে পরিমাণ।

**প্রশ্ন :** আমার ভাইয়ের দৃষ্টিতে প্রাচুর্য মানেই অর্থপ্রাপ্তি। এই ধরনের মানুষকে কীভাবে বোঝানো যায় যে অর্থই জীবনের সবকিছু না?

**উত্তর :** এটা খুব কঠিন। যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুর ক্লাস্তিকর দিক, অর্থের নেতিবাচক দিক, অর্থাৎ অতিরিক্ত অর্থের অর্থহীনতা উনি নিজে না বুঝবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কেউ বোঝাতে পারবে না। অর্থাৎ অর্থের প্রয়োজন আছে, কিন্তু অতিরিক্ত অর্থ যে নিজের জন্যে অর্থহীন এটা যতক্ষণ পর্যন্ত উনি নিজে না বুঝছেন কারো পক্ষেই বোঝানো সম্ভব নয়।

**প্রশ্ন :** দক্ষতার যথাযথ মূল্যায়ন না হলে সততা দিয়ে কি জীবনযাপন করা যায়? একজন সরকারি কর্মচারী যদি আট হাজার টাকা বেতন পান যা দিয়ে জীবনযাপন কষ্টকর, তিনি কি সততা দিয়ে প্রাচুর্যবান হতে পারবেন?

**উত্তর :** আমরা মনে করি, সরকারি এই বেতন কাঠামো বদলানো উচিত। বেতন কাঠামো হতে হবে যুক্তিসঙ্গত—যাতে একজন সরকারি কর্মচারী চাকরির টাকা দিয়ে ভদ্রভাবে জীবনযাপন করতে পারেন। যদি তা না হয় তাহলে দেখা যাবে যে, তিনি হয়তো দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছেন। কারণ তাকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, কিন্তু অর্থ দেয়া হয় নি। অর্থ উপার্জনের জন্যে তখন তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারেন। তবে দুর্নীতি করে অর্থবিস্ত হতে পারে, কিন্তু দুর্নীতি করে প্রাচুর্যবান হওয়া যায় না।

**প্রশ্ন :** আমার টাকা আছে, কীভাবে এটা সম্পদে রূপান্তরিত করতে পারি? সহজ উপায় বলবেন।

**উত্তর :** অর্থকে সম্পদে রূপান্তরিত করার উপায় হচ্ছে একে সেবায় নিয়োগ করা। একজন মানুষ যেকোনো ভাবে অর্থ-হাসিল করতে পারে। প্রতারণা করে, ছিনতাই-রাহাজানি করে বা ঘুষ খেয়ে সে অনেক টাকার মালিক হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যে অর্থ সেবার বিনিময়ে আসে নি তা কখনোই সম্পদে রূপান্তরিত হয় না।

যেমন, সন্ত্রাসী এরশাদ শিকদার প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলো। কিন্তু তার অবস্থা কী দাঁড়ালো? আজ তার সন্তানেরাও তাদের বাবা যে এরশাদ শিকদার—এটা স্বীকার করতে চায় না। খুলনায় তার বাড়ি স্বর্ণকমলের সাইনবোর্ডও তারা উঠিয়ে নিয়েছে। একইভাবে সন্ত্রাসী মুরগি মিলন বলেন, টোকাই সাগর বা ডাকাত শহীদ-কারোরই কোটি কোটি টাকা তাদের কোনো উপকার করতে পারে নি। সম্পদ অপহরণ করে যদি পাহাড় গড়েন সেই অর্থ আপনাকে কোনোদিন তৃপ্তি দিতে পারবে না, বরকত দিতে পারবে না। দিতে পারবে না খ্যাতি সম্মান কিছুই। আপনি আপনার টাকা সেবায় নিয়োগ করুন, সম্পদে রূপান্তরিত করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে এটি।

**প্রশ্ন :** সম্মান ও সম্পদ একই না আলাদা?

**উত্তর :** সম্পদ বলতে যদি শুধু অর্থকেই বোঝানো হয়, তাহলে বলতে হবে এই সম্পদ এবং সম্মান এক নয়। কারণ অনেক অর্থ থাকার পরও একজনের সম্মান না-ও থাকতে পারে। আবার প্রচুর অর্থ নেই, কিন্তু সম্মান আছে এমনও হতে পারে। কিন্তু সম্পদ মানে শুধু অর্থ নয়। সম্পদ যেকোনো

জিনিস হতে পারে—একটি ভালো কথা সম্পদ হতে পারে, ভালো আচরণ সম্পদ হতে পারে। যে কথা মানুষের জীবনে কল্যাণ নিয়ে আসে, সেটি কি সম্পদ নয়? ‘রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন’—এ কথাটি কি সম্পদ নয়? আবার অর্থকে ভালো কাজে ব্যবহার করা হলে তা-ও সম্পদ। অর্থাৎ যখন মেধা সেবায় রূপান্তরিত হয় তখন সম্পদ বাড়ে। সে সম্পদ সুনাম হতে পারে, দোয়া হতে পারে, অর্থ হতে পারে, সহায়-সম্পত্তি হতে পারে।

## প্রাচুর্য ও ধর্ম

**প্রশ্ন :** আমাদের সচ্ছলতা ও প্রাচুর্য দ্বারা কী ধরনের সচ্ছলতা ও প্রাচুর্য বোঝানো হচ্ছে? আর্থিক বা জাগতিক, আত্মিক বা পরমাত্মিক?

**উত্তর :** আসলে সব ধরনেরই। কারণ এই পৃথিবীতে আপনার দেহ ছাড়া আত্মার কোনো মূল্য নেই, আবার আত্মা ছাড়া দেহের অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ জাগতিক এবং আত্মিক—দুই জগতেই প্রাচুর্য দরকার। আমরা যে প্রাচুর্যের কথা বলছি সেটা দুই জগতেরই প্রাচুর্য। কারণ আমাদের প্রাচুর্য হচ্ছে সৎ প্রাচুর্য—আমরা মেধাকে সেবায় রূপান্তরিত করছি, বিনিময়ে প্রাচুর্য আসছে।

**প্রশ্ন :** প্রকৃত প্রাচুর্য কী হওয়া উচিত?

**উত্তর :** প্রকৃত প্রাচুর্য হচ্ছে হৃদয়ের প্রাচুর্য। মহামানবদের যে প্রাচুর্য ছিলো, সেই প্রাচুর্য—সার্বজনীন ভালবাসা, সবার প্রতি মমতা। তাদের কোনো অভাব হয় নি, তারা সবসময় অভাবমুক্ত ছিলেন। আসলে যত আপনি বিলিয়ে দিতে পারবেন, তত আপনার প্রাচুর্য বাড়তে থাকবে। যত কুক্ষিগত করে রাখতে চাইবেন, তত আপনার প্রাচুর্য কমতে থাকবে, অভাব বাড়তে থাকবে। তাই হৃদয়টাকে বড় করতে হবে। বিশ্বজনীন মমতা ধারণ করতে হবে। আর তখন আপনার প্রাচুর্যের কোনো অভাব হবে না।

**প্রশ্ন :** নবীজী (স) এবং আসহাবে সুফফারা কি প্রাচুর্যে মণ্ডিত ছিলেন? সেটা কি পারলৌকিক জীবনে অনন্ত আনন্দলোকের প্রাচুর্য, নাকি ক্ষণস্থায়ী জাগতিক প্রাচুর্য? কোন ধরনের প্রাচুর্য সত্যিকার অর্থে কাম্য? জাগতিক এবং পারলৌকিক প্রাচুর্যের সমন্বয়ে আপনার নির্দেশনা কী?

**উত্তর :** নবীজী (স) এবং আসহাবে সুফফারা প্রাচুর্যবান ছিলেন না—এটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। জীবনের শেষ দশকে নবীজী (স) একটি রাষ্ট্রের কর্ণধার ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদান অর্ধ পৃথিবীর শাসক ছিলেন। তাঁরা কি দরিদ্র ছিলেন? হযরত ওমরের সময় পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিলো। নবীজীর (স) সাহাবীরাই এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন। তারা কেউ কিম্ব গরিব ছিলেন না। তারা সম্পদের অপব্যবহার করেন নি—সাধারণ মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করেছেন। যারা নবীজী (স) এবং তাঁর সাহাবীদের গরিব বলেন, তারা আসলে ইতিহাস সম্পর্কে জানেন না বা জানলেও ভুল ধারণা পোষণ করেন। অনেকে ভাবেন, গরিব বানাতে বোধ হয় তাঁদের মাহাত্ম্য বাড়বে। আসলে তা নয়।

দুনিয়াতেও তারা গরিব ছিলেন না, আখেরাতেও তাঁরা প্রাচুর্যবান হবেন। সূরা ইব্রাহিমের ২৭ আয়াতে বলা হয়েছে—আল্লাহ বিশ্বাসীদের দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় স্থানেই প্রতিষ্ঠা দান করেন। অতএব আখেরাতে ভালো থাকার জন্যে দুনিয়াতে গরিব থাকার কোনো প্রয়োজন নেই—এ সত্যটি মহামানবরা তাদের জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। আপনি যদি নবীজীর (স) অনুসারী হন, দুনিয়াতেও আপনাকে প্রাচুর্যবান হওয়ার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। একজন বিশ্বাসী মানুষের দুনিয়ার সাফল্য তার আখেরাতের সাফল্যকে বাড়িয়ে দেয়। কারণ তিনি জানেন সম্পদ কীভাবে কাজে লাগাতে হয়।

**প্রশ্ন :** অনেকে বলে, প্রাচুর্য এলে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়, এটা কি ঠিক?

**উত্তর :** দারিদ্র ও কুফরের কাছাকাছি, অভাব ও কুফরের কাছাকাছি। আপনার যদি খাবারের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে তো নামাজেও মন বসবে না। আসলে যে আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার, সে প্রাচুর্য এলেও ভুলে যাবে, দরিদ্র থাকলেও ভুলে যাবে। সব দরিদ্র ব্যক্তি কি আল্লাহকে সবসময় স্মরণ করছে? তাই প্রাচুর্য এলে আল্লাহকে ভুলে যায়—কথাটি সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

**প্রশ্ন :** ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি ধার্মিক হতে হলে, ভালো মানুষ হতে হলে গরিব থাকতে হবে। ধনী হলে আল্লাহকে পাওয়া যাবে না—এটা কি ঠিক?

**উত্তর :** না, এটা ভ্রান্ত ধারণা; এটা জাহেলিয়াত। নবী-রসুলরা কি গরিব ছিলেন? হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যখন কোরবানি দিতে বলা হলো—প্রথমে

তিনি ১০০ দুশ্বা, পরে ১০০ উট কোরবানি দিয়েছিলেন। ১০০ উটের দাম এখন কমপক্ষে দুই কোটি টাকা। দুই কোটি টাকা যিনি একদিনে ব্যয় করতে পারেন তাকে কি গরিব বলা যায়? প্রথম জীবনে রসুলুল্লাহ (স) সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। আর মক্কা বিজয়ের পর আরবের অধিপতি হন তিনি। হযরত ওমর অর্ধেক পৃথিবীর শাসক ছিলেন। তাঁরা কি ধার্মিক ছিলেন না?

মুনি-ঋষিরা আশ্রমে থাকতেন বলে কি তাঁরা গরিব ছিলেন? তখনকার দিনে আশ্রমগুলো ছিলো একেকটি বিশ্ববিদ্যালয়-জ্ঞানার্জনের পীঠস্থান। অশ্বমেধযজ্ঞে সহস্র ঘোড়া বলিদানের বিবরণ পাওয়া যায়। রঘুপতি রাঘব রাজা রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজা ছিলেন, মহামতি বুদ্ধ রাজকুমার ছিলেন। যারা ধ্যানের পথে আসেন, সৃষ্টির সংযুক্তির পথে আসেন তারা কখনো দরিদ্র থাকেন না। তারা বিলাসিতা করেন নি, তাদের সম্পদ মানুষের জন্যে বিলিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তারা দরিদ্র ছিলেন না।

এক্ষেত্রে আমরা বোখারী শরীফের একটি হাদীস স্মরণ করতে পারি-‘দুই ব্যক্তিকে তুমি ঈর্ষা করতে পারো-আল্লাহ যাকে জ্ঞান দান করেছেন এবং যিনি এই জ্ঞান সৃষ্টির সেবায় বিতরণ করেন। আর আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন এবং যিনি সৃষ্টির কল্যাণে এই সম্পদ ব্যয় করেন।’ অর্থাৎ সম্পদশালী হওয়া ও সৃষ্টির কল্যাণে সে সম্পদ ব্যয় করা ঈর্ষণীয় বিষয়। অতএব ধার্মিক হতে হলে গরিব থাকতে হবে-এ ধারণা একেবারেই ভুল।

## প্রাচুর্যের প্রক্রিয়া

**প্রশ্ন :** বর্তমান প্রেক্ষাপটে এবং আমার অবস্থানে বৈধ পথে কীভাবে প্রাচুর্যের অধিকারী হতে পারি?

**উত্তর :** আমরা আগেই বলেছি, অবৈধ পথে অর্থ আসে, প্রাচুর্য আসে না। প্রাচুর্য আসতে হলে বৈধ পথে এবং সেবার মাধ্যমে আসতে হবে। আমরা সবসময় বাস্তবতার দোহাই দেই, প্রেক্ষাপটের দোহাই দেই। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, নির্বোধ এবং আহাম্মকরাই বাস্তবতার দোহাই দেয়। বুদ্ধিমান মানুষ, আত্মবিশ্বাসী মানুষ সবসময় বাস্তবতা নির্মাণ করে।

যেমন ধরুন, আমরা যখন বান্দরবানের লামায় কোয়ান্টাম শিশুকানন শুরু করলাম তখন অনেকেই বললেন, বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে এটি চালানো অসম্ভব।

এর জন্যে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা আমরা যোগাড় করতে পারবো না। আমরা বললাম, পারবো। যখন সবাই প্রশ্ন করলো, অর্থ আসবে কোথেকে?—আমরা মাটির ব্যাংক দেখিয়ে দিলাম। অনেকে হাসাহাসি করলো। এখন বাস্তবতা হলো—মাটির ব্যাংক থেকে সংগৃহীত অর্থ দিয়েই এক যুগ ধরে শিক্ষকানন চলছে। শিক্ষকাননের শত শত সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষকে আলোকিত মানুষরূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বছরে কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ের জন্যে আল্লাহর রহমতে আমাদের কারো কাছে হাত পাতে হয় নি।

আমরা যখন ব্লাড প্রোগ্রাম করলাম তখনো তারা বললেন, এটি স্ব-অর্থায়নে সম্ভব নয়। ২০১২ সাল পর্যন্ত কোয়াটাম রক্তদান কার্যক্রম সোয়া চার লাখ ইউনিট রক্ত এবং রক্ত উপাদান সরবরাহ করেছে। আমাদের ব্লাড প্রোগ্রাম এখন স্বনির্ভর ব্লাড প্রোগ্রাম। এর নামই হচ্ছে প্রাচুর্য-প্রয়োজন সৃষ্টি হলে সেটি পূরণ করার মতো অর্থ চলে আসা। আমরা বিশ্বাস করেছি এবং সেই সাথে প্রচেষ্টা চালিয়েছি—যে কাজগুলো করা দরকার সেগুলো করেছি। অতএব, প্রেক্ষাপট এবং অবস্থানকে কখনো দোষারোপ করবেন না। আপনি সাফল্যের পঞ্চসূত্র অনুসরণ করুন। প্রাচুর্যের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়ে যাবে।

**প্রশ্ন :** সবার পক্ষেই কি প্রাচুর্যবান হওয়া সম্ভব? হলে কীভাবে?

**উত্তর :** নিশ্চয়ই সম্ভব। প্রাচুর্যের ব্যাপারে আমাদের মৌলিক ভ্রান্তি হচ্ছে, আমরা একে অতিরিক্ত প্রাপ্তি মনে করি। স্বাভাবিক অধিকার মনে করি না। অথচ প্রাচুর্য হচ্ছে প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। প্রতিটি মানুষ প্রাচুর্যের উৎসভান্ডার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গি তাকে প্রাচুর্যবান রাখে অথবা নিঃস্ব করে। একটি শিশুর কিন্তু কোনো অভাব নেই। সে সবসময় হাস্যময়। যা পাচ্ছে, যতটুকু পাচ্ছে তাতেই সে তৃপ্ত। তার কোনো অভাববোধ নেই। কিন্তু সেই শিশু প্রাচুর্যবান থাকতে পারে, আবার নিঃস্বও হয়ে যেতে পারে যদি তার কর্ম এবং দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক না হয়।

প্রাচুর্যবান হওয়ার প্রক্রিয়া হচ্ছে মেধাকে সেবায় রূপান্তরিত করা। এ প্রসঙ্গে মার্কিন ধনকুবের হেনরি ফোর্ডের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য—'Wealth like happiness is never attained when sought after directly. It always comes as a by-product of providing a useful service'. অর্থাৎ সম্পদ আসে সবসময় বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে। যখন প্রয়োজনীয় সেবা দেয়া যায়, স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই সম্পদ অর্জিত হয়।

যারা প্রবীণ আছেন, ঢাকায় থাকলে আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, এখন থেকে ৪০ বছর আগে নবাবপুর রোড দিয়ে হাঁটা যেত না। ঘটনা কী? লাইন দিয়ে লোকজন সাবান কিনছে। কী সাবান? পচা সাবান। নামে পচা হলেও কাজে অন্য সাবানের চেয়ে ভালো। আর তা কেনার জন্যে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত লাইন দিয়ে থাকতো মানুষ। যে একবার কিনেছে সে আবার যেত কেনার জন্যে। আশেপাশে আরো কয়েকটি সাবানের কারখানা থাকলেও ক্রেতারা এখানেই ভিড় করতো। কারণ তাদের সাবান ছিলো গুণে-মানে ভালো। কাপড় পরিষ্কার হতো। দামও যুক্তিসঙ্গত। যা অন্য সাবানে ছিলো না। যেহেতু তারা সেবা দিতে শিখেছিলো, তাই এই কারখানার মালিকের প্রাচুর্যও এসেছে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততায়।

মেধাকে সেবায় রূপান্তরের আরেকটি উদাহরণ টাটা গ্রুপ। প্রথমে টাটার শুধু লোহা ছিলো। এখন লোহা বা গাড়ি না, লবণ থেকে শুরু করে চিনি চা খাবার আটা সব আছে। টাটারটা খেয়ে, টাটায় চড়ে, টাটারটাতে ঘুমিয়ে, টাটায় পরে আপনি মারা যেতে পারবেন। যত সেবা বাড়ছে, তত সম্পদ বাড়ছে। অর্থাৎ সম্পদশালী বা প্রাচুর্যবান হওয়ার প্রক্রিয়া হচ্ছে—মেধাকে সেবায় রূপান্তরিত করা।

আসলে সেবক মানেই দাতা, যিনি সেবক হয়েছেন, তার প্রাচুর্যের কোনো অভাব হয় না। হতে পারে না। অতএব আপনি আপনার মেধাকে সেবায় রূপান্তরিত করুন। আপনি প্রাচুর্যে অবগাহন করবেন।

**প্রশ্ন :** মেধা কী? কীভাবে তা অর্জন করা যায়, ব্যাখ্যা দিলে কৃতজ্ঞ হবো।

**উত্তর :** মেধা ও প্রতিভা হচ্ছে বিশুদ্ধ সম্ভাবনা। প্রত্যেকেরই কিছু কিছু ব্যাপারে সহজাত আগ্রহ থাকে, কিছু কিছু কাজ করতে ভালো লাগে। এই আগ্রহ যেমন স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে আবার অনুপ্রেরণাজাত হতে পারে। এটাই একজন মানুষের গুণ বা বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হয়। এই গুণ বা বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে মেধা। অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো কাজ বা বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ করাটাই হচ্ছে ঐ বিশেষ ব্যাপারে তার মেধা।

এটাকে যখন মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা হবে তখন সেটা সেবায় রূপান্তরিত হবে। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই অফুরন্ত মেধা সুপ্ত আছে। স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ বা অনুপ্রাণিত হয়ে এটি বিকশিত হতে পারে। আর ক্রমাগত অনুশীলনে যা অর্জন হয় সেটা হচ্ছে দক্ষতা।

**প্রশ্ন :** মেধাকে সেবায় রূপান্তর করার ধারণাটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। বুঝাবো কীভাবে যে, মেধা সেবায় রূপান্তরিত হচ্ছে? করবোই বা কীভাবে?

**উত্তর :** আসলে সেবা করা খুব সহজ। ধরুন, আপনি স্ট্যাম্প সংগ্রহ করতে ভালবাসেন। যখন শুধু নিজে সংগ্রহ করছেন তখন এটা আপনার শখ থাকছে। কিন্তু ধরুন, একই ধরনের স্ট্যাম্প আপনার ১০টা আছে। সেগুলোকে আপনি অন্যদের মাঝে বিতরণ করার ব্যবস্থা করলেন এবং বিনিময়ে কিছু অর্থ পেলেন। আপনি সেবা দিলেন এবং তারা আপনার সেবার প্রতিদান দিলো।

এটাই হচ্ছে মেধাকে সেবায় রূপান্তরিত করা-যা প্রাচুর্য আনে। তাই সবসময় খুঁজতে হবে যে, আমার মেধাটা কোথায়, কোন কাজটা আমি ভালো করতে পারি। সেই কাজেই আপনার প্রাচুর্য আসবে। এখন পৃথিবীতে সবাই যদি এমবিএ হয়ে যায়, সবাই যদি ডাক্তার হয়ে যায় তো রোগী কোথায় পাওয়া যাবে? সবাই কোনোদিন এমবিএ হবে না, ডাক্তার হবে না, ইঞ্জিনিয়ার হবে না। আর তার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু সবাই নিজস্ব কিছু মেধা আছে, যা সে অনায়াসে সেবায় রূপান্তরিত করতে পারে।

**প্রশ্ন :** মেধাকে সেবায় রূপান্তর করার নির্ধারিত পেশাগুলোর নাম বললে ভালো হয়। আমি এ ব্যাপারে কিছুটা দ্বিধাস্থিত এজন্যে যে, সকল পেশায় সরাসরি সেবার সুযোগ পাওয়া যায় না।

**উত্তর :** আসলে প্রত্যেকটি পেশাতেই সেবাদানের সুযোগ রয়েছে। যেখানে আপনার যে কাজটুকু করা প্রয়োজন সেই কাজটুকু আরেকজন মানুষকে কষ্ট না দিয়ে যদি আপনি করে দেন-এটাই হচ্ছে সেবা।

আপনি যদি কম্পিউটার টেকনিশিয়ান হন, যে কাজটি দুমিনিটে করে দেয়া সম্ভব, সেটা দুমিনিটে করুন। যদি ওয়ার্কশপে না নিয়ে তখনই কাজ করে দিতে পারেন, তা-ই করুন। টেস্ট করতে হবে বলে নিয়ে গিয়ে দুইদিন এমনিই ফেলে রাখলেন। পরে মাত্র তিন মিনিট কাজ করে দাবী করলেন অনেক বেশি-এটা সেবা হলো না, শোষণ হলো।

কাস্টমসের একজন ইন্সপেক্টর আমাকে একদিন বললেন, গুরুজী, লজ্জায় বলতে পারি না। আমি বললাম, কী? তিনি বললেন, আমার রুজি তো হালাল হয় না। বেতন যা পাই, তা দিয়ে তো খাওয়ার খরচই ওঠে না। বাকি সব মিটেবে কী করে! কাজেই উপরি নিতেই হয় বাধ্য হয়ে। বুঝলাম, তিনি একটা



রুঢ় বাস্তবতার কথা বলছেন। এক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি এটাই হতে পারে যে, আপনি যে চাকরিই করেন না কেন ফাইলটাকে আটকে রাখবেন না। ফাইল ছেড়ে দিন। আপনি তাকে কষ্ট দিলেন না। তারপর যদি খুশি হয়ে কেউ কিছু করে সেটা অন্য কথা।

যদি ডাক্তার হন-প্রত্যেক রোগীকে সময় দিন, তার সাথে সদ্যবহার করুন, তাকে আশার বাণী শোনান। ফি দিতে পারছে না বলে কাউকে ফিরিয়ে দেবেন না। শিক্ষক হলে প্রতিটি ক্লাসে সময়মতো উপস্থিত হোন, ছাত্রছাত্রীদের দিকে মনোযোগ দিন, সবার ওপরে স্থান দিন জ্ঞান বিতরণকে।

অর্থাৎ সেবা কোনো সংকীর্ণ ব্যাপার নয়। প্রতিটি পেশায় সেবার সুযোগ আছে। কারণ প্রতিটি পেশাই জন্ম নিয়েছে মানুষের কোনো না কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্যে। অতএব আপনি যে পেশাতেই থাকুন, সে পেশার মাধ্যমে যেটুকু উপকার করা সম্ভব, পূর্ণ মমতা ও আন্তরিকতা নিয়ে তা করুন। আপনার জীবন পরম করুণাময়ের আশীর্বাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

**প্রশ্ন :** আমি একজন সংগঠক। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত। দেশের উন্নয়নে ও কল্যাণে অবদান রাখতে চাই, আবার নিজেও প্রাচুর্যে থাকতে চাই। আমার করণীয় কী হওয়া উচিত?

**উত্তর :** আসলে আপনি যে কাজটা করছেন-এ কাজ করে কখনো আর্থিক প্রাচুর্যে থাকা যাবে না। নবী-রসুলরা প্রাচুর্যবান হয়েছিলেন কারণ তারা মানুষের সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকেই পরিবর্তন করেছিলেন। জীবনকে তারা গ্রহণ করেছিলেন পরিপূর্ণভাবে। সামাজিক সংগঠনে আমরা কী করি? মাঝে মাঝে বসি, একটু গল্প করি, ভালো কথা বলি-এর মাধ্যমে অবদান রাখা এবং প্রাচুর্যবান হওয়া দুটোই কঠিন। নাম বা পরিচিতি হতে পারে কিন্তু সংগঠনের টাকা আত্মসাৎ করা ছাড়া বিত্তবান হওয়ার কোনো রাস্তা দেখছি না। যদি আর্থিক প্রাচুর্য চান তাহলে আর্থিক কর্মকাণ্ডে আপনাকে জড়িত হতে হবে।

**প্রশ্ন :** প্রাচুর্যের প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের পথে একজন সাংবাদিক বা আইনজীবী হিসেবে আমার করণীয় কী?

**উত্তর :** খুব সহজ। সাংবাদিক হিসেবে আপনার যে মেধা আছে, আইনে আপনার যে মেধা আছে এটাকে সর্বোত্তম সেবায় রূপান্তরিত করুন। অনেক

আইনজীবী আছেন তার সাথে দেখা করতেও এক লাখ টাকা লাগে! উনি কোর্টে আপনার জন্যে লড়বেন না, তারপরেও এক লাখ টাকা দিতে হবে তার পরামর্শটুকু নেয়ার জন্যে। আর এখন যে পরিমাণ মামলা-মোকদ্দমা! আপনি তো সোনার খনির ওপরে আছেন। সিদ্ধান্ত নিন নীতিগতভাবে এমন কেস নেবেন, যেটা আসল। কোনো ধর্মকের কেস নেবেন না, খুনির কেস নেবেন না। যে মজলুম তার পক্ষে আপনি আইনের জ্ঞান প্রয়োগ করুন, কোনো নিরপরাধ যেন শাস্তি না পায়।

**প্রশ্ন :** আপনি বলেছেন মেধাকে সেবায় রূপান্তর করতে এবং সেবা দিয়ে সম্পদ অর্জন করতে। প্রশ্ন হচ্ছে, বাড়ি ভাড়া দিয়ে অর্থ উপার্জন করলে সেটা সেবার মধ্যে পড়ে কি না।

**উত্তর :** সেবার মধ্যে পড়ে, তবে সবচেয়ে কম পরিশ্রমের সেবা! যদি ভাড়াটিয়াদের আপনি উত্ত্যক্ত না করেন, ভাড়াটিয়াকে পানি ঠিকমতো দেন, কল খারাপ হয়ে গেলে সেটা ঠিক করে দেন, যন্ত্রণা না দেন—তাহলে অবশ্যই এটা সেবার মধ্যে পড়ে। কিন্তু এটা খুব কম পরিশ্রমের সেবা। এখানে মেধার কোনো প্রকাশ নেই যদি এটা বাপ-দাদার বাড়ি হয়ে থাকে। আর নিজে উপার্জন করে যদি আপনি বাড়ি বানিয়ে ভাড়া দেন—এটাও হচ্ছে অধিক বিনিয়োগে কম সেবা। আপনি বাড়ি বানালেন, ভাড়া দিয়ে দিলেন—বিনিয়োগ অনেক বেশি, সেবার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম।

**প্রশ্ন :** প্রাচুর্য বা সাফল্যকে চিরস্থায়ী করার জন্যে কী করা উচিত?

**উত্তর :** এমন কিছু করা উচিত যার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী। এমন একটি কাজ করে যেতে হবে, যেটি মানুষের উপকারে লাগবে যুগে যুগে কালে কালে। যেমন, আলেকজান্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করে গেছেন। লুই পাস্তুর জলাতঙ্কের প্রতিষেধক, মাদাম কুরী রেডিয়েশন আবিষ্কার করেছেন। ইমাম বোখারী রেখে গেছেন নবীজীর (স) বাণীর সংকলন। টলস্টয়, শেক্সপিয়ার, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল রেখে গেছেন অমর সাহিত্য।

আর যদি টাকাপয়সা জমিয়ে রেখে যান তাহলে আপনার ছেলে-মেয়েরাই রক্তারক্তি করবে সেটা নিয়ে। সাফল্য-প্রাচুর্যকে চিরস্থায়ী করতে হলে সেটাকে সার্বজনীন রূপ দিতে হবে। সব মানুষের জন্যে উৎসর্গ করে দিতে হবে।

**প্রশ্ন :** প্রাচুর্যের কোয়ান্টাম সূত্র কী?

**উত্তর :** প্রাচুর্যবান হওয়ার কোয়ান্টাম সূত্র টেটি। প্রথমত, শুকরিয়া। দ্বিতীয়ত, মনছবি। তৃতীয়ত, সেবা বা সাদাকা। চতুর্থত, সবর। পঞ্চমত, সজ্জায়ন-নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপকীয় গুণাবলি অর্জন।

## শুকরিয়া

**প্রশ্ন :** প্রাচুর্যের এমন একটা সমার্থক শব্দ বলুন, যেটা অবলম্বন করলে প্রাচুর্যবান হওয়া অবধারিত।

**উত্তর :** একটা শব্দ বলা কঠিন। প্রাচুর্য শব্দটি দিয়ে যতকিছু বোঝানো যায়, এটা পাওয়ার জন্যে যা যা করা দরকার-এটা এককথায় বোঝানো কঠিন। তবে হাঁ, আপনি যদি সর্বাবস্থায় শোকর আলহামদুলিল্লাহ, প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ বলতে পারেন, প্রাচুর্য আপনার আসবেই।

তাই সাফল্য ও প্রাচুর্যের প্রথম সূত্র হচ্ছে শুকরিয়া, অর্থাৎ যা আছে তার জন্যে কৃতজ্ঞতা। প্রাচুর্যের সমস্ত শক্তি সুপ্ত আছে শুকরিয়ার মধ্যে। কারণ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাস্তবতা হচ্ছে, যা নেই তা নিয়ে আপনি কখনো গুরু করতে পারবেন না। আপনাকে গুরু করতে হবে যা আছে তা নিয়ে। আমরা যখন শোকরগোজার হই-তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা সচেতন হয়ে উঠি, আমাদের কী আছে সে সম্পর্কে।

শোকরগোজার দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত হচ্ছে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ কী আছে তার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে কী নেই তার দিকে দৃষ্টি দেয়া। নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হলে আপনি মনে করবেন, আমার তো অমুকের মতো মামা-চাচার জোর নেই, তমুকের মতো আমার ভাগ্য ভালো না-আমি সফল, প্রাচুর্যবান কীভাবে হবো? ফলে একজন নেতিবাচক ব্যক্তি কখনো জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে পারে না। তার কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা থাকে না। পরিণামে ব্যর্থ হয় তার জীবন।

সফল মানুষেরা শোকরগোজার ছিলেন। মহিয়সী নারী হেলেন কেলার দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী ছিলেন। একবার এক সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করলেন যে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আপনার কোনো অভিযোগ নেই? তিনি হেসে বলেছিলেন, ঈশ্বর আমাকে যা কিছু দিয়েছেন, সেটার জন্যেই তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে

শেষ করতে পারছি না। যা দেন নি, তা নিয়ে অভিযোগ করবো কখন? একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নারী যদি এতটা শোকরগোজার হতে পারেন, তাহলে আমাদের কী পরিমাণ শোকরগোজার হওয়া উচিত!

আসলে প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে তেলে মাথায় তেল দেয়া। যত আপনি শোকরগোজার থাকবেন, তত ভালো জিনিসগুলো আপনার দিকে আকৃষ্ট হতে থাকবে। আর শোকরগোজার না হতে পারলে, আলহামদুলিল্লাহ বলতে না পারলে, ঈশ্বরকে/ ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে না পারলে, এখন যা আছে তা-ও হারাবেন। এজন্যে নবীজী (স) বলেছেন, শুকরিয়া হচ্ছে নেয়ামতের লাগাম।

আমরা কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা প্রতিদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই বলি, শোকর আলহামদুলিল্লাহ/ হরি ওম/ প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ/ ঈশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ, আমাকে একটা সুন্দর দিন দিয়েছে। সারাদিন যতবার মনে হয় ততবারই বলি, শোকর আলহামদুলিল্লাহ। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে আবার বলি, শোকর আলহামদুলিল্লাহ।

আমরা যখন থেকে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এ কথা বলা শুরু করলাম তারপর থেকে পরম করুণাময়ের আশীর্বাদ আমাদের ওপর আরো বেশি করে বর্ষিত হতে লাগলো। ফাউন্ড ও কাজের মাত্রা বেড়ে গেল। অতএব শোকরগোজার হোন, আপনার যা আছে তার প্রতি মনোযোগী হোন, তা নিয়েই শুরু করুন। আপনি সফল ও প্রাচুর্যবান হবেন।

**প্রশ্ন :** প্রাচুর্যের জন্যে শুকরিয়ার এত গুরুত্ব কেন?

**উত্তর :** আসলে প্রাচুর্যের জন্যে শুকরিয়ার গুরুত্ব এতটাই যে, যখনই দারিদ্র আসবে, অশান্তি আসবে এবং আতঙ্ক আসবে, তখনই বুঝতে হবে শুকরিয়ার অভাব রয়েছে আপনার মধ্যে। এজন্যে রসুলুল্লাহ (স) চমৎকারভাবে বলেছেন, শোকরগোজার হও। তোমাদের নেয়ামতের প্রবৃদ্ধি ঘটবে। তিনি বলেছেন, নেয়ামত হচ্ছে বন্য ঘোড়া। আর শুকরিয়া হচ্ছে এর লাগাম।

একটা জংলি ঘোড়ার ওপরে যতক্ষণ লাগাম না লাগানো হচ্ছে ততক্ষণ ঐ ঘোড়ায় কেউ চড়তে পারে না, নিজের কাজে লাগাতে পারে না। তেমনি যখনই একজন মানুষ শোকরগোজার হয় তখনই সে সচেতন হয়—আল্লাহ তাকে যে নেয়ামত দিয়েছেন সে সম্পর্কে। আর নেয়ামতের ব্যাপারে যখন সে সচেতন হয় তখন নেয়ামতের সদ্যবহারের ব্যাপারেও সে উদ্যোগী হয়, তৎপর হয়। এখানেই প্রাচুর্যের জন্যে শুকরিয়ার গুরুত্ব।

**প্রশ্ন :** না-শুকরিয়া মানে কী?

**উত্তর :** আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের অস্বীকৃতিই হচ্ছে না-শুকরিয়া। যেমন, আল্লাহ মস্তিষ্ক দিয়েছেন। আপনি মস্তিষ্ককে ব্যবহার করলেন না, এটা না-শুকরিয়া। আল্লাহ দুটি হাত দিয়েছেন পরিশ্রম করার জন্যে, দুটো পা দিয়েছেন হাঁটার জন্যে, আপনি এগুলোকে ব্যবহার করলেন না। এগুলোর সদ্যবহার না করা অর্থাৎ কর্মক্ষমতার অপব্যবহার করা হচ্ছে না-শুকরিয়া।

আল্লাহ হাত দিয়েছেন কল্যাণকর কাজ করার জন্যে, এখন কল্যাণ না করে আপনি হাতটাকে যদি ঘুষি মারার কাজে ব্যবহার করেন, একজনের নাক ফাটানোর জন্যে ব্যবহার করেন, একজনের ওপর জুলুম করার জন্যে ব্যবহার করেন—এটা হচ্ছে না-শুকরিয়া, এটা হচ্ছে অপব্যবহার।

মস্তিষ্ককে যদি কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণের কাজে লাগান—এটা নেয়ামতের অস্বীকৃতি বা অপব্যবহার। এই অপব্যবহার যারাই করেছে, তাদের পরিণতি হচ্ছে দারিদ্র অশান্তি আতঙ্ক হতাশা বিষণ্ণতা। অশান্তির আওনে তাদের পুড়তে হয়, বিষণ্ণতায় ভুগতে হয়। ধনী দেশগুলোতে ডিপ্রেশন সবচেয়ে বেশি। কেন? তারা নেয়ামতের অপব্যবহার করে।

যদি সদ্যবহার না করেন বা কোনোরকম ব্যবহারই যদি না করেন যে, আমি খুব সহজসরল মানুষ, আমি এগুলোর কিছুই ব্যবহার করি না, ব্যবহার করতে জানি না—তাহলে দারিদ্র থেকে কখনো আপনি মুক্তি পাবেন না। বিভিন্ন জায়গায় আদিবাসীদের দেখুন—তারা কিন্তু সৎ, সহজসরল। চুরি, ছিনতাই, দুর্নীতি, যৌন অপরাধ তাদের মধ্যে প্রায় নেই বললেই চলে। তারপরও তারা দরিদ্র। কেন? কারণ তারা তাদের মস্তিষ্ককে ব্যবহার করে না।

**প্রশ্ন :** আমি সনাতন ধর্মাবলম্বী। ‘শৌকর আলহামদুলিল্লাহ’ বলার পরিবর্তে আমি কি অন্য প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে পারি?

**উত্তর :** ‘শৌকর আলহামদুলিল্লাহ’র পরিবর্তে ‘হরি ওম’ বলতে পারেন। আমাদের পরিবারের অত্যন্ত সম্মানিত সদস্য আচার্য ড. পরেশ চন্দ্র মন্ডল—যিনি সনাতন ধর্মের ওপর আমাদের দেশে সর্বজন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত। তার মতে, ‘শৌকর আলহামদুলিল্লাহ’র যথাযথ প্রতিশব্দ পাওয়া খুব কঠিন। তবে তিনি মনে করেন যে, সনাতন ধর্মে ‘হরি ওম’ শব্দটিই ‘শৌকর আলহামদুলিল্লাহ’র প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। অতএব সনাতন

ধর্মের অনুসারীরা অনায়াসে ‘হরি ওম’, প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ, ঈশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ বা ভগবান তোমাকে ধন্যবাদ বলতে পারেন।

## মনছবি

সাফল্য ও প্রাচুর্যের দ্বিতীয় সূত্র মনছবি। মনছবি অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

## সেবা বা সাদাকা বা দান

**প্রশ্ন :** অন্য কাউকে কিছু দিলে আমি কীভাবে প্রাচুর্যবান হবো? এটা কি যুক্তিবিরুদ্ধ-প্রকৃতিবিরুদ্ধ কথা নয়?

**উত্তর :** মোটেই যুক্তিবিরুদ্ধ নয়। প্রকৃতিবিরুদ্ধও নয়। প্রকৃতির নিয়মই হচ্ছে কিছু পেতে চাইলে আপনাকে কিছু দিতে হবে। আপনি যা দেবেন, প্রকৃতিতে তা জমা থাকবে। আর তার প্রতিদান আপনি পাবেনই। এই জন্যেই প্রাচুর্যের তৃতীয় সূত্র হচ্ছে সেবা বা সাদাকা বা দান।

সূরা বাকারার ২৬১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ‘সৎ দান এমন একটি শস্যবীজ যা থেকে উৎপন্ন হয় সাতটি শীষ এবং প্রতিটি শীষে থাকে শত শস্যদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আরো বহুগুণ প্রবৃদ্ধি দান করেন’। একটা বীজ থেকে সাতটা শীষ এবং প্রত্যেকটা শীষ থেকে ১০০ শস্যদানা, অর্থাৎ ৭০০ গুণ। অর্থাৎ যদি আপনি এক টাকা দান করেন ৭০০ গুণ পাবেন। তারপরে আল্লাহ বলছেন যে, তিনি চাইলে আরো বহুগুণ প্রবৃদ্ধি দান করেন।

প্রকৃতির নিয়মই হচ্ছে, যখন কোথাও কোনো শূন্যতা সৃষ্টি হয়, তখন চারদিক থেকে সে জিনিস এসে শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করে। যেমন, বাতাস যখন হঠাৎ গরম হয়ে ওপরের দিকে উঠে যায়, সে ফাঁকা স্থান পূরণের জন্যে চারদিক থেকে বাতাস আসতে থাকে। আন্তে আন্তে বাতাসের বেগ বাড়তে থাকে, বাড় সৃষ্টি হয়। বাজার অর্থনীতির নিয়মও হচ্ছে, যখন কোনো সামগ্রীর অভাব সৃষ্টি হয়, শূন্যতা সৃষ্টি হয়, তখন আমদানীকারকরা সেটার দিকে ঝুঁকে পড়ে, ফলে চারদিক থেকে সেটা আসতে শুরু করে।

এভাবে যা-ই আপনি দিয়ে দেবেন, তার বহুগুণ আসবে সেই শূন্যতা

পূরণের জন্যে। অর্থদান কীভাবে প্রাচুর্য আনে তার প্রমাণ কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক। যারা-ই মাটির ব্যাংকে দান করছেন সময়ের সাথে সাথে তাদের দানের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। যে ব্যক্তি প্রথম বছর ৩০ টাকা জমা দিয়েছিলেন, তিনিই গত বছর দিয়েছেন অনেক টাকা। আয় না বাড়লে তো তিনি এত টাকা দান করতে পারতেন না।

**প্রশ্ন :** আমার তো অর্থ নেই। আমি কীভাবে সেবা বা দান করবো?

**উত্তর :** সেবা বা সাদাকা শুধু অর্থদান নয়। সেবা বা সাদাকার সুযোগ সর্বত্র। প্রতিটি ভালো কাজই সাদাকা। হাসিমুখে সুন্দর করে কথা বলা সাদাকা। আপনি অফিস থেকে ফিরে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, সারাদিন কেমন কাটলো-এটা সাদাকা। আপনার হাজবেন্ড এসেছেন, আপনি একটু হেসে এগিয়ে গেলেন, একটু মিষ্টি কথা বললেন-এটা সাদাকা। মাকে এক গ্লাস পানি ঢেলে দিলেন-এটা সাদাকা। পারিবারিক কাজে সহযোগিতা করা সাদাকা। ঘরটাকে পরিচ্ছন্ন করে রাখা সাদাকা। আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের সহযোগিতা করা সাদাকা।

এতিম মিসকীন বিধবা অসহায়দের লালনপালন করতে সহযোগিতা করা সাদাকা। অসুস্থকে দেখতে যাওয়া সাদাকা। অন্যের সাফল্যলাভে অভিনন্দন জানানো সাদাকা। অর্থনৈতিক বা সামাজিক পরিবেশের শিকার অসহায় মানুষকে পরিবেশের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করা সাদাকা। মজলুমকে সাহায্য করা সাদাকা। যেকোনো ত্রাণ কাজ সাদাকা।

তৃষিতকে পানি পান করানো, ক্ষুধার্তকে আহার দেয়া সাদাকা। রাস্তায় কাঁটা পড়ে আছে, ইট, পাথর, কাচের টুকরা পড়ে আছে-এগুলোকে অপসারণ করা, জ্বলন্ত কিছু পড়ে আছে-নিভিয়ে দেয়া সাদাকা। অধীনস্থদের সাথে মানবিক আচরণ করা সাদাকা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অর্থ বা শ্রম দিয়ে কাউকে অক্ষরজ্ঞান দান করা সাদাকা।

রক্তদান করা সাদাকা। উৎসাহ উদ্দীপক, গঠনমূলক ইতিবাচক আলোচনা বা লেখা সাদাকা। সুন্দর একটা কাজকে রিপোর্ট করা, পত্রিকায় প্রকাশ করা সাদাকা। জনগণের অভাব-অভিযোগ নিয়ে পত্রিকায় লেখা সাদাকা।

একজনকে সৎ পরামর্শ দেয়া সাদাকা। একজন পথ হারিয়ে ফেলেছে, তাকে পথ দেখিয়ে দেয়া সাদাকা। বয়স্ক, মহিলা, শিশু যাত্রাপথে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাচ্ছেন, আপনি যদি আপনার সিট ছেড়ে তাকে বসতে দেন-এটা সাদাকা।

অফিসে আপনার দায়িত্বটা সুন্দরভাবে পালন করা সাদাকা। অফিসের কাজে আরেকজনকে সহযোগিতা করা সাদাকা।

প্রযুক্তি বা বিজ্ঞানের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নতুন কোনো প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা সাদাকা। একটা যন্ত্র নষ্ট হয়ে গেছে। যন্ত্রটাকে ঠিক করে দেয়া সাদাকা। একজনকে মেডিটেশনে উদ্বুদ্ধ করা, কোর্সে উদ্বুদ্ধ করা সাদাকা। কারণ এর মাধ্যমে সে আলোকিত পথে আসছে। অর্থাৎ সৃষ্টির কল্যাণে যেকোনো কাজ হচ্ছে সেবা বা সাদাকা। এর জন্যে অর্থেরও প্রয়োজন নেই। তবে সবচেয়ে ভালো সাদাকা হচ্ছে নিজের অনন্য মেধার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটিয়ে তা সৃষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত করা।

প্রাচুর্যের জন্যে আপনি যা চান তা দান করুন। আপনি যদি সম্মান চান আরেকজনকে সম্মান করতে হবে। আপনি যদি অর্থ চান আরেকজনকে অর্থ দিতে হবে। আপনি যদি খ্যাতি চান আরেকজনকে প্রশংসা করতে হবে। অর্থাৎ যা আপনি চান সেটা আগে আপনাকে দিতে হবে। আপনি বহুগুণ ফেরত পাবেন।

**প্রশ্ন :** জ্ঞানের প্রাচুর্য কীভাবে অর্জন করা যায়?

**উত্তর :** জ্ঞান যত দান করবেন তত জ্ঞানের প্রাচুর্য বাড়বে। কারণ যত দান করবেন তত জ্ঞানের শূন্যতা সৃষ্টি হবে, আর চারদিক থেকে জ্ঞান আসতে থাকবে সেই শূন্যস্থান পূরণ করার জন্যে।

## সবর

**প্রশ্ন :** প্রাচুর্য আসার পূর্ব পর্যন্ত কী করবো দয়া করে বলবেন?

**উত্তর :** কেন বলা যাবে না? প্রাচুর্য না আসা পর্যন্ত সবর করতে হবে। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যিনি আর্থিক বলেন, রাজনীতি বলেন, সাহিত্য বলেন, ধর্ম বলেন—কোনো ক্ষেত্রে পরিশ্রম ছাড়া, কষ্ট ছাড়া, ধৈর্য ছাড়া প্রাচুর্য লাভ করেছেন, খ্যাতি লাভ করেছেন। প্রাচুর্যের জন্যে সবর করতে হবে।

আমরা সবর শব্দের খুব ভুল অর্থ করে থাকি। একজন মার খাচ্ছে, আমরা বলি, সবর কর। মানে আরো মার খাও! আসলে নীরবে অত্যাচার সহ্য করার নাম সবর নয়। সবর হচ্ছে নিজের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে ঠান্ডা মাথায় নিরলস



পরিশ্রম করা-যেকোনো প্রতিকূলতার মুখে, কষ্টের মুখে লক্ষ্যে অবিচল থাকা এবং সেই লক্ষ্যের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকা।

আপনি একটা কাজে হাত দিয়েছেন। সাময়িক ব্যর্থতা আসতে পারে। দেরি হতে পারে। কিন্তু সাময়িক ব্যর্থতা যখনই আসছে, আপনি হতাশ হয়ে যাচ্ছেন। আপনার বিশ্বাসে ফাটল ধরে যাচ্ছে। পৃথিবীতে যারা বিজয়ী হয়েছেন, যারা পৃথিবীকে কিছু দিয়ে গেছেন-তাদের জীবনে কি সাময়িক ব্যর্থতা আসে নি? একের পর এক ব্যর্থতা এসেছে। তারপরও প্রতিটি ব্যর্থতায় তারা অটল থেকেছেন এবং শেষ পর্যন্ত তারাই জয়ী হয়েছেন।

আপনি নেলসন ম্যান্ডেলার কথা ভাবুন। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে তিনি যখন প্রথম সংগ্রাম করতে শুরু করলেন তখন বর্ণবাদের অবসান হবে, ম্যান্ডেলা মুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট হবেন-এটা কল্পনা করাও অধিকাংশ মানুষের জন্যে ছিলো দুঃসাধ্য। পশ্চিমা বিশ্বের কাছে তার পরিচয় ছিলো সম্ভ্রাসী। ১৯৬২ সালে থ্রুফতার হওয়ার পর দীর্ঘ ২৭ বছর আটক ছিলেন শ্বেতাঙ্গদের কারাগারে, যার সিংহভাগ কেটেছে রোবেন দ্বীপের একটি নির্জন সেলে, যেখানে সূর্যের আলো প্রবেশ করতো না। ছয় মাসে একটির বেশি চিঠি পাওয়ার বা একজনের বেশি দর্শনার্থী আসার অনুমতি ছিলো না। তারপরও তিনি হতাশ হন নি, লক্ষ্যচ্যুত হন নি। শেষ পর্যন্ত ১৯৯০ সালে তিনি মুক্ত হলেন। বর্ণবাদের অবসান ঘটলো। ১৯৯৪ সালে তিনি মুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন।

গণচীনের প্রতিষ্ঠাতা মাও সেতুং। জেনারেল চিয়াং কাইশেকের কুয়োমিনটাং বাহিনীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে চীনের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল থেকে তিনি এক লক্ষ অনুসারী নিয়ে যাত্রা শুরু করেন ১৯৩৪ সালে। উত্তরপশ্চিম চীনের ইউনানে পৌঁছার এই সুদীর্ঘ ৯,৬০০ কিলোমিটার পশ্চাদপসারণ করতে গিয়ে পাঁচটি তুষারাবৃত গিরিপথসহ ১৮টি পর্বতমালা, কয়েকটি বড় নদীসহ ২৫টি নদী, বিস্তীর্ণ কদমাক্ত জলাভূমি পার হন। ইতিহাসে এটা লং মার্চ হিসেবে খ্যাত। ৯০ হাজার অনুসারী যাত্রাপথে মারা যান। এসময় তার দুই সন্তান জন্ম নেয়। লালনপালন করার মতো অবস্থা ছিলো না বলে পথিমধ্যে তাদেরকে দিয়ে দেন কৃষকদের কাছে। এই সন্তানদের খোঁজ আর তিনি পান নি। এতকিছুর পরও বিশ্বাসে অটল ছিলেন। ১০ হাজার অনুসারীকে সব বিষয়ে প্রশিক্ষিত করলেন। আস্তে আস্তে অনুসারীর সংখ্যা বাড়তে লাগলো। ১৫ বছরের রক্তাক্ত সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত তিনি জয়ী হন। দারিদ্রপীড়িত চীন এখন অর্থনৈতিক পরাশক্তি।

যারা আর্থিক দিক থেকে সম্পদশালী হয়েছেন তাদেরও কি কম কষ্ট করতে হয়েছে? কোরিয়ার সবচেয়ে বড় ধনকুবের প্রয়াত চুন জু জুং হুন্দাই কোম্পানির মালিক ছিলেন। তাকেও কম কষ্ট করতে হয় নি। পালিয়ে এসেছিলেন উত্তর কোরিয়া থেকে। দিনমজুর ছিলেন। দক্ষিণ কোরিয়া যাওয়ার পয়সা ছিলো না। বাবার একটা গরু ছিলো। গরুটাকে বিক্রি করে সেই অর্থ নিয়ে পালিয়ে যান দক্ষিণ কোরিয়ায়। ৫০ বছর পরে ১৯৯৮ সালে উত্তর কোরিয়ায় দুর্ভিক্ষের সময় ৪০০ ট্রাক বোঝাই গরু নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন উত্তর কোরিয়ায়-তার জন্মভূমিতে। ট্রাক এবং গরু সবই তার জন্মস্থানে রেখে এসেছিলেন।

এটা তো গেল এক জীবনের কথা। ইহুদিদের দেখুন, এরকম ধৈর্যশীল জাতি পৃথিবীতে খুব কম। খ্রিষ্টপূর্ব ৯৯ সালে, অর্থাৎ খ্রিষ্টের জন্মের ৯৯ বছর আগে জেরুজালেম থেকে তারা বিতাড়িত হলো। সেই জেরুজালেমে তারা প্রবেশ করলো দুই হাজার বছর পর ১৯৪৮ সালে এবং পুরোপুরি প্রবেশ করলো ১৯৬৮ সালে। আমাদের যেমন ঈদ, ইহুদিদের বার্ষিক উৎসব তেমনি ‘সাবাত’। ২০০০ বছর ধরে তারা সাবাতে একজন আরেকজনের সাথে হ্যান্ডশেক করে বলতো-আগামী বছর আমরা সাবাত করবো জেরুজালেমে। ১০০ বছরকে যদি তিন প্রজন্ম ধরা হয়, এই হিসেবে ৬০ প্রজন্ম ধরে তাদের একই মনছবি-আগামী বছর সাবাত করবো জেরুজালেমে।

অর্থাৎ বিশ্বাসে অটল থাকতে হবে। বিশ্বাস যখন অটল থাকে তখন সেটা হয়ই। বাধা যতই আসুক, প্রতিকূলতা যতই আসুক, বাঁক যতই আসুক, বিশ্বাসে অটল থাকতে হবে। যখন বিশ্বাসে অটল থাকবেন তখনই আপনি সবরের সাথে কাজ করতে পারবেন। আর স্রষ্টা সবরকারীর সাথেই থাকেন।

**প্রশ্ন :** ইদানীং আমার পক্ষে মেডিটেটিভ লেভেলে থাকা খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সহ্য করতে করতে সহ্যের বাঁধ ভেঙে যায়। আমি যত চেষ্টা করছি জীবনযাপনের বিজ্ঞান অনুসরণ করে চলতে, আমার চারপাশের লোকেরা সেটা নিয়ে তুমুল হৈয়ালিতে নেমেছে। সেখানে বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়িও আছেন। বিরামহীন ধৈর্য ধরে যাবো নাকি প্রতিবাদ করবো?

**উত্তর :** এটি জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। সহ্য করতে করতে বাঁধ ভেঙে গেলে তো আপনি ভেঙে গেলেন। সহ্য করতে করতে তো সহ্যক্ষমতা আরো বাড়া উচিত। যেরকম সার্কাসে দেখা যায় যে, ২২০ ভোল্ট বিদ্যুৎ

প্রবাহের মধ্যে একজন রড ধরে আছেন কিন্তু বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হচ্ছেন না। এটি একবারে সম্ভব হয় না। তারা প্রথম শুরু করেন নয় ভোল্ট থেকে। এরপর ১০, ১৫, ২০, ২৫ এভাবে বাড়তে বাড়তে তারপর একটা সময় ২২০ ভোল্ট। অতএব যত সহ্য করবেন সহ্যের ক্ষমতা তত বাড়বে। আর সহ্য করতে হবে আনন্দিতচিত্তে। এখানে আমরা অনেকেই ভুল করি। সহ্য আমরা করি, কিন্তু খুব বিরক্তি নিয়ে। আমরা কাজ করি। কারণ জানি যে, এটা আমাকেই করতে হবে। কিন্তু করি অনিচ্ছাভরে, নিরানন্দে। ফলে অশান্তিতে ভুগি।

যেমন, গৃহিণীরা অনেক সময় কিছু কাজ খুব বিরক্তি সহকারে করেন। ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে, তাকে সব কাজ করতে হচ্ছে—ঘরের ময়লা পরিষ্কার করতে হচ্ছে, খালাবাসন ধুতে হচ্ছে। কিন্তু এখানেই তিনি যদি দৃষ্টিভঙ্গিটা পাণ্টে ফেলতে পারতেন—যদি মনে করতেন যে, নবীজী (স) বলেছেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে ঈমানের অঙ্গ। অতএব ঘর-গেরস্থালির এসব কাজ করে আমি আসলে আমার ঈমান মজবুতের কাজই করছি, তাহলেই কিন্তু কাজটা হয়ে যায় আনন্দ আর তৃপ্তির উৎস।

লোকজন আপনাকে খেপাচ্ছে। আপনি খেপে যাচ্ছেন। তার মানে আপনার মেডিটেটিভ লেভেল সৃষ্টি হয় নি। বুদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ি আর কতটুকু বলতে পারে? আপনার বরং আনন্দিত হওয়া উচিত যে, এতে আপনার গুনাহ মাফ হয়ে যাচ্ছে। অতএব বিষয়টিকে সহজভাবে নিন। সবসময় প্রো-একটিভ থাকুন। শেষ পর্যন্ত আপনি জয়ী হবেন। কারণ সত্যই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়।

**প্রশ্ন :** যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হচ্ছি, বার বার থেমে যাচ্ছি—তাহলে যোগ্যতা আসবে কেমন করে?

**উত্তর :** কেউ নিজে যোগ্যতা অর্জন করে তো আপনাকে তা দিয়ে দিতে পারবে না, সেটা তো তার যোগ্যতা হবে। আপনার যোগ্যতা আপনাকেই অর্জন করতে হবে। কারণ আত্মবিকাশের অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, এটা আদায় করে নিতে হয়। বাধার সম্মুখীন তো হবেনই, বাধাই যদি না আসতো তাহলে সবাই প্রাচুর্যবান হতো। বাধা আসতেই থাকবে। যতই বাধা আসুক ধৈর্যের সাথে কাজ করুন। ক্রমাগত এগিয়ে যাবেন।

জীবন আসলে বার বার শুরু করার আরেক নাম। কখনো, কোনো অবস্থাতেই হাল ছাড়বেন না, থামবেন না। আপনি থেমে গেলে অন্যেরা এগিয়ে যাবে। বিজয় না আসা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যান। কাজের সাথে

আঠার মতো লেগে থাকুন। প্রয়োজনে সর্বশক্তি ব্যবহারের জন্যে প্রস্তুত থাকুন। একটি শিশু জন্মের পর প্রথমে চিৎ হয়ে শুয়ে শুধু হাত-পা নাড়তে পারে। একসময় সে কাত হয়, পরে উপুড় হয়। তারপর গুরু হয় হামাগুড়ি দিয়ে হাতে-পায়ে হাঁটা। এরপর সে উঠে দাঁড়ায়, হাঁটি হাঁটি পা পা করে। হাঁটতে গিয়ে সে বার বার পড়ে, বার বার উঠে দাঁড়ায়। আবার হাঁটতে গুরু করে। একসময় কারো সাহায্য ছাড়াই সে হাঁটে, দৌড়ায়। আপনিও একইভাবে লেগে থাকুন। আপনিও যোগ্যতা-দক্ষতা অর্জন করবেন।

**প্রশ্ন :** কীভাবে চললে জীবনে সফল হতে পারবো? কীভাবে চললে মানুষ আমাকে ভালবাসবে? কোনো বিষয়ে ধৈর্য ধরলে ধৈর্যের মাত্রা কতটুকু হতে পারে? ছোট এই জীবনে ধৈর্য ধরতে গিয়ে যদি কষ্ট পেতে পেতে মরে যাই, তবুও কি ধৈর্য ধরবো? আমি কি কোনো ভয়ঙ্কর রাস্তা দিয়ে রাত একটা বা দুইটায় যাওয়ার সাহস করতে পারি (খুব দরকারে)?

**উত্তর :** বোঝা যাচ্ছে যে, আপনি তরুণ। আসলে ধৈর্যের কোনো সীমা নেই। এই ব্যাপারে তো মীর্জা গালিবের সেই গজল আছে যে, মারনে কি বাদ ভি মেরে আঁখে খুলি রেহি, উসকো আদাত পার গায়াথা হুসনো ইন্তেজার কি। অর্থাৎ মৃত্যুর পরেও আমার চোখ খোলাই রয়ে গেল। কেন? তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো অপেক্ষা করার। প্রিয় কখন আসবে সেই অপেক্ষায় পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে এতই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো যে, মৃত্যুর পরেও দেখা গেল-তার চোখ খোলাই রয়েছে। অপেক্ষা বা সবার বা ধৈর্যের সীমা কতটা হতে পারে-কবি গালিব তা সুন্দর এই রূপকটির মধ্য দিয়ে বুঝিয়েছেন। আর অপেক্ষার ফলও সেভাবেই ফলে।

বাস্তব জীবনেও যখনই আমরা ধৈর্য ধরেছি, আমরা আল্লাহর রহমতকে সবসময় টের পেয়েছি। আমাদের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে, চেতনা বিস্তারের ক্ষেত্রে এমন অনেক পরিস্থিতির মুখোমুখি আমরা হয়েছি, যেখানে অন্য কেউ হলে মারামারি কাটাকাটি হয়ে যেত। কিন্তু আমরা ধৈর্য ধরেছি। ফলে পরিস্থিতি একসময় আমাদের অনুকূলে চলে এসেছে। কারণ কোরআনে খুব স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ সবসময় ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন।

একবার এক শক্তিমান প্রভাবশালী মানুষ তার তরুণ প্রতিপক্ষকে খুব রেগে বলছেন যে, আই উইল ক্রাশ ইউ। তরুণ উত্তরে বললো যে, ইয়েস, ইউ ক্যান ক্রাশ মি। কারণ আপনার অনেক শক্তি, আপনি ক্রাশ করতে

পারবেন। শুনে শক্তিমান প্রতিপক্ষ খুব খুশি। কিন্তু এরপর তরুণ বললো, তবে ক্রাশ করার পর তো কিছু অ্যাশ থাকবে, ছাই থাকবে। তিনি বললেন যে, হ্যাঁ থাকবে। তরুণ তখন বললো যে, ঐ ছাই থেকে আমার পুনর্জন্ম হবে।

অর্থাৎ আপনি যদি বিশ্বাসকে প্রবল রাখতে পারেন, নান ক্যান ক্রাশ ইউ—ঐ ছাই থেকে, ঐ বিপর্যয় থেকে আপনার পুনর্জন্ম হবে। অতএব সবসময় মনে রাখবেন যে, সবর বা ধৈর্য হচ্ছে জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর ভয়ঙ্কর রাস্তা দিয়ে রাত একটা বা দুইটায় যাওয়ার যদি আসলেই প্রয়োজন হয়, তাহলে তো যেতেই হবে। কিন্তু প্রয়োজন ছাড়া যাওয়ার দরকারটা কী? কারণ আল্লাহর সাহায্য তখনই পাওয়া যায়, যখন ঝুঁকিটা নেবেন প্রয়োজনে।

**প্রশ্ন :** অন্যায়ভাবে কেউ জুলুম করে যদি আমার জীবনের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাহলে আমার কী করা উচিত?

**উত্তর :** ঠান্ডা মাথায় শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। যখন শক্তি সঞ্চয় হবে, যখন বুঝবেন যে, এবার তার হাতটা আপনি ধরতে পারবেন, তখন গিয়ে হাতটা ধরবেন। বলবেন যে, এতদিন যা করেছো করেছো, এবার আর পারবে না। এবার যদি কর তাহলে হাতটা ভেঙে দেবো। সবসময় মনে রাখবেন, দুর্বলের কোনো বন্ধু হয় না। দুর্বলের বন্ধু কেউ কোনোকালে ছিলো না, কোনো কালে হবেও না। অতএব সবর করবেন, ঠান্ডা মাথায় শক্তি সঞ্চয় করবেন।

**প্রশ্ন :** আমি নেতিবাচক চিন্তার ফলাফল সহজে পাই কিন্তু ইতিবাচক চিন্তার ফলাফল বুঝতে পারি না কেন?

**উত্তর :** আসলে যেকোনো ইতিবাচক বিষয়ের প্রভাব পড়ে দেরিতে। বছর দুই আগে হাইতির ভূমিকম্পের কথা মনে করুন। চোখের সামনে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ ভেঙে গেল। কিন্তু গড়তে কত সময় লেগেছিলো? হাইতি গড়ে উঠতে কত বছর লেগেছিলো? অথচ ভাঙতে লাগলো কয়েক সেকেন্ড মাত্র। নেতিবাচকতার প্রভাব পড়ে দ্রুত। ভালো কথার প্রভাব পড়ে দেরিতে। যেমন, আপনাকে কেউ সুন্দরী বললো। এটা আপনার মধ্যে তেমন প্রতিক্রিয়া না-ও করতে পারে। ভাববেন, আমাকে তো সবাই সুন্দরীই বলে। কিন্তু কেউ যদি বলে, তুমি তো পঁচাত্তমুখী—প্রভাবটা পড়ে সাথে সাথেই। এটাই বাস্তবতা—ধ্বংস করতে সময় লাগে না কিন্তু গড়তে সময় লাগে।

## সজ্জায়ন

**প্রশ্ন :** প্রাচুর্যের জন্যে সজ্জের গুরুত্ব কতটুকু?

**উত্তর :** আমাদের প্রাচুর্যের ক্ষেত্রে বড় বাধা হচ্ছে, ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার বৃত্ত। আমরা মনে করি, সব সুখ সম্পদ প্রাচুর্য আমি একা ভোগ করবো—আর কেউ না। এটা করতে গিয়ে আমরা আসলে কিছুই করতে পারি না। নিজেও প্রাচুর্য পাই না এবং চারপাশের মানুষকেও প্রাচুর্যের সন্ধান দিতে পারি না।

আসলে বড় কিছু করতে চাইলে সজ্জবদ্ধতা ছাড়া তা সম্ভব নয়। আপনার স্বপ্ন, আপনার চিন্তা বাস্তবায়নের জন্যে হাজারো মানুষকে সম্পৃক্ত করতে পারলেই আপনি বড় হবেন। এখানেই সজ্জায়নের গুরুত্ব। সজ্জায়ন ‘আমি’কে ‘আমরা’য় বদলে দেয়। ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ লীন হয়ে যায় সামগ্রিক কল্যাণে। ফলে সংশ্লিষ্ট সবার প্রাপ্তির পরিমাণ হয় বহুগুণ। কারণ এক মাথার চেয়ে দুই মাথার জ্ঞান বেশি। দুইয়ের চেয়ে তিন-এর। সজ্জায়নে বহু মস্তিষ্ক একাত্ম হয়ে উচ্চমাত্রার সৃজনশীলতা, শক্তি ও প্রেরণার নতুন উৎসে রূপান্তরিত হয়। সজ্জায়নে সৃষ্টি হয় সিস্টেম ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতা—সৃষ্টি হয় গতিশীল নেতৃত্ব ও কর্মপন্থা। কারণ পাঁচ হাজার লোকের একটা ফ্যাক্টরি করতে চাইলে আপনাকে পাঁচ হাজার মানুষকে ম্যানেজ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

ম্যানেজেরিয়াল ক্যাপাসিটির অভাবে কী হয়—তার একটি বড় উদাহরণ আদমজী জুট মিল। স্বাধীনতার পরে আমরা এই বিশাল মিলের অধিকারী হলাম, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এটি পরিণত হলো শ্বেত হস্তিতে। বিশাল সেই জায়গায় এখন ইপিজেড অবস্থিত।

আমাদের কোম্পানিগুলো বড় হতে পারে না, কারণ আমরা নাম দেই কোম্পানি কিন্তু আচরণ করি তালুকদারের, ম্যানেজারের নয়। আমরা ধমকাই, সবকিছু নিজের মতো চালাতে চাই। কিন্তু ম্যানেজ করতে পারি না। ফলে তিনজনের একটা কোম্পানি হলে পাঁচ বছরের মধ্যে এটা কমসে কম চারটা কোম্পানি হয়ে যায়। ১০ জনের একটা দল হয়ে যায় তিনটা দল।

অথচ ইউরোপ-আমেরিকায় তা নয়। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো আমাদের কীভাবে শোষণ করেছে এর খুব ছোট্ট উদাহরণ—গ্লাক্সো। ৩০ বছর আগে এটা শুধু গ্লাক্সো ছিলো, তারপরে বারোজ ওয়েলকামের সাথে মার্জ হয়ে হলো গ্লাক্সো বারোজ ওয়েলকাম। তারপর স্মিথক্লাইনের সাথে মার্জ হয়ে হলো গ্লাক্সোস্মিথক্লাইন। সারা দুনিয়াতে এখন টিকার একচেটিয়া ব্যবসা তাদের।

তালুকদারি মনোভাবে মালিকই সবকিছু। আর কর্পোরেট কালচারে সবকিছুর উর্ধ্বে সিস্টেম। এই সিস্টেম তখনই ডেভেলপ করে, নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার গুণাবলি তখনই বিকশিত হয় যখন সজ্জায়ন হয়। সজ্জায়ন ছাড়া, সজ্জা ছাড়া মেধার চূড়ান্ত বিকাশ কখনো হয় না। আমরা যখন সজ্জের মাধ্যমে আমি-কে আমার মध्ये লীন করে দেই তখন শক্তির আসল ফল্লুধারায়, বিশ্বাসের পর শক্তির যে দ্বিতীয় স্তর-সেখানে প্রবেশ করি।

সজ্জায়ন মানুষকে সুশৃঙ্খল করে। সাধারণভাবে আমাদের আচরণ কথা বা কাজের ওপরে কোনো লাগাম থাকে না। কিন্তু সজ্জের অংশ হলে তার আচরণ, কাজ ও সময়ের সুবিন্যাসায়ন হয়। সে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বুঝতে পারে, আমি এই আচরণ করতে পারবো, আর এই আচরণ করতে পারবো না-একটা সুন্দর কর্মপ্রক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

দুজন মানুষ যখন ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন আল্লাহর রহমত তাদের ওপর বর্ষিত হয়। তখন তারা আর দুইজন থাকে না, তিনজন হয়। সজ্জাশক্তির ক্ষেত্রে গাণিতিক নিয়ম খাটে না। অর্থাৎ  $1+1=2$  নয়, তখন  $1+1=$ কমপক্ষে ৩, কোয়ান্টাম স্তরে  $1+1=11$ । অর্থাৎ ১১ জন লোক বিক্ষিপ্তভাবে যা করতে পারে সজ্জাবদ্ধ দুইজন তার চেয়ে বেশি করতে পারবে। কারণ সংখ্যা শক্তি নয়, শক্তি হলো এক চেতনায় বিশ্বাস এবং সজ্জাবদ্ধতায়।

সজ্জা সবসময় একটি মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে গঠিত হয়। সমচেতনায় বিশ্বাসীরা যখন মহান লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয় সেখানে বিভিন্ন মেধা, যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার বিকাশ ঘটে। প্রত্যেকের জ্ঞানের পরিধি বাড়তে থাকে। এজন্যেই বড় কিছু করতে হলে সবসময় সজ্জাবদ্ধ হতে হবে।

মহামানবরা সজ্জের এই গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন বলেই সাধনার একটা পর্যায় শেষে তারা লোকালয়ে ফিরে সজ্জা গড়েছেন। বোধি লাভের পর শত শত ভিক্ষু নিয়ে মহামতি বুদ্ধ গড়েছিলেন ভিক্ষুসজ্জা। বুদ্ধ মন্ত্রের তৃতীয় বাক্য হচ্ছে, সজ্জাং শরণং গচ্ছামি! স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মিশন। ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র গড়েন সৎসজ্জা। নবীজী (স) নব্বয়ত লাভের আগেই সমাজসেবার জন্যে তরুণদের নিয়ে গঠন করেছিলেন ‘হিলফুল ফুয়ুল’। তিনি বলেছেন, তোমরা সজ্জাবদ্ধ থাকো, কারণ সজ্জের সাথে আল্লাহর রহমত থাকে। হযরত ওমরের (রা) সময় বিশাল রাজত্বের ১১টি প্রদেশের গভর্নরের মধ্যে সাতজনই ছিলেন হাবশি ক্রীতদাস। অতি সাধারণ মেধার মানুষও সজ্জের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পরে যে মেধার অসামান্য বিকাশ ঘটাতে পারেন, নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করতে পারেন-এটাই তার প্রমাণ।

পেতে হলে দিতে হবে





## দান কেন?

**প্রশ্ন :** সাদাকা বা সেবা বা দানের সাথে প্রাচুর্যের সম্পর্ক কী? দান কেন প্রাচুর্য বাড়ায়?

**উত্তর :** প্রাচুর্যের পঞ্চসূত্রের একটি হলো দান। কারণ, দানের মাধ্যমে যখন সম্পদ বা অর্থ হস্তান্তরিত হয়ে সাময়িক শূন্যতা সৃষ্টি হয়, তখন তা পূরণের জন্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অর্থের গতিশীলতা সৃষ্টি হয় এবং অর্থাগম ঘটে।

প্রাচুর্যের ক্ষেত্রে দান পাঁচভাবে ভূমিকা পালন করে। প্রথমত, দান উপার্জনকে শুদ্ধ করে। কারণ উপার্জন করতে গিয়ে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যে অন্যায় হয়, অতিরঞ্জন হয় দান সে অন্যায়কে কাটায়। দ্বিতীয়ত, দান পাপমোচন করে। তৃতীয়ত, দান বালা-মুসিবত ও রোগ দূর করে। চতুর্থত, দান দারিদ্র বিমোচন করে ও দাতার অন্তরে তৃপ্তি প্রদান করে। পঞ্চমত, দান সম্পদে বরকত দেয়।

দান কীভাবে বৈষয়িক সমৃদ্ধি আনে তার একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে মুসলিম শরীফে—একবার এক লোক পাহাড়ে হেঁটে বেড়ানোর সময় মেঘের ভেতর থেকে আওয়াজ শুনতে পেলো যে, ‘অমুকের বাগানে পানি দাও’। কিছুক্ষণ পরই বৃষ্টি শুরু হলো এবং পানি পাহাড়ের পাশে একটি ঝর্ণা দিয়ে গড়াতে লাগলো। লোকটি কৌতূহলী হয়ে ঐ নালাকে অনুসরণ করলো। যেতে যেতে এক জায়গায় পৌঁছে সে দেখলো, জনৈক ব্যক্তি কোদাল দিয়ে মাটি কেটে ঐ পানি তার বাগানে ঢুকাচ্ছে। নাম জিজ্ঞেস করতেই সে চমকে উঠলো। কারণ এই নামই সে শুনেছিলো গায়েবি আওয়াজে। তার কাছে জানতে চাইলো যে, সে কী এমন পুণ্যের কাজ করেছে যে, প্রকৃতি এভাবে তাকে সহযোগিতা করেছে। সে তখন বললো, আমি এ বাগানের ফসলকে তিন ভাগ করি। একভাগ পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্যে, একভাগ জমিতে বিনিয়োগের জন্যে এবং বাকি একভাগ দানের জন্যে ব্যয় করি। এজন্যেই হয়তো আমি এভাবে সহযোগিতা পাই।

দানের আত্মিক উপকার প্রসঙ্গেও একটি ঘটনা আছে। একবার কামেল বুজুর্গ জন্ম মিসরি হজে গিয়েছেন। আরাফাতের ময়দানে মোরাকাবায় বসে তিনি শুনলেন, এ বছর সর্বপ্রথম হজ কবুল হয়েছে আহমেদ আশফাক নামে দামেস্কের জনৈক মুচির যিনি হজেই আসেন নি। শুনে সাধক কৌতূহলী

হলেন। দামেস্কে গিয়ে বহু খোঁজাখুঁজি করে তাকে পেলেন। তার কাছে শুনলেন ঘটনা। মুচি খুব সামান্য উপার্জন করেন। সংসারের খরচ মিটিয়ে যা বাঁচে তা একটু একটু করে জমিয়ে ৪০ বছর ধরে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন হজে যাওয়ার খরচ। যাওয়ার সবকিছু যখন ঠিকঠাক, দিনক্ষণ দেখে যাত্রা করবেন ভাবছেন—এমন সময় ঘটলো একটি ঘটনা। একদিন তার ছোট ছেলে কাঁদতে কাঁদতে এসে জানালো, অমুক প্রতিবেশীর বাড়িতে সে গিয়েছিলো। রান্নাঘর থেকে মাংস রান্নার গন্ধ পেয়ে একটু মাংস খেতে চাওয়ায় সেই প্রতিবেশী মাংস তো দিলোই না, উপরন্তু তাকে বললো সেখান থেকে চলে যেতে। শুনে আহমেদ আশফাক একটু উত্তেজিত হলেন। এ কেমন কথা! এইটুকু ছেলেকে সামান্য একটু মাংস দিতেও কার্পণ্য! মুচির চিৎকার শুনে প্রতিবেশী গৃহকর্তা বেরিয়ে এলো। বললো, ভাই, আপনার রাগ হওয়াটা স্বাভাবিক। বাচ্চাটাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে আমারও কম খারাপ লাগে নি। কিন্তু আমি নিরুপায় ছিলাম। জেনেশুনে আপনার ছেলেকে আমি মরা ছাগলের মাংস খেতে দিতে পারি নি। আমাকে মাফ করবেন। এবার আহমেদ আশফাকের অবাক হওয়ার পালা। মরা ছাগল মানে কী? সব খুলে বল।

প্রতিবেশী তখন বললো, বেশ অনেকদিন হলো—কোনো কাজ যোগাড় করতে পারছি না। ঘরে যে খাবার ছিলো, তা-ও ফুরিয়ে যাওয়ার পর থেকে ছেলে-মেয়ে নিয়ে গত কয়েকদিন প্রায় অনাহারেই আছি। অবশেষে খিদের জ্বালা সহ্যে না পেয়ে আজ সকালে বের হয়েছিলাম কিছু জোটে কি না দেখতে। হঠাৎ দেখলাম মাঠের ধারে পড়ে আছে একটা মরা ছাগল। তখনো পচন ধরে নি। তাই ছুরি দিয়ে খানিকটা মাংস কেটে এনে স্ত্রীকে দিয়ে বললাম রান্না করতে। তখনই আপনার ছেলে এলো। কিন্তু আমরা না হয় ক্ষুধার তাড়নায় মরা ছাগলের মাংস খেতে বাধ্য হচ্ছি, আপনার ছেলেকে তো তা খাওয়াতে পারি না।

শুনে আহমেদ আশফাক দুঃখে-অনুতাপে-সমবেদনায় কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারলেন না। এরপর তার চোখ ফেটে পানি এলো। প্রতিবেশীকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ভাই আমার! এত কষ্ট নিয়ে তুমি আছো! আমাকে তো একটু জানাতে পারতে। দৌড়ে গেলেন বাড়িতে। এক ঝটকায় তুলে নিলেন টাকার সেই থলেটা, ৪০ বছর ধরে যাতে তিনি জমাচ্ছিলেন হজে যাওয়ার রসদ। প্রতিবেশীর হাতে দিয়ে বললেন, এই নাও আমার ৪০ বছরের সঞ্চয়। এটা দিয়ে কোনো ব্যবসা শুরু কর। হজে যাওয়ার চেয়েও তোমার দুঃখমোচন আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ভাগ্যে থাকলে পরে হজ করবো।

বাস্তবে হজে না গেলেও স্রষ্টার ইচ্ছায় সে বছর তার হজই কবুল হলো সর্বপ্রথম। অর্থাৎ প্রাচুর্য, তা বৈষয়িক বা আত্মিক-উভয় ক্ষেত্রেই দানের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়। কারণ সূরা সাবার ৩৯ আয়াতে আল্লাহ বলছেন, তুমি যা দান করবে আমি এর প্রতিদান অবশ্যই দেবো।

সূরা বাকারার ২৭৪ আয়াতে বলা হয়েছে, যারা তাদের উপার্জন থেকে দিনে বা রাতে, প্রকাশ্যে বা গোপনে দান করে তাদের জন্যে পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোনো ভয় বা পেরেশানি থাকবে না।

**প্রশ্ন :** মাটির ব্যাংকে দান করলে কী ধরনের উপকার হতে পারে?

**উত্তর :** নবীজী (স) এর হাদীস হলো—‘সদকা অকল্যাণের ৭০টি দরজা বন্ধ করে দেয়।’ নেক নিয়তে মাটির ব্যাংকে যখনই আপনি দান করছেন অকল্যাণের বা বালা-মুসিবতের ৭০টি দরজা এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

১৯৯৮ সালে শুরু হয় মাটির ব্যাংক কার্যক্রম। গত ১৫ বছরে মাটির ব্যাংকে দান করে উপকৃত হয়েছেন অসংখ্য মানুষ। উপকারের ধরনের কোনো শেষ নেই। রোগ নিরাময়, আর্থিক সমৃদ্ধি, পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন, শিক্ষায় সাফল্য—সবই আছে এই তালিকায়! কয়েকটি ঘটনা এরকম—

দুটো পায়েই ত্রুটি নিয়ে কানাডাতে জন্মেছিলো এক প্রাজুয়েটের নাতি। ডাক্তারদের মতে যা দুরারোগ্য। নাতির সুস্থতা কামনায় তিনি মাটির ব্যাংকে কিছু অর্থ মানত করলেন এবং সেইসাথে নিয়মিত করাতে লাগলেন সদকা হিলিং। সবাইকে অবাক করে দুমাসের মধ্যেই ঠিক হয়ে গেল বাচ্চাটির দুটো পা! সর্বাধুনিক হাসপাতালের ডাক্তাররা যেখানে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন সেখানে পরম করুণাময় দানের বরকতে সুস্থ করে দিলেন শিশুটিকে। এখন সে স্বাভাবিকভাবে হাঁটছে দৌড়াচ্ছে শুধু নয়, তুখোড় মেধার কারণে কানাডায় তার স্কুলের টিচাররা তাকে ডাকেন ‘এক্সট্রা অর্ডিনারিলি জিনিয়াস বয়’ নামে।

আলট্রাসোনোগ্রামে সব স্বাভাবিক দেখা গেলেও সন্তানসম্ভবা মিসেস লায়লাকে ডাক্তার বার বার সিজার করাতে বলছিলো। কিন্তু মিসেস লায়লা নরমাল ডেলিভারির সিদ্ধান্ত নিলেন। সবই ঠিক ছিলো। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় একটু জটিলতা দেখা দিলো। গলায় নাড়ি পেঁচিয়ে বাচ্চা কিছুটা নেমে গর্ভনালীতে আটকে থাকায় তার হার্টবিট পাওয়া যাচ্ছিলো না। সব শুনে হবু মা সাথে সাথে দানের নিয়ত করলেন। অবশেষে সাড়ে চার ঘণ্টা পর অপারেশন ছাড়াই জন্ম নিলো সুস্থ কন্যা সন্তান।

আরেক গ্রাজুয়েটের বাবার ডায়াবেটিস ধরা পড়লো। উদ্বিগ্ন পরিজনরা নিয়মিত দান করতে লাগলেন মাটির ব্যাংকে। ছয় মাস পর আবার মেডিকেল চেক-আপ করানো হলো এবং রিপোর্টে দেখা গেল, কোনো সমস্যা নেই।

দলিল রেজিস্ট্রির কাজে গুলশানে যাবার পথে দুই কোটি টাকা সম্মুখের দলিল, ১৬ লক্ষ টাকার পে-অর্ডার ও অন্যান্য কাগজপত্র ভুলে সিএনজিতে ফেলে নেমে যান এক দলিল লেখক। জমি বিক্রেতার বাড়িতে গিয়ে বুঝলেন সিএনজিতে সব ফেলে এসেছেন। সাথে সাথে দানের নিয়ত করলেন। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! পাঁচ মিনিটের মধ্যে সিএনজি চালক সেই বাড়ির গেটে এসে তার ফাইলটি ফেরত দিয়ে গেলেন।

মেয়েকে কাক্ষিত স্কুলে ভর্তি করাতে নিয়মিত দান করে যাচ্ছিলেন এক মা। লটারির মাধ্যমে বাছাই করা হবে জেনে মানত করলেন। ভর্তি পরীক্ষায় ২২,০০০ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে নেয়া হলো ২৪০ জনকে যার মধ্যে তার মেয়ে একজন।

এক বাস মালিকের তিনটি বাস চলাচল করে ঢাকা শহরে। প্রায়ই বাসগুলো এক্সিডেন্ট করতো, পুলিশ কেস হতো। তিনি প্রতিটি বাসের ড্রাইভিং সিটের পাশে রেখে দিলেন মাটির ব্যাংক। ড্রাইভারদের বলে দিলেন, প্রতিদিন প্রথম ও শেষ ট্রিপের টাকা মাটির ব্যাংকে রাখতে। কিছুদিনের মধ্যে ক্ষতির পরিমাণ ১০/১৫ হাজার টাকা থেকে নেমে আসে ২/১ হাজার টাকায়।

ডুপ্লেক্স বাসার সিঁড়ির ফাঁকা জায়গা দিয়ে পড়ে গিয়েছিলো পরিবারের ছোট্ট মেয়েটি। সবাই ভয়ে কান্না শুরু করলো। একজন বরফ আনতে না আনতেই মেয়ে উঠে হাঁটতে শুরু করলো। আট ফুট উচ্চতা থেকে পড়ে গিয়েও তার কোনো হাঁড় ভাঙে নি বা কোথাও আঘাত পায় নি। মেয়েটির বাবা জানালো, পরিবারের সুরক্ষার জন্যে তারা নিয়মিত দান করেন।

শারীরিক কোনো ক্রটি না থাকার পরও দীর্ঘদিন সন্তান হচ্ছিলো না এক দম্পতির। সন্তান লাভের নিয়তে প্রতিদিন সকালে ও বিকেলে দান করতে শুরু করলেন। এখন ফুটফুটে দুই মেয়ে নিয়ে তাদের পরিপূর্ণ সংসার।

আরেক গ্রাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম সারির রেজাল্ট করার পর স্বাভাবিকভাবেই চেয়েছিলেন শিক্ষক হিসেবে যোগ দিতে। কিন্তু মামার জোর বা রাজনৈতিক প্রভাব না থাকায় খুব একটা আশাবাদী ছিলেন না। তবুও আবেদন করলেন এই নিয়ত করে যে, নিয়োগ পেলে প্রথম মাসের বেতনের একটা অংশ মাটির ব্যাংকে দান করবেন। বিস্মিত হয়ে দেখলেন প্রভাবশালী (!) অনেক প্রতিদ্বন্দ্বীদের ডিঙিয়ে যোগ্যতার ভিত্তিতেই তিনি শিক্ষক হলেন।

এভাবেই দানের স্বতঃস্ফূর্ত কল্যাণধারায় হাজারো দাতার জীবনে এসেছে প্রশান্তি, রোগমুক্তি আর সাফল্য। তাই দাতা হোন। যা আছে সেখান থেকেই দান করুন। পেরেশানী থাকবে না। বালামুসিবত থেকে মুক্ত থাকবেন। সাফল্য-প্রাচুর্য আসবে। দাতাদের নামই ইতিহাসে থাকে। যারা মানুষকে সমাজকে দেশকে দেয়ার জন্যে চেষ্টা করেন তারাই সফল হন, অমর হন।

**প্রশ্ন :** ইতিহাসে একজন গ্রহীতার নাম আছে। তিনি মহামতি বুদ্ধ। ভিক্ষাবৃত্তি নাকি প্রথম বৌদ্ধধর্ম থেকে আসে। কথাটি কি ঠিক? আমি শুনেছি তিনি শুধু মানুষের কাছ থেকে দান গ্রহণ করতেন।

**উত্তর :** মহামতি বুদ্ধ যদি ভিক্ষুক হয়ে থাকেন তাহলে বাংলাদেশের চেহারার পাল্টে দেয়ার জন্যে তাঁর মতো ভিক্ষুক একজনই যথেষ্ট। তিনি ছিলেন কপিলাবস্তুর রাজকুমার। জন্মের আগে জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, রাজপুত্র গৃহত্যাগী হবে। সে কথা মাথায় রেখেই পিতা শুদ্ধোধন তাকে কখনো ধর্মচিন্তা বা জীবনের করণ বাস্তবতার মুখোমুখি হতে দেন নি। ডুবিয়ে রেখেছিলেন বিলাস-ব্যসনে। একদিন রাজকুমার বেড়াতে বেরোলে তিন ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। প্রথমে একজন বৃদ্ধ, তারপর একজন অসুস্থ এবং শেষে একজন মৃতকে তিনি দেখতে পান। সহিস চন্ডকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে চন্ড তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, এটিই সকল মানুষের নিয়তি। সেই রাতেই সিদ্ধার্থ তার ঘুমন্ত স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে নিঃশব্দে বিদায় জানিয়ে প্রাসাদ ত্যাগ করেন।

সোনার চামচ যার মুখে ছিলো, সমস্ত আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে সত্যের সন্ধানে যিনি সিংহাসন ছেড়ে গৃহত্যাগী হয়েছিলেন তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করবেন কী জন্যে? বোধিলাভ করার পরেও সিদ্ধার্থকে রাজপ্রাসাদে ফিরিয়ে আনার জন্যে রাজা চেষ্টা কম করেন নি। সন্ন্যাসী হওয়ার পরেও তো বুদ্ধ বাবার কাছে চাইতে পারতেন। তার কিসের অভাব ছিলো যে, তিনি ভিক্ষা করবেন?

আসলে ভিক্ষু আর ভিক্ষুক এক নয়। সে সময় যারা সর্বস্বত্যাগী ছিলেন তাদের সাধনার নিয়ম ছিলো, আগুন জ্বালানো যাবে না। দিনের নির্দিষ্ট সময়ে তারা পাত্র হাতে বেরিয়ে পড়তেন রান্না করা খাবারের খোঁজে। যা পেতেন তা-ই খেতেন। যদি না পেতেন, তাহলে খেতেন না। আসলে এরাই ছিলেন ভিক্ষু যারা সত্যের সন্ধানে, জ্ঞানের সন্ধানে সংসারের সমস্ত মায়া ত্যাগ করে আশ্রমে জড়ো হতেন।

রসুলুল্লাহ (স)-এর যুগেও মসজিদে নববীর পাশে চত্বর ছিলো। সেখানে যারা থাকতেন তাদের বলা হতো আসহাবে সুফফা। চত্বর থেকে তারা বেরোতেন না। কোন মুহূর্তে কোন আয়াত নাজিল হয়, কোন মুহূর্তে নবীজী (স) কী বলেন-সেসব বাণী মুখস্থ করে ফেলতেন। তাদের ঘর-সংসার, আয়-উপার্জন কিছুই ছিলো না। কেউ কিছু দিলে তারা খেতেন। যেদিন জুটতো না, সেদিন খেতেনও না। এদেরকে কি ভিক্ষুক বলা যায়?

আপনি নিজেকে উৎসর্গ করে দেখুন-সিদ্ধান্ত নিন যে, সারাক্ষণ শুধু ধ্যানই করবেন। কেউ কিছু দিলে খাবেন, না দিলে খাবেন না-কতদিন পারবেন? একদিন না দিলে, দ্বিতীয় দিন মেজাজ খারাপ হবে, তৃতীয় দিন অবস্থা আরও খারাপ হবে। কিন্তু এঁদের এমনও সময় গেছে যে, দিনের পর দিন খান নি, পেটে পাথর বেঁধে রেখেছেন। কারণ এরা ছিলেন সাধক, ভিক্ষুক নয়।

**প্রশ্ন :** আমার মাসিক আয় ৩০ হাজার। তার মধ্যে থেকে ২৬ হাজার টাকা পুরোপুরি পরিবারের খরচ এবং এক হাজার টাকা সঞ্চয় করি আর বাকি তিন হাজার টাকা দান করি। এভাবে আমি তৃপ্ত এবং বেশ ভালো আছি। কিন্তু আমার পরিবার থেকে দান কমিয়ে সঞ্চয় বাড়াতে বলে। আমাকে সঠিক নির্দেশনা দিন।

**উত্তর :** যত অন্তর থেকে দান করবেন, তত আপনার বরকত বাড়তে থাকবে। এক্ষেত্রে দানের পরিমাণ না কমিয়ে যদি খরচটাকে কিছু কমাতে পারেন তাহলে ভালো। কিন্তু দান কমাবেন না। মনে রাখবেন, দান কমালে প্রতিদানও কমে যাবে। কারণ স্রষ্টা সৎ দানকে খুব পছন্দ করেন এবং সৎ দানের কমপক্ষে ৭০০ গুণ বরকত তিনি দিয়ে থাকেন। অতএব আপনি ঠিক পথে আছেন। পরিবারকে বোঝান। যদি সম্ভব হয় পারিবারিক খরচ কমিয়ে দিন। কিন্তু দান কমাবেন না।

**প্রশ্ন :** মেডিটেশন করলে পাপ ক্ষয় হয়, দান করলেও পাপমোচন হয়। কীভাবে পাপ ক্ষয় হয় তা ব্যাখ্যা করুন।

**উত্তর :** খুব সহজ। পাপ তো আসলে হয়ে যায়। এটাকে ক্ষয় করার কোনো উপায় নেই, পুণ্যটাকে বাড়াতে হবে। ঐ পুণ্য দিয়ে পাপ ক্ষয় হবে। অতএব, যখনই আপনি মেডিটেশন করছেন, যখনই আপনি দান করছেন-সৎকর্ম

হচ্ছে। সৎকর্মের যে পুণ্য তা জমা হচ্ছে। তার ফলে পাপের তুলনায় পুণ্যের পরিমাণ বাড়ছে। এভাবে পাপ ক্ষয় হয়।

**প্রশ্ন :** আজ পর্যন্ত যতগুলো কাজে মাটির ব্যাংকে টাকা রেখেছি সবগুলোতে সফল হয়েছি। কাজের আগে সৃষ্টির কাছে প্রার্থনাস্বরূপ একবার টাকা রাখি, কাজে সফল হলে শুকরিয়াস্বরূপ আরেকবার রাখি। প্রথম প্রথম মাটির ব্যাংককে ব্যাকডেটেড ব্যাংক মনে করতাম। যে কারণে অনেকদিন মাটির ব্যাংক রাখি নি। ফলে এর সুফল এবং মজা থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

**উত্তর :** মাটির ব্যাংক যে অত্যন্ত বরকতি ব্যাংক, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। এতে দাতা ও গ্রহীতা দুজনেরই কল্যাণ হচ্ছে। যিনি রাখছেন তার কল্যাণ হচ্ছে আর এ টাকা দিয়ে দুস্থ মানুষের কল্যাণ হচ্ছে।

**প্রশ্ন :** আমি ২৬৪ তম কোর্স সম্পন্ন করে পরদিন শান্তিনগরে প্রশান্তি হলে সন্ধ্যায় প্রোথামে যাওয়ার পথে মারাত্মক দুর্ঘটনায় আহত হই। সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে শোকর আলহামদুলিল্লাহ বলে মাটির ব্যাংকে টাকা রাখলাম। শান্তিনগরে যাওয়ার পথে কোয়ান্টা ভঙ্গি করে বসেছিলাম। মেডিটেশন শুরুর প্রাক্কালে কেন এত বড় দুর্ঘটনা ঘটলো? সে ব্যাপারে আমি বিভিন্ন চিন্তা করছি, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছি, দয়া করে কিছু পরামর্শ দিন।

**উত্তর :** যেটাকে আপনি বলছেন মারাত্মক দুর্ঘটনা আসলে কি সেটা মারাত্মক? আপনার দুর্ঘটনা হয়েছে ফেব্রুয়ারির ১২ তারিখে। আর আজ মার্চের ৫ তারিখ। আজ আপনি প্রজ্ঞা জালালি অনুষ্ঠানে এসেছেন এবং এ চিঠি লিখছেন। এটাই প্রমাণ করে যে, আপনার অনেক বড় বিপদ কেটে গেছে। কারণ যেটাকে মারাত্মক দুর্ঘটনা বলছেন-সেটা যদি সত্যিই মারাত্মক হতো তাহলে তো আজ আপনার এখানে থাকার কথা ছিলো না। পঙ্গু হয়ে হাসপাতালে থাকতেন।

আসলে অনেক সময় অনেক বড় বিপদ অল্পের ওপর দিয়ে আল্লাহ তায়ালা কাটিয়ে দেন। আপনার ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। শোকর আলহামদুলিল্লাহ বলেছিলেন এবং মাটির ব্যাংকে টাকা রেখেছিলেন বলেই আল্লাহ আপনাকে এই রহমত করেছেন। আপনি সবসময় শুকরিয়া আদায় করবেন এবং ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমগুলোতে একাত্ম থাকার চেষ্টা করবেন।



**প্রশ্ন :** অনেকে নামাজ এবং ইসলামি আইন সঠিকভাবে পালন করে না, কিন্তু কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকে দান করে ফলও পায়। মাটির ব্যাংকে নিয়ত করে টাকা প্রদান করে ফল পাওয়া কি ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করবেন?

**উত্তর :** এটা তো সহজ বিষয়। নামাজ না পড়া বা ইসলামি আইন না মানার জন্যে তার শাস্তি হতে পারে। এ শাস্তি অপেক্ষা করছে পরবর্তী জীবনের জন্যে। তার আগ পর্যন্ত আপনাকে স্বাধীনতা দিয়ে দেয়া হয়েছে।

তারপরও তা নির্ভর করছে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর। তিনি শাস্তি যেমন দিতে পারেন, চাইলে মাফও করে দিতে পারেন। নামাজ না পড়ার জন্যে কি আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে কাউকে ঘোষণা দিয়ে শাস্তি দিয়েছেন যে, তুমি নামাজ পড় না, এজন্যে তোমার এই শাস্তি?

আর দানের প্রতিদান আল্লাহ তায়ালা দেবেন বলেছেন। দানের এই শর্তস্বরূপ উনি কোথাও বলেন নি যে, দান করার পরে নামাজ পড়তে হবে, রোজা রাখতে হবে। তাহলে আমি প্রতিদান দেবো। কোরআন শরীফের কোথাও কি এরকম কিছু পাবেন? পাবেন না। অর্থাৎ আপনি যে ভালো কাজ করবেন, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিদান দেবেন। দান করে এই উপকারের সাথে নামাজ বা ইসলামি আইন বা শরিয়ার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই।

যেমন, মাটির ব্যাংকে নিয়ত করে দান করছেন এমন অনেক সনাতন ধর্মাবলম্বী, খ্রিষ্ট এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আছেন। তারা উপকৃত হচ্ছেন কেন? কারণ দানের প্রতিদান দেয়ার ওয়াদা আল্লাহ স্বয়ং করেছেন। কোথাও এই প্রতিদানের অন্য কোনো শর্ত দেন নি।

আর আরেকজন নামাজ পড়ছে না কিন্তু মাটির ব্যাংকে দান করে কেন উপকার পাবে-এটা নিয়ে আপনার মাথাব্যথা কেন? উপকার তো দিচ্ছেন আল্লাহ। আপনারটা থেকে তো দিচ্ছেন না, আল্লাহ তাঁর ভান্ডার থেকে দিচ্ছেন। এমন হতো যে, আপনারটা নিয়ে আল্লাহ তাকে দিয়ে দিয়েছেন, তা তো না। এটা এক ধরনের ঈর্ষা। এই ঈর্ষা হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত সাফল্যের অন্তরায়। কারণ হাদীস আছে-আগুন যেমন খড়কুটোকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, ঈর্ষাও তেমনি সমস্ত সৎকর্মকে ধ্বংস করে দেয়। অতএব আরেকজন ভালো আছে দেখে আপনি ভালো বোধ করছেন না-নিজেকে সবসময় এই ঈর্ষা এবং হিংসা থেকে মুক্ত রাখবেন। এতে আপনি প্রশান্তিতে থাকবেন। প্রশস্ত হবে আপনার কল্যাণ ও সাফল্যের পথও।

## দান কি শুধু ধনীরাই করবে?

**প্রশ্ন :** আমি একজন ছাত্র। হক্কুল ইবাদ মাটির ব্যাংকে সবাইকে দান করতে বলা হয় কেন? দান তো করবে ধনীরা। ছাত্রত্ব শেষ করে যখন আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করবো, তখন না দান করার কথা উঠবে।

**উত্তর :** আসলে এখানে দানের ব্যাপারে দুটো ভুল ধারণা কাজ করছে। প্রথমটি হলো—দান শুধু ধনীরাই করবে। সূরা বাকারার প্রথম তিন আয়াতে বলা হয়েছে—এ কিতাবের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, এটি স্রষ্টা সচেতনদের পথ প্রদর্শক। যারা গায়েবে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে এবং প্রদত্ত রিজিক হতে সৎপথে ব্যয় করে অর্থাৎ দান করে। এখানে দানকে স্রষ্টা সচেতনদের অপরিহার্য অংশ হিসেবে বলা হচ্ছে এবং তা শুধু ধনীদের জন্যে নয়। বরং নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ধনী-গরিব সবার জন্যেই। প্রসঙ্গত এখানে রিজিক বলতে শুধু খাবার নয়, বরং অর্থ মেধা শ্রম—সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত। ফলে দানও শুধু অর্থ বা খাবার নয় বরং মেধা শ্রম সময় সেবা—সবকিছু বিতরণের মাধ্যমেই হতে পারে।

আর দ্বিতীয় ভুল ধারণাটি হলো—আমরা মনে করি, যখন অনেক অর্থকড়ির মালিক হবো তখন একটা মসজিদ বানাবো, এতিমখানা বানাবো বা বড় কোনো সেবামূলক কাজ করবো। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে—যখন সামর্থ্য হয়, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব মহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কোনো ইচ্ছা থাকে না। ফলে বড় কিছু করার কল্পনা করতে করতেই আমরা সময় পার করে দেই, বড় কিছু আর করা হয় না।

বড় দান করার সুযোগ যখন আসবে তখন অবশ্যই বড় বড় সেবামূলক উদ্যোগ নেবেন। কিন্তু সে সুযোগ আসার আগেই সজ্জবদ্ধভাবে ছোট ছোট দান দিয়ে আমরা বড় বড় সেবামূলক কাজ করতে পারি। আর এ উদ্দেশ্যেই কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক। এখানে ধনী গরিব ছাত্র পেশাজীবী গৃহবধূ নির্বিশেষে সবাই খুব সামান্য পরিমাণ অর্থও নিয়মিত দেয়ার মাধ্যমে দানের বরকত লাভ করতে পারেন। শাস্ত্রত ধর্মের শিক্ষা এটিই।

**প্রশ্ন :** যারা ছাত্র—আয়ের কোনো উৎস নেই, তারা কীভাবে দান করবে?

**উত্তর :** যদি আর্থিক দান হয়, তাহলে হাতখরচের টাকা থেকে দান করতে হবে। সে যদি দান করে তাহলে এটা তার জন্যে অত্যন্ত কল্যাণকর হবে।

নবীজী (স) বলেছেন, একটা খেজুর যদি থাকে তাহলে খেজুরের একটা অংশ হলেও দান কর। আসলে ছাত্র হোক বা যে-ই হোক, এমন কেউ নেই যার হাতখরচ নেই, যে খরচ করে না। প্রত্যেকে খরচ করছে, নিজের আয় না থাকলেও খরচ করছে। অতএব, সেখান থেকে দান করতে হবে।

দুশ্বর হচ্ছে, দান বলতে শুধু অর্থ বোঝায় না। শুধু অর্থ দান করতে হবে তা নয়। একটু শুভকামনা, সুন্দর ব্যবহার, একটা সুপরামর্শ, পথিককে সাহায্য করা কিংবা পথ থেকে কলার খোসা সরিয়ে ফেলা—এ সবই হতে পারে দান। উপার্জনের আগেও আপনি দাতা হতে পারেন এ সেবার মাধ্যমে।

## দান ॥ কাকে, কীভাবে

**প্রশ্ন :** দান তো অনেকে দেখানোর জন্যে বা নামের জন্যেও করে। এরকম দান থেকে কি বরকত পাওয়া যাবে?

**উত্তর :** যে দান লোক দেখানো, যা মানুষের প্রশংসা বা বাহবা কুড়ানোর জন্যে, দাতার পরিচয় বা স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে করা হয়, তা সৎ দান নয়। দান করে গ্রহীতাকে খোঁটা দেয়া, অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে শোষণ করা দানের বরকতকে নষ্ট করে।

দানের বিনিময়ে গ্রহীতার কাছ থেকে যদি কোনো সুযোগ, আনুকূল্য, সমীহ বা বস্তুগত প্রাপ্তি—এমনকি একটু আপ্যায়ন বা ধন্যবাদও প্রত্যাশা করা হয়, তবে তা যথার্থ দান নয়। কোরআনে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দান করে ও তা গোপন রাখে এবং গ্রহীতাকে এজন্যে খোঁটা ও কষ্ট দেয় না—তারা পুরস্কৃত হবে। তাদের কোনো ভয় ও দুঃখ-কষ্ট থাকবে না। (সূরা বাকারা : ২৬৩)

**প্রশ্ন :** সালামি বা বকশিশ কি দান, হোটেলের টিপস কি দান?

**উত্তর :** না, এটা প্রতিদান। কারণ একজন আপনাকে সেবা করেছে, আপনি তাকে টিপস দিচ্ছেন। এটা দান নয়, প্রতিদান। আর অধিকাংশ সময়ে টিপস আপনি কী জন্যে দেন—এত বড় হোটেলে খেলেন, টিপস না দিলে কী মনে করবে এজন্যে টিপস দেন। অথবা আপনি যে কত বড়লোক—এটা দেখানোর জন্যেও আপনি টিপস দেন। কাজেই সালামি বা বকশিশ দান নয়।

**প্রশ্ন :** নিঃস্বার্থ দান করা এবং নিয়ত/ মানত করে দান করার মধ্যে পার্থক্য কী? মানত করে দান করাটা স্বার্থোদ্ধারের আওতায় পড়ে কি?

**উত্তর :** আসলে, নিঃস্বার্থ এবং নিঃশর্ত-দুটোর মধ্যে তফাত আছে। একটা হচ্ছে স্বার্থহীন, আরেকটা শর্তহীন। নিঃস্বার্থ দান বলতে আমরা বুঝি যাকে দান করা হচ্ছে তার কাছ থেকে কোনো প্রতিদান প্রত্যাশা না করা। যখন মানত/ নিয়ত করছেন, তখন কিন্তু যাকে দান করছেন তার কাছ থেকে কোনো ধরনের প্রতিদান প্রত্যাশা করছেন না। এ প্রত্যাশা হচ্ছে স্রষ্টার কাছে।

কারণ, নিয়ত/ মানত পূরণ করার যে অধিকার শক্তি ক্ষমতা-এ শুধু স্রষ্টার রয়েছে, অন্য কারো নেই। যেহেতু যাকে দান করা হচ্ছে তার কাছ থেকে প্রতিদান প্রত্যাশা করা হচ্ছে না, প্রত্যাশা করা হচ্ছে স্রষ্টার কাছ থেকে-তাই এটা নিঃস্বার্থ। আর স্রষ্টা এ ব্যাপারে নিজেও অঙ্গীকারাবদ্ধ। তিনি নিজেই অঙ্গীকার করেছেন যে, তোমরা দান কর, আমি এর প্রতিদান দেবো। আমি তোমাদের কল্যাণ করবো, মঙ্গল করবো। অতএব, কল্যাণ কামনা করে যখন আপনি নিয়ত/ মানত করছেন-এর মধ্যে দোষের কিছু নেই।

আরেকটা দান হচ্ছে নিঃশর্ত। প্রভু, দান করবো তোমার জন্যে। তুমি খুশি হবে-সেজন্যে আমি দান করছি। শুধু স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্যে। নিজের কোনো মঙ্গল কামনা না করে যে দান-এটা নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম দান। কিন্তু মানত করে দান করাটাও চমৎকার একটি দান। কারণ, স্রষ্টা চাওয়াটাকে পছন্দ করেন। যেকোনো চাওয়ার জন্যে বিনিময় দেয়া সবসময়ই ভালো। কাজেই এই বিনিময়ের মধ্যে দোষের কিছুই নেই, এটাও উত্তম দান।

**প্রশ্ন :** যখন কোনোকিছুর মানত করে মাটির ব্যাংকে টাকা রাখি, তখন যদি মনে মনে বলি, এই মাটির ব্যাংকের কারণে আমার মানত পূরণ হবে। তাহলে কি গুনাহ হবে না? কারণ মানত পূরণের শক্তি কেবলমাত্র আল্লাহর হাতে।

**উত্তর :** প্রার্থনাটা খুব সহজ। হে আল্লাহ! তোমার অবহেলিত বঞ্চিত বান্দাদের জন্যে তুমি দান করতে বলেছো, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্যে দান করছি, তুমি আমার মঙ্গল কর, আমার উপকার কর। কারণ তুমি সমস্ত দানের প্রতিদান দেবে-এই ওয়াদা তুমি করেছো।

আর এতকিছু বলারও দরকার নেই। আল্লাহ সব দেখছেন এবং সব শুনছেন। আল্লাহ! তুমি আমার সব সমস্যা দূর করে দাও-এটা সংক্ষেপে

ভাবলেই চলবে। সবসময় মনে রাখবেন, আপনি যা চিন্তা করছেন এটা আপনার প্রভুও একইভাবে বুঝতে পারছেন। তাকে অত খোলাসা করে ভেঙে বলার কোনো দরকার নেই।

**প্রশ্ন :** বাজারে এখন অনেক জাল বা নকল টাকার নোট আছে এবং আসছে। আমার কাছেও একটা ৫০০ টাকার নোট এসেছিলো। আমি অনেক চিন্তার পরে সেই নকল নোট মাটির ব্যাংকে দান করি। আমি কি ঠিক করলাম? অনুগ্রহ করে জানাবেন।

**উত্তর :** উপকারটাও যদি নকল হয় তখন কী করবেন? কারণ আল্লাহ তায়ালা আপনার অন্তর দেখেন। যেটা কোথাও চলবে না সেটা আপনি মাটির ব্যাংকে রাখলেন। মাটির ব্যাংক ভাঙা হলো। আপনার নামে মানি রিসিট কাটা হয়ে গেল। কিন্তু ব্যাংকে এই নকল নোট নিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এটা ধরা পড়বেই। তাই জেনেশুনে কখনো নকল নোট দান করবেন না। ছিঁড়ে ফেলে দেবেন। যাতে আরেকজন প্রতারিত না হন। আপনি যখনই এটা ছিঁড়ে ফেলবেন তখনই এটা সাদাকা হয়ে যাবে আল্লাহর কাছে। আল্লাহ দেখছেন যে, আপনি কাউকে প্রতারিত করলেন না। কাউকে ঠকালেন না। তিনি আপনার এই সৎকর্মের প্রতিদান দেবেন।

**প্রশ্ন :** যাকাত কি দানের পর্যায়ে পড়ে? যাকাত না দিলে কী অসুবিধা? যাকাত কিভাবে দিলে তা সঠিকভাবে আদায় করা যায়?

**উত্তর :** যাকাত দান নয়, যাকাত হচ্ছে ফরজ। অর্থাৎ ঐচ্ছিক নয়, সামর্থ্য থাকলে যাকাত দিতেই হবে। নিজের প্রয়োজন মেটানোর পর বর্তমান হিসাবে ৮৫ গ্রাম সোনা বা ৫৯৫ গ্রাম রূপা বা সমপরিমাণ অর্থ (৭৪ হাজার টাকা) এক চান্দ্র বছর জমা থাকলে সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের ওপর যাকাত ফরজ। এককথায় বছর শেষে আপনার কাছে সোনা-রূপা, টাকাপয়সা, সঞ্চয়পত্র সব মিলিয়ে ৭৪ হাজার টাকার সম্পদ থাকলে যাকাত ফরজ হবে।

যাকাত যেহেতু ফরজ, তাই সঠিকভাবে যাকাত আদায় না করলে পুরো সম্পদই আপনার জন্যে হারাম হয়ে যাবে। আর যাকাত দিলে সম্পদ হালাল হওয়ার পাশাপাশি তা বাড়তে থাকে। তাই যাকাতদাতা হওয়ার সুযোগ আনন্দিতচিত্তে গ্রহণ করুন এবং দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সজ্ঞাবদ্ধভাবে যাকাত আদায় করুন। আপনার সম্পদ ক্রমাগত বাড়তে থাকবে।

**প্রশ্ন :** মুসলিমরা অমুসলিমদের দান করা জায়েয। কিন্তু অমুসলিমরা মুসলিমদের সাহায্য/ দান করলে তা মুসলিমদের গ্রহণ করা কি জায়েয/ বৈধ? হলে কী জন্যে হবে? সে ব্যাপারে কোরআন হাদীস কী বলে?

**উত্তর :** আমাদের দেশ যারা চালাচ্ছেন তাদের জিজ্ঞেস করুন। এই যে বিদেশ থেকে যত সাহায্য আসছে, ঋণ আসছে—এগুলো কি মুসলমানদের কাছ থেকে আসছে? আসলে আমরা জীবনটাকে খুব সংকীর্ণভাবে দেখি।

অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যাপারে মুসলিম-অমুসলিম চিন্তা করাটাই হচ্ছে বোকামি। একটি রাষ্ট্রে সব ধর্মের লোক থাকে। তারা পরস্পর মিলেমিশে শান্তিতে থাকবে। যার যার ধর্ম পালন করবে। ভালো কাজে সাহায্য করবে, অন্যায় কাজ থেকে পরস্পর পরস্পরকে বিরত রাখবে। এটাই নবীজীর (স) শিক্ষা। নবীজী (স) মদীনাতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন এবং তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হলেন। যাদের নিয়ে তিনি রাষ্ট্র গঠন করলেন—যে চার্টার ছিলো, যাকে ‘মদীনা চার্টার’ বলা হয় সেখানে মুসলমানরা ছিলো এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ সংখ্যালঘু। সেখানে আর্থিক-সামাজিক কোনো লেনদেনে তো কখনো সমস্যা হয় নি। বড় বড় সাহাবীরা ইহুদিদের সাথে লেনদেন করেছেন।

নবীজী তো ইহুদির বাড়িতে দাওয়াত গ্রহণ করেছেন, খাওয়া-দাওয়া করেছেন। তিনি তো প্রশ্ন তোলেন নি যে, ইহুদির বাড়িতে যাওয়া যাবে না, খ্রিষ্টানদের বাড়িতে যাওয়া যাবে না। নবীজীর কাছে কি অমুসলিমরা আসেন নি? তারা কি মেহমান হন নি?

অতএব, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নবীজীর শিক্ষা খুব সুস্পষ্ট। মদীনা সনদে প্রত্যেকের ধর্মপালনের অলঙ্ঘনীয় অধিকারকে স্বীকার করা হয়েছিলো। তারা এক রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসেবে সম-অধিকারসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে সেখানে বসবাস করেছেন। বরং রসুলুল্লাহ (স)-এর নেতৃত্বাধীন সে রাষ্ট্রে মুসলমানরাই ছিলেন সংখ্যালঘু। অতএব অর্থনৈতিক লেনদেন, সামাজিক কাজকর্মের ব্যাপারে মুসলিম অমুসলিম প্রসঙ্গ একেবারেই অবান্তর।

**প্রশ্ন :** কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকের টাকা অন্য কোথাও দান করা যাবে কি না।

**উত্তর :** মাটির ব্যাংকটা তো কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের এবং আপনি এখানে দেয়ার নিয়তেই টাকা রাখছেন। তাহলে অন্য কোথাও এটা কীভাবে দেয়া যাবে? অন্য কোথাও দেয়ার স্বাধীনতা আপনার আছে—কিন্তু মাটির ব্যাংকে

রাখার পর এ টাকার হকদার ফাউন্ডেশন। সবসময় মনে রাখবেন, স্ত্রীর জন্যে যে টাকা রাখবেন, সেটা স্ত্রীর জন্যেই। এটাতে অন্য কাউকে ভাগ দেবেন না। সেটা যত ভালোর জন্যেই হোক না কেন।

আর মাটির ব্যাংকের টাকা ফাউন্ডেশনে দেয়ার চেয়ে ভালো জায়গা আপনি কোথাও পাবেন না। এ টাকা মানুষকে আলোকিত করার জন্যে, মানুষের কল্যাণের জন্যে পরিকল্পিত ও সজ্জবদ্ধভাবে ব্যয় করা হয়। যেহেতু এটি যৌথ কাজ, যত টাকা জড়ো হচ্ছে সমস্ত টাকার সওয়াব আমরা সবাই পাচ্ছি। অর্থাৎ বছরে যদি পাঁচ কোটি বা ১০ কোটি টাকা আসে, সেই ৫/১০ কোটি টাকা দানের সওয়াব আমরা প্রত্যেকে পাচ্ছি। আর মাটির ব্যাংকের টাকা দিয়ে যে কাজগুলো আমরা করছি, তার অধিকাংশ হচ্ছে সদকায়ে জারিয়া। যার ফলে এই দানের পূর্ণ সওয়াব মৃত্যুর পরও আপনি পেতে থাকবেন। তাই মাটির ব্যাংকে নিজে দান করবেন এবং বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবাইকে নিয়মিত দান করতে উৎসাহিত করবেন।

## দান যখন শিক্ষা

**প্রশ্ন :** ভিক্ষুকদের শিক্ষা দেয়া কি সং দানের মধ্যে পড়ে?

**উত্তর :** নবীজী (স) শিক্ষাবৃত্তিকে সবসময় নিরুৎসাহিত করেছেন। অভাবগ্রস্ত এবং ভিক্ষুক কিন্তু এক নয়। আসলে ইসলামসহ অন্যান্য সকল ধর্মে দান এবং তার মাহাত্ম্য সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, আমাদের সমাজে প্রচলিত শিক্ষাব্যবসা কোনোভাবেই তার আওতায় পড়ে না। সাপ্তাহিক ২০০০, দৈনিক যায়যায়দিন ও দৈনিক ইত্তেফাকের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এ সংক্রান্ত কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য।

‘শিক্ষাব্যবসায়ী নেটওয়ার্ক’ শিরোনামের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘ভিক্ষুকদের ঘিরে ইতোমধ্যে গড়ে উঠেছে এক বিশাল নেটওয়ার্ক। এ নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ করছে পেশাদার ভিক্ষুক-গডফাদাররা। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থেকে তারাই পরিচালনা করছে রাজধানীর শিক্ষাভিত্তিক ‘ব্যবসা’কে। ভিক্ষুক-গডফাদাররা সারাদেশ থেকে ভিক্ষুক সংগ্রহ করে শিক্ষার নানা কৌশল শিখিয়ে তাদের ছেড়ে দিচ্ছে রাজধানীর বিভিন্ন স্পটে। সাধারণভাবে ১০০ টাকায় ৫০ টাকা, কখনো কখনো ৪০/৪৫ টাকা পায় ভিক্ষুকেরা, বাকিটা চলে যায় ভিক্ষুক-গডফাদারদের পকেটে।

ভিক্ষাবৃত্তিতে ঢাকা শহরে বছরে প্রায় ৩০ কোটি টাকা আয় করে সঙ্ঘবদ্ধ ভিক্ষুকের দল। এদের প্রতিদিনের আয় গড়ে ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা। মাসিক আয় নয় হাজার টাকা এবং বছরে আয় এক লাখ টাকার ওপর।

এর মধ্যে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয় কয়েকজন পেশাদার ভিক্ষুকের বিলাসবহুল জীবনযাপনের কথা। একজন ভিক্ষুক জমির আলী, তার জমি আছে ৩৫ বিঘা। ভিক্ষার টাকা জমিয়ে প্রতিবছর রংপুরে তার গ্রামের বাড়িতে এক বিঘা করে জমি কেনেন। ছেলে-মেয়েদের জন্মদিনে পাঠান টাকার অভিজাত কনফেকশনারির কেক। ১২টি বেবিট্যাক্সি ও দুইটি মাইক্রোবাসের মালিক ভিক্ষুক জালাল মোল্লার মাসিক আয় ৬০ হাজার টাকা। গ্রামের বাড়িতে তার দোতলা বিল্ডিংয়ের নাম দিয়েছেন মুসাফিরখানা। ভিক্ষুক করম আলী শেখের আছে সুদের ব্যবসা। শহরে ভিক্ষুক সেজে ভিক্ষা করলেও গ্রামে রয়েছে তার আলিশান বাড়ি, প্রাইভেট রিকশা। রিকশাওয়ালার বেতনই দেন মাসে আড়াই হাজার টাকা। (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩.০১.২০০৭)

ভিক্ষাবৃত্তির একাধিক কলাকৌশল ছাড়াও কখনো কখনো ভিক্ষুকরা হয়ে ওঠে আতঙ্ক। একশ্রেণীর মাদকসেবী ভিক্ষুক হাতে র্রেড নিয়ে ভয় দেখিয়ে রিকশা কিংবা বেবিট্যাক্সি যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে। মাঝে মাঝে ছিনতাইও করে। আরেকদল ভিক্ষার নামে মলমূত্র ছিটিয়ে দেয়ার ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করে পথচারী বা রিকশাযাত্রীদের কাছ থেকে। ভিক্ষায় আরো বেশি আয়ের জন্যে পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ হতে ডাক্তারের কাছেও ধরনা দেয় এদের কেউ কেউ।

বিভিন্ন খবরের কাগজের এ রিপোর্টগুলো পড়ার পর এখন আপনি সিদ্ধান্ত নিন ভিক্ষুকদের ভিক্ষা দেয়া সৎ দানের মধ্যে পড়ে কি না।

**প্রশ্ন :** বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চলমান ভিক্ষাবৃত্তি কীভাবে দূর করা যায়? ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধের ব্যাপারে আমার করণীয় কী হওয়া উচিত?

**উত্তর :** আপনার করণীয় খুব সহজ। আপনি নিজে স্বাবলম্বী হোন। আপনি ভিক্ষা চাইবেনও না, ভিক্ষা দেবেনও না। প্রথমে নিজেকে স্বাবলম্বী হতে হবে। আর যখন দান করতে ইচ্ছে হবে, সঙ্ঘবদ্ধ দানের যে সুযোগ রয়েছে সেই সুযোগকে গ্রহণ করবেন। তাহলেই এক থেকে দুই, দুই থেকে চার, এভাবে সৃষ্টি হবে স্বাবলম্বনের সুযোগ।



**প্রশ্ন :** সূরা দোহাতে সাহায্যপ্রার্থীকে তিরস্কার না করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে । অথচ আমরা পথে চলতে অধিকাংশ সাহায্যপ্রার্থী বা ভিক্ষুককে ফিরিয়ে দেয়া কর্তব্য বলে মনে করি । এ নির্দেশের সমন্বয় কীভাবে হবে?

**উত্তর :** আসলে আমরা খুব সহজভাবে বিষয়টিকে দেখতে পারি—একজন বিপন্ন মানুষ বিপদগ্রস্ত হয়ে সাহায্য চাচ্ছে । সে হচ্ছে সাহায্যপ্রার্থী । আরেকজন মানুষ সাহায্য চাওয়ার নামে প্রতারণা করছে—দুজনের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য রয়েছে । এক ভদ্রমহিলা একদিন এসে বললেন, গুরুজী, মাঝে মাঝে তো কিছু ভিক্ষুকদের দেখলে মনটা খারাপ লাগে, আমি কি তখন ভিক্ষা দিতে পারি? আমি বললাম, ঠিক আছে, দেবেন । অসুবিধা কী?

কয়েকদিন পর তার একটা চিঠি পেলাম । চিঠিটা এরকম, একদিন সকালে তিনি হাঁটতে বেরিয়েছিলেন ধানমন্ডি লেকে । হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় দেখলেন এক অল্পবয়সী মা খুব জীর্ণশীর্ণ একটি বাচ্চাকে কোলে নিয়ে মলিন মুখে বসে আছে । ভদ্রমহিলার খুব মায়া হলো । মেয়েটিকে বেশকিছু টাকাপয়সা দিলেন ।

ঘটনাচক্রে সেদিনই আবার একটা কাজে দুপুরবেলা তাকে আসতে হলো ঐ জায়গায় । এসে যে দৃশ্য দেখলেন তাতে তিনি বিস্মিত । সকালবেলার সেই মলিন চেহারার মেয়েটি আরেক মহিলার সাথে খুব জমিয়ে গল্প করছে । তার কোলে বাচ্চাটা নেই । নেই আশেপাশে কোথাও । কিন্তু বাচ্চাটি যে বয়সের বা তার শরীরের যা অবস্থা, তাতে এ সময়ে একজন গৃহহীন মায়ের কোল ছাড়া অন্য কোথাও তার থাকার কথা নয় । তার মানে বাচ্চাটি আসলে এই মেয়েরই নয় । ভিক্ষা করার জন্যে ভাড়ায় পাওয়া এক হতভাগ্য শিশুমাত্র । আর এই মেয়েটিও একজন পেশাদার ভিক্ষুক । সজ্জবদ্ধ ভিক্ষুক চক্রের সদস্য হিসেবে সে এ এলাকায় ভিক্ষা করে ।

এতসব দেখে ভদ্রমহিলা নিজেই বোকা বনে গেলেন । তার আবেগের সুযোগকে কেউ এভাবে কাজে লাগিয়েছে ভেবে নিজেকে প্রতারণিত মনে করলেন । তখন তিনি বুঝলেন কেন ভিক্ষুকদের ভিক্ষা দিতে নিরুৎসাহিত করা হয় । অর্থাৎ সত্যিকারের বিপন্নকে সাহায্য করা ভালো কাজ । কিন্তু সাহায্য করার নামে প্রতারণিত হওয়াটা আহাম্মকি ছাড়া কিছু নয় ।

**প্রশ্ন :** ট্রাফিক সিগনালে দাঁড়িয়ে থাকা ভিক্ষুকদের দান করা কতটা যুক্তিসঙ্গত? প্রতিদিন একই লোককে এ সমস্ত ট্রাফিক সিগন্যালে দেখা যায় ।

**উত্তর :** একই ব্যাপার। একজন তার অভিজ্ঞতা বলছিলেন—একবার রোজায় ইফতারের বেশ আগে আমি বিজয় সরণি সিগন্যালটা পার হবো। এক মধ্যবয়সী মহিলা ভিক্ষুকও পার হবে। খুব মায়া হচ্ছিলো কারণ তার একটা পা নেই, ক্রাচে ভর দিয়ে কষ্ট করে হাঁটছে।

আমি তার বেশ পেছনে, আর সে খানিকটা আগে। এর মধ্যেই দেখি উল্টোদিকের সিগন্যালটা হঠাৎ ছেড়ে দিয়েছে। বাস দেখে আমি পিছু সরে এলাম। আর সামনে তাকিয়ে দেখি মহিলা ক্রাচ হাতে নিয়ে দৌড়ে রাস্তা পার হচ্ছে! আমি জোরে হেসে ফেলেছিলাম। সেই মহিলাকে পরেও দেখেছি ক্রাচ নিয়ে ভিক্ষা করতে। এদের ভিক্ষা দিয়ে আপনি ভিক্ষাব্যবসাকে উৎসাহিত করেছেন। সাহায্য করার নামে শিকার হচ্ছেন প্রতারণার।

**প্রশ্ন :** কেউ কেউ বাড়িতে আসে সাহায্যের জন্যে। যেমন, মেয়ের বিয়ের সাহায্য কিংবা চিকিৎসার জন্যে—এ দান কি করা যাবে?

**উত্তর :** যদি আপনি জানেন, আসলেই সে দুস্থ, তার মেয়ের বিয়ের জন্যে সাহায্যের দরকার, তাহলে দেবেন।

**প্রশ্ন :** আমার বাসায় একটি মাটির ব্যাংক আছে। আমার মা-বাবা মাটির ব্যাংকে টাকা রাখেন। কিন্তু আমার বাবা মাটির ব্যাংকে দানের পাশাপাশি ভিক্ষুকদেরকেও টাকাপয়সা দেন। আমি এ ব্যাপারে অনেক বলেছি। আমি চাই তিনি ভিক্ষুকদের না দিয়ে মাটির ব্যাংকে দান করুন। কীভাবে বলবো?

**উত্তর :** বাবা দিতে চাইলে তো আর আপনি তাকে বাধা দিতে পারবেন না। আর সেটা ঠিকও হবে না। তবে তাকে বোঝাতে পারেন। আর এক্ষেত্রে নিচের খবরটি হয়তো আপনার জন্যে সহায়ক হতে পারে—

আসলে পেশাদার ভিক্ষুকদের নিয়ে গত ২০ বছর ধরেই বলে আসছে কোয়ান্টাম। বিভিন্ন সময়ে জাতীয় দৈনিকের কিছু অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে দেখা যায় তারই প্রতিফলন। ২০১১ সালের জুলাইতে কালের কণ্ঠে প্রকাশিত হয়েছিলো তেমনই এক প্রতিবেদন—

গতকাল সোমবার সকাল। আজিমপুর কবরস্থান এলাকা। শবেবরাতে সারারাত খয়রাত সংগ্রহ শেষে চারজন ভিক্ষুক ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সবার বাড়ি কুড়িগ্রামে। সবাই একসঙ্গে ভিক্ষা করেছেন। চারজন মিলে টাকা

পেয়েছেন ১৮ হাজার ৭৫২। সবই ১০ টাকা, ৫ টাকা আর ২ টাকার নোট। এখন চলছে ভাগবাটোয়ারা। টাকার সঙ্গে পেয়েছেন ৩০ কেজির মতো হালুয়া ও বেশ পরিমাণ রুটি, ১৬-১৭ প্যাকেট বিরিয়ানি। তাদের স্ত্রী-ছেলে-মেয়েরাও ঘুরে বেড়িয়ে শিক্ষা করেছে। সবার টাকা একসঙ্গে মেলানো হবে।

এই ভিক্ষুকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, স্ত্রী-সন্তানরা বাসায় বাসায় গিয়ে হালুয়া, রুটি ও মাংস সংগ্রহ করেছে। ভোরেই তারা ৩০ কেজি হালুয়া বিক্রি করে দিয়েছে। গাবতলী এলাকার এক হোটেল মালিক তাদের কাছ থেকে এই হালুয়া কিনে নিয়েছেন ৩০ টাকা কেজি হিসাবে। যেগুলো বিক্রি হবে না, বাড়িতে নিয়ে বিশেষভাবে অনেকদিন রাখা হবে। কথা বলে জানা যায়, মিরপুর এলাকার কয়েকজন হোটেল মালিক আছেন যারা (কর্মচারীদের মাধ্যমে) প্রতিবছরই আজিমপুর কবরস্থানের সামনে এসে ভিক্ষুকদের কাছ থেকে হালুয়া কিনে নেন।

চার ভিক্ষুকের একজন আজমত শেখ জানান, রাজধানীর আজিমপুর বা হাইকোর্ট-যে এলাকাতেই হোক না কেন, শবেবরাতের আগের দিন এসে তাদের জায়গা কিনে যেতে হয়। এবার তারা এক রাতের জন্যে তিন হাজার টাকা দিয়ে আজিমপুরের দুটি স্পট কিনেছেন। তাদের আরেকটি দল শিক্ষা করছে চায়না বিল্ডিংয়ের সামনে। আজিমপুরে বটতলা, কবরস্থান এলাকা, নিউ পল্টন রোডের কয়েকজন সন্ত্রাসী ও কবরস্থানের কয়েকজন কর্মী এই স্পট বিক্রির ব্যবসা করে। এই টাকার একটি অংশ পুলিশও পায়। টাকা না দিলে তাদের বসতে দেয়া হয় না।

চার ভিক্ষুকের আরেকজন নিয়ামত জানান, তারা কুড়িগ্রাম থেকে ট্রাকে করে আজিমপুর এসেছেন। শবেবরাত ও রোজাকে সামনে রেখে একটি পরিবহন চক্র তাদের আনা-নেয়ার কাজ করে। তাদের যে ট্রাকে করে আনা হয়, সেই ট্রাকে রংপুর বগুড়া শেরপুর চান্দাইকোনা সিরাজগঞ্জ এবং টাঙ্গাইল থেকেও ভিক্ষুক তোলা হয়। তাদের কাছ থেকে জনপ্রতি দেড় হাজার টাকা করে ভাড়া নেয়া হয়েছে আসা ও যাওয়ার জন্যে। তারা সবাই রোজার ঈদের পর আবার ফিরে যাবেন। এর আগ পর্যন্ত ঢাকাতেই থাকবেন। সারাদেশ থেকে ভিক্ষুকরা এভাবেই আসা-যাওয়া করে বলে নিয়ামত জানান।

শবেবরাতে আজিমপুর, বায়তুল মোকাররম, মিরপুর ও হাইকোর্ট মাজার বা বনানী কবরস্থানে খয়রাতপ্রার্থী ভিক্ষুকদের 'হাট' বসে। পুলিশের মতে, এসময় ঢাকায় কমপক্ষে ৫০ হাজার ভিক্ষুক আসে ঢাকার বাইরে থেকে। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা থেকে এসেছেন জামাল মিয়া। বয়স এখন ৫৬।

তিনি বলেন, আমরা সিজনাল ফকির। ১২ মাস ভিক্ষা করি না। বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতে আসি। রোজা আর শবেবরাত আমাদের ভালো সিজন। এরপর একবছর চলে ভালোমতোই। তারপরও যা করি ঐটারে ওভারটাইম বলা যায়। বছরে খাওয়া খরচ বাদ দিয়ে আমাদের একেকজনের দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা থাকে।

আট/ নয় বছর বয়সে টাইফয়েড হয়েছিলো জামাল মিয়া। এরপর থেকেই পঙ্গু। পরিবারের অবস্থা ভালো না। আর কোনো কাজও করতে না পারায় ১০ বছর বয়স থেকে জামাল ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নেন। একপর্যায়ে টাঙ্গাইল, জামালপুর ও সিরাজগঞ্জের আরো সাতজন পঙ্গু ভিক্ষুকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তখন সবাই মিলে পাঁচ সদস্যের একটি দল গঠন করেন। এরপর থেকেই চলছে তাদের এই যৌথ ভিক্ষাবৃত্তি। এখন তাদের পাঁচ সদস্যেরই হাতে পর্যাপ্ত টাকা আছে। বাড়িতেও সবাই ঘর করেছেন। তার ঘর টিনশেডের। বিয়ে করেছেন। সন্তান আছে। দুই মেয়ে এক ছেলে। জমিও কিনেছেন এলাকায়। গরু কিনেছেন চারটি।

আজিমপুরে পাইপ কারখানার সামনে কোলের ওপর কোরআন শরীফ রেখে বিড়বিড় করে শব্দ করছিলেন এক ভিক্ষুক। নাম সুফিয়া বেগম। বয়স বড়জোর ৩০ বছর। স্বপ্ন আলো, এই আলোতে লেখা চোখে দেখার কথা নয়। তার কাছে গিয়ে জোরে শব্দ করে কোরআন পড়তে বলা হলে প্রথমে সুফিয়া ঘাবড়ে যান। শেষ পর্যন্ত তিনি স্বীকার করেন, তিনি কোরআন পড়তে পারেন না। মানুষের সহানুভূতি পাওয়ার জন্যে তিনি সঙ্গে কোরআন রেখে পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সুফিয়ার সঙ্গে কথা বলার সময় সেখানে ভিড় জমে যায়। এগিয়ে আসেন দুজন পুলিশ সদস্য। এ সময় বিপদ আঁচ করতে পেরে বাথরুমে যাওয়ার কথা বলে কোরআন শরীফ রেখেই পালিয়ে যান সুফিয়া। আর ফেরেন নি।

হাইকোর্ট মাজারের সামনের রাস্তায় হুইল চেয়ারে বসে ভিক্ষা করছিলেন এক ভিক্ষুক। পায়ে সাদা কাপড়ের জুতো। মুখে হালকা ছোট ছোট দাঁড়ি। এলাকায় সবাই তাকে ভিক্ষুকদের ‘লিডার’ বলেই জানে। আসল নাম কেউ জানে না। কাছে গিয়ে নাম জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘ফকিরের আবার নাম কী? আমারে সবাই লিডার কয়, কিছু লিখতে চাইলে এই নামেই লিখেন। আমি ভিক্ষুক সমিতির হাইকোর্ট শাখার সভাপতি। আরো কথা বলতে চাইলে তার সঙ্গে পরে যোগাযোগ করতে হবে বলে তিনি জানান। হাইকোর্ট মাজার এলাকার কয়েকজন স্থানীয় ভিক্ষুকের সঙ্গে কথা বলেও এই নেতার নাম জানা

যায় নি। কিছুক্ষণ পর ‘লিডার’কে দেখা গেল হাইকোর্টের উল্টোপাশের ফুটপাথে হুইল চেয়ারে নয়, হেঁটে বেড়াচ্ছেন। হাতে সিগারেট। অনেকটা বিরক্তির সঙ্গে বললেন, পা পঙ্গু হলেও হাঁটাহাঁটি করতে পারেন। অনেকক্ষণ হুইল চেয়ারে বসে থাকায় মাজা ধরে গেছে। এ কারণে এখন একটু হাঁটছেন।

এলাকার কয়েকজন ভিক্ষুকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, হাইকোর্ট এলাকায় সাধারণ দিনে ভিক্ষা করতে এলে এই নেতাকে ২০ টাকা করে দিতে হয়। রাতে ঘুমাতে হলে আরো ২০ টাকা লাগে। আর শবেবরাতের দিনে এই টাকার পরিমাণ আরো বেশি-৫০ থেকে ১০০। কেউ টাকা না দিলে তাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। এই ভিক্ষুকদের মধ্যেও সম্রাসী ও ক্যাডার আছে। এই নেতার দলে ক্যাডার হিসেবে কাজ করে ১০/১২ জন কিশোর ও যুবক ভিক্ষুক। এরা মূলত পঙ্গু ভিক্ষুকদের হুইল চেয়ার ঠেলে বেড়ায় এবং সারা দিন যা আয় হয়, তার অর্ধেক নিয়ে নেয়। ভাসমান যৌনকর্মীদের দালাল হিসেবেও এরা কাজ করে।

অর্থাৎ এটাই হলো পেশাদার ভিক্ষুকদের অবস্থা। বাবাকে খুব সুন্দর ভাষায় এগুলোই বুঝিয়ে বলুন। তারপরও যদি তিনি দিতে চান, সেটাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিন।

## কীভাবে ব্যয় হয়

**প্রশ্ন :** কোয়ান্টাম অফিসের সাথে যারা জড়িত অর্থাৎ বিভিন্ন কাজকর্ম করে থাকে তাদের বেতন কীভাবে দেয়া হয়? মাটির ব্যাংকের টাকা এতে ব্যবহার হয় কি না।

**উত্তর :** কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের কর্মীদের ব্যয় নির্বাহের জন্যে আমাদের অন্যান্য খাতের আয়গুলোই যথেষ্ট। মাটির ব্যাংকের অর্থ সুনির্দিষ্টভাবেই আমরা সৃষ্টির সেবায়, দারিদ্র বিমোচন এবং মানুষকে আলোকিত করার কাজে ব্যয় করছি।

**প্রশ্ন :** এই ব্যাংকের টাকা কি সবসময় লামায় দুস্থ মানুষের জন্যে দেয়া হয়?

**উত্তর :** আমাদের সেবামূলক কাজের অনেক খাতের মধ্যে একটা হচ্ছে লামা। এই টাকা সৃষ্টির জন্যে কল্যাণকর সব খাতে ব্যয় হয়।

**প্রশ্ন :** আমি নিয়মিত মাটির ব্যাংকে দান করি এবং যথেষ্ট উপকার পাচ্ছি। কিছুদিন আগে সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকার ভিক্ষুকদের ওপর প্রতিবেদন পড়ে ওদেরকে যা ভিক্ষা দিতাম তা-ও মাটির ব্যাংকে রাখছি। কারণ কোনটা যে ভিক্ষুক বুঝতে পারছি না। আমি কি ঠিক করছি? আর মাটির ব্যাংকের টাকা কী খাতে খরচ হয়?

**উত্তর :** আপনি ভিক্ষুকদের টাকা না দিয়ে যে টাকা মাটির ব্যাংকে রাখছেন সবচেয়ে সঠিক কাজটি করছেন। আর মাটির ব্যাংকের টাকা পুরোটাই দুস্থ মানুষকে আলোকিত করার কাজে ব্যয় হয়, সেবামূলক কাজে ব্যয় হয়, হক্কুল ইবাদে ব্যয় হয়।

**প্রশ্ন :** আমি মাটির ব্যাংকে নিয়মিত টাকা রাখি। কিন্তু কিছুদিন আগে কোয়ান্টামের হয়ে মাটির ব্যাংকের কাজ করেন এমন একজন আন্টির হাজবেন্ড উক্তি করলেন যে, মাটির ব্যাংকের টাকা যাদের পেছনে খরচ হয় তারা তো অনেকেই মুসলমান না। মাটির ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে কোনো লাভ নেই। এ ধরনের উক্তি আমার মধ্যে একটু দ্বিধা তৈরি করেছে। এ সম্পর্কে কিছু বললে উপকৃত হবো।

**উত্তর :** যিনি এটা বলেছেন তার আসলে ধর্ম সম্পর্কে, ইসলাম সম্পর্কে খুবই সীমিত জ্ঞান। কোরআন হাদীসে দানের গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে। দানের কোনো ধর্ম নেই, কোনো গোত্র নেই, কোনো জাত নেই, পাত নেই, বর্ণ নেই। দানের কোনো মুসলমান নেই, হিন্দু নেই, খ্রিষ্টান নেই, বৌদ্ধ নেই। দানের ক্ষেত্রে আছে শুধু মানুষ। রসুলুল্লাহ (স)-এর হাদীস রয়েছে-‘তোমার প্রতিবেশী যদি না খেয়ে থাকে এবং তুমি যদি পেট পুরে খাও তাহলে তুমি ঈমানদার নও, মুসলমান নও।’ এখানে প্রতিবেশীর কথা বলা হয়েছে। মুসলমান প্রতিবেশীর কথা বলা হয় নি।

ইসলাম জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের কল্যাণ করার কথা বলেছে। আর মাটির ব্যাংকের টাকায় শুধু লামার কাজ না, খতনা কার্যক্রম মাটির ব্যাংকের টাকায় হচ্ছে। যতরকম সেবামূলক কার্যক্রম, তার একটা বড় অংশ হচ্ছে মাটির ব্যাংকের টাকায়। আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি-মাটির ব্যাংকের টাকার দানের যে বরকত তা প্রত্যেকেই পাচ্ছেন।

**প্রশ্ন :** আমরা লামায় যে কোরবানি দিই তার মাংস মুসলমান ছাড়াও বিধর্মীরা খাচ্ছে। তা কি শরিয়ত মোতাবেক হচ্ছে?

**উত্তর :** শরিয়ত সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুব ক্ষুদ্র। আমরা আমাদের ক্ষুদ্রতা দিয়ে ধর্মকে ক্ষুদ্র করে ফেলি। কোরবানির মাংস প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করছি। অভুক্ত প্রতিবেশীকে অনু দান করা ঈমানের অংশ। আর প্রতিবেশী যেকোনো ধর্মের হতে পারে।

হযরত ইবরাহীম (আ) খুব অতিথিপরায়ণ ছিলেন। প্রায়ই চেনা অচেনা মেহমানদের বাড়িতে নিয়ে আসতেন, খাওয়াতেন, থাকার ব্যবস্থা করে দিতেন। তার প্রতিদিনের অভ্যাস ছিলো—বাড়ি থেকে একটু দূরে বড় রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। পরিশ্রান্ত পথিক পেলোই তিনি নিয়ে আসতেন ঘরে। প্রতিদিন অন্তত একজন অতিথিকে না পেলো তার ভালো লাগতো না।

একবার তিনি তিন দিন দাঁড়িয়ে থেকেও কোনো অতিথিকে পেলেন না। তিন দিন পর সন্ধ্যায় দেখলেন, উটের পিঠে চড়ে আসছে এক বৃদ্ধ পথিক। তিনি খুব খুশি হলেন। অনেক সমাদর করে তাকে ঘরে নিয়ে গেলেন। খাবার পরিবেশন করে অতিথিকে সাথে নিয়ে ইবরাহীম (আ) যখন বসলেন, দেখলেন—অতিথি ‘বিসমিল্লাহ’ না বলেই খাবার মুখে তুলছে। ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি খাওয়ার আগে আল্লাহর নাম নিলেন না? লোকটি বললো, দেখুন আমি একজন অগ্নি উপাসক। বিসমিল্লাহ বলে খাওয়ার কোনো নিয়ম আমার ধর্মে নেই।

শুনে ইবরাহীম (আ) খুব বিরক্ত আর রাগান্বিত হলেন। দূর দূর করে তিনি বৃদ্ধকে তাড়িয়ে দিলেন। লোকটি চলে যাওয়ার পর হযরত জিবরাঈল (আ) তার কাছে এসে বললেন, দেখ! এই লোকটির বয়স ৮০ বছর। গত ৮০ বছর ধরেই আল্লাহ এ লোকটিকে প্রতিপালন করে চলেছেন—সে আল্লাহকে স্মরণ না করলেও। আর তুমি একবেলার জন্যেও তাকে খাওয়াতে পারলে না।

শুনে ইবরাহীম (আ) খুবই লজ্জিত হলেন। নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। অনেক খুঁজে অবশেষে পেলেন বৃদ্ধকে। মাফ চেয়ে অনুনয়-বিনয় করে নিয়ে এলেন এবং একসাথে বসে খেলেন। আসলে ইসলামের শিক্ষা এটাই। দুহুকে সাহায্য করার সময় আপনি দেখবেন—সে মানুষ এবং সে বিপন্ন। তার ধর্ম কী, তার বর্ণ কী, তার গোত্র কী, তার ভাষা কী তা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়।

## দানে উদ্বুদ্ধ করা

**প্রশ্ন :** আমি নিজে মাটির ব্যাংকে দান করি। কিন্তু এর কথা অন্যদের কাছে বলার ব্যাপারে কিছু দ্বিধা-সংকোচ রয়েছে। এক্ষেত্রে কী করণীয়?

**উত্তর :** মাটির ব্যাংকে দানের ব্যাপারে অন্যদের উদ্বুদ্ধ করতে দ্বিধা-সংকোচ থাকার কোনো যুক্তি নেই। কারণ এর মাধ্যমে আপনি একদিকে ধর্মের নির্দেশ পালন করছেন, অন্যদিকে তার উপকার করছেন। সূরা আল ফজরের ১৬-২০ নং আয়াতে বলা হয়েছে—যখন কারো রিজিক সংকুচিত হয় তখন সে বলে, আমার রব আমাকে হেয় করেছেন। তখন আল্লাহ বলেন, এটা অমূলক কথা। তোমাদের এ অবস্থার কারণ তোমরা এতিমকে সম্মান কর নি, অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করতে পরস্পরকে উৎসাহিত কর নি এবং অর্থ সম্পদের প্রতি সীমাহীন লোভে আচ্ছন্ন হয়ে তা কুক্ষিগত করেছো। অর্থাৎ শুধু নিজে দান করা নয়, এই দানে অন্যদেরকেও উৎসাহিত না করলে আপনার রিজিক সংকুচিত হবে, আপনি অভাবগ্রস্ত হবেন। ঋগবেদে বলা হয়েছে, ‘এসো প্রভুর সেবক হই। গরিব ও অভাবীদের দান করি।’ অর্থাৎ গরিব ও অভাবীকে দান করা ঈশ্বরের সেবা করা।

আপনি আপনার কোনো ব্যক্তিগত লাভের জন্যে মাটির ব্যাংকের কথা অন্যকে বলছেন না বরং এর মাধ্যমে আপনি তারই উপকার করতে চান। সেটা কীভাবে? প্রথমত, আপনি তাকে সঠিকভাবে দান করার সুযোগ করে দিচ্ছেন ও তার বৈষয়িক সমৃদ্ধি আনয়নে সাহায্য করছেন। দ্বিতীয়ত, এর মাধ্যমে আপনি তার কাছে জীবনযাপনের বিজ্ঞানের বাণী পৌঁছে দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। আর এভাবে তার দৈহিক মানসিক পারিবারিক ও আত্মিক সমৃদ্ধিতেও আপনি ভূমিকা রাখছেন। যেমন, আপনি প্রথম কাউকে একটি মাটির ব্যাংক দিলেন এবং তাকে দান করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। পরেরবার তার সঙ্গে দেখা হলে তার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিন, তার সমস্যার কথা শুনুন এবং জীবনযাপনের বিজ্ঞানের আলোকে তাকে পরামর্শ দিন এবং তা অবশ্যই আন্তরিকতা, মমতা ও সহানুভূতির সাথে। মূলত মাটির ব্যাংকের মাধ্যমে আপনি তাকে সৎকাজে সম্পৃক্ত করছেন, আলোকিত করছেন।

কাজেই মাটির ব্যাংকের ব্যাপারে সমস্ত লজ্জা, সংকোচ ঝেড়ে ফেলতে হবে। কারণ একজন মানুষকে ভালামুসিবত থেকে মুক্ত ও আলোকিত করার মতো পুণ্যময় কাজটিই আপনি করছেন।



**প্রশ্ন :** যারা কোয়ান্টাম সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করে না তাদের জন্মদিনে কি মাটির ব্যাংক উপহার হিসেবে দেবো?

**উত্তর :** যে কাউকে দিতে পারেন উপহার হিসেবে। আমার কাছে তো মনে হয় এর চাইতে উত্তম উপহার আর কিছু হতে পারে না। কারণ, আপনি তাকে কল্যাণের পথ দেখাচ্ছেন, জীবন-মুক্তির পথ, বালামুসিবত দূরের পথ, রিষিক বৃদ্ধি করার পথ দেখাচ্ছেন। সবদিক থেকেই মাটির ব্যাংক একটি উত্তম উপহার। এর সাথে সবসময় মাটির ব্যাংকের ব্রোশিউর বা বুলেটিন দেবেন। তাতে তিনি পুরো কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন।

**প্রশ্ন :** ঘরে মা-বাবা-মুরুব্বীদের মাটির ব্যাংকে দান সম্পর্কে বিশ্বাস করাতে কষ্ট হচ্ছে। এখন কী করা যায়?

**উত্তর :** এ নিয়ে জোর করবেন না। আসলে একটা বয়সের পর অধিকাংশ মানুষেরই নতুন ধ্যানধারণা গ্রহণের মানসিকতা তেমন থাকে না। আপনার মা-বাবা বা মুরুব্বীদের হয়তো দানের ব্যাপারে নিজস্ব কোনো ধারণা আছে যা তিনি বদলাতে চান না। মাটির ব্যাংকের ব্যাপারটা তাই তাদের ওপর চাপিয়ে না দিয়ে সেই ভাষায় বোঝানোর চেষ্টা করুন যে ভাষা তারা বোঝেন। নীরব দানের গুরুত্ব বোঝান এবং বলেন যে, দানের একটা সহজ উপায় হলো মাটির ব্যাংক। মাটির ব্যাংক নিয়ে বিশেষ কিছু বলার দরকার নেই। বলবেন, দান করা ভালো এবং দানটা যাতে সহজে করতে পারো—এজন্যেই মাটির ব্যাংক। আর তারপরও যদি তারা মানতে না চান তাহলে আর কিছুই বলবেন না। আপনি আপনার মতো দান করে যান। আর তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন যাতে তারা সঠিক সত্য উপলব্ধি করতে পারেন।

**প্রশ্ন :** অপরিচিত বা মোটামুটি পরিচিত যারা ঢাকার বাইরে থাকেন, যাদের সাথে আমার যোগাযোগ হয়, তাদেরকে কি মাটির ব্যাংক দিতে পারি?

**উত্তর :** যেকোনো মানুষের কল্যাণের জন্যে তাকে মাটির ব্যাংক দিতে পারেন। কাকে দিচ্ছেন শুধু তার নাম ঠিকানা রেখে দেবেন। যাতে করে তিন/ চার মাস পর যোগাযোগ করে তার কাছ থেকে মাটির ব্যাংক সংগ্রহ বা ফেরত আনতে পারেন এবং নতুন আরেকটি ব্যাংক তাকে দিতে পারেন

## উদ্ধৃত করতে গিয়ে বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা

**প্রশ্ন :** গুরুজী, মাটির ব্যাংক সম্পর্কে জানাতে গেলে অনেকে মনে করে এতে আমার কোনো লাভ আছে। তখন উত্তরে কী বললে একজন মানুষকে সহজে বোঝাতে সক্ষম হবো?

**উত্তর :** বলবেন, অবশ্যই আমার লাভ আছে। কোনো লাভ না থাকলে কি আমরা এ কাজ করি? লাভটা কী? এই ব্যাংক যে আমি আপনাকে দিচ্ছি, কেন দিচ্ছি? কারণ, এতে দান করলে আপনি নিজে উপকার পাবেন। সেই সাথে আপনার যে সওয়াব তার সমপরিমাণ সওয়াব আমার আমলনামায় লেখা হবে। এজন্যে আপনাকে মাটির ব্যাংক দিচ্ছি। আপনার উপকার তো হবেই, আমার উপকারও হবে। এখানে দান যত বাড়বে, সওয়াবও তত বাড়বে।

মাটির ব্যাংকে দানে লাভের কোনো শেষ নেই। ধরুন, একজন ৫০ টাকা মাটির ব্যাংকে দান করে মারা গেছেন। কিন্তু যেহেতু এটি সজ্জবদ্ধ দান এবং যদি ১০০ কোটি টাকা এ ব্যাংকে আসে তো ঐ ৫০ টাকা থেকেই ১০০ কোটি টাকার সওয়াব তিনি পেতে থাকবেন সদকায়ে জারিয়া হিসেবে।

**প্রশ্ন :** আমি মাটির ব্যাংক বিতরণ করেছি। অনেকে প্রশ্ন করে, পীর সাহেবের কাছে গিয়ে সমস্যা যায় নি, মাটির ব্যাংকে দান করে কি সমস্যা যাবে?

**উত্তর :** আমরা কখনো বলি না যে, মাটির ব্যাংকে দান করলেই সমস্যা যাবে। আমরা যা বলি, তা হলো, মাটির ব্যাংকে দানের প্রতিদানে আল্লাহ এ সমস্যামুক্ত করে দেবেন। আর তথাকথিত পীর সাহেবের কাছে গেলে তো সমস্যা যাবেই না। কারণ এই পীর সাহেবদের নিয়ে বিখ্যাত এক উক্তি করেছিলেন আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (র)। তিনি বলেছেন, মুরিদ পীর ধরে আখেরাত পাওয়ার জন্যে, আর পীর মুরিদ ধরে দুনিয়া পাওয়ার জন্যে। অতএব টাকা পাওয়ার জন্যে সে আপনাকে ধরেছে। আপনি টাকা দেবেন কিন্তু আপনার কোনো উপকার হবে না।

পীর সাহেবের কাছে টাকা দেয়া নিয়েও খুব মজার ঘটনা আছে। এক ডাক্তার এফসিপিএস পরীক্ষা ছয়বার দিয়েও পাস করতে পারে নি। শেষবার এক পীর সাহেবকে নগদ ১০ হাজার টাকা দিলো যাতে সে পাস করতে পারে। কিন্তু সেবারও ফেল। তখন তার এক কোয়াস্টাম থ্রাজুয়েট বন্ধু তাকে

বললো, তুমি তো পীর সাহেবকে এডভান্স ১০ হাজার টাকা দিয়ে এসেছো। কারণ পীর সাহেবদের সবসময় এডভান্স দিতে হয় এবং দোয়া কবুল না হলেও এই টাকা ফেরত নেয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। এবার তুমি আবার ১০ হাজার টাকার একটা মানত কর। তবে পুরোটা না দিয়ে অর্ধেক দাও এবং বাকিটা পাশ করতে পারলে দেবে—এ মানত কর। বলে তাকে একটা মাটির ব্যাংক দিলো। সে তার বন্ধুটির কথা শুনলো এবং পাঁচ হাজার টাকা রাখলো। শুকরিয়ার ব্যাপার হলো, এবার সে পাশ করলো। অবাক হয়ে সে বার বার তার বন্ধুর কাছে জিজ্ঞেস করছিলো যে, এটা কেমন করে হলো? তার বন্ধু বুঝিয়ে বললো, দেখ, এটা কোনো পীরের কেলামতি না, কোয়ান্টামেরও কোনো অলৌকিক ক্ষমতা না। এটা হলো দুস্থদের জন্যে সং নিয়তে দানের মাহাত্ম্য।

**প্রশ্ন :** আমার এক আত্মীয় প্রশ্ন তুলেছেন যে, আমরা মাটির ব্যাংকের মাধ্যমে শিরক করছি। কারণ আমরা মাটির ব্যাংক যাদেরকে দিচ্ছি তারা বলছেন, মাটির ব্যাংকের মাধ্যমে এই এই সাফল্য পেয়েছি। কেউ কেউ বলছে, মাটির ব্যাংকে কিছু একটা আছে, যার জন্যে এত সাফল্য আসছে। এতে কি শিরকের মতো গুনাহ হচ্ছে? এর উত্তর কীভাবে দেবো?

**উত্তর :** কেউ কেউ হয়তো এভাবে বলে থাকতে পারেন কিন্তু আমরা সবসময়ই বলি, সৃষ্টির সন্তুষ্টির জন্যে দানের কারণে এই বরকত। আসলে শিরক সম্পর্কে কারো কারো সঠিক ধারণার অভাব রয়েছে। সঠিক ধর্মীয় নির্ধারিত শিরককে বোঝার চেষ্টা না করে তারা তর্ক বা কথার মারপ্যাচে শিরক খোঁজার চেষ্টায় ব্যাকুল থাকে। ফলে দৈনন্দিন সাধারণ কথোপকথনও অনেক সময় তাদের কাছে শিরকের মহাপাপ হিসেবে ধরা দেয়। যেমন, একটি ছেলে খুব ভালো একজন শিক্ষকের কাছে পড়ে এ-প্লাস পেলো। ছেলেটির মা-বাবা যদি বলেন, ঐ শিক্ষকের কাছে পড়ে আমার ছেলে রেজাল্ট করেছে, তার মানে কি এটা শিরক হয়ে গেল? নিশ্চয়ই না। কারণ এটা একটা সাধারণ কথোপকথনের রীতি।

শিরক মানে আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করা। এটা যতটা না প্রায়োগিক তার চেয়ে বেশি মানসিক বা বিশ্বাসের। যেমন, বলা হয় আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে কিছু চাওয়া যাবে না। কিন্তু মা-বাবার কাছে আমরা কি চাই না? বলি না যে, মা, পাঁচটা টাকা দাও; বাবা, অমুক জিনিসটা এনে

দাও। বলি। কারণ এটাই দৈনন্দিন কথোপকথন।

কাজেই সবকিছুতে শিরক খোঁজার মানসিক জটিলতায় যারা আক্রান্ত তাদের কথা দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। এরা নিজেরা সৎকর্ম করছে না, করতে সাহায্য করছে না এবং আরেকজন করুক এটাও চাচ্ছে না। এদের অবস্থা হচ্ছে কোরআনের সূরা মুদাস্সির-এ বর্ণিত মানুষদের মতো, যারা পরকালে ব্যর্থ হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের এই ব্যর্থতা বা জাহান্নাম কী জন্যে? তখন তারা বলবে, আমরা সালাত কায়েম করি নি, অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করি নি এবং অন্যদের সাথে মিলে অন্যায প্ররোচনা ও অন্যায কাজে লিপ্ত থেকেছি।

**প্রশ্ন :** একবার এক থ্রাজুয়েটের বাসায় মাটির ব্যাংক দিতে গিয়ে বেশ তিজ্ঞ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলাম। ব্যাংক তো নিলেনই না উপরন্তু ফাউন্ডেশনকে নিয়ে অনেক বাজে কথা বললেন। আমরা নাকি কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করছি। মানুষকে প্রতারিত করছি। তার কোনো সুস্পষ্ট অভিযোগ ছিলো না। সবই এরকম মোটাদাগের অভিযোগ।

**উত্তর :** লেবাননের কবি কাহলিল জিবরানের একটি চমৎকার গল্প আছে এ প্রসঙ্গে। তার ব্রোকেন হার্ট গল্পগ্রন্থের গল্প ‘দ্যা টেম্পেস্ট’ বা ‘ঝড়’। গভীর জঙ্গলে পরিত্যক্ত এক ভাঙা বাড়ি। এক দরবেশ সেখানেই সাধনায় নিমগ্ন। এক শীতের রাতে প্রচণ্ড ঝড় হলো।

ঝড়, বজ্রপাত আর গাছপালা ভাঙার তান্ডব চললো সারারাত। এর মধ্যেই ভাঙা জানালা দিয়ে একটা পাখি এসে পড়লো দরবেশের ঘরের ভেতরে। বৃষ্টিতে ভিজে ঠান্ডায় মৃতপ্রায়। আলতো হাতে পাখিটিকে তুলে নিয়ে দরবেশ দেখলেন তার একটা ডানা ভেঙে গেছে। গুরু করলেন শুশ্রূষার কাজ। নিজের পাগড়টাকে ভাঁজ করে বিছানার মতো করে তার মধ্যে পাখিটাকে রাখলেন। পাগড়টাকে চুলোর পাশে রেখে দিলেন যাতে ধীরে ধীরে উষ্ণ হয়ে ওঠে পাখিটা। মলম এনে লাগিয়ে দিলেন ক্ষতস্থানগুলোতে। ভাঙা ডানাটাকে বেঁধে দিলেন একটা কাঠির সাথে। খাবার ও পানি দিতে লাগলেন সময়মতো।

সেবা-শুশ্রূষা পেয়ে আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠলো পাখিটি। একসময় একটু একটু উড়তেও পারলো। একদিন ডানা মেলে উড়ে গেল সে এই পরিত্যক্ত বাড়ি ছেড়ে, তার পরম কল্যাণকামী আশ্রয়দাতাকে ছেড়ে। এই বাড়ি একদিন দুর্যোগের রাতে তার আশ্রয়স্থল হয়েছিলো, এই আশ্রয়দাতার

অক্লান্ত সেবাযত্নে সে ভালো হয়ে উঠেছিলো। দরবেশ কিন্তু কষ্ট পান নি। বরং এই পরিণতির কথা তিনি জানতেন। একটি মৃতপ্রায় জীবনের বেঁচে ওঠার সহযোগী তিনি হতে পেরেছেন—এটাই ছিলো তার পরম তৃপ্তি। যখন ডানা ভাঙা ছিলো তখন তার জীবনে দরবেশের প্রয়োজন ছিলো। আজ যখন সে উড়তে শিখেছে, সে মুক্তির আনন্দে অবগাহন করুক আর তিনি মনোনিবেশ করুন আরো অসহায় আত্মের কল্যাণে—এটিই ছিলো তার অভিপ্রায়।

আমাদের ফাউন্ডেশনেও অনেকে আসেন এই পাখির মতোই—যাদের ডানা ভাঙা থাকে। অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক বা আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে বেঁচে থাকার আশা হারিয়ে তারা আসেন। আমরা মমতা দিয়ে, পরিচর্যা দিয়ে তার এই ক্ষতকে সারিয়ে নতুন জীবনের আবাহনে উজ্জীবিত করি।

এদের কেউ কেউ হয়তো এই পাখির মতোই উড়ে চলে যান। প্রশান্তি নিয়ে, সুস্থ হয়ে বা সাফল্য পেয়ে তারা আবার নিজেদের বলয়ে ফিরে যান। একটুখানি পেয়েই হয়তো তারা ভাবেন, পেয়ে গেছি। আর কিছু পাওয়ার নেই। তারা তৃপ্ত হয়ে যান। তবে সবাই নন। অধিকাংশই আরো শক্ত বন্ধনে জড়িয়ে শুধু থেকে যাওয়া নয়, নিজেরাও হয়ে ওঠেন এই দরবেশের মতো একেকজন সেবক। এটাই নিয়ম।

কাজেই যে উড়ে চলে যায় তার জন্যে সবসময় তৃপ্তির হাসি হাসবেন। তার যখন বিপদ ছিলো, প্রয়োজন ছিলো, আমরা তাকে সেবা করেছি। আজ আর আমাদের সেবার প্রয়োজন তার নেই। আমরা দূর থেকে তার জন্যে মঙ্গলকামনা করে যাবো। তবে যদি সে কখনো ফিরে আসতে চায়, আসবে। আমরা আনন্দিতচিত্তে তাকে বরণ করে নেবো।

আর বদনাম যদি কিছু করে আরো তৃপ্ত হবেন। সে আসলেই উপকৃত হয়েছে, তা না হলে সে বদনাম করতো না। কারণ কিছু কিছু মানুষ আছে উপকৃত হলে সে নিজেকে ছোট মনে করে—অমুকের কাছ থেকে আমি উপকৃত হয়েছি। নিজের অহমটাকে ঢাকার জন্যে তারা নিন্দা করে।

অতএব মাটির ব্যাংক সম্পর্কে যদি কেউ বদনাম করে থাকে তো তৃপ্ত হবেন, তার জন্যে দোয়া করবেন। সে যে উপকৃত হয়েছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকবেন। তারপরও আমরা তার কল্যাণ কামনা করবো—সে আরো ভালো থাকুক, একটা সময় হয়তো আসতে পারে যখন তিনি তার ভুল বুঝবেন। তিনি আবার আমাদের সাথে আসবেন। কাজেই যেকোনো মানুষ আসুক—আমরা তার সেবার জন্যে সবসময় প্রস্তুত। তার ভাঙা ডানা শক্ত হোক, সে মুক্তির আনন্দে উড়ে বেড়াক। এটাই আমাদের আনন্দ।

## মাটির ব্যাংকে দানের প্রক্রিয়া

**প্রশ্ন :** মাটির ব্যাংকে সর্বনিম্ন কত টাকা হলে জমা দেয়া যাবে?

**উত্তর :** মাটির ব্যাংকে দানের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন বলে কিছু নেই। তিন/ চার মাস পর ব্যাংকে জমা অর্থ ফাউন্ডেশনে দিয়ে নতুন ব্যাংক নিয়ে যাবেন।

**প্রশ্ন :** কোনো সফলতা অর্জনের উদ্দেশ্যে যদি মানত করা হয় যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সফলতা অর্জিত হলে কোয়ান্টাম ব্যাংকে মানবতার কল্যাণের জন্যে .... টাকা দেবো। ঐ পরিমাণ টাকা যদি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই এডভান্স দেয়া হয়, তাহলে কি সফলতা অর্জন ত্বরান্বিত হবে?

**উত্তর :** চেষ্টা করে দেখতে কোনো দোষ নেই। পরম করুণাময় যেকোনো সময় করুণা করতে পারেন। কিন্তু যদি না হয়? কোনো অসুবিধা নেই। ঐ টাকা তো মানুষের কল্যাণেই ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি যে, যতবারই মানত করা হয়েছে, যতবারই টাকা দেয়া হয়েছে, চমৎকার ফল পাওয়া গেছে। অতএব মানত করে ফেললে টাকা আপনি আগেও দিতে পারেন।

**প্রশ্ন :** মাটির ব্যাংকে টাকা দেয়ার নিয়ত করে সাথে সাথে না দিয়ে তিন/ চারদিন এমনকি সপ্তাহ পরে জমা করি, এতে কোনো অসুবিধা হবে কি?

**উত্তর :** একটা অসুবিধা হচ্ছে, অনেক সময় আপনি ভুলে যাবেন। যাতে ভুলে না যান সেই জন্যে সাথে সাথে জমা করবেন।

**প্রশ্ন :** অনেক সময় আমরা যে পরিমাণ টাকা মাটির ব্যাংকে দেবো বলে নিয়ত করি, দেখা যায় সেই পরিমাণ টাকা হাতে নেই। এজন্যে অল্প টাকা, যা আছে তা-ই দিয়ে দেই। এতে কি নিয়তের কোনো খেলাপ হবে বা যা নিয়ত করেছিলাম পরে কি তা আবার দিয়ে দিতে হবে?

**উত্তর :** নিয়ত সামর্থ্য অনুসারেই করবেন। টাকা যা আছে সে অনুসারেই নিয়ত করবেন। দিতে পারবেন না, পূরণ করতে পারবেন না-এরকম নিয়ত করবেন না। কিন্তু নিয়ত করলে সেটা অবশ্যই দেবেন।

**প্রশ্ন :** মাটির ব্যাংকে নিয়ত করলে সেটা যদি আসল পথে পূরণ না হয়ে দুনম্বর পদ্ধতিতে হয়, তাহলে কি নিয়ত পূরণ করতে হবে?

**উত্তর :** নিয়ত করলে কাজটা এক নম্বর পদ্ধতিতে হবে, না দুনম্বর পদ্ধতিতে হবে—সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নিয়ত করলে পূরণ করতে হবে।

**প্রশ্ন :** আমি প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মাটির ব্যাংকে কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা রাখি, এক্ষেত্রে কোনো মানত বা উদ্দেশ্য থাকে না বরং এটি একটি অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

**উত্তর :** খুব ভালো অভ্যাস। এ অভ্যাস স্থায়ী হোক—এটাই দোয়া করি।

**প্রশ্ন :** মাটির ব্যাংকে দানের ক্ষেত্রে কাজের ওপর ভিত্তি করে শতকরা কী পরিমাণ দান করতে হবে?

**উত্তর :** আসলে মাটির ব্যাংকে দানের পদ্ধতিটা খুব সহজ। আপনি যদি ব্যবসায়ী হন, প্রত্যেকদিন দোকান খোলার সাথে সাথে মাটির ব্যাংকে কিছু রাখুন। পরিমাণটা আপনার নিজের ইচ্ছেমতো। নিয়মিত রাখতে থাকুন। দেখবেন যে, আপনার বেচাকেনা বেড়ে যাচ্ছে। আপনি যখন দান করতে থাকবেন, আপনার প্রাচুর্য বাড়তে থাকবে। তারপর আপনার উপার্জনের শতকরা কত ভাগ দেবেন তা আপনি নিজেই নির্ধারণ করে নেবেন।

**প্রশ্ন :** রাস্তায় যদি কেউ সাহায্য চায় অথবা খাবারের জন্যে টাকা চায়, দেয়া যাবে? মাজারে টাকা দিতে তো কোনো অসুবিধা নেই?

**উত্তর :** আসলে রাস্তায় যারা চায়, এরা সব পেশাদার ভিক্ষুক। অনেক আগের একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। তখন তরুণ। মনটা নরম ছিলো, যদিও পয়সা ছিলো না। একদিন রাত্রিবেলা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ দেখি রাস্তার ধারে একজন খুব কাতরাচ্ছে। জান বেরিয়ে যায় যায় অবস্থা। জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে? বললো, যক্ষ্মা হয়েছে। ঢাকায় এসেছে চিকিৎসা করাতে, এখন বাড়ি যাওয়ার টাকা নাই। খায়ও নি কয়েকদিন।

কথা শুনতে শুনতে আমি খুব ব্যথিত হয়ে উঠলাম। চিন্তা করতে লাগলাম, কীভাবে একে সাহায্য করা যায়। আমার যেহেতু সামর্থ্য নাই, চিন্তা করলাম

কার কার কাছে চাইতে পারি। মনে পড়ে গেল কয়েকজন সহপাঠী ও বন্ধুর নাম। তাদেরকে খবর দিলাম। হিসেব করে দেখলাম, গাড়িভাড়া ওষুধ খাবার-সব মিলিয়ে ২৫ টাকা হলে হয়ে যায়। অবশ্য ২৫ টাকা শুনে যদি এখনকার ২৫ টাকা মনে করেন তাহলে হবে না। এটা যে সময়ের কথা তখন টাকায় দুই সের চাল পাওয়া যেত। টাকাপয়সা যোগাড় হয়ে গেল। তাকে পাঠিয়ে দিলাম বাড়িতে। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলাম, যাক, আমরা একজন বিপন্নকে সাহায্য করতে পারলাম।

এর সপ্তাহখানেক পরে একদিন আরেক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ শুনি একইরকম আওয়াজ। তাকিয়ে দেখি ঐ লোকটাই। একইভাবে সাহায্য চাইছে। প্রথমে আমাকে চিনতে পারে নি। গত সপ্তাহের কথা যখন বললাম, তখন চুপ হয়ে গেল। পারলে তক্ষুণি ছুটে পালায়। একবার ভাবলাম, যাদের কাছ থেকে টাকাপয়সা এনে একে দিয়েছি তাদের ডেকে এনে ভালো করে দুচার ঘা লাগিয়ে দিই। পরে অবশ্য তা আর করি নি। কিন্তু বিপন্নকে সাহায্য করতে গিয়ে যে বোকা বনেছি-সেটা মনে ছিলো অনেকদিন।

আবার যারা মাজারে ভিক্ষা করে তাদের কী অবস্থা? আমরা অনেকে মাজারে ভিক্ষা দিতে যাই। মনে করি যে, আহা, এত সওয়াব! সিলেটের হযরত শাহজালালের মাজারের ঘটনা-২০০৪ সালে হযরত শাহজালালের মাজারে যখন বোমা ফাটলো আমাদের তখন সিলেটে আমাদের কোর্স ইচ্ছিলো। পরদিন খবরের কাগজে বেরোলো চমকপ্রদ এক ঘটনা। এক ভিক্ষুক গত ২১ বছর ধরে কাঠের ট্রলিতে বসে পঙ্গু সেজে ভিক্ষা করতো। ২১ বছর ধরে প্রতিদিন সকালবেলা তাকে কাঠের ট্রলিতে করে এনে তার সহযোগী তাকে বসিয়ে রেখে যেত। আশেপাশের সবাই জানে সে পঙ্গু। কিন্তু যেদিন বোমা ফুটলো সেদিন সবাইকে অবাক করে দিয়ে ট্রলি ছেড়ে সে দিলো ভোঁ দৌড়। অর্থাৎ কত নিখুঁত অভিনেতা!

তাই রাস্তা-ঘাটে যাদেরকে দেখবেন তারা অধিকাংশই এরকম পেশাদার ভিক্ষুক। এদেরকে ভিক্ষা দেয়াটা অর্থহীন। তবে সবসময় সত্যিকার দুর্গতকে সাহায্য করা কর্তব্য। আর তা সম্ভবভাবে করা সহজ।

আর মাজারগুলোতে দানের অর্থ দিয়ে কী হয় তা নিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রকাশিত হয়েছিলো এক প্রচ্ছদ-প্রতিবেদন। ‘টাকায় টাকা মাজার’ শিরোনামে এ রিপোর্টটির নির্বাচিত কিছু অংশ হুবহু তুলে ধরা হলো-

‘অনেক অনেক দিন আগের কথা। এক মাজারের খাদেম তার মোতাওয়াল্লিকে বললো যে, সে হজে যাবে। অনুমতি পেয়ে ঘোড়ায় চড়ে



আরব দেশের উদ্দেশ্যে রওনা করলো খাদেম। কিছুদূর যাওয়ার পরে ঘোড়াটা মারা গেল। খাদেম ঘোড়াটিকে পথে কবর দিয়ে বসে কাঁদতে লাগলো। পথচারীরা কবর এবং খাদেমের কান্না দেখে যাওয়ার পথে টাকা দিতে লাগলো। এভাবে কবরটি মাজারে পরিণত হলো। খাদেম হয়ে গেল মোতাওয়াল্লি। ওদিকে অনেকদিন অপেক্ষা করে খাদেমের সন্ধানে বের হলেন তার হুজুর। পথিমধ্যে মাজারসহ শিষ্যকে আবিষ্কার করলেন।

হুজুর জিজ্ঞেস করলেন, এটা কার মাজার? শিষ্য বললো, হুজুর, এটা আপনার দেয়া ঘোড়ার কবর। জমজমাট মাজার দেখে খুশি হয়ে হুজুর বললেন, ঘোড়ার জাতটা খুব ভালো। এটার মা ঘোড়াটি দিয়েই তো আমি মাজার করেছি। আর সে জন্যেই নাম ঘোড়াশাহ পীরের মাজার। পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের ‘বাঙালির হাসির গল্প’ গ্রন্থে এ রকম ঘোড়াশাহ পীরের মাজারের গল্প আছে।....

....পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব মতে, দেশে মোট মাজারের সংখ্যা ২০ হাজার ৭০টি। এর মধ্যে ঢাকা জেলায় আছে ১,৫৮৮টি। তবে সবচেয়ে বেশি চট্টগ্রামে-২,৫৮৮টি। যে কারণে চট্টগ্রাম মাজারের শহর হিসেবেও পরিচিত।....

ইসলামে মাজার জিয়ারতের নিয়ম হচ্ছে প্রথমে সালাম পাঠ করা। এরপর কোরআনের আলোকে কবরবাসীর জন্যে দোয়া করা। হযরত মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর মেয়ে বিবি ফাতেমাও নিয়মিত মাজার জিয়ারত করতেন। তবে বর্তমানে যা করা হয়-যেমন মাজারে বাতি দেয়া, ফুল ছিটানো, চাদর জড়ানো, চুমু দেয়া, মানত করা, কবরে শায়িত মৃতব্যক্তির কাছে কিছু চাওয়া-এর কোনো কিছুই ইসলামি শরিয়তে জায়েয নয়।....

দেশের জমজমাট মাজারগুলোতে দেখা যায়, টাকার নিচে ঢেকে গেছে কবর। ....গরু, খাসি, মুরগি কিংবা আগরবাতি, গোলাপজল, মোমবাতি সবকিছু বিক্রির মধ্য দিয়ে আসে টাকা। মাজারে প্রত্যেকটি বিষয় আলাদা আলাদা ইজারা দেয়ার ঘটনাও আছে। এমনকি ভিক্ষুকদের বসার জায়গাও বিক্রি হয় বিভিন্ন হারে।....

ঢাকার ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যে বিখ্যাত পন্ডিত হেকিম হাবিবুর রহমান খান আখুন্দজাদার ‘আসুদগানে ঢাকা’ বা ‘ঢাকায় যারা সমাহিত’ নামক গ্রন্থটিকে প্রামাণ্য ধরা হয়। উর্দুভাষায় রচিত এ বইয়ে তিনি লিখেছেন কবরহীন এবং সাধারণ কবরের মাজার হয়ে যাওয়ার ইতিহাস। তার বইয়ে প্রথম জানা যায় যে, পুরান ঢাকার জিন্দাবাজার মসজিদের পাশের

মাজারটিতে কোনো কবর নেই। প্রাচীনকালে মহররমের সময় এখানে লাল-সবুজ নিশান দিয়ে সাজিয়ে তার নিচে শরবত রাখা হতো। এটাই কালক্রমে মাজারে পরিণত হয়। হেকিম হাবিবুর রহমান লিখেছেন, ‘উল্লিখিত গম্বুজ দেখে ধারণা করা হয় যে, ইহা আসলে কোনো কবরই নয়। বরং উহা একটি মোকাম।’ একইভাবে পুরান ঢাকার নবাব দেউড়ি কবরস্থানের পশ্চিমের মাজারটি জনৈক মদ বিক্রেতার কাছ থেকে দখল করার জন্যে রাতারাতি গড়ে তোলা হয়েছিলো। এখানেও কোনো কবর নেই।

### শাহ আলীর মাজার : বছরে আয় তিন কোটি ১২ লাখ টাকা

এই মাজার কমিটির সভাপতির পদে নির্বাচিত হওয়াটা সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়ার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শাহ আলীর মাজারকে ঘিরে এমনই মতামত মিরপুরবাসীর।

১৯৭৩ সালের ১১ জানুয়ারি বর্তমান মাজার ভবনটি নির্মিত হয়। শাহ আলী মাজারের সম্পত্তির পরিমাণ ২৪ একর। ....মাজারের আওতায় রয়েছে বেশ কিছু অঙ্গপ্রতিষ্ঠান। জেনারেল হাসপাতাল, কামিল মাদ্রাসা, এতিমখানা, আজিজিয়া মাদ্রাসাসহ বিশাল মসজিদ, পুকুর, জলাশয় ছাড়াও রয়েছে ছয় তলা মার্কেট। ১৩১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন বাবদ প্রতি মাসে ব্যয় হয় সোয়া পাঁচ লক্ষ টাকা।

....জাঁকজমকভাবে ১২টি উৎসবে ব্যয় হয় পাঁচ লক্ষ টাকা। বছরে একবার তিন দিনের ওরস হয় যাতে ব্যয় হয় অন্তত ১০ লক্ষ টাকা। ঈদে মিলাদুন্নবীতে ব্যয় হয় এক লক্ষ টাকা। মাজারের রয়েছে ১৭টি সিঁদুক। মাসে একবার খোলা হয়। এতে গড়ে আসে প্রায় চার লক্ষ টাকা। কবরে ছুঁড়ে মারা টাকা তোলা হয় সাত দিন পর পর। মাসে এর পরিমাণ দুই লক্ষ টাকা। দানের টাকা মাসে সাত লক্ষ বললেও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন খাদেম জানান, এর পরিমাণ ১০ লক্ষ থেকে ১২ লক্ষ টাকার মতো। পশুপাখি ইজারা হয় ১৫ থেকে ১৮ লক্ষ টাকায়। অফিসের দেয়া হিসাবমতে আয়ের পরিমাণ ছাড়িয়ে যায় বছরে এক কোটি ১০ লক্ষ টাকার ওপরে। তবে কয়েকটি সূত্রমতে প্রতি মাসেই মাজারের আয় ২৫-২৬ লক্ষ টাকা। আর সেই হিসেবে মাজারের আয় বছরে তিন কোটি ১২ লক্ষ টাকা।

### বার আউলিয়া : বছরে আয় ৪০ লক্ষ টাকা

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড থানার সোনাইছড়ি গ্রামে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশেই এই দরগাহ। .... ০.৮ শতক জমির ওপর মূল মাজার।

এছাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, মসজিদসহ খাদেমদের আওতায় রয়েছে আরো ৪০ শতক জমি। মাজারের তিনটি দানবাক্সে মাসিক আয় দুই লক্ষ টাকা, যা বছরে দাঁড়ায় ২৪ লক্ষ টাকা। দানবাক্সের বাইরে জিয়ারতের সময় মাজারে ফেলা টাকার পরিমাণ মাসে এক লক্ষ টাকা করে বছরে আসে ১২ লক্ষ টাকা। মানতের গরু ছাগল হাঁসমুরগি থেকে আসে মাসে ২০ হাজার টাকা করে বছরে দুই লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। এছাড়া মোমবাতি আগরবাতি বিক্রি করে আসে মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে বছরে ৬০ হাজার টাকা। এতে করে মোট আয় হয় বছরে ৩৯ লক্ষ টাকা। যদিও আশেপাশের লোকজনের মতে এই আয় আরো বেশি।

১২ জন শিক্ষক ও কর্মচারীর বেতন পরিশোধে মাজারের ব্যয় হয় মাসে ২৫ হাজার টাকা করে বছরে তিন লক্ষ টাকা। বাকি টাকা কোন খাতে ব্যয় হয় জানতে চাইলে মাজার অফিস জানায়, এটার ভিন্ন ভাগ আছে। বংশজাত খাদেমরা পায় ১৫%। এরকম পরিবার আছে তিনটি। উপখাদেম বা সংগ্রাহকরা পায় ১৫% যা ভাগ হয় ১৩ জনের মধ্যে। মোতাওয়াল্লি পান ২০%। বিভিন্ন উৎসবে ব্যয় হয় ১২%।....

### হযরত শাহজালাল (রহ) মাজার : আয় ১৩ কোটি টাকা

....মাজারে কর্মরত কয়েকজনের সাথে কথা বলে জানা যায়, প্রতিদিনের দানখয়রাতের পরিমাণ গড়ে দুই লক্ষ টাকা। বৃহস্পতি ও শুক্রবার এটা দ্বিগুণ হয়ে আসে চার লক্ষ টাকা। কখনো কখনো এরও বেশি। বার্ষিক ওরসের সময় প্রতিদিন আসে গড়ে ৫০ লক্ষ টাকা। তিন দিনে এই আয়ের পরিমাণ ছাড়িয়ে যায় দেড় কোটি টাকার বেশি। সব মিলে বছরে আয় প্রায় ১৩ কোটি টাকার মতো। তার মানে প্রতি মাসের গড় আয় এক কোটি টাকার ওপরে।

দরগায় দানখয়রাত থেকে আসা এই বিপুল খাতের নেই কোনো হিসাব-নিকাশ। নেই খাতা-পত্র, নেই টাকা খরচের জবাবদিহিতা। কওম ও মুফতি পরিবারের লোকজন এ টাকা ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়। মাজারের খাদেম হিসেবে কওম ও মুফতিদের পৌনে ৩০০ পরিবারে ভাগ হয় টাকা। বংশ পরম্পরায় এটা হয়ে আসছে।

বংশ ধারাবাহিকতায় নিযুক্ত হন মোতাওয়াল্লি। বছরের দিনগুলোকে উত্তরাধিকার মোতাবেক বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে ভাগ করা হয়ে থাকে। নির্ধারিত দিনগুলোর আয় তুলে নেয় নির্ধারিত পরিবার। এছাড়া বার্ষিক ওরসের তিন দিনের আয় চলে যায় মোতাওয়াল্লির ঘরে। মাজারে বিপুল

পরিমাণ আয় আছে, ব্যয় নেই। উন্নয়নের কাজ হয় সরকারি অনুদানে।

টাকাপয়সার হিসাব সম্পর্কে জানতে চাইলে দরগার ম্যানেজার জানান, ‘এসব আমি জানি না। মোতাওয়াল্লি সাব বলতে পারে।’ মোতাওয়াল্লি বলেন, ‘এত হিসাব নিকাশের কী আছে? যা দানখয়রাত আসে, আমরা খাদেমরা খাই, তারপর পারলে কিছু করি।’

### খান জাহান আলীর মাজার : আয় ৮০ লক্ষ টাকা

ষাটগম্বুজ মসজিদের সন্নিহিত এই মাজারে প্রতিদিন ১০-১২ হাজার টাকা আসে ভক্তদের দান-খয়রাত থেকে। শুক্রবার আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮ থেকে ২০ হাজার টাকা। মাসে গড় আয় প্রায় চার লক্ষ টাকা। এছাড়া প্রতিবছর ২৪ ও ২৫ অগ্রহায়ণ ওরস হয়। ওরস ইজারা সবসময়ই দেড় লক্ষ টাকার ওপরে। চৈত্রী পূর্ণিমা উপলক্ষে মেলা বসে যা তিন দিনের জন্যে বলা হলেও হয় সাত দিন। এসময় ইজারা দেয়া হয় পাঁচ থেকে সাত লক্ষ টাকা। মাজারের মোট জমির পরিমাণ ৩৫০ বিঘা। সব মিলিয়ে বছরে আয় হয় ৮০ লক্ষ টাকার মতো। এ টাকার নেই হিসাব-নিকাশ, নেই সরকারি সংশ্লিষ্টতা। খাদেম পরিবারগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে ভাগ করে নেয় নিজেদের মধ্যে।

### হযরত আমানত শাহ (রহ) মাজার : আয় তিন কোটি টাকা

....দুইটি স্থায়ী দানবাক্সের আয় মাসিক ১০ লক্ষ টাকা, বাৎসরিক এক কোটি ২০ লক্ষ টাকা। বার্ষিক ওরস মাহফিলের আয় ৫০ লক্ষ টাকা। বিশেষ উৎসব-যেমন, শবেবরাত এবং শবেকদরে আয় হয় ৩৫ লক্ষ টাকা। মানতের পশুপাখি গরু ছাগল বিক্রি করে আয় হয় পাঁচ লক্ষ অর্থাৎ বছরে ৬০ লক্ষ টাকা। মানতের মোমবাতি ও আগরবাতি থেকে আসে মাসে ৫০ হাজার করে বছরে ছয় লক্ষ টাকা। দানবাক্সের বাইরেও জিয়ারতের টাকা থেকে আসে দুই লক্ষ। নানা খাত মিলিয়ে বছরে আয় হয় প্রায় তিন কোটি টাকার ওপরে।

মাজার পরিচালনা খাতের ব্যয়ের পরিমাণ আয়ের তুলনায় অতি নগণ্য। কর্মচারীর বেতন মাসিক ৪০ হাজার টাকা, বছরে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। বার্ষিক ওরসসহ বিশেষ অনুষ্ঠান পালন বাবদ খরচ বছরে ১০ লক্ষ টাকা।....

### হযরত গরীব উল্লাহ শাহ মাজার : এক কোটি টাকা

....আটটি দানবাক্সের বার্ষিক আয় ২৪ লক্ষ টাকা। বার্ষিক ওরসের চাঁদা ১৫ লক্ষ টাকা। কবরের জায়গা বিক্রি হয় প্রতিটি আট হাজার টাকা। এই খাত থেকে বছরে আয় হয় প্রায় নয় লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। দোকান ভাড়া

খাতে আয় ২৪ লক্ষ টাকা। মানতের গরু-ছাগল বিক্রি করে আয় এক লক্ষ টাকা। মোমবাতি আগরবাতি বিক্রি সাত লক্ষ টাকা। বিশিষ্ট ভক্তদের এককালীন চাঁদা ১৫ লক্ষ টাকা। শুক্রবারে মসজিদের চাঁদা ৫০ হাজার টাকা। গিলাফের আয় এক লক্ষ টাকা। সব মিলিয়ে বছরে এখান থেকে আয় এক কোটি টাকার উপরে। .....মাজার পরিচালনা বাবদ বার্ষিক ব্যয় পাঁচ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। এই মাজারের নামে রয়েছে মোট সাত একর জমি।

**বিড়ালদহ হযরত শাহ সৈয়দ করম আলী (রহ) মাজার : বছরে ৫০ লক্ষ টাকা**

রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কের পাশেই পুঠিয়ার বিড়ালদহে হযরত শাহ সৈয়দ করম আলী (রহ) মাজার শরীফ। বিড়ালদহ মাজারের সবচেয়ে বড় আয়ের উৎস রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কের বিভিন্ন বাস ও ট্রাক থেকে তোলা চাঁদা। ....এই মাজারের আয়ের পরিমাণ বছরে ৫০ লক্ষ টাকার ওপরে।’

দানের অর্থ নিয়ে মাজারগুলোতে কী করা হয় তার খানিকটা উঠে এসেছে ওপরের রিপোর্টে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাজারের আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। একমাত্র মাজারের লোক ছাড়া বাইরের কেউ এই অর্থ কোথায় কীভাবে ব্যয় হয় তা জানেন না। তাই দান করার আগে আপনি কোথায় দান করছেন তা নিয়ে ভাবতে হবে আপনাকেই।

**প্রশ্ন :** কল্যাণ সাফল্য ও প্রাচুর্য লাভের জন্যে শুধু মাটির ব্যাংকে দান করবো, নাকি ধর্মীয় কাজেও দান করতে হবে? বিভিন্ন দান বাস্তবে দান করতে অসুবিধাটা কোথায়?

**উত্তর :** যেসব দান বাধ্যতামূলক-সেটি অবশ্যই করবেন। যেমন, যাকাত হচ্ছে একটি বাধ্যতামূলক দান। এটা দিতেই হবে। মাটির ব্যাংকে যতই দেন, যদি যাকাত আপনার ওপর ফরজ হয়, আপনাকে যথাযথভাবে যাকাত আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে আপনার কোনো স্বাধীনতা নেই। না করলে সেটা কবির গুনাহ হিসেবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ স্ব স্ব ধর্মীয় যে দান-যে দান বা হক আদায় করা বাধ্যতামূলক-সেটা অবশ্যই করবেন।

আর দান সেটাই যেখানে আপনার স্বাধীনতা রয়েছে। তবে এ স্বাধীনতা আপনাকে প্রয়োগ করতে হবে প্রজ্ঞার সাথে। কোথায় দিচ্ছেন, আপনার দানের অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় হচ্ছে কি না, জেনে বুঝে নিতে হবে। এ নিয়ে ১৪ আগস্ট, ২০০৭ সালে দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত হয়েছিলো একটি

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। ‘রাজধানীর দানবাক্সে বছরে জমা হয় নয় কোটি টাকা’ শিরোনামের এ প্রতিবেদনে উঠে আসে চমকপ্রদ কিছু তথ্য। পাঠকদের জন্যে ঐ রিপোর্টটির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলো—

ঢাকার রাজপথে চলতে লাইটপোস্ট, বাজার, মসজিদের সামনে বিভিন্ন খুঁটিতে পীর ফকির ও বিভিন্ন মাজারের নামে এক ধরনের দানবাক্স ঝুলে থাকতে দেখা যায়। এসব দানবাক্সে বছরে নয় কোটি টাকা আয় হয়। কিন্তু এসব অর্থ কারা কীভাবে খরচ করে তার কোনো হিসাব নেই।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৯০টি ওয়ার্ডে চার হাজার ৯৫০টির মতো দানবাক্স আছে। এসব বাক্সের প্রতিটিতে দৈনিক গড়ে ৫০ টাকার মতো সংগ্রহ হয়। এ হিসাবে এসব দানবাক্স থেকে বছরে আট কোটি ৯১ লাখ টাকা আদায় হয় বলে দানবাক্স স্থাপনকারী ও অর্থ সংগ্রহকারীরা জানান। এই বিপুল অঙ্কের টাকা বিভিন্ন পীর-ফকির এবং মাজারের মতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নামে সংগ্রহ করা হলেও আদৌ ধর্মীয় কাজে লাগানো হয় কি না, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

বাক্সগুলোতে যেসব পীর-ফকিরের নাম-ঠিকানা থাকে তার প্রায় সবই ঢাকার বাইরের। যারা এসব বাক্স নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন তাদের ব্যক্তিগীবনে ধর্মীয় বিধিবিধান মানার ক্ষেত্রেও উদাসীনতা দেখা যায়।

ঢাকা শহরে সবচেয়ে বেশি দানবাক্স দেখা যায় বিভিন্ন পীরের নামে। এ ছাড়া চন্দ্রপাড়া (রহ), শাহাবাবা ফরিদপুরি, শর্ষিনার পীর, খাজা মইনুদ্দীন চিশতিয়া (রহ), পীর ইয়েমেনি (রহ), শাহ কামাল (রহ) ও আমবাগান পীর সাহেবের নামে দানবাক্স চোখে পড়ে। বিভিন্ন মসজিদ মাদ্রাসা মাজার ও ওরসের নামেও দানবাক্স ঝুলে থাকতে দেখা যায়। এসব দানবাক্স বিভিন্ন পাইকারি ও খুচরা বাজার, চালের আড়ত, রেল ও বাস স্টেশনের মসজিদ ও মাদ্রাসার সামনের সড়কে টাঙিয়ে রাখা হয়।

ইয়ারউদ্দিন (রহ) পীর সাহেবের নামে দানবাক্সগুলোর বেশিরভাগ নিয়ন্ত্রণ করেন মোহাম্মদপুরের জহুরি মহল্লার দারুল জান্নাত জামে মসজিদের সাবেক ইমাম। শহরে ১৫০টি দানবাক্স তার নিয়ন্ত্রণে আছে বলে তিনি জানান।..... ঢাকা শহরে দানবাক্সের নিয়ন্ত্রণে তিনটি গ্রুপের সন্ধান মিলেছে।.....

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৪০টি ওয়ার্ডে প্রায় পাঁচ শতাধিক দানবাক্স আছে। আর এসব দেখভালের জন্যে আছে ১২ জন খাদেম। ..... এসব বাক্স থেকে কত আয় হয় জানতে চাইলে তিনি বলেন, এসব আমরা হিসাব করি না। যা আসে সব একত্র করে দরগায় পাঠিয়ে দেই।.....

দানবাক্সের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি অর্থ সংগৃহীত হয় তিনটি মাজারে। গোলাপ শাহ মাজার গুলিস্তান, হযরত শাহ আলী বোগদাদি (র) ও হাইকোর্টের মাজারে। অভিযোগ-দানবাক্সের মাধ্যমে আসা অর্থের একটা বড় অংশ যায় কমিটির সদস্যদের পকেটে।’

কাজেই বুঝতেই পারছেন দান কোথায় করছেন সেটাও দেখার বিষয়। যথার্থ ধর্মীয় ও মানবিক কাজে যেখানে ব্যয় হয় সেখানে দান করতে কোনো অসুবিধা নেই।

## প্রসঙ্গ মানত

**প্রশ্ন :** অনেকে বলেন, মানত করা নাকি শিরক? এ ব্যাপারে জানতে চাই।

**উত্তর :** মানত করা যদি শিরক হতো তাহলে কোরআন শরীফে সৎকর্মশীলদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হতো না যে, তারা মানত পূরণ করে। সূরা আদ-দাহ্‌রে বলা হয়েছে-সৎকর্মশীলরা যখন কোনো কিছু ওয়াদা বা মানত করে তখন তারা এটা পূরণ করে। অর্থাৎ মানত করতেই হবে তা নয়। তবে যদি করা হয়, তা পূরণ করতে হবে। এটি সৎকর্মশীলদের একটি গুণ হিসেবে আল্লাহ বলছেন। স্বয়ং আল্লাহ যার বৈধতা দিয়েছেন তাকে শিরক বলা যে কতটা মূর্খতার পরিচায়ক তা সহজেই বোধগম্য।

**প্রশ্ন :** মাটির ব্যাংকে মানত পূর্ণ হবার আগে টাকা দেবো, না পরে?

**উত্তর :** মানত পূর্ণ হওয়ার পর অর্থ দিতে হয়। মানতের এটাই নিয়ম। তবে আগেও দিতে পারেন। তখন সেটা দান হয়ে গেল। যেকোনো দানই প্রভুর কাছে গ্রহণযোগ্য, যদি তা তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে হয়।

**প্রশ্ন :** কোনো বড় কাজের জন্যে হক্কুল ইবাদে মানত করলে সেটা কি তখনই দেয়া উচিত, না কাজটা হওয়ার পরে দেয়া উচিত?

**উত্তর :** যেভাবে মানত করেছেন সেভাবেই দেয়া উচিত। যদি কাজ শেষ হওয়ার পরে দেয়ার মানত করে থাকেন, তাহলে সেভাবেই দেবেন। আর যদি

মনে করেন দীর্ঘমেয়াদী কাজের খন্ড খন্ড সম্পন্ন হওয়ার পর কিছু কিছু করে দেবেন তাহলে সেই অনুপাতেই দিতে হবে।

**প্রশ্ন :** কীভাবে মানত করবো—এটা একটু বুঝিয়ে বললে ভালো হয়।

**উত্তর :** আপনি নিয়ত করতে পারেন, এ কাজটা যদি হয়ে যায় তাহলে এই পরিমাণ অর্থ মাটির ব্যাংকে দান করবো। কাজটা হয়ে গেলে সেটা করবেন।

**প্রশ্ন :** আমি বেশ কয়েকদিন আগে একটি কাজের জন্যে মাটির ব্যাংকে চার হাজার টাকা মানত করি। ইতোমধ্যে কাজটিতে সাফল্য পাই। কিন্তু এখন আমার এমন সামর্থ্য নেই যে, ঐ টাকাটা দিতে পারবো। আমি কী করবো?

**উত্তর :** এখন কী করবেন—যেটুকু টাকা হয়, যেটুকু দিতে পারেন—প্রত্যেকদিন এটা দিয়ে দেবেন চার হাজার টাকা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত। যদি মনে করেন এখন পাঁচ টাকা দিতে পারবেন, তো পাঁচ টাকাই দেবেন। যেমন, কোনো ব্যাংকে যদি আপনার অনেক ঋণ হয়ে যায় আর আপনি ঋণখেলাপি হয়ে পড়েন, তখন আপনি যদি কিছু কিছু করে ব্যাংকে দিতে থাকেন তখন ব্যাংক আর মামলা করে না। এখানেও অনেকটা তা-ই। মানত চার হাজার টাকা। কিন্তু আছে মাত্র পাঁচ টাকা, সারাদিন খাওয়া-দাওয়া করে পাঁচ টাকা বাঁচলো—সেটাই দান করুন। তবু দানখেলাপি হবেন না।

**প্রশ্ন :** মাটির ব্যাংকে মানতের টাকা দিতে যদি দেরি হয় তাহলে কোনো অসুবিধা হবে কি না। আমার একটি বিশেষ কাজের জন্যে বড় এমাউন্ট মানত ছিলো। একসঙ্গে দিতে এই মুহূর্তে অসুবিধা, তাই পরে দিতে চাচ্ছি।

**উত্তর :** মানত যদি পূরণ হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই তা দিতে হবে। পবিত্র কোরআনে এ ব্যাপারে স্পষ্টই বলা হয়েছে, সৎকর্মশীলরা যখন কোনো কিছুর ওয়াদা বা মানত করে তখন তারা তা পূরণ করে। আপনি যে উদ্দেশ্যে মানত করেছিলেন সে কাজটা হয়ে গেছে। এখন শয়তান চেষ্টা করবে নানা অজুহাত, বাধা ইত্যাদি সৃষ্টি করে আপনাকে মানতখেলাপি করতে।

কাজেই সাবধান থাকবেন। আপনার বড় এমাউন্ট একসঙ্গে দিতে অসুবিধা, ঠিক আছে, দেয়া তো শুরু করুন। আল্লাহর কাছে বলুন, হে



আল্লাহ! এখন কিছু দিলাম, আরো এলে আরো দেবো। অতিসত্ত্বর তুমি আমাকে মানতের অর্থ আদায়ের সামর্থ্য দাও।

**প্রশ্ন :** অনেক সময় একাধিক মানতের টাকা জমা হয়ে যায়, কিন্তু হাতে তখন টাকা পয়সা থাকে না, ফলে মানত সম্পন্ন করতে অনেক দেরি হয়, এটা কি ক্ষতিকর?

**উত্তর :** এই যে একাধিক মানতের টাকা জমা হয়ে যায়—কী করবেন? এ ব্যাপারে খুব সহজ পরামর্শ আপনাকে দিতে পারি। যেহেতু আপনার টাকা-পয়সা কম, মানত করারই প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকদিন আপনি নিয়মিত দান করতে থাকুন। যা আপনি দিতে পারেন, দিতে থাকুন প্রত্যেকদিন। আপনি দেখবেন যে, আপনার স্বাচ্ছন্দ্য, আপনার সাফল্য আসতে থাকবে।

আমাদের এক গ্রাজুয়েটের ঘটনা বলি। ভদ্রমহিলা কয়েক বছর আগে তার স্বামীকে হারিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এরপর থেকে তার সংসারে আর্থিক টানাপোড়েন শুরু হলো। উপার্জন যা হতো তা দিয়ে মাসের অর্ধেক আর বাকি সময় ধারদেনা করে কোনোরকম চলছিলো। কোর্স করে তার ছেলে যখন মাটির ব্যাংকের কথা শুনলো, মা-কে উদ্বুদ্ধ করলো ব্যাংকে টাকা রাখতে। বললো, মা, তুমি প্রতিদিন তোমার যতটুকু ইচ্ছা—এক টাকা, দুই টাকা করে মাটির ব্যাংকে দান করতে থাকো।

ভদ্রমহিলা তা-ই করলেন। প্রত্যেকদিন এক টাকা, দুই টাকা, পাঁচ টাকা—যখন বাজার খরচ থেকে যা বাঁচাতে পারছেন, মাটির ব্যাংকে দান করতে শুরু করলেন। আর এর মধ্য দিয়ে তার বিস্ময়কর পরিবর্তনের কথা তিনি বলছিলেন কোর্সের প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে—‘অদ্ভুত ব্যাপার, তিন/ চার মাস যেতে না যেতেই আমার সংসারে আয়-রোজগার বাড়তে লাগলো। নতুন নতুন আয়ের উৎস সৃষ্টি হলো। টানাপোড়েন দূর হয়ে আমার সংসারে এখন সচ্ছলতা আর প্রাচুর্য হাতছানি দিচ্ছে।’

আমরা মনে করি যে, দান বড়সড় পরিমাণে করতে হবে। আসলে দান যা আছে তা থেকেই করতে হয়। আর নিয়মিত দানটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মাটির ব্যাংকে মাঝে মাঝে অনেক টাকা রাখি কিন্তু নিয়মিত দিই না। এটা নয় বরং মাটির ব্যাংককে দেখতে হবে পরিবারের এমন এক সদস্যের মতো, যে উপার্জনক্ষম। পরিবারে যে উপার্জন করে, আমরা যেভাবে নিয়মিত তার আরাম আয়েশ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে খেয়াল রাখি, মাটির ব্যাংককেও ঠিক

ওভাবেই দেখতে হবে। কারণ আল্লাহ বলেছেন, তুমি দাও, আমি প্রতিদান দেবো। আর আল্লাহর প্রতিদান অবশ্যই বেশি হয়। যেমন, বাবা অনেক ধনী-ছেলে প্রথম উপার্জন থেকে বাবার জন্যে উপহার এনে বললো যে, বাবা, আমি প্রথম উপার্জন করেছি, তোমার জন্যে এটা নিয়ে এসেছি। বাবা কী করবেন? সাথে সাথে বাবার মনে হবে ছেলেকে নিয়ে গিয়ে আরো অনেক কিছু কিনে দিই। আল্লাহর ক্ষেত্রেও, প্রভুর ক্ষেত্রেও ঠিক একই ব্যাপার। তাঁকে দেয়ার পথ হচ্ছে দুস্থ মানুষের জন্যে, অভাবগ্নদের জন্যে দেয়া এবং যখন আপনি তাঁকে দেন, তখন স্রষ্টা ঐ বাবার চেয়েও বেশি সন্তুষ্ট হন। আর তিনি যখন এর প্রতিদান দেন, আপনার দানের তুলনায় তা অনেক-অনেক গুণ বেশি হয়। আর সবসময় মনে রাখবেন, নবীজী (স) বলেছেন, সে আমলই উত্তম যা নিয়মিত করা হয়। অতএব নিয়মিত দান সবচেয়ে ফলপ্রসূ।

**প্রশ্ন :** কেউ যদি ডেডলাইন দিয়ে কোনো কিছু মানত করে এবং ডেডলাইনের মধ্যে যদি মানত পূর্ণ না হয়, যদি অনেক পরে মানত পূর্ণ হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত দান কি তাকে করতে হবে?

**উত্তর :** এ প্রশ্নটি হচ্ছে দানকে কীভাবে ফাঁকি দেয়া যায়, পাশ কাটানো যায়, দান না করে পারা যায় সেজন্যে। আসলে আমাদের জন্যে কল্যাণকর হচ্ছে কীভাবে এবং কতভাবে আমরা দান করতে পারি। দানের সাথে, মানতের সাথে ডেডলাইনের কোনো সম্পর্ক নেই। মানতের সম্পর্ক কাজের সাথে। কাজটা যদি হয়ে যায়, তাহলে মানত পূরণ করতে হবে। আপনি মানত না করেন ভালো, কিন্তু মানত করলে তা পুরো করতে হবে। তা না হলে আপনি দায়বদ্ধ থেকে যাচ্ছেন।

হয়তো এমন কোনো বিপদ বা অকল্যাণ ঘটতে পারে, যা আপনার জীবনকে আরো অস্থির অশান্তিময় করে তুলতে পারে। এজন্যে ডেডলাইন দিয়ে মানত করবেন না। কাজ হয়ে গেলে দান করবেন—এই নিয়তে মানত করবেন। কাজটাই হচ্ছে শর্ত। অতএব কাজ হয়ে গেলে এটি পূরণ করবেন। যদি কাজ না হয় তাহলে মানত পূরণ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

**প্রশ্ন :** কেউ যদি মাটির ব্যাংকে মানত করে কিছু টাকা দেয়—যেন সে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে ভর্তি হতে পারে। হঠাৎ সে সিদ্ধান্ত নিলো, ভর্তি হবে না। তাই ফরমও কিনলো না। তবে কি মানতের টাকা দিতে হবে?

**উত্তর :** না, তাহলে আর মানতের টাকা দেয়ার দরকার নেই। কারণ মানতের টাকা তখনই দিতে হবে যখন মানত পূরণ হয়।

**প্রশ্ন :** আমি একজনের কাছে এক লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পেতাম। সেই টাকা ফেরত পাচ্ছি না বলে নিয়ত করলাম, যদি পুরো টাকাটা পাই তাহলে তার ১০% হিসেবে ১৫ হাজার টাকা মাটির ব্যাংকে দেবো। কিন্তু তিনি আমাকে মাত্র ১৫ হাজার ফেরত দিয়ে আর দিতে পারবেন না বলে এমনভাবে ক্ষমা চান যে, আমি মেনে নিই। এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে আমার নিয়ত কীভাবে পূরণ করবো?

**উত্তর :** এখানে দুটো ব্যাপার আছে। প্রথমত, আপনি মানত করেছিলেন—পাওনা টাকা পেলে তার ১০% দান করবেন। কিন্তু আপনি পুরো টাকা পান নি, পেয়েছেন মাত্র ১৫ হাজার টাকা। আপনি তাই এখন এই ১৫ হাজারের ১০% দান করতে পারেন—তাহলে আপনি ফিকাহ, আইন বা শরিয়তের দৃষ্টিতে ঠিক থাকলেন। কিন্তু আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি হলো, আল্লাহর প্রতি আপনার ভালবাসা, আকুতি এবং দানের তাৎপর্যকে আপনি কীভাবে অনুভব করেন সেটা। আপনার দেনাদারের অপারগতাকে অনুধাবন করে তাকে ক্ষমা করে দেয়ার যে কাজটি আপনি করেছেন, তা অবশ্যই একটি পুণ্যের কাজ।

একটা বিষয় খেয়াল করে দেখুন, যে পরিমাণ নিয়ত করেছেন সে পরিমাণ টাকা—ই কিন্তু আপনি পেয়েছেন। আপনি ১৫ হাজার টাকা নিয়ত করাতেই এক লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা মাফ করতে পেরেছেন। এখন আল্লাহকে বলতে পারেন যে, হে আল্লাহ! এই টাকাটা আমি গরিবদের জন্যে যেহেতু নিয়ত করেছিলাম, তাদের জন্যেই দিচ্ছি। বরকত দেয়ার মালিক তুমি। তুমি আমার সম্পদে বরকত দান কর।

**প্রশ্ন :** একটি উৎস থেকে পাওনা টাকা পেয়ে কোয়ান্টামে দেবো বলে নিয়ত করেছিলাম। কিন্তু গত দুবছরে সম্পূর্ণ টাকা না পেয়ে খুব অল্প পরিমাণে টাকা কয়েক ভাগে পেয়েছি। এ অবস্থায় কী করণীয়?

**উত্তর :** পার্সেন্টেজ দিতে থাকেন। যা পেয়েছেন তার পার্সেন্টেজ দেন।

**প্রশ্ন :** মানত করলে সবসময় কাজ হয় না। এতে এসোসিয়েটদের মাঝে মাটির ব্যাংক বিতরণ করতে সাহস পাই না। পাছে আবার প্রতারক বলে।

**উত্তর :** আসলে মানত মানে কী? কাজ হলে আপনি টাকা রাখছেন-কাজ না হলে রাখছেন না। যাকে বিতরণ করবেন তাকে এটাই বলবেন যে, তার যদি কাজটা হয়, তাহলেই যেন তিনি রাখেন। না হলে নয়। এখানে আপনার প্রতারক হওয়ার তো কোনো কারণ নেই। অতএব আপনি নিঃসংকোচে বলতে পারেন যে, ইনশাল্লাহ আপনার উপকার হবে।

**প্রশ্ন :** দানের অর্থ ও মানতের অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করবো কীভাবে?

**উত্তর :** এত জটিলতার মধ্যে কেন যান? মানত যেভাবে পারেন সেভাবে দিন; এত হিসাব-নিকাশের দরকার নেই। স্রষ্টাকে বলুন, হে প্রভু, আমি তো হিসাব-নিকাশ বুঝি না-যা পারি দিলাম। বাকিটা তুমি দেখো।

**প্রশ্ন :** কেউ যদি মানত করে তার পুত্রসন্তান হলে মাজারে যাবে কিন্তু মাজারে যেতে পারে নি, এক্ষেত্রে কি মাটির ব্যাংকে দান করা যায়? কীভাবে অর্থের পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

**উত্তর :** আসলে মানত বলতে যেটা আমরা বুঝি, সেটা হচ্ছে স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্যে। মানত কোথাও যাওয়ার জন্যে নয়, স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্যে করা উচিত। এরকম যদি হয়, খুব সহজ উপায় হচ্ছে যে, স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্যে আপনি যেকোনো পরিমাণ অর্থ মাটির ব্যাংকে দান করতে পারেন। যেহেতু এই দানটা সৃষ্টির কল্যাণে ব্যয় হবে।

**প্রশ্ন :** বাসা পাল্টানোর সময় মাটির ব্যাংকের টাকা চুরি হয়ে গেছে। এটাতে আমার বন্ধুর দেয়া কিছু টাকাও ছিলো। এখন আমার কী করণীয়?

**উত্তর :** এক্ষেত্রে আপনি কিছু না-ও করতে পারেন। আবার যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে একটা পরিমাণ ধরে মাটির ব্যাংক বাবদ দিয়েও দিতে পারেন। এমনও তো হতে পারতো যে, মাটির ব্যাংক থেকে না হয়ে আপনার পকেট থেকেই চুরি হয়ে গেল! সেটা যখন হয় নি তো চুরি যা হয়েছে সেটাকে সাদকা হিসেবেই ধরে নিন, সেইসাথে আরো কিছু দিয়ে দিন। আশা করছি, এতে আপনার অশান্তি দূর হবে, বন্ধুর দানের টাকা খোয়ানো নিয়ে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব-তা-ও মিটবে। আর দানের প্রতিদান তো আছেই।

## নিয়ত পূরণ না হলে

**প্রশ্ন :** মাটির ব্যাংকে অনেক নিয়ত করে দান করেছি। ফল হয় নি। যেমন, এক পরীক্ষায় সাফল্য লাভের জন্যে পরীক্ষা ফিসের সমান অর্থ নিয়ত করেও ফল হয় নি। যদিও প্রস্তুতি ভালো ছিলো।

**উত্তর :** পরীক্ষায় সাফল্যের জন্যে তো শুধু নিয়ত করাই যথেষ্ট নয়। পরীক্ষায় ভালো রেজাল্টের জন্যে দরকার সঠিক নিয়মে লেখাপড়া এবং পরীক্ষা ভালো দেয়া। যদি সারাবছর নিয়মিত পড়ালেখা না করেন এবং পরীক্ষায় ভালো করার নির্দেশনাগুলো অনুসরণ না করেন, তাহলে যত পরিমাণ মানত-ই করেন না কেন, ফল পাবেন না।

আবার আপনি যেটাকে ভালো প্রস্তুতি বলছেন, আপনার কাছে ভালো মনে হলেও আসলে হয়তো তা ভালো প্রস্তুতি না-ও হতে পারে। আমাদের অনেক ছাত্রছাত্রীই ভাবে যে, খুব ভালো পরীক্ষা দিয়েছি। অথচ নম্বর তো পেলাম না। তারা আসলে ভালো পরীক্ষা দেয় নি। হয়তো অনেক লিখেছে কিন্তু বানান ভুল কিংবা উত্তর ভুল দিয়েছে। কিন্তু রেজাল্ট খারাপ হলে তারা তা মেনে নিতে পারে না।

কাজেই পরীক্ষায় ভালো করার জন্যে আপনাকে পড়াশোনা ও ভালো রেজাল্টের সূত্রগুলো অনুসরণ করতে হবে এবং সত্যিকারভাবে ভালো প্রস্তুতি নিতে হবে। তখনই মাটির ব্যাংকে দান ফলপ্রসূ হবে। পরীক্ষা ভালো দেয়ার পর রেজাল্ট ভালো হওয়ার জন্যে আনুষঙ্গিক যে প্রয়োজন-যেমন, পরীক্ষকের যথাযথ মূল্যায়ন পাওয়া, টেবুলেশন শিটে গন্ডগোল না হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলোতে আপনি দানের বরকত পাবেন। কিন্তু ভুল বানান বা ভুল উত্তর লিখেছেন আর দানের বরকতে পরীক্ষার খাতায় তা ঠিক হয়ে আপনি ভালো রেজাল্ট পেয়ে যাবেন-এমনটা কল্পনা করাটা বোকামিরই নামান্তর।

**প্রশ্ন :** মানত করার সঠিক পদ্ধতি কী? আমি একটি কাজের জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ মাটির ব্যাংকে মানত করি। কিছুদিন পর কাজটি তাড়াতাড়ি হওয়ার জন্যে একতৃতীয়াংশ আগাম মাটির ব্যাংকে রাখি। তারপরও কাজটি হয় নি। আবার নতুন করে মানত করি। কিন্তু কাজটি এখনো হয় নি। এখানে উল্লেখ করছি যে, কাজটি ১০০% যুক্তিসঙ্গত এবং আমার নিজস্ব চাকরি সংক্রান্ত। মানত করার জন্যে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম আছে কি না।

**উত্তর :** আপনার উদ্দেশ্য যা-ই হোক, কাজটি হলে আপনি যে সুবিধা পাবেন তার ওপর মানত করে রাখুন। মানত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অর্থ বাড়াতে থাকুন। তবে মানতের পাশাপাশি আপনাকে কাজটি সম্পন্ন করার প্রক্রিয়ার মধ্যেও যেতে হবে-প্রক্রিয়ার জন্যে সময় দিতে হবে।

আপনার পেটব্যথা হয়েছে, আপনি এখনই মানত করলেন, দুঘণ্টা পরে আপনার পেটব্যথা চলে যেতে পারে। এটা এক ধরনের মানত। কিন্তু আপনি চাকরির জন্যে মানত করছেন। সেটা যুক্তিসঙ্গত-ঠিক আছে। কিন্তু এর সাথে আর্থিক ব্যাপার জড়িত এবং পরোক্ষভাবে অপরপক্ষ জড়িত। চাকরির একটি প্রক্রিয়া রয়েছে। আর এ সবকিছুর জন্যেই সময় দরকার। সে পর্যন্ত তো আপনাকে সবর করতেই হবে।

**প্রশ্ন :** মাটির ব্যাংকে টাকা রাখার পরও নিয়ত পূরণ হয় না। করণীয় কী?

**উত্তর :** করণীয় হচ্ছে যে, নিয়মিত দান করা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া। সবরের সাথে কাজ করলে, সময় হলে সৎ নিয়ত পূরণ হবেই।

## আত্মিক শিশু ॥ রক্তদান ॥ মুষ্টিচাল ॥ মৃত্যুবার্ষিকী

**প্রশ্ন :** আমি ১০০ ব্যাচের একজন গ্রাজুয়েট। কোয়ান্টাম শিশুকাননের একটি শিশুকে আমি আত্মিক শিশু হিসেবে গ্রহণ করে তার জন্যে বার্ষিক একটা অর্থ প্রদান করতাম। সম্প্রতি আমার ভাইয়ের ক্যান্সার ধরা পড়ায় তার চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের সুবিধার্থে ভেবেছিলাম, আত্মিক শিশুর খরচটা আর দেবো না। কিন্তু এর মধ্যেই একদিন স্বপ্নে দেখলাম, কয়েকটি ছোট বাচ্চা আমার কাছে এসে কী যেন চাচ্ছে। সাথে সাথেই আমি এক বছরের পুরো টাকা অফিসে গিয়ে দিয়ে এলাম।

**উত্তর :** আসলে আপনি যথার্থ কাজ করেছেন। কারণ আল্লাহ নিজে বলেছেন, এতিমের মাথার ওপর যার হাত থাকে, তার মাথার ওপর থাকে আমার হাত। এমন হতে পারে যে, আত্মিক শিশুর জন্যে এই ব্যয়ের উসিলায় স্রষ্টা আপনার ভাইয়ের রোগকষ্টকে লাঘব করে দিতে পারেন। কারণ রোগমুক্তির জন্যে দোয়া যেরকম, দানও সেরকম গুরুত্বপূর্ণ। আপনি হয়তো শিশুদের আন্তরিকভাবেই ভালবাসেন, সেজন্যেই তারা স্বপ্নেও চলে এসেছে।

**প্রশ্ন :** কাউকে রক্ত দেয়া কি দানের মধ্যে পড়ে? রক্তদানের ধর্মীয় বা শারীরিক গুরুত্ব কী? আমি কোথায় রক্ত দিতে পারি?

**উত্তর :** অবশ্যই রক্তদান উত্তম দান। ধর্মীয় দিক থেকেও রক্তদান অত্যন্ত পুণ্য বা সওয়াবের কাজ। আব্বাহ বলেন—‘একজন মানুষের জীবন রক্ষা করা সমগ্র মানবজাতির জীবন রক্ষা করার মতো মহান কাজ।’—(সূরা মায়দা : ৩২)। আপনি রক্ত দিয়ে একজন মানুষের জীবন রক্ষা করছেন।

শুধু পুণ্যই নয়, রক্তদানে আপনি শারীরিকভাবেও উপকৃত হবেন। পরীক্ষায় দেখা গেছে, রক্তদান করার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই দেহে রক্তের পরিমাণ স্বাভাবিক হয়ে যায়। আর লোহিত কণিকার ঘাটতি পূরণ হতে সময় লাগে চার থেকে আট সপ্তাহ। রক্ত দেয়ার সাথে সাথে দেহের বোনম্যারো নতুন লোহিত কণিকা তৈরির জন্যে উদ্দীপ্ত হয়। আর বছরে তিনবার রক্তদান দেহের লোহিত কণিকাগুলোর প্রাণবন্ততা বাড়িয়ে রক্তদাতার সার্বিক সুস্থতা আর কর্মক্ষমতাকেই বাড়িয়ে দেয়।

নিয়মিত স্বেচ্ছা রক্তদাতারা দুরারোগ্য রোগ-ব্যাদি থেকে সাধারণত মুক্ত থাকেন। সিএনএন পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, রক্তে যদি লৌহের পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে কোলেস্টেরলের অক্সিডেশনের পরিমাণ বেড়ে যায়, ধমনী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলাফল হৃদরোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি। নিয়মিত রক্ত দিলে দেহে এই লৌহের পরিমাণ কমে, যা হৃদরোগের ঝুঁকিকেও কমিয়ে দেয় কার্যকরীভাবে।

ফ্লোরিডা ব্লাড সার্ভিসের এক জরিপে দেখা গেছে, যারা নিয়মিত রক্ত দেন, তাদের হার্ট-এটাকের ঝুঁকি অন্যদের চেয়ে ৮৮ ভাগ কম এবং স্ট্রোকসহ অন্যান্য মারাত্মক হৃদরোগের ঝুঁকি ৩৩ ভাগ কম।

মিলার-কিস্টোন ব্লাড সেন্টারের এক গবেষণায় দেখা যায়, নিয়মিত রক্ত দিলে ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে। বিশেষ করে, ফুসফুস লিভার কোলন পাকস্থলী ও গলার ক্যান্সারের ঝুঁকি নিয়মিত রক্তদাতাদের ক্ষেত্রে অনেক কম।

আর রক্তদানের জন্যে চমৎকার নিরাপদ জায়গা হলো কোয়ান্টাম ল্যাব। আপনার বয়স ১৮-৬০ বছর এবং ওজন কমপক্ষে ৪৮ কেজি হলে চার মাস পর পর আপনি এখানে রক্ত দিতে পারবেন। রক্তদান খুব সহজ ও নিরাপদ বলেই গত ১২ বছরে প্রায় পৌনে দুই লাখ রক্তদাতা কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমে রক্ত দিয়েছেন। আর এ রক্ত থেকে উপকৃত হয়েছেন সোয়া চার লাখ মুমূর্ষু মানুষ।

আপনি রক্ত দেয়ার জন্যে যেকোনো সময় শান্তিনগরস্থ কোয়ান্টাম ল্যাবে আসতে পারেন। সেই সাথে আপনার জন্মদিনকে মহীয়ান করে রাখতে পারেন রক্তদানের মধ্য দিয়ে।

**প্রশ্ন :** মুষ্টিচাল জমা রাখার অনুমতি কি শুধু গ্রাজুয়েটদের? আমরা কি শিশুকাননের সন্তানদের জন্যে এই মহৎ কাজে অংশ নিতে পারি?

**উত্তর :** মুষ্টিচাল শুধু গ্রাজুয়েট বা প্রো-মাস্টার না, প্রত্যেকেই রাখা উচিত। কারণ, রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, ‘প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে যে পেট পুরে খায় সে মুসলমান নয়, সে বিশ্বাসী নয়।’ কিন্তু এখনকার সমাজব্যবস্থাটাই এমন যে, প্রতিবেশী খেয়েছেন কি না-সে খোঁজ নেয়ার সুযোগ আমাদের হয় না। আবার নিতে চাইলেও সহজভাবে সেটা হয়তো করা যায় না। প্রতিবেশীই হয়তো সন্দেহ করে।

এজন্যেই মুষ্টিচাল। এর নিয়ম হচ্ছে, আপনার পরিবারের জন্যে ভাত রান্না করতে যে পরিমাণ চাল নেবেন, সেখান থেকে এক মুষ্টি চাল তুলে রাখবেন। উদ্দেশ্য হলো, পেট পুরে খেলে যে পরিমাণ লাগতো সেখান থেকে চাল তুলে রাখলাম, পেট পুরে খেলাম না। এভাবে প্রতিদিন রান্নার সময় চাল জমিয়ে দুই/ তিন সপ্তাহ পর যখন বেশ পরিমাণ হবে, তখন সে চালটা মেপে তার দামটা ফাউন্ডেশনে দিয়ে দেয়া। আর নিজের কাছে চালটা রেখে দেয়া। তাহলে হাদীসের মর্ম অনুসারে আপনারও পেট পুরে খাওয়া হলো না এবং রসুলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশও অনুসরণ করা হলো। আমরা প্রত্যেকেই নিয়মিত এ কাজটি করতে পারি।

**প্রশ্ন :** সামনে আমার বাবার মৃত্যুবার্ষিকী। তার আত্মার শান্তি কামনায় কীভাবে দান করা উচিত? অনুগ্রহ করে আপনার মতামত জানাবেন।

**উত্তর :** বাবার মৃত্যুবার্ষিকী পালন করার জন্যে আমরা যে পারিপার্শ্বিক সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি-এর চেয়ে খারাপ আর কিছু নেই। এর মধ্যে গুনলাম, রংপুরে আমাদের এক গ্রাজুয়েটের বাবা মারা গেছেন। তাদের গ্রামের রেওয়াজ হলো, কুলখানির দিন আশেপাশের সবাইকে একবার গরু জবাই করে খাওয়াতে হবে। ১০/১৫ দিনের মধ্যে আরেকবার এবং ৪০ দিনের সময় পুরো গ্রামবাসীকে আবার খাওয়াতে হবে।



পরিবারের কেউ মারা গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সমস্ত মেজবানী করতে গিয়ে আমরা তালিকা করি-কী কী পদের খাবার খাওয়ানো হবে। রেজালা, রোস্ট আরো অনেক ধরনের খাবার থাকতে হবে। কেন? মৃতের দোয়া অনুষ্ঠান-এটা কি কোনো আনন্দউৎসব? একটা মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন করতে গিয়ে আমরা যে ব্যয় করি, তা যদি আমরা মানুষের কল্যাণে, এতিম-অসহায়ের কল্যাণে, একজন মানুষকে শিক্ষিত বা স্বাবলম্বী করার কাজে ব্যয় করতাম, তাহলে সেটা হতো সত্যিকারের সাদাকা এবং সদকায়ে-জারিয়া হিসেবে তা থেকে যেত। সদকায়ে-জারিয়া হচ্ছে এমন সৎকর্ম যার সওয়াব আপনি আপনার মৃত্যুর পরও পেতে থাকবেন। যে কারণে আমরা সবসময় উদ্বুদ্ধ করি-অপচয় নয়, সৎকাজে ব্যয় করার জন্যে।

অসহায় শিশুদের আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা, টিউবওয়েল স্থাপন-এগুলোও সদকায়ে-জারিয়া। আপনার মরহুম বাবার নামে আপনি একটা টিউবওয়েল স্থাপনের অর্থ দান করতে পারেন। কারণ বিশুদ্ধ পানির সংস্থান করা উত্তম সাদাকা। অলি-বুজুর্গ, মুনি-ঋষিদের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি, কোথাও গেলে প্রথমেই তারা একটা দীঘি খনন করতেন-যা হাজারো মানুষকে যোগাতো বিশুদ্ধ পানি।

# এগিয়ে যান



## সামনে এগুতে হলে

**প্রশ্ন :** সফলতার জন্যে সামনে এগুতে হলে কোনটা বেশি দরকার-দক্ষতা না সততা? কখনো মনে হয় দক্ষতা, কখনো মনে হয় সততা। আসলে কী হবে?

**উত্তর :** আসলে বৈষয়িক শক্তির উৎকর্ষের প্রতীক দক্ষতা। আর নৈতিক শক্তির উৎকর্ষের প্রতীক সততা। সাফল্যের জন্যে দক্ষতা এবং সততা দুটোই দরকার। তবে বেশি দরকার সততা। কারণ দক্ষতা সততা সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু সততা দক্ষতা সৃষ্টি করতে পারে।

ব্যক্তিজীবনে যত ধরনের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা বা ডিগ্রি যা-ই থাকুক না কেন, সততা যদি না থাকে তাহলে দক্ষতা কখনো প্রাচুর্য আনতে পারে না। বরং তা সংগ্রহ ও ভোগের স্পৃহা বাড়ায়। সেই সাথে বাড়ায় আসক্তি ও দুর্দশা। কিন্তু দক্ষতার সাথে যখন সততা থাকে তখন তা সেবা ও দানের স্পৃহাকেই বাড়িয়ে দেয়। সততার প্রক্রিয়াই হচ্ছে—এটি দক্ষতা সৃষ্টি করে নিজেকে পরিণত করে অন্যের বিশ্বস্ততার কেন্দ্রবিন্দুতে। একজন মানুষের ভেতর থেকে যখন নৈতিক ও আত্মিক শক্তি জাগ্রত হয় তখন দক্ষতা আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়—পরিস্থিতি তাকে দক্ষ করে তোলে।

এ প্রসঙ্গে আরবদের পারস্য বিজয়ের উদাহরণটি দেয়া যেতে পারে—পারস্য বিজয়ের সময় মহাবীর রুস্তমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে যখন নামিদামি সেনাপতি কাউকেই কাছে পেলেন না, তখন খলিফা ওমর সেনাপতি মনোনীত করলেন সাদ বিন আবু ওয়াক্কাসকে, যার যুদ্ধ পরিচালনায় কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিলো না। যুদ্ধক্ষেত্রে বিশাল পারস্যবাহিনী হাতি সামনে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। সেনাপতি রুস্তম একটা উঁচু জায়গায় হাতির পিঠে হাওদায় বসে দূর থেকে আরব বাহিনীর জীর্ণশীর্ণ অবস্থা দেখে হাসছেন—এ তো কিছুক্ষণের খোরাক!

আবু ওয়াক্কাস বুঝলেন, সরাসরি যুদ্ধে সুবিধা করা যাবে না। তিনি আত্মনিমগ্ন হলেন। বুদ্ধি বেরিয়ে এলো। তীরন্দাজ প্রধানকে নির্দেশ দিলেন—সামনের যে হাতিটাকে অনুসরণ করে দুপাশের হাতিগুলো বল্লমের ফলার মতো এগোচ্ছে—ওটার দুই চোখে তীর মারতে হবে। সবচেয়ে দক্ষ তীরন্দাজ দল অবস্থান নিলো। প্রশিক্ষিত হাতির পাল এগিয়ে আসছে, হাতির পেছনে লাখে সৈন্য। ৫০ হাতের মধ্যে আসার সাথে সাথে দুজন তীরন্দাজ দুটি তীর মারলেন। দুটিই গিয়ে বিধলো নেতা হাতির দুচোখে। তীর ঢোকান সাথে

সাথে অক্ষ হয়ে হাতি পেছনে ঘুরে গেল। নেতা হাতিকে দিক পরিবর্তন করতে দেখে বাকি হাতিগুলোও পেছনে ঘুরে গেল।

আরব বাহিনীর পরিবর্তে পুরো পারস্য বাহিনী হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। বিপুল সংখ্যক সৈন্য হতাহত হলো। সেনাপতি রস্তুম হাতির হাওদা থেকে নেমে ঘোড়া নিয়ে পালাতে গিয়ে নিহত হলেন। জয়ী হলো আরবরা। অর্থাৎ তাদের সুসজ্জিত বিশাল বাহিনী না থাকলেও নৈতিক শক্তিতে যেহেতু তারা উজ্জীবিত ছিলেন, মস্তিষ্ককে ব্যবহার করে নতুন রণকৌশল অবলম্বনে অচিরেই তারা দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন এবং বিজয় তারা ই পেয়েছেন। অবহেলিত পশ্চাদপদ জনপদের অখ্যাত মানুষরাই তখনকার দুই সুপারপাওয়ার রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়। পতন করে এক নতুন সভ্যতার।

গত শতাব্দিতে চেয়ারম্যান মাওয়ের নেতৃত্বে লালফৌজও একইভাবে ১৫ বছরের যুদ্ধে চিয়াং কাইশেকের বিশাল সুসজ্জিত বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে চীনে কমুনিজম প্রতিষ্ঠা করে। লালফৌজের সেনাপতিসহ সাধারণ সৈনিক-প্রচলিত অর্থে কারোরই কোনো সামরিক ট্রেনিং ছিলো না। নৈতিক শক্তিই তাদের মধ্যে চিয়াং কাইশেককে হঠানোর প্রয়োজনীয় দক্ষতা সৃষ্টি করে।

আবার দক্ষতা আছে, কিন্তু সততা নেই-এমন হলে তা কল্যাণ বয়ে আনে না। কারণ সেক্ষেত্রে মানবিকতার দৃষ্টিকোণ লোপ পায় এবং দানবীয় লোলুপ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়। যেকোনো উপায়ে লাভবান হওয়ার বাসনায় সততাকে বিসর্জন দেয়ার মানসিকতা তৈরি হয়। আমাদের চারপাশে এত অজস্র দুর্নীতি, ভেজাল, প্রতারণা-সবই তো নৈতিকতাবর্জিত দক্ষ লোকদেরই কীর্তি!

শুধু দক্ষতার পরিণাম দুর্দশা-অশান্তি। অনেক কষ্ট করে দক্ষ হলেন-দক্ষ হওয়ার পর আপনার দুর্দশা, অশান্তি আরো বাড়লো। যেরকম সিএনএন-এর মালিক টেড টার্নার। এত কষ্ট করে সিএনএন করলেন। এখন আর টেড টার্নার মালিক নেই, এখন এর মালিক 'টাইম ওয়ার্লার কোম্পানি'। এর মধ্যে খবরে দেখলাম, আমেরিকাতে নাকি এক মাসে এত বেশি সংখ্যক সিইও পদত্যাগ করেছে, যা এর আগে কখনো করে নি। কেন? কারণ নানারকম ম্যানিপুলেশন আর দুর্নীতির অভিযোগ।

আমেরিকার বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দার জন্যে দায়ী করা হচ্ছে হার্ভার্ডের এমবিএ করা দক্ষ ম্যানেজারদের। ইউরোপের বড় বড় ব্যাংকে লালবাতি জ্বালানোর পেছনেও কাজ করেছে এই দক্ষ সিইওদের দুর্নীতি। অর্থাৎ শুধু দক্ষতা লোভ, আসক্তি আর অনৈতিকতার প্রসার ঘটায় যা পরিণামে শুধু সেই

ব্যক্তির নয়, গোটা সমাজেই ডেকে আনে দুর্দশা, অশান্তি ।

যুক্তরাষ্ট্র এখন পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ শিল্পোন্নত দেশ । বিশ্বের ৫৫% সম্পদ তার অধিকারে । কিন্তু মার্কিন সরকার এখনো এটা বলতে পারে না যে, দেশে সাহায্য নেয়ার মতো কোনো লোক নেই, বস্তিতে রাস্তার পাশে কেউ রাত কাটায় না, না খেয়ে কেউ থাকে না । বলতে পারে না, একজন নারী ধর্ষণের আশঙ্কা ছাড়াই দিনে বা রাতে নিউইয়র্ক শহরের যেকোনো রাস্তায় চলাচল করতে পারে । ২০১১ সালে নিউইয়র্কের ওয়াল স্ট্রিটে ‘অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট’ বা ‘ওয়াল স্ট্রিট দখল কর’ আন্দোলনে প্রকাশ পেয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ বঞ্চিত মানুষের করুণ অবস্থা । নেতাহীন এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকারীদের দাবি ছিলো—সবচেয়ে ধনী মাত্র ১% মানুষের হাতে যে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে আছে, তা সুষম বন্টন করে দিতে হবে অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার বাকি ৯৯% মানুষের মাঝে ।

আবার ইতিহাসের দিকে তাকান । এখন থেকে ১৪০০ বছর আগে খোলাফায়ে রাশেদার যুগের শেষ দুই দশকে আরবে দান বা যাকাত নেয়ার মতো কেউ ছিলো না । আরবের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে একজন নারী একা চলে যেতে পেরেছেন, পথে কোনো বিপদের আশঙ্কা ছাড়াই । এটাই হচ্ছে সততা এবং দক্ষতার মধ্যে পার্থক্য ।

১৪০০ বছর আগে আরবে যে মানুষগুলো সবসময় লিপ্ত থাকতো হানাহানি লুটপাটে, কন্যাশিশুকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলা ছিলো যাদের সামাজিক ঐতিহ্য, সেই মানুষগুলোই রূপান্তরিত হয়েছিলো মানবিকতার প্রতীকে । এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিলো নৈতিক শক্তির উত্থানের ফলে ।

আসলে প্রতিটি মানবশিশুই ভালো মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করে । সাধারণত খারাপ পারিপার্শ্বিকতার কারণে ভালো গুণ চাপা পড়ে খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকট হয়ে ওঠে । কিন্তু যে অন্তরে ডুব দিতে পারে, পারিপার্শ্বিকতা যত খারাপই হোক না কেন—তার ভেতরের নৈতিক শক্তি বিকশিত হবেই । আর নৈতিক শক্তির অন্তর্জাগরণ তাকে সব বিষয়েই পর্যায়ক্রমে দক্ষ করে তুলবে । সে অর্জন করবে কাক্ষিত সাফল্য ।

**প্রশ্ন :** কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার পূর্বে কোনো কাজ ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ কি না তা বিচার না করে তাৎক্ষণিক করে ফেলতাম । এখন ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণ মনের ভেতরে আসায় অনেক কিছুই করতে পারি না । মনে হচ্ছে ক্রমশ ভীতু হয়ে যাচ্ছি, ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছি—এর থেকে

পরিত্রাণের উপায় কী? এটা শুধু আমি না, আরো অনেকেরই হচ্ছে। দয়া করে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

**উত্তর :** আসলে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ এই বিচারটাই হচ্ছে মানবীয়। এটাই নৈতিক শক্তি। এটা করতে পারছেন বলেই আপনি মানুষ হওয়ার পথে অগ্রসর হতে পারছেন। ন্যায়-অন্যায় ভালো-মন্দ বিচার-বিবেচনা যদি না থাকে, তাহলে মানুষ এবং জানোয়ারের মধ্যে কোনো তফাত থাকবে না। যদি তাত্ক্ষণিকভাবে কাজ করে ফেলেন এবং পরে অনুতপ্ত হন—এতে কী হয়? আহাম্মক আগে কাজ করে, পরে চিন্তা করে। আর বুদ্ধিমান আগে চিন্তা করে পরে কাজ করে। আমরা বুদ্ধিমান হতে শিখছি, মানুষ হতে শিখছি।

ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতা যে আমাদের আছে, এটি অত্যন্ত গুণ লক্ষণ। কিন্তু এটি যেন আমাদের ভীত না করে। যদি ভীতু হয়ে যান, আপনি পরাজিত হলেন। যে ভয় পেলো, সে শেষ হয়ে গেল। তার দ্বারা পৃথিবীতে কিছু হবে না। তার ন্যায়-অন্যায়েরও কিছু নেই। একজনকে ধরে আপনি ঘুষি দিতে পারেন, কিন্তু দিলেন না। কেন দিলেন না? কারণ ঘুষি দেয়াটা অন্যায়। এখানে আপনি মানুষ হিসেবে পরিচয় দিলেন।

আর আপনি তাকে ঘুষি দিতে পারেন না, সে শক্তিই আপনার মুষ্টিতে নেই—এজন্যে আপনি ঘুষি দিলেন না। এটা মানবীয় নয়, এটা অক্ষমতা। এই পার্থক্যটা বুঝতে হবে। যিনি ন্যায় করেন তিনি সবসময় সাহসী। যেকোনো অন্যায়ের সামনে তিনি সাহসী। কী হবে? মারা-ই তো যাবো। অতএব ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা যার আছে, যিনি সত্যের পূজারি—তিনি সবসময়ই সাহসী।

**প্রশ্ন :** আমাদের চারপাশে যারা সৎ এবং অন্যের কল্যাণে নিবেদিত তারা সবসময় বিপদগ্রস্ত হন। যারা অসৎ ও অন্যের অমঙ্গল চায়, তারাই সবসময় ভালো থাকে। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?

**উত্তর :** আপনার ধারণা ঠিক নয়। ভালো থাকে বলতে আপনি যা বুঝিয়েছেন, তা হলো তাদের অর্থ, ক্ষমতা থাকতে পারে, কিন্তু তারা কখনো ভালো থাকে না। পেশাগত কারণে সাধারণ মানুষের দুঃখকে আমি অনেক কাছ থেকে দেখেছি। আজ পর্যন্ত কোনো অসৎ, অন্যায়কারীকে ভালো থাকতে দেখি নি। সে অনেক টাকা ক্ষমতা শক্তির মদমত্ততার মধ্যে থাকতে পারে, কিন্তু ভালো থাকতে পারে না। কারণ ভালো থাকতে হলে ভালো মানুষ হতে হবে।

**প্রশ্ন :** বর্তমান সময়ে দেখা যায় যে, পারস্পরিক লেনদেনে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে জড়াতে হয়। যার জন্যে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করতে হয়। এ অবস্থায় একজন সৎ মানুষ হিসেবে আমার করণীয় কী?

**উত্তর :** একজন সৎ মানুষ শক্তিশীল, যদি না সামগ্রিক সিস্টেম সৎ হয়, যথাযথ হয়। কারণ, সমাজের অধিকাংশ মানুষই যখন অসৎ তখন বিচ্ছিন্ন সৎ মানুষটিই হয়ে পড়ে কোণঠাসা, নিঃসঙ্গ। তার সততা, আদর্শকে বাস্তবায়িত করা হয় কঠিন। আরেকজন চোখের সামনে অন্যায় করে গেলেও তাকিয়ে দেখা ছাড়া তার আর কিছু করার থাকে না। সমাজের অধিকাংশ মানুষই যখন দুর্নীতি, বিনাশ্রম উপার্জনে নিমজ্জিত, তখন ঘুষ/ উপরির লেনদেন চলে প্রকাশ্যেই। কিন্তু যখন অধিকাংশ মানুষই ছিলো সৎ, তখন অন্যায় হতো গোপনে। তাই সৎ মানুষের সংখ্যা বাড়তে হবে। সৎ মানুষের সংখ্যা যত বাড়বে, যত তারা সজ্জবদ্ধ হবে, যত তারা দক্ষ হবে তত দ্রুত সমাজ বদলাবে। সিস্টেম বদলাবে। সম্ভব হবে ন্যায় ও নৈতিকতার বাস্তবায়ন।

## শৃঙ্খলা

**প্রশ্ন :** নিয়মিত মেডিটেশন, ধর্মকর্ম এবং রুটিন মেনে চলার মাধ্যমে আমরা কি এক ধরনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছি না? অথচ আমরা চাই শৃঙ্খলমুক্ত অর্থাৎ স্বাধীন হয়ে থাকতে। আবার ফাউন্ডেশন বলে, শৃঙ্খলাই শৃঙ্খলমুক্তির পথ। শৃঙ্খলা কীভাবে শৃঙ্খলমুক্তির পথ হয়?

**উত্তর :** আসলে আমরা স্বাধীনতা বলতে অধিকাংশ সময় শুধু নিজের স্বাধীনতা বুঝি। স্বাধীনতা মানে যে সবার স্বাধীনতা এটা বুঝি না। আর একমাত্র শৃঙ্খলাই পারে সবার স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে। আসলে স্বাধীনতা এবং স্বৈচ্ছাচারিতা বা সবকিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এক বিষয় নয়। শৃঙ্খলাই আসলে স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে এবং এজন্যেই আমরা বলি যে, শৃঙ্খলাই শৃঙ্খলমুক্তির পথ।

শৃঙ্খলা হচ্ছে অনন্য মানুষের ভূষণ। অনন্য মানুষের যদি একটি পোশাক থাকে, সেটা হচ্ছে শৃঙ্খলা। কারণ সে নিজে স্বাধীন এবং এজন্যে অন্যের স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে। যে নিজে স্বাধীন নয়, সে কখনো অন্যের স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করতে পারে না।



আসলে জীবনকে আপনি যত শৃঙ্খলাপূর্ণ করতে পারবেন তত জীবনের অর্জন বেশি হবে। এটাই বুদ্ধিমানদের পথ। নির্বোধরা কষ্ট বেশি করে, কিন্তু আউটপুট কম হয়। কারণ নির্বোধরা শৃঙ্খলাকে অনুসরণ করে না। অথচ সব ধর্মেই নিয়মকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যদি নিয়ম গুরুত্বপূর্ণ না হতো, তাহলে স্রষ্টা কখনো নিয়ম অনুসরণ করতে বলতেন না। এমনকি লক্ষ করলে দেখবেন, সৃষ্টি জগতেও সবকিছু নিয়মেরই অধীন। আমরা যদি শৃঙ্খলা না মানি, যে যার মতো চলি তাহলে কখনো স্রষ্টাকে উপলব্ধি করতে পারবো না। স্রষ্টাকে উপলব্ধি করতে হলে তাঁর নিয়মকে অনুধাবন করতে হবে।

শৃঙ্খলা হচ্ছে জীবনের স্বাধীনতার মূল সূত্র। আপনি যত ডিসিপ্লিনড হবেন তত আপনি স্বাধীন হবেন। তাই শৃঙ্খলার জন্যে সৎসঙ্গে একাত্ম হতে হবে, নেতৃত্বকে অনুসরণ করতে হবে, নেতৃত্ব প্রদান করতে হবে, সময়ানুবর্তী হতে হবে, দায়িত্বশীল হতে হবে, কর্তব্যনিষ্ঠ হতে হবে।

**প্রশ্ন :** অনন্য মানুষ হওয়ার জন্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব কতটা?

**উত্তর :** আপনি নিজে যদি আপনার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তাহলে অন্যের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হতে পারবেন। যখন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবেন, তখন অনন্য মানুষ হওয়ার পথে আপনি অগ্রসর হবেন। আর যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ না করেন, আপনার ওপর শয়তানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে। আপনার প্রবৃত্তি, আপনার খেয়াল আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

যেমন, কখনো কখনো হয়তো এমন হয়—আপনার ভালো লাগছে না, ভাবলেন, যাই, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে আসি। সেখানেও ভালো লাগছে না, তাহলে ড্রাগস নিলে হয়তো ভালো লাগবে। বন্ধুরাও বলবে, খেয়েই দেখ না, কত ভালো লাগে। কৌতূহলবশত একবার যখন খাবেন আপনি আর সে পথ থেকে বেরোতে পারবেন না।

অর্থাৎ নিজেকে যদি নিজে নিয়ন্ত্রণ করেন, আপনার ওপর আত্মার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, আপনি অনন্য মানুষ হবেন। আর নিজের নিয়ন্ত্রণ যদি অন্যের ওপর ছেড়ে দেন, অন্যরা আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, আপনি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেন। এজন্যে ব্যক্তিজীবনে ডিসিপ্লিনড হতে হবে। প্রতিদিনের কাজের রুটিন অনুসারে চলতে হবে। পড়াশোনার রুটিন, কর্মস্থলের রুটিন, পারিবারিক কর্তব্যের রুটিন, সাংগঠনিক দায়িত্বের রুটিন—সব কাজ একটি রুটিনের মধ্যে চলবে। যত রুটিনের মধ্যে চলবেন, তত আপনি সামনে এগিয়ে যাবেন,

আপনাকে কেউ পেছনে ফেলতে পারবে না। আর আপনি যত মেধাবী হোন—যদি রুটিনের মধ্যে না চলেন, আপনি জীবনে প্রথম হতে পারবেন না, শতকরা ৯৯ জন মানুষ জীবনে প্রথম হতে পারে নি। কারণ তারা নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে রুটিন অনুসরণ করতে পারে নি।

**প্রশ্ন :** অস্থিরতার জন্যে আমি গুছিয়ে কোনো কাজ করতে পারি না। কীভাবে আমি গুছিয়ে কাজ করতে পারবো?

**উত্তর :** প্রথমে আপনাকে স্থির হতে হবে। আর এজন্যে দরকার নিয়মিত মেডিটেশন। সেই সাথে প্রতিদিনের মেডিটেশনে যদি আপনি আপনার দিনের কাজগুলোকে অবলোকন করেন, পরিকল্পনা করেন—তাহলেই দেখবেন প্রতিটি কাজ হচ্ছে ঠিক আপনার পছন্দমতো গোছানো এবং সুবিন্যস্ত।

আসলে আমরা প্রাচুর্যবান হতে পারি না—তার একটি প্রধান কারণ হলো, আমরা গুছিয়ে কাজ করতে পারি না, সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করতে পারি না। কাজ অনেক থাকে, কিন্তু জট পাকিয়ে যায়, এলোমেলো হয়ে যায়। রুটিনমাফিক করতে পারি না, ফলে শেষপর্যন্ত লাগসই কিছু হয়ে ওঠে না। কোয়ান্টামের ভাষায়, আমরা কাজের সুবিন্যাসায়ন করতে পারি না। আসলে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করতে হলে আপনাকে আগে প্রশান্ত হতে হবে। এজন্যে নিয়মিত মেডিটেশন করুন। মনছবি স্থির করুন। মহৎ লক্ষ্য থাকলে জীবন আস্তে আস্তে সুশৃঙ্খল হয়ে উঠবে। আপনি গুছিয়ে কাজ করতে পারবেন।

**প্রশ্ন :** কর্মব্যস্ত সুখী জীবন বলতে বলতে ব্যস্ততা এত বেড়েছে যে, ২৪ ঘণ্টায় দিন অনেক ছোট হয়ে গেছে। ৩০ ঘণ্টায় দিন হলে ভালো হতো। এখন কী করে সমন্বয় করবো? আপনার পরামর্শ প্রয়োজন।

**উত্তর :** আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবেন। কারণ যত পরিশ্রম করতে পারবেন তত ভালো থাকবেন। তবে শুধু ব্যস্ত থাকলেই হবে না। গাধাও ব্যস্ত থাকে। কিন্তু গাধার পরিশ্রমের ফল অন্যেরা পায়। আপনাকে পরিশ্রমের ফসল নিজের ঘরে তুলতে হবে। এজন্যে নিয়মিত দুবেলা মেডিটেশন করবেন। ধ্যানতীর্থ কোয়ান্টামমে কোয়ান্টায়ন করবেন। সুবিন্যাসায়ন করে কাজগুলো করবেন। আপনি ২৪ ঘণ্টায় ৪০ ঘণ্টার কাজ করতে পারবেন।

## আত্মপর্যালোচনা

**প্রশ্ন :** আত্মমূল্যায়ন বিষয়টি কী?

**উত্তর :** নিজেকে মূল্যায়নের প্রক্রিয়ার নামই আত্মমূল্যায়ন। আত্মমূল্যায়ন হচ্ছে নিজের সাথে নিজের প্রতিযোগিতা যে, গতকাল আমি কতটুকু করতে পেরেছি আর আজকে আমি কতটুকু করতে পারলাম। এটি একান্তই আপনার। এই আত্মপর্যালোচনা, আত্মমূল্যায়ন যদি এক বছর নিয়মিত প্রতিদিন করেন, দেখবেন, একজন সৎ এবং দক্ষ মানুষ হিসেবে আপনি আপনার চারপাশের মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছেন। কারণ যে নিজের বিচার নিজে করে, সে অন্যের বিচারে সবসময় উতরে যায়। যে নিজের বিচার নিজে করে না, সে অন্যের বিচারে উতরাতে পারে না। নিজেকে মূল্যায়নের জন্যে করণীয়-বর্জনীয় নিয়ে একটা শিট তৈরি করে প্রতিদিন পূরণ করে নিজের কাছে রাখতে পারেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনে ফাউন্ডেশনের সহযোগিতা নিতে পারেন।

**প্রশ্ন :** কিছু নেতিবাচক কাজ পরিত্যাগ করতে আমি আশ্রয় চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না। বার বার করে ফেলি, অনুতপ্ত হই, তওবা করি কিন্তু আবার করি।

**উত্তর :** নিজের ভেতরটাকে শোধরানোর চেষ্টা করবেন। যতবার ভুল করবেন, ততবারই উঠে দাঁড়াবেন। নিয়মিত অটোসাজেশন দেবেন, মেডিটেশন করবেন এবং সৎসঙ্গে থাকবেন। কারণ অধিকাংশ সময়ই মানুষ খারাপ চিন্তা করে যখন সে একা থাকে। রাতে নির্জন মুহূর্তে কু-চিন্তা বেশি আসে। সবসময় ভালো কাজের মধ্যে থাকুন-আপনি অসৎ কাজ করার, খারাপ চিন্তা করার সুযোগ পাবেন না। রাতে নির্জন মুহূর্তেও সজ্ঞা নিয়ে, মনছবি নিয়ে চিন্তা করুন। সবসময় ভালো কাজে ব্যস্ত থাকুন, আপনি ভালো থাকবেন।

**প্রশ্ন :** আমি তো কাগজে রুটিন করে কাজ করি, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ঘুমাবার আগে যে হিসেব মেলাবার কথা, সেই হিসেবই আমি ঠিকমতো করতে পারি না, একটু সাহায্য করুন।

**উত্তর :** আমি সাহায্য করলে তো লাভ হবে না। কারণ, আপনার ওখানে আমার যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। নিজের সাহায্য নিজেকেই করতে হবে।

এরপরে ঘুমানোর আগে দাঁড়িয়ে থাকবেন যে, হিসেব না মিলিয়ে ঘুমাবো না। দেখবেন, আপনার আত্মপর্যালোচনা ঠিক হচ্ছে। আসলে যে বেহিসেবি, তার না প্রাচুর্য থাকে, না তার কাজের কোনো শৃঙ্খলা থাকে। আপনি দেখবেন, গরিব মানুষদের কিন্তু কোনো হিসেব নাই। আর পৃথিবীর যত ধনী মানুষ-তারা সবাই হিসেবি। অতএব হিসেবটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। নিজের হিসাব নিজে নেবেন, আপনি সবসময় এগিয়ে থাকবেন।

## সিদ্ধান্ত গ্রহণ

**প্রশ্ন :** সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্তকে বেশি প্রাধান্য দেবো? যদি দুটি সিদ্ধান্তের মাঝে একটিকে গ্রহণ করতে হয়-কোন কোন দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবো?

**উত্তর :** খুব সহজ। যে সিদ্ধান্তটি আপনি নিতে চাচ্ছেন তাকে দুটি ভাগে ভাগ করুন-বামপাশে সুবিধা অর্থাৎ এ সিদ্ধান্তটা নিলে আপনার কী কী লাভ হবে আর ডানপাশে অসুবিধা অর্থাৎ এ সিদ্ধান্তটা নিলে আপনার কী কী ক্ষতি হবে। এবার এই পয়েন্টগুলোর মধ্যে তুলনা করুন যে, লাভের তুলনায় ক্ষতি কি বেশি না কম। যদি মনে হয় বেশি, তাহলে সিদ্ধান্তটি নেবেন না। আর যদি মনে হয় কম, তাহলে নেবেন। কারণ এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত।

আসলে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে আছে-সিদ্ধান্ত না নিয়ে এক ধরনের আনন্দ পায় এবং এরা নিজেরা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চায় না। এরা চায়, আরেকজন সিদ্ধান্ত দিয়ে দিক। বলে, এ কাজটা তো করতে চাই, কিন্তু আরেকজন বলে দিক, তাহলে করবো। কারণ, যদি কোনোরকম অসুবিধা হয় তাহলে যেন বলতে পারে-অমুকে বলেছিলো, আমি তো চাই নি। অর্থাৎ দোষটা যেন তার ওপরে চাপিয়ে দিতে পারে। আর ভালো হলে বলে, দেখ, আমার সিদ্ধান্ত কত সঠিক।

আসলে নিজের দায়িত্ব নিজেকে নিতে হবে। প্রয়োজনে শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শ আপনি নিতে পারেন, কিন্তু মনে রাখবেন-জীবন আপনার, সিদ্ধান্তও আপনাকেই নিতে হবে। ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ঠিক আছে; ভুল যদি নিয়ে থাকি, আমিই নিয়েছি, আমিই এর মোকাবেলা করবো। প্রতিটি সফল মানুষ সবসময় নিজের দায়িত্ব নিজে নিয়েছেন। কখনো অন্যের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেন নি-নিজের সাফল্যেও না, ব্যর্থতায়ও না।

অতএব সফল মানেই সবক্ষেত্রেই সফল নয়। ইতিহাসে যত সফল মানুষ আছেন, সবক্ষেত্রে কিন্তু তারা সফল নন। যেমন, একজন সফল ব্যবসায়ী কিন্তু সব ব্যবসায়ে সফল হন না—অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফল হন। যদি দশটা ব্যবসা করেন, তার মধ্যে সাতটাতে তিনি সফল আর বাকি তিনটাতে হয়তো ব্যর্থ। তবে সফল তাদেরকে বলা হয়, যারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফল। তিনি তার সাফল্য বা ব্যর্থতার দায়িত্ব কারো ওপরে চাপিয়ে দেন না, তিনি নিজে নেন। একজন লিডার একজন সফল মানুষ। আপনি যদি লিডার হতে চান, আপনাকে দায়িত্ব নিতে শিখতে হবে—নিজের এবং অন্যদের, সাফল্য এবং ব্যর্থতা—দুয়েরই। তাহলেই আপনি সফল হতে পারবেন। কারণ যে ঝুঁকি নেয়, সফল হওয়ার সম্ভাবনা তারই বেশি থাকে।

**প্রশ্ন :** আমরা অনেক সময় আবেগবশত অনেক ভুল সিদ্ধান্ত নিই, অনেক ভুল কাজ করি। কিন্তু যখন কাজটা করি তখন বুঝতে পারি না যে, এটা আবেগবশত কিংবা অযৌক্তিক। এ ধরনের ভুল সাথে সাথে ধরতে পারার উপায় কী?

**উত্তর :** এজন্যে আপনাকে প্রজ্ঞাবান হতে হবে। বুঝতে হবে যে, আপনার আজকের কাজের ফল আগামী এক বছর, দুই বছর বা পাঁচ বছর পর কী হবে? আসলে আমরা অনেক সময় মনে করি যে, ‘একটি ভুল’। কিন্তু এই একটি ভুলই জীবন ধ্বংস করার জন্যে যথেষ্ট। জীবন ধ্বংস করার জন্যে একশটা ভুলের দরকার নেই। এ প্রসঙ্গে একটা সত্য ঘটনা বলা যায়—

একবার এক লোক কৈ মাছ ধরার জন্যে পানিতে নামলো। একটা ধরার পরে দেখে সেখানে আরো মাছ। তার কাছে মাছ রাখার কিছু ছিলো না। সে তখন হাতের মাছটা মুখে কামড়ে ধরলো। তারপর হাত দিয়ে ধরতে গেল আরো একটি মাছ। এদিকে মুখে কামড়ে রাখা কৈ-টা তড়পাতে তড়পাতে ঢুকে গেল তার গলার ভেতর। এখন এটা না মারা যাচ্ছে, না গলা দিয়ে নামছে, না বাইরে আসছে। শেষমেশ লোকটি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারাই গেল। ছোট একটা ভুলের পরিণামে তাকে জীবন দিতে হলো।

ইতিহাসের দিকে যদি তাকান—১৭৫৭ সালে পলাশীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় ঔপনিবেশিক শাসনের যে সূচনা হলো, তার গোড়াতেও ছিলো এই প্রজ্ঞাহীনতা, এই ভুল। সিরাজউদ্দৌলা যদি তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী দলের

নেতা মীরজাফরের কথা শুনে যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ না দিতেন, তিনি যদি বুঝতে পারতেন যে, এই মুহূর্তে যুদ্ধ বন্ধের আদেশ কতটা বিপর্যয় নিয়ে আসবে—তাহলে ভারতবর্ষের ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে রচিত হতো। এই প্রজ্ঞাহীনতার পরিণতি আমরা এখনো ভোগ করে চলেছি। এখনো আমরা ইংরেজদের প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি নি। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা নিজেদের মতো চলার স্বাধীনতা অর্জন করি নি।

## গ্রাউন্ড জিরো

**প্রশ্ন :** গ্রাউন্ড জিরো বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

**উত্তর :** গ্রাউন্ড জিরো শব্দটা আমাদের দেশে পরিচিত হয়েছে ২০০১ সালে নিউইয়র্কের টুইনটাওয়ার ধ্বংসের ঘটনা থেকে। অর্থাৎ গ্রাউন্ড জিরো হচ্ছে একটা ধ্বংসস্তূপ, একটা শূন্য সমতল জায়গা—যেখানে নতুন করে কিছু গড়তে হবে। যেখান থেকে নতুন উত্থান হবে, নতুন অভ্যুদয় হবে, সেটাই হচ্ছে গ্রাউন্ড জিরো।

গ্রাউন্ড জিরো বলতে আমরা বোঝাই বর্তমান অবস্থাকে। এটি কারো কারো কাছে হতে পারে কোনো ব্যর্থতা। যেমন, যিনি কোথাও ইন্টারভিউ দিয়েছেন, চাকরি হয় নি। তার জন্যে এটি গ্রাউন্ড জিরো। যার ব্যবসায় ক্ষতি হয়ে গেছে, তার জন্যে সেটি গ্রাউন্ড জিরো। অথবা স্বামীর সাথে খুব ঝগড়া হয়েছে—এটা গ্রাউন্ড জিরো। কোনো বিপদে পড়েছেন বা কেউ মামলা করে দিয়েছে—এটি হলো গ্রাউন্ড জিরো। রেজাল্ট খারাপ হয়েছে—এটি গ্রাউন্ড জিরো। কাজক্ষিত বিষয়ে ভর্তি হতে পারেন নি—এটি গ্রাউন্ড জিরো।

আবার কারো কারো জন্যে এটা হতে পারে সাফল্য। আপনি চাকরি পেয়েছেন, ব্যবসায়ে লাভ করেছেন অথবা রেজাল্ট ভালো করেছেন—এটা আপনার বর্তমান গ্রাউন্ড জিরো।

সাফল্যের গ্রাউন্ড জিরো সূত্রের মূল কথা হচ্ছে আপনার বর্তমান অবস্থা যা-ই হোক, সেটিকে দেখতে হবে নতুন কার্যক্রম, নতুন সাফল্যের ভিত্তিভূমি হিসেবে। কারণ সাফল্য একটি চলমান প্রক্রিয়ার নাম। সফল মানুষেরা ব্যর্থতায় হতাশ না হয়ে বরং ব্যর্থতার মধ্যেই সাফল্যের বীজ খুঁজে নিয়ে নতুন উদ্যমে লক্ষ্যপানে এগিয়ে গেছেন। আবার একটি সাফল্যে আত্মতুষ্টি না হয়ে আরো সাফল্যের অভিযাত্রায় নতুন লক্ষ্যপানে যাত্রা করেছেন।

আমরা সাফল্যের উচ্চশিখরে পৌঁছাতে পারি না। তার একটি কারণ আমরা সাময়িক সাফল্যে তৃপ্ত হয়ে যাই। অনেক সময় দেখা যায়, আমরা ছাত্রজীবনে খুব ভালো রেজাল্ট করে ভালো চাকরিতে প্রবেশ করছি, কিন্তু এরপর আর কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারছি না। এর কারণও হলো একটি লক্ষ্য অর্জনের পর সামনে নতুন কোনো লক্ষ্য না থাকা।

আসলে ক্রমাগত পথ চলা, ক্রমাগত অগ্রসর হওয়ার নামই হচ্ছে সাফল্য। আপনি থামলেই অন্যরা এগিয়ে যাবে। সাফল্য এমন একটি যাত্রা যেখানে প্রতিটি ধাপকে মনে করতে হবে একেকটি গ্রাউন্ড জিরো, অর্থাৎ নতুন সাফল্যের ভিত্তি। আজকে পৃথিবীতে যারাই সাফল্যের স্বর্ণশিখরে অবস্থান করছেন তারা প্রত্যেকেই এই নীতি অনুসরণ করেছেন।

**প্রশ্ন :** আমি ঢাকার একটি বেসরকারি কলেজের কম্পিউটার বিজ্ঞানের প্রভাষক। ভালো বেতন, কাজের কম সময় এবং বাসার কাছের কলেজ-সব মিলিয়ে পেশাটি নিয়ে আমার তৃপ্ত থাকাটাই স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু তা হয় নি। আমি হতাশা এবং একঘেয়েমিতে ভুগছি। মনে হচ্ছে সময় চলে যাচ্ছে অনেক, কিন্তু এগুনো হচ্ছে না এতটুকু। ছাত্রজীবনে অতি মিতব্যয়ী বাবার অবিবেচনাপ্রসূত কৃচ্ছতার শিকার হয়ে উপার্জনের নানা উপায় উদ্ভাবন করে চালাতে হয়েছে অনার্স-মাস্টার্স। তারপরও লাভ করেছি ১ম শ্রেণী। চাকরিও পেয়ে গেলাম অতি দ্রুত। কিন্তু তারপর আর কোনো নতুন লক্ষ্য বা ভিশন নিয়ে এগোনো হয় নি। কখনো ভাবি, সহকর্মীদের মতো রাতদিন প্রাইভেট পড়িয়ে লাখ টাকা উপার্জন করবো। কখনো ভাবি, বিদেশে উচ্চতর পড়াশোনার জন্যে যাবো। আবার কখনো ভাবি, চাকরি বদলাবো। কিন্তু আসলে আমার কী করা উচিত তা আমি জানি না।

**উত্তর :** আমাদের সমস্যাটা এখানে যে, আমরা সবাই অনেক বড় কিছু করতে চাই। কিন্তু সেটার জন্যে যেভাবে কাজ করা দরকার-উদ্যমী হওয়া দরকার সেটা আমরা হই না। যেমন, আপনি বলেছেন, ছাত্রজীবনে উপার্জনের জন্যে সময় দিয়েও আপনি প্রথম শ্রেণী পেয়েছেন। তার মানে আপনি মেধাবী।

মেধার সর্বোচ্চ প্রয়োগ করে সর্বোচ্চ সাফল্য পাওয়াও আপনার পক্ষে সম্ভব ছিলো। কিন্তু সে লক্ষ্য আপনার ছিলো না। আপনি ফার্স্ট ক্লাস পেয়েই তৃপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট আর হতে চান নি। এখনো আপনি একটা ভালো চাকরি, নির্বাণ্ণাট নিরিবিলি জীবন, আরাম-আয়েশের সুযোগ-

এরকম অল্প কিছুতেই তৃপ্ত। কিন্তু যেহেতু আপনার মেধা আছে এবং কলেজের বাইরেও বেশ একটা সময় আপনার কেটে যাচ্ছে অর্থহীনভাবে—সেজন্যেই এ অস্থিরতা, একঘেয়েমি।

আসলে আমাদের অসুবিধাটা হচ্ছে, আমরা সাময়িক সাফল্যে তৃপ্ত হয়ে যাই। মনে করি যে, বড় কিছু করে ফেললাম। হতাশা ব্যর্থতা আর ভোগান্তির শুরু হয় এখান থেকেই। এজন্যে প্রতিটি অর্জনকেই ভাবতে হবে গ্রাউন্ড জিরো। অর্থাৎ এটা যেন অর্জন নয়, এ হলো ধ্বংসস্তুপ। এখান থেকে এখন আমাকে নতুনভাবে শুরু করতে হবে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অবিস্মরণীয় সাফল্যের পরবর্তী বাংলাদেশে এত ব্যর্থতা, অরাজকতা আর হতাশার কারণও কিন্তু এই একই। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে আমরা গ্রাউন্ড জিরো ভাবতে পারি নি। ফলে বিজয় আমরা পেয়েছি কিন্তু বিজয়ের পর আমরা কী করবো—সে লক্ষ্য আমাদের সামনে ছিলো না। তাই আমরা প্রাচুর্যের পথে এগুতে পারি নি।

আপনি আপনার এ হতাশা, একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাবেন, যদি ‘এর পরে কী’—এ লক্ষ্য আপনি স্থির করতে পারেন। তা অবশ্যই হতে হবে অর্থপূর্ণ, মহৎ কোনো লক্ষ্য।

## শ্রমানন্দ

**প্রশ্ন :** নিজেকে সাফল্যের কেন্দ্রবিন্দুতে নিতে হলে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে? শ্রমানন্দ শব্দটি বুঝলাম না। ব্যাখ্যা করলে খুশি হবো।

**উত্তর :** আসলে সাফল্য হচ্ছে এক বিরামহীন প্রচেষ্টার নাম। সাফল্যের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকতে চাইলে প্রতি মুহূর্তে রক্তকে ঘাম করে ঝরাতে হবে এবং রক্তকে ঘাম করে ঝরানোর মতো মানসিক উদ্দীপনা, উদ্যম, উদ্যোগ ও শক্তি আপনার থাকতে হবে। শ্রমানন্দে কাজ করতে হবে, অর্থাৎ শ্রমকেই আনন্দে রূপান্তরিত করতে হবে।

পবিত্র কোরআনে সূরা বালাদের চার নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘লাকাদ খালাক নাল ইনসানা ফি কাবাত’—‘আমি মানুষকে কষ্ট ও পরিশ্রমনির্ভর করে সৃষ্টি করেছি।’ অর্থাৎ যত পরিশ্রম করবেন তত আপনি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।



যেমন একটা উদাহরণ দেয়া যায়। একটা মেশিন বা একটা ইউনিট বা একটা ফ্যাক্টরিকে যত ফুল ক্যাপাসিটিতে কাজ দেয়া যায়, তত সে মেশিন বা ইউনিট বা ফ্যাক্টরির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে, তত সেটা লাভজনক অবস্থায় থাকবে। আর যদি এটাকে রেস্ট দেয়া হয়, ওয়াক আউট/ লক আউট করা হয়, তাহলে কী হয়, তার একটা উদাহরণ আদমজী জুট মিল। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এই জুট মিলটি একসময় ছিলো সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গর্ব। তখনকার দিনে বিদেশি কোনো রাষ্ট্রপ্রধান ঢাকায় এলে তাকে আদমজী জুট মিল দেখাতে নিয়ে আসা হতো। এই মিলের মালিক আদমজী পরিবারও ছিলো শীর্ষ ধনী পরিবার।

কিন্তু কাজ দিতে না পারার কারণে স্বাধীনতা পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যেই এটা পরিণত হলো শ্বেতহস্তিতে। আয়ের তুলনায় ব্যয় এত বেশি হলো যে, মিল আর চালানো যাচ্ছিলো না। ফলে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক করে বন্ধ করে দেয়া হলো। বলা হয়, আধুনিক যুগে পাটের চাহিদা কম। কিন্তু যারা দক্ষ ব্যবস্থাপনা করতে পেরেছে, শ্রম দিয়েছে, তাদের দেশে জুট মিল বিকশিত হয়েছে, হচ্ছে এখনো।

আদমজী জুট মিল যখন ফুল ক্যাপাসিটিতে চলেছে, তখন সেটা লাভজনক ছিলো, কিন্তু যখন আমরা এটাকে বিশ্রাম দিলাম, আরাম দিলাম, তখন থেকেই আস্তে আস্তে এটা তার শ্রী হারাতে শুরু করলো এবং এখন এর কোনো অস্তিত্বই আর নেই।

মনে রাখবেন, জীবন হচ্ছে সময়ের সমষ্টি, আর সময় অর্থবহ হয় কাজের মধ্য দিয়ে। স্রষ্টা আমাদেরকে মানুষ বানিয়ে পাঠিয়েছেন। কিছু মানবীয় গুণাবলি, কিছু কল্যাণকর গুণাবলি দিয়ে পাঠিয়েছেন। সৃজনশীল শক্তি দিয়ে পাঠিয়েছেন, মমতা দিয়ে পাঠিয়েছেন যাতে আমরা মানুষের কল্যাণ করতে পারি, নতুন নতুন সৃষ্টি করতে পারি। যাতে নতুন কিছু করার তৃপ্তিতে, সৃষ্টির আনন্দে আনন্দিত থাকি। অর্থাৎ মানুষ হিসেবে কর্মের যে স্বাধীনতা, সৃজনশীলতার যে স্বাধীনতা—এই স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষকে দেয়া আছে।

সাফল্যের কেন্দ্রবিন্দুতে আসার জন্যে কাজের এই আনন্দকে উপলব্ধি করতে হবে। রক্তকে ঘাম হয়ে ঝরতে দিতে হবে, তাহলে ঘামের ঐ নোনা পানিতে সাফল্যের বীজ অঙ্কুরিত হবে। যত বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিশ্রম করবেন, তত আপনার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবেন। লক্ষ্যের জন্যে কাজকে ভালবেসে আনন্দের সাথে রক্তকে ঘাম হয়ে ঝরতে দেয়ার নামই শ্রমানন্দ।

**প্রশ্ন :** আমি ঠিক করেছি প্রতিদিন চার ঘণ্টা ঘুমাবো। বাকি ২০ ঘণ্টা রুটিন করে পড়ালেখা, মেডিটেশন আর ফাউন্ডেশনে সময় দেব। কিন্তু রাত ১০টা থেকে ১১টা বাজতেই ভীষণ ক্লান্ত লাগে, ভোরেও ওঠা হয় না। গুরুজী, অক্লান্ত পরিশ্রমের রহস্য কী? নিয়মিত প্রাণায়াম ও ব্যায়াম করি। তারপরেও আলস্য কাটাতে পারছি না। আশা করি একটা পরামর্শ দেবেন।

**উত্তর :** বোঝা যাচ্ছে যে, আপনি একটু নন্দলাল। নন্দলাল মানে আদরের দুলাল। পরিশ্রম এখনো বোঝেন নি। সেজন্যে ভাবেন যে, বললেই শরীর শুনবে। আসলে তা নয়। প্রস্তুতি প্রয়োজন। প্রতিদিন কমপক্ষে শতবার মনে মনে বলুন, সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন। এরপর ৪০ দিন বা ৯১ দিনের জন্যে লামায় কোয়ান্টামমে চলে যাবেন। পাহাড়ে প্রতিদিন সকালবেলা ১০ কিলোমিটার হাঁটবেন। ৪০ দিন হাঁটার পর আপনি অক্লান্ত পরিশ্রমের রহস্য কিছুটা বুঝতে পারবেন। সেই সাথে দূর হয়ে যাবে ‘নন্দলাল’ ভাবটাও।

**প্রশ্ন :** যখন কোনো কাজের মধ্যে ঢুকে যাই, একেবারে পারিপার্শ্বিক খেয়াল থাকে না। যে জন্যে অনেকে আত্মকেন্দ্রিক বা অসামাজিক ভাবে, এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?

**উত্তর :** আসলে চারপাশটা খেয়াল করতে পারাটাই হচ্ছে ভালো। তবে যখন যে কাজ-সে কাজের মধ্যে ডুবে যাওয়াটা আরো ভালো। কারণ কাজের মধ্যে ডুবে যেতে পারলে সে কাজের প্রতি সুবিচার করা হয়। এতে প্রথম প্রথম সামাজিকভাবে কিছু সমস্যা হতে পারে। কিন্তু যখন তারা দেখবে আপনি আসলে একজন মনোযোগী কর্মী-কাজ পেলে তাতে আত্মনিমগ্ন হয়ে যান তখন আর কেউ কিছু মনে করবে না। কারণ মানুষ কাজের ফলাফলটা দেখতে চায়।

**প্রশ্ন :** আমি চাকরির পাশাপাশি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংসহ ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স ২য় শ্রেণীতে পাশ করেছি। বর্তমানে এমবিএ-র ফলাফলের অপেক্ষায় আছি। আশা করছি ১ম শ্রেণী পাবো। মা প্রতিরাতে বকাঝকা করেন। মা-র ধারণা আমি বড় কোনো অসুখে আক্রান্ত হতে যাচ্ছি। অথচ কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট হওয়ার পর মাত্র দুই দিন জ্বরে ভুগেছি। এ পর্যন্ত আর কিছু হয় নি। আমার মায়ের ধারণা কি সঠিক?

**উত্তর :** আসলে সন্তানদের কষ্টসহিষ্ণু বা পরিশ্রমী করে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের অধিকাংশ মা-বাবাই অবিদ্যা দ্বারা আক্রান্ত। তারা মনে করেন, পরিশ্রম করলে বোধহয় ছেলে-মেয়ের শরীর খারাপ হবে। মানসিক চাপ পড়বে। আপনার মায়ের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। তিনি হয়তো অবচেতনভাবে চান না যে, আপনি এত পরিশ্রম করেন। আপনাকে নিয়ে টেনশনের কারণেই হয়তো কথাগুলো বলেন। ভাবেন, আপনি যদি আরেকটু কম কাজ করতেন তাহলে হয়তো আরামে থাকতেন।

কিন্তু কাজটাই যে আনন্দের উৎস হতে পারে—এটা অধিকাংশ মায়েরা বোঝেন না তাদের সন্তান বাৎসল্যের কারণে। বাস্তবতা হচ্ছে—কাজ করলে কেউ কখনো অসুস্থ হয় না, অসুস্থ হয় টেনশন করলে। আপনার মায়ের ধারণা ঠিক হওয়ার কোনো কারণ নেই। এটা একটা আশঙ্কা। যখনই মা এটা বলেন, আদর করে তাকে বলবেন, মা, তুমি আমার জন্যে দোয়া কর। তুমি বল—তুই খুব ভালো থাকবি। তাহলে দেখবে, আমি খুব ভালো থাকবো।

মায়ের হাতটা মাথার ওপর তুলে নেন। প্রত্যেকদিন সকালবেলা বলেন, আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে, তুমি দোয়া করে দিলে আমার কোনো অসুখ হবে না। তখন মা এত প্রভাবিত হয়ে যাবেন যে, দোয়া না করে এরপর থেকে আপনাকে আর বেরোতে দেবেন না। আর এসব কথাও আপনাকে আর বলবেন না। মা-ও তৃপ্ত হবেন যে, আমার ছেলে এখনো আমাকে কত ভালবাসে, আমার দোয়া কত গুরুত্বপূর্ণ তার কাছে।

আসলে জীবনে সাফল্য লাভ করতে হলে আপনাকে কষ্টসহিষ্ণু এবং পরিশ্রমী হতে হবে। আল্লাহ যে অনুগ্রহ সম্পদ, যে নেয়ামত, যে রিজিকের কথা বলেছেন—এটা অনুসন্ধান করে পেতে হবে। যেকোনো কষ্ট, যেকোনো পরিশ্রমের জন্যে তৈরি থাকতে হবে। আপনি যদি অলীক কল্পনার পেছনে ঘোরেন, তাহলে আপনি অনুগ্রহ সম্পদের অধিকারী হতে পারবেন না। আল্লাহর অনুগ্রহ এবং সম্পদ অনুসন্ধানে তারাই সফল হবে, যে শোকরগোজার, যে কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। যে স্বাবলম্বী, যে স্বনির্ভর, যে নিজে উদ্যোগী হয়, নিজে কাজ করে এবং অন্যকেও কাজে অনুপ্রাণিত করে।

**প্রশ্ন :** শ্রমানন্দ সৃষ্টির প্রক্রিয়া কী? কাজে আনন্দ না পেলে কী করবো?

**উত্তর :** শ্রমানন্দ সৃষ্টির জন্যে সবসময় অটোসাজেশন দেবেন, ‘আমি আনন্দের সাথে কাজ করছি। প্রতিটি কাজ আমার জন্যে নতুন আনন্দ এনে দিচ্ছে’।

আর আপনি যদি জানেন আপনি কেন কাজ করছেন তাহলে আপনার কাজে আনন্দ পাওয়া সহজ হবে। এ নিয়ে গল্প আছে। মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব আশ্রয় মতি মসজিদ নির্মাণ করছেন। তিন শ্রমিক কাজ করছিলেন। প্রথমজনকে জিজ্ঞেস করা হলো-আপনি কী করছেন? শ্রমিক জবাব দিলো-আমি পাথর কাটছি। দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞেস করা হলে সে জবাব দিলো-আমি পাথরটা এমনভাবে কাটছি যাতে এটা সুন্দর চৌকোনা হয়-নির্ধারিত জায়গায় মাপমতো বসে যায়। তৃতীয়জনকেও যখন প্রশ্ন করা হলো-আপনি কী করছেন, সে জবাব দিলো-আমি মসজিদের জন্যে পাথর এমনভাবে মসৃণ করছি যাতে এ পাথরের ওপর নামাজে দাঁড়িয়ে সেজদায় গিয়ে পাপী-তাপী পুণ্যাত্মা যে কেউ আল্লাহর স্মরণে লীন হয়ে যেতে পারে।

এ গল্পে তিন শ্রমিকের উত্তরের মধ্য দিয়ে আমরা কাজের প্রতি তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পাই। প্রথম শ্রমিকের কাছে কাজটা ছিলো স্রেফ জীবিকার একটা মাধ্যম। দ্বিতীয় শ্রমিকের কাছে কাজ হলো একটা প্রফেশন-পাথর কাটার কাজটা সে সুন্দর ও সুচারুরূপে করতে চায়, কারণ সে চায় একজন দক্ষ শ্রমিক হিসেবে নিজের পরিচিতি। তৃতীয় শ্রমিক কাজটিকে নিয়েছে একটি মিশন হিসেবে। তার কাছে কাজ মানে একটি বড় স্বপ্নের বাস্তবায়ন। উপার্জন বা প্রফেশন গড়ার জন্যে নয়, সে কাজ করে কাজের প্রতি ভালবাসার জন্যে, সৃষ্টির প্রতি ভালবাসার জন্যে।

আপনি যে কাজই করুন না কেন, যদি আপনার কাছে এটা পরিষ্কার থাকে যে, কেন আপনি কাজ করছেন এবং সে কেন-র উত্তর যদি হয় অর্থপূর্ণ কল্যাণকর কিছু করা তাহলেই কাজ হবে আপনার অফুরন্ত আনন্দের উৎস।

আসলে আমরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যা দেখি সেটা স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন হচ্ছে সেটা যা ঘুমাতে দেয় না। সফল ও প্রাচুর্যমন্ডিত মহৎ জীবনের যে স্বপ্ন-সেই স্বপ্ন যখন আপনি দেখবেন, তখন আপনার ঘুম কমে যাবে। আপনি পরিশ্রম করতে শিখবেন। সহনশীল হতে শিখবেন। সজ্জবদ্ধ হতে শিখবেন। আপনার স্বপ্নের সাথে তখন মিশে যাবে হাজারো মানুষের স্বপ্ন। আপনি তখন শুধু সাফল্য ও প্রাচুর্যেই অবগাহন করবেন না, পরিণত হবেন কালজয়ী অনন্য মানুষে।

**প্রশ্ন :** আপনি গ্রাউন্ড জিরো ও শ্রমানন্দের কথা বলেন। আমি তো জিরোতে নাই-ই, বরং মাইনাস-এ আছি। আমার পারিপার্শ্বিক ও আর্থিক প্রতিবন্ধকতা আছে। সেইসাথে আছে কিছু শারীরিক প্রতিকূলতা। পরিশ্রমের কথা বাদ দিলাম, কোনো কিছুতেই আনন্দ পাই না। আমার পক্ষে কি কিছু করা সম্ভব?

**উত্তর :** মাইনাসে থাকলে তো আরো ভালো। আপনার তো আর নতুন করে কিছুই হারানোর নেই। যার হারানোর কিছু নেই, তিনিই নিশ্চিত মনে সামনে এগুতে পারেন। কারণ তার কোনো পিছুটান থাকে না।

এই মাইনাসটাকেই গ্রাউন্ড জিরো ধরুন। এখান থেকেই শুরু করুন। শতকরা ৯০ জন সফল মানুষই আর্থিক পারিবারিক পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা নিয়ে মাইনাস অবস্থায়ই জন্মগ্রহণ করেছেন। তারা সেখান থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে সাফল্যের পথে এগিয়ে গেছেন। আর্থিক ও পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতাই তাদের ভেতরের শক্তির জাগরণের কারণ হয়েছে।

দৈহিক কোনো প্রতিবন্ধকতা ও সফলদের সাফল্যগাথা রচনায় অন্তরায় হতে পারে নি। মহাকবি হোমার দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ছিলেন। অমর সুরস্রষ্টা বেটোভেন জীবনের শেষ বছরগুলোয় কানে কিছুই শুনতেন না। কলকাতার মাসুদুর রহমান দুই পা কাটা পড়ার পরও ইংলিশ চ্যানেলে সাঁতার কেটে ১৯৯৫ সালে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

ফরাসি নাগরিক ফিলিপ ট্রেইজন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কনুই থেকে দুই হাত ও দুই পা হারান ১৯৯৪ সালে। পঙ্গু হয়ে বাড়িতে থাকাকালে সাঁতারুদের ওপর এক তথ্যচিত্র দেখে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। শুরু হয় প্রস্তুতি। দুই বছর ট্রেনিং নেন। ৪২ বছর বয়সে ২০১০ সালে ঘণ্টায় তিন কিলোমিটার গতিতে ১৩ ঘণ্টায় ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন। সৃষ্টি করেন হাত এবং পা ছাড়া সাঁতার কাটায় নতুন ইতিহাস।

১০ এপ্রিল, ২০১০-দৈনিক ইত্তেফাকের একটি রিপোর্ট ছিলো-সহপাঠীরা বেঞ্চে বসে পরীক্ষা দিচ্ছে। পাশেই মেঝেতে চটে বসে পরীক্ষা দিচ্ছে প্রতিবন্ধী কফিল উদ্দিন। তার দুই হাত-পা থেকেও নেই। এসএসসি পাশ করার পর অভাবের কারণে চট্টগ্রামে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতে যায় সে। সেখানে একটি ভবনের ছাদে রড বাঁধাই করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের তারে রড লাগার সাথে সাথে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারায়। চিকিৎসার সময় দুই হাতের কনুই ও দুই পায়ের হাঁটুর নিচ পর্যন্ত কেটে ফেলতে হয়।

গ্রামের বাড়িতে ফিরে সে মায়ের ছোট্ট মুদির দোকানে কাজ করে। লেখাপড়ায় আগ্রহ ছিলো প্রবল। প্রথমে মুখে কলম নিয়ে লেখার চেষ্টা করে, হয় না। পরে দুই কনুইয়ের মাঝখানে কলম ধরে লেখার চেষ্টায় তিন বছরে সফল হয়। এখন সে দ্রুত লিখতে পারে। এইচএসসি পরীক্ষার শতভাগ উত্তর সে নির্ধারিত সময়েই লিখেছে। লেখাপড়া শেষ করে সে বিচারক হতে চায়।

সীমাবদ্ধতা কীভাবে শক্তি হতে পারে, প্রতিবন্ধিত্বও কীভাবে সাফল্যের উৎস হতে পারে এ নিয়ে জেনের বিখ্যাত গল্প রয়েছে—

এক জাপানি বালক। ১৩ বছর তার বয়স। একটা দুর্ঘটনায় বাম হাত হারিয়ে ফেললো। তার ছিলো জুডো শেখার প্রচণ্ড আগ্রহ। কিন্তু যেহেতু তার বাম হাত নেই, কোনো জুডো-গুরু তাকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হলেন না—বাম হাত নেই, একে কী শেখাবো? জুডো তো একটা সাংঘাতিক ব্যাপার! যেটার জন্যে দুটো হাতের প্রয়োজন।

ছেলেটি এই গুরুর কাছে যায়, ঐ গুরুর কাছে যায়। সবাই শুধু বলে যে, না, তুমি জুডো শিখতে পারবে না। তোমার জন্যে এগুলো নয়। তুমি বরং অন্য কিছু কর। কিন্তু বালক বিশ্বাসে অটল। বাম হাত নেই তাতে কী? জুডো সে শিখবেই। ঘোরাঘুরি করতে করতে শেষমেশ সে এক বয়োবৃদ্ধ গুরুর সন্ধান পেলো। বালকের শেখার আকুতি দেখে গুরুর মায়া হলো। তিনি তাকে বললেন যে, ঠিক আছে, আমি তোমাকে শেখাবো। তবে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, আমি যা বলবো তা তুমি মানবে এবং লেগে থাকবে।

গুরু হলো তার জুডো শেখা। দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল। বছর পার হলো। একসময় ছেলেটি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো—প্রতিদিন তার গুরু তাকে একটা কৌশলই, জুডোর একটি প্যাঁচই কেবল শেখাচ্ছেন। ডান-বাম, সামনে-পেছনে আর কিছুই না, শুধু একটাই কৌশল, একটাই প্যাঁচ।

একসময় তার মনে প্রশ্ন জাগলো, দুঃখ হলো—জুডোর এত প্যাঁচ আছে, সব বাদ দিয়ে গুরু আমাকে শুধু একটি প্যাঁচ শেখাচ্ছেন? আবার সাহসও পায় না যে, গুরুর সামনে বললে আবার না বেয়াদবি হয়ে যায়।

একদিন সাহস করে বলেই ফেললো যে, সেনসেই! (জুডো-গুরুকে শিষ্যরা সম্মান করে ডাকে সেনসেই) আমি কি আর কোনো কৌশল শিখবো না?—বললো খুব করুণ স্বরে। গুরু জবাব দিলেন, তুমি একটি কৌশল শিখছো আর এই একটি কৌশলই, একটি প্যাঁচই তোমার ভালোভাবে রপ্ত করা দরকার। অতএব একাধিচিন্তে অনুশীলন করে যাও।

গুরু বলে দিয়েছেন। তার কাছে এটুকুই যথেষ্ট। যেহেতু গুরু তাকে খুব স্নেহ করেন, একটা প্যাঁচই মমতার সাথে বার বার বার বার শেখাচ্ছেন—সে অনুশীলন করে চললো। পাঁচ বছর পার হয়ে গেল এই একটা প্যাঁচ শিখতে। দীর্ঘ অনুশীলনে এই প্যাঁচের সবকিছু দারুণভাবে রপ্ত করলো সে।

এবার গুরু সিদ্ধান্ত নিলেন তাকে প্রতিযোগিতায় নামানোর। প্রতিযোগিতা গুরু হলো। প্রথম দুই ম্যাচে খুব অনায়াসে সে ঐ এক প্যাঁচ দিয়েই দুজনকে

হারিয়ে দিলো। এবার ফাইনাল। ফাইনাল ম্যাচে সে সত্যি সত্যি বেশ বেকায়দায় পড়লো। কারণ তার প্রতিপক্ষ বেশ শক্তিশালী আর অভিজ্ঞ।

একসময় মনে হলো যে, বালকটি বোধহয় হেরে যাচ্ছে। ভীষণ মার খাচ্ছে। রেফারিও বুঝতে পারছে না খেলা কি চলতে দেবে, না থামিয়ে দেবে। কারণ যেভাবে ছেলেটি মার খাচ্ছে তাতে যেকোনো সময় সে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু তার গুরু ইশারা করলেন যে, না, খেলা চলুক।

বিরতি হলো। গুরু বালকের মাথায় হাত বুলিয়ে উৎসাহ দিলেন। সুন্দর খেলছো। তুমি জিতবে। খেলা আবার শুরু হলো। শক্তিশালী প্রতিপক্ষ অধৈর্য হয়ে উঠলো। মরিয়া হয়ে আক্রমণ করতে লাগলো। বালক ঠান্ডা মাথায় প্রতিটি আক্রমণ কাটাচ্ছে। হঠাৎ প্রতিপক্ষ একটা ভুল করার সাথে সাথে বালক তার পঁচাচ প্রয়োগ করলো এবং জিতে গেল। বালক চ্যাম্পিয়ন হলো।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে বালক তো মহাখুশি। এটা তার কাছেও বিস্ময়কর যে, একটিমাত্র কৌশল প্রয়োগ করে সে জিতে গেল! ফেরার পথে সে গুরুকে জিজ্ঞেস করলো যে, সেনসেই! এই একটিমাত্র কৌশল প্রয়োগ করে আমি জিতলাম কী করে?

তখন গুরু বললেন যে, দেখ, তুমি দুটি কারণে জিতেছো। এক হচ্ছে, তুমি জুডোর খুব দুরূহ একটি কৌশল, খুব কষ্টকর জটিল একটি পঁচাচকে খুব ভালোভাবে শিখেছো। দুই হচ্ছে, আমার জানামতে এই পঁচাচ থেকে বাঁচার জন্যে প্রতিপক্ষের একটিই পথ আছে। তা হলো প্রতিদ্বন্দ্বীর বাম হাত ধরে ফেলা। সে যদি তোমার বাম হাত ধরতে পারতো তাহলেই বাঁচতো। কিন্তু তোমার তো বাম হাতই নেই। অতএব তুমি জিতে গেছো।’

এই জাপানি বালকের মতো সীমাবদ্ধতাই হতে পারে আপনার শক্তি, হতে পারে আপনার বিজয়ের অনুঘটক। আসলে শারীরিক আর্থিক পারিবারিক বা পারিপার্শ্বিক—কোনো সীমাবদ্ধতাই সাফল্যের পথে অন্তরায় নয়, যদি আপনি সীমাবদ্ধতা নিয়ে হীনম্মন্যতায় না ভোগেন। কারণ হীনম্মন্যতা নেতিবাচকতার জন্ম দেয়। আর নেতিবাচকতার পরিণতি হচ্ছে হতাশা আর ব্যর্থতা।

আপনি শুধুমাত্র আপনার হীনম্মন্যতাকে জয় করুন। ভাবুন—এটা নাই, ওটা নাই তাতে কি! আমিও মানুষ। আমার একটা জীবন আছে, মস্তিষ্ক আছে, চিন্তা করার শক্তি আছে। ব্যস, আর কিছু দরকার নেই। বিশ্বাসকে প্রবল করুন। সাহসী হোন। লক্ষ্য স্থির করুন। নিরলস পরিশ্রম করুন। সাফল্য আপনার। আনন্দ আপনার। সারা পৃথিবী আপনার।

..প্রিয় পাঠক,

এ বইয়ের কোনো বিষয় সম্পর্কে আপনার কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকলে  
নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে পারেন :

মহাজাতক

যোগ ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,  
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭।

E-mail : [info@quantummethod.org.bd](mailto:info@quantummethod.org.bd)



## হাজারো প্রশ্নের জবাব ॥ ১ম পর্ব ‘মেডিটেশন’-এ যা ছিলো

কোয়ান্টাম  
কোয়ান্টাম কী  
কোয়ান্টাম মেথড  
কোর্স করতে চাচ্ছি করতে পারছি না  
অন্যকে কোর্সে উদ্বুদ্ধ করা  
কোর্স করার পর বিরূপ পরিস্থিতি  
কোয়ান্টাম, মেডিটেশন ও ইসলাম  
কোর্স ফি  
কোর্স করার পরে পরিবারের কোনো  
সদস্য যখন ফাউন্ডেশনে অগ্রহী  
কোয়ান্টাম চেতনার সাথে অসামঞ্জস্যতা

### মেডিটেশন

সাফল্যের শক্তি রহস্য  
মেডিটেশনের প্রস্তুতি ও প্রক্রিয়া  
মনের বাড়ি  
অবলোকন  
শিখিলায়ন  
অটোসাজেশন  
অটোসাজেশন চর্চা  
অটোসাজেশন কী হবে  
মেডিটেশন অনুশীলন  
কোন মেডিটেশন করবো  
কীভাবে লেভেল ভালো করবো  
ক্যাসেট/ সিডি-তে না নিজে নিজে  
ফল পাচ্ছি না  
মেডিটেশনে ঘুম পায়  
মেডিটেশনে চোখে পানি  
মেডিটেশনে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হওয়া  
মেডিটেশনে শারীরিক মানসিক অস্বস্তি  
চর্চা : বিভিন্ন  
মেডিটেশনের অপব্যবহার  
অন্যকে মেডিটেশন শেখানো  
বিরতকর প্রশ্ন  
মেডিটেশন কোর্স পরবর্তী করণীয়  
কোয়ান্টা ধ্বনি ও ভঙ্গি  
কমান্ড সেন্টার ও অন্তর্গুরু

কমান্ড সেন্টারে অন্যকে হিলিং  
প্রজ্ঞা  
প্রকৃতির সাথে একাত্মতা  
ধ্যানের গভীর স্তর ॥ কোয়ান্টায়ন

### দৃষ্টিভঙ্গি

দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব  
বিশ্বাস  
মনছবি ॥ জীবনের লক্ষ্য  
ব্যর্থতার পরে দৃষ্টিভঙ্গি  
নিয়তি ॥ ভাঙতে হবে নেতিবাচকতার বৃণ্ড  
তাবিজ/ জাদু/ বান-টোনা/ গণক/ রত্নপাথর  
এস্ট্রলজি  
পোশাক  
অবিদ্যা  
পাশ্চাত্য ও অবিদ্যা  
মিডিয়া ও অবিদ্যা  
কুসংস্কার  
কোয়ান্টাম দৃষ্টিভঙ্গি ॥ দি সায়েন্স অফ লিভিং

### প্রশান্তি

কেন টেনশন  
তথাকথিত বিনোদন এবং প্রশান্তি  
শুকরিয়া-টেনশনের সমাধান  
রাগ-ক্ষোভ-অভিমান  
ভয়  
নেতিচিন্তা  
দুঃখ ও হতাশা  
হীনম্মন্যতা  
আলস্য ও দীর্ঘসূত্রিতা  
মোবাইল/ গেমস/ ইন্টারনেট  
ঈর্ষা/ হিংসা/ ঘৃণা  
প্রশংসার লোভ/ অহংকার  
অনুশোচনা/ উত্তরণ  
জানাকে মানায় রূপান্তর  
অনন্য মানুষ  
গুরুজী/ মহাজাতক/ এস্ট্রলজি



পরিবার এখন লভভত্ব হচ্ছে কনজুমারিজমের ঘূর্ণিঝড়ে। মিডিয়া, মোবাইল আর ইন্টারনেটের নেতিবাচক প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে পরিবারে। ফেসবুক ও মোবাইলের কল্যাণে(!) পরকীয়া আর মেন্টাল লিভ টুপেন্দার নতুন প্রজন্মকে করছে মেরুদণ্ডহীন। তরুণ প্রজন্মের একটা বড় অংশ হয়ে যাচ্ছে সিদ্ধান্তহীন, দারিদ্রহীন।

বিশ্বে ১৯৯৫ সালে সুখী মানুষের দেশের তালিকায় বাংলাদেশ ছিলো এক নম্বরে। আর এ সুখের উৎস পরিবারের প্রতি শাস্ত্র মমত্ববোধ। প্রেম-বিদ্বে-পরিবারে সুখী হওয়ার হাজার বছরের পরীক্ষিত সূত্রগুলোই বেরিয়ে এসেছে শত শত প্রশ্নের জবাবে।

এই প্রশ্ন-উত্তরের সংকলিত রূপই হচ্ছে—হাজারো প্রশ্নের জবাব ৩। প্রেম-বিদ্বে-পরিবার



## হাজারো প্রশ্নের জবাব

২।

শিক্ষা-ক্যারিয়ার-সাফল্য

### মহাজাতক

শহীদ আল বোখারী মহাজাতক বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক মেডিটেশন চর্চার পথিকৃৎ। জাগতিক ও মানবিক সমস্যা সমাধানের জন্যে জীবনযাপনের বিজ্ঞান কোয়ান্টাম মেথড এর উদ্ভাবক ও প্রশিক্ষক। পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে ২০ বছর ধরে তিনি একনাগাড়ে দেশের সর্বত্র কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। আর মেডিটেশন চর্চার ইতিহাসে উদ্ভাবক কর্তৃক এককভাবে রাস নিয়ে ৩৫০টি কোর্স সম্পন্ন করা বিশ্বে এই প্রথম।

দুই যুগ ধরে বাংলা ভাষায় সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ 'কোয়ান্টাম মেথড' ছাড়াও তার রচিত 'আত্মনির্মাণ', 'চেতনা অতিচেতনা নিরাময় ও প্রশান্তি', 'জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন' ও এর ইংরেজি সংস্করণ '1001 Autosuggestions to change your life', 'আলোকিত জীবনের হাজার সূত্র কোয়ান্টাম কথিকা' এবং 'কোয়ান্টাম ১ হাজারো প্রশ্নের জবাব' পাঠকের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে।

### কোয়ান্টাম

কোয়ান্টাম আধুনিক মানুষের জীবনযাপনের বিজ্ঞান। সঠিক জীবনদৃষ্টি প্রয়োগ করে মেধা ও প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকে অনন্য মানুষে রূপান্তরিত করাই এর লক্ষ্য। স্ব-উদ্যোগ, স্ব-পরীক্ষণ ও স্ব-অর্থায়নে সৃষ্টির সেবার সম্ভাবনাক্রমে কাজ করে বাংলাদেশকে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় আতিথে রূপান্তরিত করাই এর মনোভাব। কোয়ান্টাম মেথড অনুশীলন করে সমাজের সর্বস্তরের লাক্ষা মানুষ অশান্তিকে প্রশান্তিতে, রোগকে সুস্থতায়, ব্যর্থতাকে সাফল্যে, অভাবকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করেছেন। কোয়ান্টাম চর্চার মাধ্যমে আপনিও বদলে দিতে পারেন আপনার জীবন।



[www.quantummethord.org.bd](http://www.quantummethord.org.bd)